সূচীপত্র

বৈশাখ হইতে চৈত্র, ১৩৩৮

(লেখক লেখিকার নামানুসারে)

৫ম বর্ষ | বৈশাখ, ১৩৩৮ | ১ম সংখ্যা

নব-বর্ষে

অনেক আশা-নিরাশা, হর্ষ-বিষাদের মধ্য দিয়া প্রতি বৎসরই যেমন পুরাতন বর্ষ বিদায় হয় এবং অনেক উজ্জ্বল আশার ভিতর দিয়া নববর্ষের আগমনকে বরণ করা হয় এবারও পুরাতনকে তেমনি ভাবেই বিদায় দিয়া আমরা নূতন বছরকে বরণ করিয়া লইতেছি। নিখিল কালের প্রবাহে বর্ষ পরিক্রমণ একটা সামান্য বুদ্‌বুদের তুল্য হইলেও মানুষের স্বল্প স্থায়ী জীবনে এক একটা বর্ষ কম রেখাপাত করিয়া যায় না। বিশেষতঃ এই সময়ে—যখন যুগ পরিবর্ত্তনকারী রাষ্ট্রীয় উদ্বেলতা জাতিকে প্রতিনিয়ত আঘাতে সচেতন রাখিতেছে, যখন বিশ্বগ্রাসী প্রবল ক্ষুধার তরঙ্গে ভারত হাবুডুবু খাইতেছে, যখন তাহার স্বপ্ন-বিলাস সব ভাঙ্গিয়া আসিতেছে!

এমন সময়ও সাহিত্যের মধ্য দিয়াই আমরা বাংলার নর-নারীকে আমাদেরই প্রাণের কথা, হর্ষ-বিষাদ, আশা-নিরাশার কথা জানাইতে যাইতেছি। প্রতিদিন দেশের শিক্ষিত লেখক-লেখিকাদের মনে যে চিন্তার তরঙ্গ উঠিতেছে—তাহারই প্রকাশ আমরা করিতেছি। ইহার সঙ্গে দেশের অন্তরাত্মার যোগ কতখানি তাহা পাঠক-পাঠিকারা সহজেই উপলব্ধি করিতে পারিবেন।

বাংলার মত নিরক্ষর ও স্বদেশী ব্যবসায় শূন্য দেশে মাসিক সাহিত্য প্রচার করিয়া দু'একজন ভাগ্যবান কিঞ্চিৎ লাভবান' হইলেও অনেকেই যে বিপুল ক্ষতি সহ্য করিতেছেন তাহাতে সন্দেহ নাই। কিন্তু এই ক্ষতির মধ্য দিয়াই বাংলার সাহিত্য-জীবনের স্পন্দন শোনা যাইতেছে—ইহাই পরম লাভ।—এই ক্ষতির রাজ্যেও পুষ্পপাত্রের পঞ্চম বর্ষে পদার্পণ আমাদিগকে নিরাশার মধ্যেও যথেষ্ট আশা দিতেছে।—

আজিকার নববর্ষে পুষ্পপাত্রের জনকস্বরূপ, প্রতিষ্ঠাতা সতীশচন্দ্রকে মনে পড়িতেছে। প্রিয়তমা কন্যা পদ্মের স্মৃতি জীবন্ত করিতে তিনি তাঁহার আজীবনের সাহিত্য-সাধনাকেও মূর্ত্ত করিয়া রাখিতে চাহিয়াছিলেন এই পুষ্পপাত্রের মধ্যেই—আজ কন্যা ও জনক দু'জনারই স্মৃতির অমর নিদর্শন হইয়াছে এই পুষ্পপাত্র।—

যে সব ক্ষমতাশালী লেখক-লেখিকার সাহায্য আমরা প্রতি মাসে নূতন ভাব সম্পদের অর্ঘে পাইতেছি—আজ নব বর্ষের প্রারম্ভে তাঁহাদিগকে শত শত ধন্যবাদ জানাইতেছি। আর যাহারা পুষ্পপাত্রকে জীবন্ত রাখিবার জন্য গ্রাহক-গ্রাহিকা হইয়া বা বিজ্ঞাপন দিয়া ইহাকে সাহায্য করিতেছেন তাঁহাদেরও শত ধন্যবাদ জানাইতেছি।

—আশার মধ্য দিয়াই আমরা নববর্ষকে বরণ করিয়া লইতেছি, আমাদের সে আশা সফল এবং পুষ্পপাত্রকে উত্তরোত্তর আরো সমৃদ্ধ করিতে পারেন—লেখক-লেখিকা ও গ্রাহক-গ্রাহিকারাই। আমরা সব সময়ই তাঁহাদের মনস্তুষ্টির সাধ্যমত চেষ্টা করিব—বিনিময়ে তাঁহাদের সকল সহানুভূতি পাইলেই আমাদের সকল প্রচেষ্টা সার্থক হইবে।

মর্ম্মর

শ্রীহেমেন্দ্রকুমার রায়

কবিতা

মর্ম্মর! মর্ম্মর! মনোহর মর্ম্মর
মর্ম্মের নর্ম্মের শোনো স্বর থর্ থর্!
কাঁপে মন, কাঁপে বন, পুলকের শিহরণ,
কান ভ'রে প্রাণ ভ'রে করে সুর বিহরণ!
ভরে সুখ, ভরে দুখ, ভরে মোর যৌবন,
চারি ভিত্ ভ'রে প্রীত্ গায় গীত মৌবন!
মনোহর মর্ম্মর—শোনো স্বর থর্ থর্!

মর্ম্মর! মর্ম্মর! তপতীর মর্ম্মর!
চুম্বনে রুম্ ঝুম্ কপোতীর অন্তর!
কুঞ্জ কি ঘন-শ্যাম, মুঞ্জরী অভিরাম!
দোল্ সখী, হিন্দোলে তান ধরে অবিরাম!
ঠোঁটে ঠোঁট্, বুকে বুক, জ্যোৎস্নার চন্দন!
নন্দিত প্রাণ-মন ছন্দিত নন্দন!
তপতীর মর্ম্মর—ছায়াময় অন্তর!

মর্ম্মর! মর্ম্মর! সুন্দর মর্ম্মর!
তটিনীর তট ঘেঁসে তোল্ কবি তোর ঘর!
কল-তান নদী গায়, তার সাথে মন ছায়—
পল্লব-মূর্চ্ছনা—জাগ্রতে, তন্দ্রায়!
তাই শোনে চন্দ্রমা, সূর্য্য ও শুকতারা,
তাই শোনে নিশীথের আঁখিজল-মুক্তারা!
সুন্দর মর্ম্মর—তোল্ হেথা তোর ঘর!

মর্ম্মর! মর্ম্মর! উন্মাদ মর্ম্মর!
সেই তালে বাদলের কালো মেঘ ঝর্ঝর!
মাঠে আজ কল্-কল্, বন্যার দলবল,
কুল্‌কুচো করে ত্যাখ্ মেঘ্‌লার দম্‌কল্!
দোলে গাছ ঝঞ্ঝায়, গায় মধু মল্লার,
অম্বরে ডম্বর, হুল্লোড় হল্লার!
সেই তালে মর্ম্মর, বর্ষার ঝর্ঝর!

মর্ম্মর! মর্ম্মর! নর্ত্তিত মর্ম্মর!
মঞ্জুস বঞ্জুল আনে প্রেম-মন্তর!
ফাল্গুনে বন্-বীথি, ভ'রে আজ কোন্ গীতি
চুল্‌বুলে ফুল্-বাঁশী, রাঙা সুর শোন্ নিতি!
চোখে মৌ-মঞ্জুষা—প্রাণ-চুরি মঞ্জুর!
কোকিলার মুখখানি পায় চুমু চঞ্চুর!
—আর নাচে মর্ম্মর,
অশোকের মন্তর!

মর্ম্মর! মর্ম্মর! অস্ফুট মর্ম্মর!
আসে শীত বর্ব্বর, কম্পিত জর্জ্জর!
কুয়াশার জাল-বোনা, মিছে আজ তাল-গোনা,
তার-ছেঁড়া শ্যাম-বীণা, মরা-চাঁদ আল্‌পনা!
হিমিকার বুক ভ'রে কাঁদে তাই বুল্‌বুলি,
পাতা সব ঝরা আর উড়ে যায় ফুল্-ধূলি!
ম'রে যায় মর্ম্মর—
হিম-শীতে জর্জ্জর!

বাণী

শ্রীজগদীশ গুপ্ত (গল্প)

কন্যা বাদলী বা অপর্ণা আই এ পাশ করিতেই মিষ্টার সেনের মনে হইল, তিনি পুরাপুরি 'ফরেন্' আব্‌হাওয়ায় পৌছিয়া গেছেন। পূর্ব্ব হইতেই ঐ দিক্‌কার হাওয়ার মাঝেই না হোক্, সীমানায় তিনি বিচরণ করিতেন—পঠদ্দশায় একবার তাঁর বিলাত যাত্রার প্রস্তাব হইয়াছিল; তিনি উপরকার ত্বক্ আর ভিতরকার জিহ্বা দুরস্ত করিতে সুরু করিয়াছিলেন...তাহাদের ভারতীয় গন্ধশূন্য করিতে সক্ষম হইয়াছিল কিনা এই সমস্যা মনে যখন প্রবল তখন দৈবাৎ যাওয়ার প্রস্তাব নাকচ্ হইয়া যায়—

কিন্তু সূত্র পাইয়া যে 'ফরেন্' ভাবটি তাঁহাকে আশ্রয় করিয়াছিল সেটা তাঁহাকে ত্যাগ করিল না।

সেন দম্পতির এ আক্ষেপ যাইবার নয়—বিলাত যাওয়া ঘটে নাই; অতিরিক্ত আক্ষেপ এই যে, সন্তান দুটিই কন্যা রূপে আসিয়াছে; কিন্তু এটি গোপনীয়; শয়নকক্ষে নিভৃত আলাপে গৃহিণীর মুখে এই আক্ষেপটা শোনা যায়—সেন নির্লিপ্ত, অন্ততঃ তাই মনে হয়।

ওঁরা বড় কন্যা সুপর্ণার বিবাহ দিয়াছেন বড় জমিদারের ঘরে; কিন্তু যতদূর অনুমান হয়, জমিদারের ঘরে সুপর্ণা সম্পূর্ণ সুখী নহে। জমিদারের গৃহে তাহাকে জমিদার গৃহিণীর মত থাকিতে হয়, অর্থাৎ "তুল্‌তামলি" ঝামেলার মাঝে তাহাকে শারীরিক ও মানসিক শ্রম করিতে হয়—মেম্‌সাহেবের মত নহে...তাকে যারা মা বলিয়া ডাকে তাহাদের দিকে সে আগে ভ্রূভঙ্গী করিয়া চাহিয়া থাকিত - এখন ক্রমশঃ সহিয়া আসিয়াছে।

কনিষ্ঠা কন্যা অপর্ণার বিবাহ দিলেই হয়—পাণিপ্রার্থী একাধিক সুযোগ্য ব্যক্তি পুনঃ পুনঃ হাজিরা দিতেছে; কিন্তু পাত্র নির্ব্বাচন লইয়া সেন দম্পতির মতভেদ ঘটিয়াছে।

* * * *

হরিবিলাস সেনের গৃহিণী চম্পকবরণীর প্রতি অসাধারন অনুরাগ; অনুরাগের একটা ফল ইহাই দাঁড়াইয়াছিল যে, স্ত্রীর বাক্যালাপে কর্ণপাত করিতে না চাহিলেও কথাগুলি ব্যর্থ হয় না—তার কর্ণে প্রবেশ করে—

এখনও করিতেছিল—

ঈষৎ উত্তাপের সহিত ঈষৎ শ্লেষ মিশাইয়া চম্পকবরণী বলিতেছিলেন,—সুপি সুখী হয় নাই তা' বোধ হয় এতদিনে তোমার কানে গেছে। খেটে' খেটে' তার শরীর ভেঙ্গে যাচ্ছে এ আমি দিব্য চক্ষে দেখতে পাচ্ছি। সে ত' জমিদার নয়—চতুর্ভুজ এক দেবতা; চার হাতে করে' মেয়েটিকে নাচিয়ে নিয়ে বেড়াচ্ছে।—বলিয়া চম্পকবরণী একটা নিঃশ্বাস চাপিয়া গেলেন...

জীবন্ত মানুষকে পুতুল নাচের পুতুল করিয়া তুলিলে যে শোচনীয় কাণ্ড ঘটিতে থাকে, একটি নিঃশ্বাসে সে কষ্টের কিছুই প্রকাশ হয় না।

ঠোঁটের ভিতর হইতে চুরুটটা টানিয়া লইয়া হরিবিলাস বলিলেন,—"ভাল কথা!...কাল দেখা করতে গিয়েছিলাম প্রবোধের সঙ্গে—দেখা হল; সুপিকেও দেখে এলাম, রং আরো খুলেছে মনে হ'ল, শরীরও বেশ—

চম্পকবরণী চোখ পাকাইয়া বলিলেন,—ঠিক্' ঠিক... আমার কথা উলটে' দেয়া চাই-ই ত, তোমার! একেবারে স্বচক্ষে দেখে' এসে দাঁড়িয়েছ হলপ্ করে...

হরিবিলাস বলিলেন,—অস্বাস্থ্যকর মেদবৃদ্ধি; তা ছাড়া আর কিছু নয়; আমি তা' দেখেই বুঝেছি—বদ্ধ বাতাসে বাসের দোষ।

কিন্তু চম্পকবরণী শান্ত হইলেন না; বলিলেন,—যে তোমাকে জানে না তার কাছে তোমার এই চালাকি চল্‌বে...

—আমি বল্‌ছিলাম...

চম্পকবরণী স্বামীর মুখের দিকে অনড় দৃষ্টিতে চাহিয়া বলিলেন,—তুমি কি বল্‌ছিলে আর তার অর্থ কি তা' আমি তখনই বুঝ্‌তে পেরেছি...তুমি অবাক্ হবার ভাণ করলেই আমি তা' ভুলে যাব না।

একটা আপোষের চেষ্টায় হরিবিলাস বলিলেন,—অপর্ণার সম্বন্ধে তোমার কি ইচ্ছেটা ?

—সুপির কথা ভেবে তোমার অস্বস্তি হয় কি না আমায় পরিষ্কার বলো দেখি আজ !

সেন বলিলেন,—হয়।

—তবে ?

বুঝিতে না পারিয়া সেন বলিলেন,—তবে কি ;

—তুমি প্রতুলকে আসকারা কেন দিচ্ছ তা' হলে ? উড়নচণ্ডীর একশেষ—চালচুলো নেই—সম্বলের মধ্যে এক মাতুল শকুনি আর কলকাতার কলেজের বিদ্যে ! ছিঃ।—বলিয়া চম্পকবরণী ঘৃণাভরে ওষ্ঠদ্বয় কিয়ৎক্ষণ বিকৃত করিয়া রাখিলেন।

হরিবিলাস সেই বিকৃতির দিকে চাহিয়া খুক্ খুক্ করিয়া একটু কাশিয়া লইলেন...নীরবতার মাঝে দু'জনের একজন অস্বাভাবিক অবস্থায় পৌছিয়া গেলে সঙ্গসুখে কেবল ব্যাঘাত ঘটে এমন নয়—কেমন যেন ভয় ভয় করে। বলা বাহুল্য হরিবিলাস স্ত্রীকে স্বাভাবিক অবস্থাতেই ভয় করিয়া চলেন।

চম্পকবরণীর ঝোঁক্ পড়িয়া গেল—কথাটা তিনি শেষ করিবেনই ; বলিলেন,—তুমি যাকে বলো চটপটে, আমি তাকে বলি ছট্‌ফটে...তুমি যাকে বলো চার চৌকশ, আমি তাকে বলি ডেঁপো'।...কিসের সঙ্গে কিসে !

হরিবিলাস বলিলেন,—আমি ত' তা কিছু বলিনি... তবে বুঝবার ভুলে—

—তুমি বলেছ, সত্য গোপনের অপরাধ কত বড় সে শিক্ষা তুমি পাওনি !...অতুল রায় পাচ বচ্ছর বিলেতে বাস করে এসেছে—তোমার ব্যবহারে তুমি তা অস্বীকার করছ, তার বাপের টাকায় বাংলাদেশের আদ্দেক কেনা যায়, কিন্তু মুক্তো তুমি চেন না।

হরিবিলাস বলিলেন—আমি ত' কারু স্বপক্ষে কি বিপক্ষে কিছুমাত্র জিদ্ প্রকাশ করিনি ! তুমি ভুল বলছ।

—ফলে ঘট্‌ছে কি ?

কিছুই না।

—উল্টো ঘট্‌ছে। আমি ভুল বলিনি···তোমার নিজের প্রকৃতি কদর্য্য, রুচি কদর্য্য—তাই বাঁদরটাকে তোমার ভাল লাগে।

শুনিয়া হরিবিলাসের মনে হইল, কোথাও অপরাধ ঘটিয়াছে নিশ্চয়ই—নতুবা এই কথাগুলি কন্যার সম্মুখে স্ত্রীর মুখ দিয়া নিঃসঙ্কোচে বাহির হইত না ; সবিনয়ে বলিলেন—আমি তবে এখন থেকে নির্লিপ্ত রইলাম, তোমরা মা ও মেয়ে যা করবে তাতেই আমার সায় দেয়া রইল ; আমি ছুটি নিলাম। অপি কি বলে ?

সেলাই লইয়া অপর্ণা সেই টেবিলের ধারেই ছিল—পিতামাতার কথোপকথন তার কর্ণে প্রবেশ করিতেছিল কিনা সন্দেহ...দু' একবার মাঝে মাঝে মুখ তুলিয়া কখন বাপের মুখের দিকে কখন মায়ের মুখের দিকে চাহিতেছিল—কিন্তু সেটা দৈবাৎ, তার অর্থ নাই।

বাপের মুখে তারই সম্বন্ধে প্রশ্ন শুনিয়াও সে মুখ তুলিয়া চাহিল না। চম্পকবরণী তাহার মুখের দিকে চাহিলেন, কিন্তু সীবনমগ্ন চিত্তে কোনো রেখাপাত হইয়াছে কিনা মুখ দেখিয়া তাহা বুঝা গেল না ; নিষ্কাম মুখমণ্ডলে একটী অখণ্ড একাগ্রতা ছাড়া আলোকের প্রতিবিম্ব নাই।

সবাই যেন ওজনের পাল্লায় উঠিয়া দুলিতেছেন কোন্ দিকে ভারি হইবে ঠিক নাই। এমন সময় বৈঠকখানা ঘরের দুয়ারের উপর করাঘাতের শব্দ হইল...

হরিবিলাস উঠিয়া দাঁড়াইলেন—এমনভাবে যেন কঠিন বন্ধন মুক্ত হইয়া গেছে—

চম্পকবরণী বলিলেন,—এসেছেন বাবু...বাড়ীর মালিক...দুয়োরে জুতো ঘষছে বুঝি ! পথের কাদায় ঘর দুয়োর আমার ভরে দিলে ! বলিয়া দুস্তর ঘৃণায় তাঁর বাক্য বন্ধ হইয়া রহিল...বলিলেন—এমন ফচ্‌কে দেখেছ কখন !

স্ত্রীর এই বিষদৃষ্টি অগ্রাহ্য করিয়া হরিবিলাস কন্যার মুখের দিকে চাহিয়া দেখিলেন, মায়ের আজিকার মুখের পাশে তার মুখখানা অতিশয় উজ্জ্বল দেখাইতেছিল।

* * *

হরিবিলাস দরজা খুলিয়া দিয়া প্রতুলকে একেবারে সঙ্গে করিয়া লইয়া আসিলেন।

প্রতুল চ্যাটার্জ্জী ছাব্বিশ বছরের সুশ্রী যুবক—আধুনিকতার কোনো লক্ষণের অভাব তাহাতে নাই।

চেয়ারে সে বসিল না ; চেয়ারের পিটের উপর দু'হাত তুলিয়া দিয়া হাসিমুখে আর কলস্বরে একটা সংবাদ সে

রাষ্ট্র করিয়া দিল, বলিল—এক নতুন জিনিষ দেখা গেল আজ—শুনে অবাক্ হয়ে যাবেন। বলিয়া সে একে একে সবারই মুখের দিকে চাহিল—যেন এখনই তাঁদের অবাক্ হইয়া যাইবার কথা।

চম্পকবরণী বলিলেন—বটে!

হরিবিলাস ওষ্ঠদ্বয় প্রসারিত করিয়া একটু হাসির ভঙ্গী করিলেন—

প্রতুল বলিতে লাগিল—মেয়েমানুষ ভাগ্য গণনার পেশা নেয় জান্তাম না—ধাপ্পাবাজী পুরুষেরই একচেটে ছিল—

চম্পকবরণী স্বামীর দিকে চাহিয়া বলিলেন—তা ঠিক্।

প্রতুল বলিল—ভবিষ্যৎ জান্বার এত ব্যাকুলতা মানুষের কেন তা জানিনে...

চম্পকবরণী বলিলেন—অনেক কথাই শেষ পর্য্যন্ত জানবার থাকে—কারু কারু জানাই হয় না।

হরিবিলাস বলিলেন—তা ঠিক্।...তারপর?

—ধর্ম্মতলা দিয়ে আসছি...এক জায়গায় দেখি, বেজায় মানুষের ভিড়। একজনকে জিজ্ঞাসা করলাম, কি হে? সে বল্লে, ভেতরে ভৈরবী রয়েছেন।...কি ভেবে ঘরের ভেতর ঢুকে গেলাম জানিনে—

চম্পকবরণী বলিলেন,—কারু কারু জীবনের উদ্দেশ্য থাকে না, কাজেরও কারণ কি কৈফিয়ৎ থাকে না।

প্রতুল বলিল,—তা ঠিক্।...তারপর শুনুন!...আমি শুনে অবধি সেই থেকে মনে মনে খালি হাস্‌ছি।

—কি বল্লে বলো বাপু। বলিয়া অতিশয় উত্তাপ বশতঃ চম্পকবরণী নড়িয়া বসিলেন।

হরিবিলাস বলিলেন—বস', বসে বলো। অপর্ণা কৌতূহলী হইয়া তাহার মুখের দিকে চাহিয়া রহিল...

কিন্তু চ্যাটার্জী বসিল না, দাঁড়াইয়া সে বলিতে লাগিল, টাকা দুটো জলে দিয়ে এসেছি।

চম্পকবরণী বলিলেন—তা আর বেশী কি! কারু কারু তার ঢের বেশী জলে পড়েছে!

অপর্ণা বলিল—তা ঠিক্। তারপর কি হ'ল বলুন।

আমার ডান হাতের রেখাগুলো দেখে দেখে সে বলতে লাগল, তুমি একটা অপদার্থ, পাষণ্ড তোমার আচরণে তোমার মা কেঁদে কেঁদে চক্ষু অন্ধ করে ফেলবে, কুসঙ্গে মিশে তুমি জাল জোচ্চরী নেশা টেশা করবে; জুয়া খেলতে টাকা চুরি করবে—তার ফলে পাঁচটি বৎসর তোমাকে শ্রীঘর বাস করতে হবে। আমি তাকে বললাম, ফাঁসি হবে না শুনে আমি দুঃখিত হয়েছি। ভৈরবী বল্লে, দুঃখিত কেবল তুমিই হবে এমন নয়, আরও অনেকে হবে! বলিয়া প্রতুল চ্যাটার্জ্জি কৌতুকভরে ঠিক্‌রাইয়া ঠিক্‌রাইয়া হাসিতে লাগিল...

চম্পকবরণী খুশী হইলেন—

বলিলেন, আমি ত এতে অত হাসির কথা কিছু দেখছি নে!

—দেখছেন না!

চম্পকরাণী অকাট্য কণ্ঠে বলিলেন,—না।

শুনিয়া প্রতুলের কৌতুকহাস্য নির্ব্বাপিত হইয়া আসিতে লাগিল...

হরিবিলাস বলিলেন,—আমি হলে ব্যাপারটা গোপন রাখতাম, প্রতুল...তুমিও আর কাউকে বলো না।

শুনিয়া প্রতুল বড় দমিয়া গেল...অপ্রত্যাশিত একটি ধাক্কা যেন আসিয়াছে। শুষ্ককণ্ঠে বলিল,—আপনারা নিশ্চয়ই এ-সব বিশ্বেস করেন না!

চম্পকরাণী বলিলেন,—করি। কখন কখন ওদের কথা সত্যিসত্যিই ফলে যায়—দেখে অবাক হয়ে যেতে হয়।

হরিবিলাস বলিলেন,—অবাক্ হয়ে কেবল যেতে হয় নয়, বহুদিন পর্য্যন্ত অবাক হয়ে থাকতে হয়—শেষদিন পর্য্যন্ত। আমি একবার হাত দেখিয়েছিলাম যখন কলেজে পড়ি। দৈবজ্ঞ বলেছিল, তোমার যিনি স্ত্রী হবেন তাঁর মত সুন্দরী আর সুশীলা মেয়ে...

প্রতুল হঠাৎ পরমোৎসাহে বলিয়া উঠিল—তা হলেই দেখুন...তা তা তা—

বলিতে বলিতে তেমনি হঠাৎ গলা কাঠ হইয়া প্রতুল থামিয়া হাঁ করিয়া রহিল।

চম্পকবরণীর নাসিকাদ্বয় স্ফুরিত হইয়া ওঠা নামা করিতে লাগিল; বলিলেন—কি বলতে যাচ্ছিলে?

—বলতে যাচ্ছিলাম যে, দেখুন তা হলে ওদের কথা কখন কখন সত্যি না হয়ে যায় না! বলিল বটে, কিন্তু যে অনিষ্টের তুলনা নাই তাহার সংশোধন হইয়াছে বলিয়া ঘুণাক্ষরেও মনে হইল না—তার মনের হাঁপানিও কমিল

না..চাহিয়া দেখিল, অপর্ণা গম্ভীর, মিঃ সেন ততোধিক গম্ভীর এবং মিসেস্ সেন ততোধিক গম্ভীর।

প্রতুল চেয়ারের উপরে হাত বুলাইতে লাগিল...

হরিবিলাস মৃত্তিকার দিক হইতে চোখ তুলিয়া প্রতুলের দিকে চাহিয়া মৃদু একটু হাস্য করিলেন...

হাসিটুকু ভূমিকা—

পরক্ষণেই তিনি একটি গল্প করিলেন এক ব্যক্তি অবগত হইয়াছিল যে, সে কোনও অজ্ঞাত আত্মীয়ের ধনের অধিকারী হইবে। শুনিয়া আনন্দে সে চাকরী ছাড়িয়া দিয়াছিল। এরূপ সাতবৎসর বেকার অবস্থায় কাটাইবার পর তার বৃন্দাবনবাসিনী এক পিসি তাহাকে ডাকিয়া আনিয়া নগদ ছাপ্পান্নটী টাকা তাহার হস্তে অর্পণ করিয়াছিলেন।

প্রতুল বলিল,—আমার মনে হয়, ভৈরবী আমাকে দেখেই বুঝতে পেরেছিল মনে মনে আমি তাকে বিশ্বাস করিনে; মনে আমার বজ্জাতি আছে তাই আক্রোশ করে শুনিয়ে দিয়েছে যা তা। আপনার কি বিশ্বাস? বলিয়া সে অপর্ণার দিকে চাহিল।

কিন্তু অপর্ণাও তার বিরুদ্ধে গেছে, বলিল,—নিশ্চয় জানিনে যখন, তখন একেবারেই অবিশ্বাস করি কেমন করে। চুরি ত আমরাই করি, জেলেও যাই। বলিয়া সে হাতের সুঁচটির দিকে চাহিয়া রহিল।

চম্পকবরণী বলিলেন,—একশোবার।

অপর্ণার মুখের কথা শুনিয়া প্রতুলের মনোবেদনার অন্ত রহিল না; আবেগভরে বলিল,—আপনাদের ভাব দেখে মনে হচ্ছে আমি যেন সত্যিই ওই সব করে বেড়াই—এতদিনে ভৈরবীর কথায় ধরা পড়ে গেছি। আপনি একবার চলুন না; কি বলে দেখি।

যেন অকস্মাৎ জ্ঞাননেত্র ফুটিয়া গেছে—

এমনি দীপ্ত আর ক্ষিপ্র দৃষ্টিতে চম্পকবরণী কন্যার মুখের দিকে চাহিলেন; বলিলেন,—নিশ্চয় যাবে। সত্যি কথা শুনতে ভয় করবে আমার মেয়ে তেমন নয়। বলিয়া কন্যার গুণে যেন প্রথম মুগ্ধ হইয়া তিনি স্বামীর মুখে নিজের পুলকের তরঙ্গাভিঘাত ঘটে কি না তাহা লক্ষ্য করিতে লাগিলেন...

প্রতুল বলিল,—সত্যি কথা যতই কদর্য্য হোক্, আমার কথা বলছি, আমি তা বিশ্বাস করবো না।

চম্পকবরণী বলিলেন,—তাতে কিছু ক্ষতি বৃদ্ধি নেই, আর সে পরের কথা। বলিয়া তিনি ভ্রূভঙ্গী করিয়া রহিলেন।

নিঃশব্দে আর নিরানন্দ সভার ভিতর হইতে মনমরা প্রতুল চ্যাটার্জ্জি সকাল সকাল আর ধীরে ধীরে নিষ্ক্রান্ত হইয়া গেল।

* * * *

পরদিন প্রত্যূষে হরিবিলাস এবং কিছু বেলা হইলে অপর্ণা বাহির হইয়া গেলে চম্পকবরণী অতীতের স্মৃতির মাঝে মগ্ন হইয়া গেলেন...অপর্ণার শৈশব, কৈশোর এবং সম্প্রতি সমাগত যৌবনের প্রধান প্রধান ঘটনাগুলি নিরিবিলি বসিয়া তিনি মনে মনে আবৃত্তি করিতে লাগিলেন। করিতে করিতে সুপর্ণার মইয়ের উপর হইতে পা পিছলাইয়া পড়িয়া পা মচকানটা অপর্ণায় আরোপ করিয়া বসিলেন—কিন্তু অল্পসময়ের জন্য, পরক্ষণেই চমকিয়া তিনি সতর্ক হইয়া গেলেন...

তারপর যে কার্য্যটি তিনি করিলেন তাহা আরো গোপনীয়। অপর্ণার শোবার ঘরে আসিয়া তার ড্রয়ার খুলিয়া তার সেদিনকার তোলা ফটোখানা লইয়া, একখানা গাড়ী ডাকাইয়া তিনি ধর্ম্মতলার দিকে রওনা হইয়া গেলেন।

* * * *

ধর্ম্মতলায় যাইয়া তিনি কাহার সঙ্গে কি কথা কহিলেন তাহা কেহ জানিতে পারিল না, কিন্তু দশটার সময় যখন তিনি টেবিলে নামিলেন, তখন মনে হইল, পূর্ব্বদিনের বন্দোবস্ত তিনি ভুলিয়া গেছেন...

কিন্তু অপর্ণা ভোলে নাই, সে মনে করাইয়া দিয়া বলিল—মা, আমি কার সঙ্গে যাব?

—কোথায়?

—ধর্ম্মতলায়। ভুলে গেছ নাকি!

চম্পকবরণী জানিতেন, বাধা দিলে মেয়ের জেদ বাড়ে; মাথা নাড়িয়া বলিলেন,—আমি ত যেতে বারণ করি।

অপর্ণা বলিল,—কিন্তু কালকে ত তোমার কথায় মনে হয়েছিল অন্যরকম!

—ভেবে দেখলাম, ওসব কথায় কান না দেয়াই ভাল, অনর্থক সুস্থ শরীরকে ব্যস্ত করা।

হরিবিলাস বলিলেন,—তা ছাড়া আর কিছু নয়।

—কিন্তু অমি যাব।

—তবে যাও। চম্পকবরণী তৎক্ষণাৎ অনুমতি দিলেন; এবং স্বামী স্ত্রীতে মিলিয়া কন্যাকে পুনঃ পুনঃ সাবধান করিয়া দিলেন—নাম ধাম খবরদার বলিসনে, যতই জেরা করুক।

অপর্ণা বলিল—আচ্ছা।

রামজিওনের জিম্বায় বাড়ীর গাড়ী অপর্ণাকে লইয়া অল্পক্ষণ পরেই ধর্ম্মতলার দিকে ছুটিল।

* * * *

অপর্ণা দেখিল, আধা অন্ধকার ঘর; বিপুলকায়া ভৈরবী তার অনুচরবর্গ লইয়া কম্বলাসনে উপবিষ্ট রহিয়াছে—পার্শ্বেই সিন্দুর চর্চ্চিত বিশাল ত্রিশূল...তার সম্মুখে জলচৌকি; জলচৌকির দক্ষিণ দিকে ছোট একখানি কম্বলের আসন... কিছুদূরে দর্শকগণের অথবা দর্শন প্রার্থী অথবা দর্শনীদাতা-গণের বসিবার জন্য বেঞ্চি পাতা রহিয়াছে; কিন্তু সে আসন এখন শূন্য...

ভারতীয় তপঃ ক্লেশের কোনো লক্ষণই ভৈরবীর দেহে বিদ্যমান নাই...গৈরিক বসন, চুলের রং কটা. চুলগুলি আগোছাল, যেন কেউ চুলগুলি তুলিয়া ধরিয়া ঢুলাইয়া দিয়া গেছে...

মানুষকে ভয় দেখাইবার কি প্রলুব্ধ করিবার কোনো আয়োজনই সেখানে নাই—অত্যন্ত সাদাসিদে...মনে হয় না যে ভিতরে ষড়যন্ত্র চলিতেছে।

ভৈরবী সহচরীর সঙ্গে কথা কহিতেছিল—

অপর্ণা প্রবেশ করিতেই ভৈরবী একবার তার দিকে চাহিয়া মুখের কথাটা আগে শেষ করিল, তারপর বলিল,—এস, মা, এস, বস'। বলিয়া জলচৌকির পাশেই যে আসন খানা ছিল তাহার দিকে চাহিল...

অপর্ণার মনে হইল, ভৈরবীর কণ্ঠস্বর সুমিষ্ট, কিন্তু সে বসিল না; দাঁড়াইয়াই জিজ্ঞাসা করিল—আপনি কি অদৃষ্টজ্ঞ?

ভৈরবী হাসিয়া বলিল,—লোকে বলে তাই।

—লোকে যা-ই বলুক আপনি কি যথার্থ ই তাই?

—হাঁ।...বস'।

ভৈরবীর স্বর অতি স্পষ্ট, এবং অপর্ণার মনে হইল, গম্ভীর।

অপর্ণাকে কে যেন টানিয়া লইয়া যথাস্থানে বাসাইয়া দিল, এবং তার বাঁ হাতখানা টানিয়া লইয়া জলচৌকির উপর চিৎ করিয়া পাতিয়া দিল...

ভৈরবী অপর্ণার প্রসারিত করতলের উপর আসমানী রঙের একটা তরল পদার্থ খানিকটা ঢালিয়া দিয়া বলিল,—বাম হস্তে বিগত জীবন, দক্ষিণ হস্ত ভবিষ্যৎ...বলিতে বলিতে সে হাতের উপর আরো একটু ঝুঁকিয়া আসিল্..একটানা অস্ফুট গুঞ্জনস্বরে মন্ত্রপাঠ করিতে লাগিল—

তারপর প্রাঞ্জল সুস্পষ্টস্বরে বলিতে লাগিল—ছোট্ট মেয়েটী, একমাথা ঝাঁকড়া চুল...চার বছরের শিশু... জ্বরবিকারে শয্যাগত...আরোগ্য লাভ বায়ান্ন দিনে... বেড়ালের আঁচড়—দু'হাতে ঝর্‌ঝর্ রক্তপাত।...ইস্কুলে যাতায়াত—সখীসঙ্গে গলাগলি। সমুদ্রতীর—ঢেউয়ের আঘাতে পতন—মানুষের চাঞ্চল্য, জননীর ক্রন্দন। গাড়ীতে মোটরে সংঘর্ষ; পিতা সামান্য আহত; পুত্রী অজ্ঞান।... স্কুল হইতে কলেজ—পদকলাভ...নতমুখী সুন্দরী ছাত্রীর দিকে চাহিয়া বিরাট সভা করতালি দিতেছে...

ঘুমপাড়ানির গানের মত বহমান সুরে অপর্ণার অলস বোধ হইতে লাগিল...

ভৈরবী বলিতে লাগিল—তারপর দেখছি স্বয়ম্বরের আয়োজন। বলিয়া ভৈরবী অপর্ণার বাম হস্ত ত্যাগ করিয়া বলিল—এখন ভবিষ্যৎ। দক্ষিণহস্ত। বলিয়া সে নিঃশব্দে অপেক্ষা করিতে লাগিল—কিন্তু অপর্ণার মুখের দিকে চাহিল না।

অপর্ণা প্রথমে বিস্মিত পরে স্তব্ধ হইয়া গিয়াছিল; দক্ষিণ হস্ত সমর্পণ করিবার পূর্ব্বে সে ভৈরবীর মুখের দিকে চাহিয়া দেখিল—কিন্তু সেখানে কোনো ভাবেরই বিকাশ নাই—না দ্বন্দ্ব, না উদ্বেগ, না প্রয়াস, না হর্ষ। জ্ঞাতসারে ক্রমাগত মিথ্যার বাহিনী সে অবলীলাক্রমে উচ্চারণ করিয়া চলিয়াছে কিনা তাহা তাহার মুখমণ্ডলের রেখাপথগুলিকে দেখিয়া বুঝিবার উপায় নাই। কেবলমাত্র সহজ অথচ অসাধারণ অনুমানশক্তির উপর নির্ভর করিয়া যাহা সে বলিতেছে তাহা এই মুহূর্ত্তে মিথ্যা প্রতিপন্ন হইয়া যাইতে পারে—এদিকেও তার অসীম নিশ্চিন্ত নিঃস্পৃহা!

অপর্ণা তার ডান হাতখানা ধীরে ধীরে জলচৌকীর উপর তুলিয়া দিল, বলিল—যদি ভয়ঙ্কর কিছু হয় তবে বল্‌বেন না।···স্থানের আবহাওয়ার গুণেই তার কণ্ঠস্বর খুব মৃদু হইয়া ফুটিল।

ভৈরবী বলিল—সম্মুখে বিপদ থাকলে আমি সতর্ক করে দিতে পারি...কি তুমি গ্রহণ কর্‌বে, কি তুমি পরিহার কর্‌বে তারও ইঙ্গিত তুমি পেতে পারো।

বলিয়া ভৈরবী পুনরায় সেই গুঞ্জনস্বরে সুরু করিল,—সহস্রলোকে মুখের দিকে সাগ্রহে চেয়ে আছে...কৃপাপার্থী দুটি লোক অগ্রসর হয়ে আস্‌ছে—একজন গৌরবর্ণ, একজন শ্যামল, দুইজনেই একনিষ্ঠ পাণিপ্রার্থী; উভয়েই ধনী... গৌর ব্যক্তি নিজের শত্রু—অকুণ্ঠিত ব্যয়ে নিঃস্ব—পরের দুঃখের কারণ...এদেরই একজন তোমার ভবিষ্যৎ পতি—

—কোন্‌টি?

—বুঝতে পারছিনে ঠিক।

অপর্ণা ব্যগ্র হইয়া বলিল,—ভালকরে দেখুন।

—দেখি। তিনজনে চৌমাথায় দাঁড়িয়ে আছে; একজন হাসিমুখে তাকিয়ে আছে যে দিকে সে দিকে সুবৃহৎ অট্টালিকা, ধনের সমারোহ; দ্বিতীয়টি—

বলিয়াই ভৈরবী যেন হঠাৎ দিশেহারা হইয়া গেল খানিক নিঃশব্দ থাকিয়া বলিল,—জাঙিয়া পরা, গলায় পদক, অধোবদন—তার সম্মুখে কারাগৃহ আর কিছু দেখছিনে, বোধহয় আমার দেখবার নয়। বলিয়া ভৈরবী যখন অপর্ণার হাত ছাড়িয়া দিল তখন অপর্ণার সেই হাতখানা কাঁপিতেছে।

ভৈরবী চোখের উপর হাত বুলাইয়া শ্রান্ত দেহে শিথিল হইয়া বসিয়া রহিল...

অপর্ণার মাথা ঘুরিতেছিল—

সে ভৈরবীর সম্মুখে দর্শনীর টাকা দুটি রাখিয়া বাহিরে আসিয়া দেখিল, এই অলৌকিক ঘটনার পর পৃথিবী যেন চেহারা বদলাইয়া একেবারে পর হইয়া গেছে—ঘরের কাছে তার সাড়া নাই; দূরে একান্তে দাঁড়াইয়া আছে।

* * * *

অপর্ণা যখন গাড়ীতে উঠিল তখন তাহার মনে হইতেছিল, বাবা আর মায়ের কাছে সব কথা বলিতে পারিলে বুক যেন খালি হয়; কিন্তু চল্‌তি গাড়ীতে বসিয়া ক্রমশঃ তার ইচ্ছার ভাবান্তর ঘটিতে লাগিল। অ... ভবিষ্যতের রহস্যের অভ্যন্তরে মানুষের সীমাবদ্ধ দৃষ্টির প্রবেশ চমকপ্রদ বটে; কল্পনাতীত কত ব্যাপারই সম্ভব হইবার সংবাদ অহরহ পাওয়া যাইতেছে—এটাও হয়তো তাহারই একটা...কিন্তু তবু কোথায় যেন প্রতিবাদ আছে, অপ্রত্যয়ের কারণ আছে!

গৌরবর্ণ ব্যক্তিটি যে প্রতুল তাহাতে সন্দেহ নাই, আবার আছেও যেন...

বাড়ীর দুয়ারে আসিয়া গাড়ী হইতে নামিবার সময়েও সে ভাবিয়া কিছু স্থির করিয়া উঠিতে পারে নাই...

* * *

বাপ মায়ের সম্মুখে সে অতিশয় গম্ভীর হইয়া রহিল... কিন্তু তার কথা কহিবার অহেতুকী অনিচ্ছা জননীর জিহ্বা-তাড়নায় অচিরাৎ ধূলিসাৎ হইয়া গেল—

আদ্যন্ত শ্রবণ করিয়া হরিবিলাস মুগ্ধস্বরে কহিলেন,—আশ্চর্য্য শক্তি!...এই সব বল্‌লে?

অপর্ণা শান্তস্বরে বলিল,—হ্যাঁ অবিকল বল্‌লে।

চম্পকবরণী বলিলেন,—"কে রে যায় বেড়ী পায় বিরস বদন"ই তোমাদের প্রতুল চ্যাটার্জ্জী···তিনিই ঘোরতর গৌরবর্ণ। আমার যেটুকুন্‌ সন্দেহ ছিল তা' গেছে।

হরিবিলাস উত্তরোত্তর অধিকতর বিস্মিত হইয়া পড়িতেছিলেন, বলিলেন,—বাঃ!···প্রতুলকেও সে চেনে না, অপর্ণাকেও চেনে না; ওদের সম্ভাবিত নৈকট্যের কথাও জানে না; অথচ দৈবী দৃষ্টিতে তা' হুবহু ধরা পড়ে গেছে।...আশ্চর্য্য বটে...আমার আর সন্দেহ নেই।... কেমন করে এসব ঘটে তা' কল্পনাও করতে পারিনে। বলিয়া হরিবিলাস ভৈরবীর শক্তিমত্তায় পরম পুলকিত হইয়া স্ত্রীর মুখাবলোকন করিতে লাগিলেন...

চম্পকবরণী প্রত্যুত্তরে বলিলেন,—ঐশী শক্তি। বলিয়া স্বামীর চোখের ইসারায় চোখ ফিরাইয়া দেখিলেন, অপর্ণা চোখে রুমাল চাপা দিয়া কাঁদিতেছে।

হরিবিলাস উঠিয়া দাঁড়াইলেন—

অপর্ণা চোখের উপর হইতে রুমাল সরাইয়া প্রশ্ন করিল,—কিন্তু সে যে প্রতুলবাবুর কথাই বলেছে তা' তোমরা কেমন করে জেনে একেবারে নিঃসন্দেহ হচ্ছ?

[illegible]কবরণী বলিলেন,—কিছুদিন সবুর সয়ে থাক্‌লেই [illegible]ছ ঘুচে যাবে। বলিয়া তিনিও উঠিয়া গেলেন।

অপর্ণা একাকিনী বসিয়া কত কি ভাবিতে লাগিল তাহার হিসাব কিতাব নাই।

* * *

প্রতুল চ্যাটার্জ্জী কলিকাতার বাহিরে গিয়াছিল; ফিরিয়া দেখিল, তাহার স্থানচ্যুতি ঘটিয়া গেছে, এবং তাহার স্থান অধিকার করিয়াছে অতুল রায়।...তিনদিন আমোদ-প্রমোদ আর ভ্রমণের ঘূর্ণীর মাঝে ফেলিয়া-চম্পক বরণী কন্যার নিরুদ্যমতা ক্ষয় করিয়া আনিয়া ছিল ..

অপর্ণা পুনরায় সুশ্রী হইয়া উঠিয়াছে—

একটি বিষয়ে জননীর সঙ্গে তার মতভেদ নাই, তাহা এই যে, রায়ের বাক্‌পটুতায় সামান্য ব্যাপারই অসামান্য রসাত্মক হইয়া উঠিয়াছিল...বিলাতের মেম সাহেবের সম্বন্ধে কৌতুকের কথা কি এতও সে জানিত—হাসাইয়া মারিয়াছে!

এমনি একটা হাসাহাসির মাঝেই প্রতুল চ্যাটার্জ্জি প্রবেশ করিয়াই অনুভব করিল, সিংহাসন শূন্য নাই—এমন কি, যেন অভিষেকেরই একটা আয়োজন চলিয়াছে।... তাহার দিকে কেহ চাহিয়াও দেখিল না।

কেবল প্রতিদ্বন্দ্বী অতুল রায় বলিল—এস প্রতুল; ফির্‌লে কখন? বলিয়া সে সকৌতুকে অর্পণার মুখের দিকে চাহিতে যাইয়াই একটা দ্বিধা জাগিয়া সে প্রতুলের দিকেই চাহিয়া রহিল...

প্রতুল বসিল না—

চম্পকবরণী বলিলেন,—অতুল, তোমার বিলেতেও দৈবজ্ঞ আছে শুনেছি, কিন্তু এমনটি বোধ হয় নেই—এ সর্ব্বজ্ঞ। কাউকে কষ্ট দিবার অভিপ্রায় আমার নেই; কিন্তু নাছোড়বান্দা লোককে শোনানই ভাল যে, অপর্ণাও তাকে হাত দেখিয়েছিল...অদৃষ্ট গণনায় যাকে জেলে—

প্রতুল বলিয়া উঠিল—কিন্তু নির্ঘাৎ সনাক্ত ত' এখনো হয় নাই ..গৌরবর্ণ অশেষ নির্গুণ ব্যক্তিটি কে, আর শ্যামবর্ণ অশেষ গুণবান্ ব্যক্তিটিই বা কে!

চম্পকবরণী একেবারে দেয়ালের দিকে মুখ ঘুরাইয়া বলিলেন,—জান্‌তে কি আর বাকি থাক্‌বে!

—আমি বল্‌ছি, অদূর ভবিষ্যতের কথা—আজকালের মধ্যেই জান্‌বার কি উপায় আছে!

—আমাদের তাড়াতাড়ি নেই।

—মিস্ সেন এ-সব রাবিশ বিশ্বেস করেন না এ ভরসা আমার আছে।

অপর্ণা বলিল—রাবিশ নেহাৎ নয়...আমার ছেলে-বেলাকার অত কথা সে কেমন করে বল্‌লে!

একটি দীর্ঘনিঃশ্বাস নিক্ষেপ করা ছাড়া প্রতুলের গত্যন্তরই রহিল না—তা-ও নিঃশব্দে।

চম্পকবরণী বলিলেন,—আমরাও কিছু বুঝি সুঝি... একেবারেই অজ্ঞান নই।

খানিক্ চুপ্ চাপ্ গেল...

মাঝখানে অতুল রায় এক্সচেঞ্জ রহস্য ব্যাখ্যা করিতে সুরু করিয়াছিল—এক্সচেঞ্জের হারের দরুণ ভারতবর্ষের বহু টাকা লোকসান যাইতেছে—ইহাই ছিল তার প্রতিপাদ্য...

কিন্তু প্রসঙ্গ নীরস বলিয়া কেহ তাহাতে মনোযোগ দিলেন না...

চারিটি ব্যক্তি একত্র হইয়া আছে, কিন্তু নিঃশব্দ দেখিয়া মনে হয়, সবাই আপন চিন্তায় বিভোর, কিন্তু তা নয়... মনে মনে সবাই ছটফট যাই যাই করিতেছিলেন—

এই দুরূহ অবস্থায় আসান্ দিলেন সেন—

তিনি গৃহে ছিলেন না; বাহিরে আওয়াজে বুঝা গেল, তিনি আসিয়াছেন··—

চারিজনেরই মনে হইল, বাঁচা গেল।

কিন্তু বাঁচা গেল কই!—হরিবিলাস এমন গম্ভীর মুখ লইয়া প্রবেশ করিলেন যাহা দেখিয়া তাঁর হিতৈষী মাত্রেরই শঙ্কিত হইয়া উঠিবার কথা...

তিনি ঝপ্ করিয়া চেয়ারে বসিয়া পড়িয়া এমন শোকাচ্ছন্ন আকার গ্রহণ করিলেন যে, কাহারো বুঝিতে দেরী হইল না, ব্যাপার গুরুতর। সবাই চঞ্চল হইয়া উঠিলেন—

চম্পকবরণী ব্যগ্র হইয়া প্রশ্ন করিলেন,—কি হয়েছে তোমার?

হরিবিলাস অঞ্জলির ভিতর হইতে মুখ তুলিয়া কেবল

বলিলেন—আমার ? কিছুই না ! বলিয়া তিনি পুনরায় অঞ্জলির ভিতর ডুব দিলেন।

অপর্ণা নত নেত্রে নিজের করাঙ্গুলির নখমালা দেখিতে লাগিল ; প্রতুল খদ্দরের চাদরের সরু মোটা সূতা বাছিতে লাগিল ; অতুল দেয়াললগ্ন "তুমি ভয়াবহ" নামক ছবিখানা নিরীক্ষণ করিতে লাগিল, এবং চম্পকবরণী অসহিষ্ণু হইয়া আঙ্গুল তুলিয়াছেন—স্বামীকে কিঞ্চিৎ সম্বোধন করিতে যাইবেন, এমন সময় হরিবিলাস আবার মাথা তুলিলেন ; বলিলেন—জ্যোতিষীর কররেখা বিচারই বল, আর ভবিষ্যৎ দর্শনই বল, সব সময়েই কি সত্য হয় ?

মনে হইল, সত্য না হওয়াটাই যেন তিনি চান্।

চম্পকবরণী বলিলেন,—সে জ্যোতিষীর জ্ঞানের ওপর উপর নির্ভর করে...

—আমি বল্‌ছি ধর্ম্মতলার ঐ ভৈরবীর কথা।

—নিশ্চয় ! তার ঐশী ক্ষমতা আছে !...আর কেউ তা' স্বীকার না করুক, অপর্ণা তা' বেশ জানে।

অতুল রায় বলিল,—আমার পাঁচ সাতটি পরিচিত লোক হাত দেখিয়েছিল ; তারাও বল্‌ছে ঐশী শক্তিই বটে !

হরিবিলাস কাতর স্বরে বলিলেন,—তবু, ভুলচুক্ কি হ'তে পারে না ! তাড়াতাড়িতে, কি হঠাৎ আন্‌মনা হ'য়ে গুলিয়ে যেতেও ত' পারে। কি বলিতে কি ব'লে ফেলা—

চম্পকবরণী মাথা নাড়িয়া চূড়ান্ত করিয়া দিলেন ; বলিলেন,—উঁ হুঁ।

অতুল রায় বলিল,—না।

চম্পকবরণী স্বামীকে ভর্ৎসনা করিতে লাগিলেন,—তোমার চিরটা কালই দু'নৌকায় পা দিয়ে গেল...কোন্ দিকে গেলে সুবিধে হয় তা' তোমার ঠাহর করতে এত সময় লাগে যে সহ্য করা কঠিন...তুমি যে মানুষ হ'লে না তার কারণ একদিকে তোমার হঠ্‌কারিতা, অন্যদিকে তোমার দ্বিধা...

চম্পকবরণী এম্‌নি করিয়া স্বামীর সহস্র দোষ উদ্ঘাটিত করিয়া দিলেন—কিন্তু সেন সাহেবের ম্লান চক্ষে দীপ্তি ফিরিল না...তাঁর নাক দিয়া দীর্ঘনিঃশ্বাস ঘন ঘন বাহির হইতেছিল, তাহারও শেষ হইল না...তাঁর অস্থির দৃষ্টি ঘুরিতে ঘুরিতে একসময়ে প্রতুল চ্যাটার্জ্জির উপর পড়িতেই তাঁর আকাশে দোদুল্যমান আত্মা যেন ঠাঁই পাইয়া গেল...

চম্পকবরণীর বিস্ময়াহত চক্ষুর সম্মুখে তিনি হঠাৎ উঠিয়া আসিয়া হাত বাড়াইয়া প্রতুলের হাত চাপিয়া ধরিয়া তাহার মুখের দিকে চাহিয়া রহিলেন...

চম্পকবরণী বলিলেন,—ও কি হ'চ্ছে ?

প্রতুল বলিল,—হাম্‌বাগ্ ! আমার ইচ্ছে হ'চ্ছে পুলিশ ডেকে ভৈরবীর বুজ্‌রুকি ভেঙে' দি'।...সে আপনাকে কিছু বলেছে নিশ্চয় ! চাব্‌কে, —

চম্পকবরণী রাগে কাঁপিতেছিলেন : বলিলেন,—তা' তুমি পারো ; কিন্তু তাতে তোমার সুবিধে হতে পারত হাটে হাঁড়ি ভাঙার আগে।...সে যদি কোনো অকল্যাণের কথাও বলে থাকে তবে—

বলিতে বলিতে স্বামীর আর্ত্তনাদে তিনি চম্‌কিয়া উঠিয়া থামিয়া গেলেন, হরিবিলাস বলিতে লাগিলেন,—বল' না, বল' না ; অকল্যাণের কথা জিহ্বাগ্রেও এন না। বলিয়া তিনি প্রতুল চ্যাটার্জ্জির হাত ছাড়িয়া দিয়া বসিয়া পড়িলেন।

চম্পকবরণী ভয় পাইয়া গেলেন ; আর প্রশ্ন করিলেন না। সেন বলিলেন,—বল্‌ছি, ব্যস্ত হ'ও না ; আমায় একটু একটু সাম্‌লে নিতে দাও···

—সাম্‌লে তুমি নাও। কিন্তু তোমার মন ভাল নেই, তুমি ওপরে যাও

—না না ; একা আমি এখন কোথাও থাক্‌তে পার্‌ব না...তোমাদের পাঁচজনের মুখের দিকে চেয়ে তবু একটু সুস্থ আছি।

অপর্ণা জিজ্ঞাসা করিল,—কি হয়েছে, বাবা ?

—আমিও গিয়েছিলাম তোমাদের সেই ভৈরবীর কাছে কেন গিয়েছিলাম তাই এখন ভাবছি !...একেবারে বুজ্‌রুক আগাগোড়া মিথ্যে...অসম্ভব...কিছু সে জানে না...

প্রতুল বলিল,—আমি তা' বরাবর বলে' আস্‌ছি !... কি বলেছে সে আপ্‌নাকে ?

হরিবিলাস তাঁর একমাত্র অবলম্বন প্রতুল চ্যাটার্জ্জির দিকে চাহিয়া বলিলেন,—বলেছে...বলিয়া ম্লান একটু

হাসিয়া তিনি পুনরায় বলিলেন,—বলেছে, আমি নব্বই বছর পর্য্যন্ত বাঁচব ; চিরদিন সুস্থ সবল থেকে নব্বই বছরে সজ্ঞানে হঠাৎ আমার মৃত্যু হবে। কিন্তু...

বলিয়া হরিবিলাস স্ত্রীর দিকে চোখ ফিরাইলেন--

বিষণ্ণ ছল ছল চক্ষে চাহিয়া রহিলেন...

এবং সেদিনকার বিচ্ছেদ-বেদনা তাঁর নয়নপল্লবে মূর্ত্ত হইয়া উঠিল...

চম্পকবরণী স্বামীকে চিনিতেন ; তাঁহার মুখ দিয়া হাসি কান্নায় মিশ্রিত একটা অদ্ভুত শব্দ নির্গত হইল...বলিলেন, তুমি মিছে কথা বল্‌ছ।

—সে ত' সুখের কথা ; চিরদিন সুস্থ সবল থেকে নব্বই বছরে সজ্ঞানে হঠাৎ মৃত্যু খুবই বাঞ্ছনীয় ; কিন্তু উনি---

চম্পকবরণী ধম্‌কাইয়া উঠিলেন,—ওঠো···ওপরে যাও বল্‌ছি।

—যাই।...ভৈরবী বল্‌লে, তোমাকে দ্বিতীয় বার দার-পরিগ্রহ করতে হবে...তার কটা চোখ আর লাল মুখ দিয়ে ঝড়্‌ বইবে ; শুনে' অবধি...

সেন আসিতেই বুঝা গেল তিনি সেই হইতে দুঃসহ কষ্ট ভোগ করিতেছেন...

চম্পকবরণী চোখ বুজিয়া রহিলেন...

প্রতুল হাসিয়া বলিল,—মিছে কথা মিছে কথা, এমন মিছে কথা আর হয় না।

হরিবিলাস কাতরকণ্ঠে জানিতে চাহিলেন,—ঝড়ের মত মুখ চোখ। সে কেমন ধারা ?

চম্পকবরণী চোখ খুলিয়া তাকাইলেন ; ক্ষীণস্বরে বলিলেন,—চোখে দেখলেই আর সন্দেহ থাকবে না।... তোমার কপালে যদি বিপত্নীক হওয়া লেখা থাকে তবে হবেই...চোখ আর মুখ—

প্রতুল বলিল,—কটা চোখ আর লাল মুখ !

—চোখ মুখ দেখে' শিক্ষে পাবার লোকই তুমি...

—কিন্তু এত সত্বর। তিন হপ্তা আর তিন মাস ! মোটে !---তোমার পরমায়ুঃ আর একুশ দিন, আমার গ্রহের ফের সুরু হতে আর তিন মাস আছে।—বলিয়া চোখে দিবার অভিপ্রায়ে কোঁচা তুলিতে যাইয়াই হরিবিলাস দেখিলেন, তিনি পেন্টুলান পরিধান করিয়া আছেন ; রুমালের কথা তার মনেই পড়িল না।

চম্পকবরণীর অকারণেই মনে হইতে লাগিল, প্রতুল চ্যাটার্জ্জিটা তাঁহারই দিকে চাহিয়া আছে—আর কত দুষ্ট হাসি সে চাপিয়া আছে তাহার ঠিক্ নাই···

প্রতুলও তাঁহারই উদ্দেশে বলিল,—কাতর হবেন না—সত্যি এ হতেই পারে না।...আমাকে আশীর্ব্বাদ করুন—আপনার আশীর্ব্বাদে আমার ফাঁড়াও কেটে যাবে।

মিষ্টার সেন এতক্ষণে সুস্থ হইয়া উঠিয়াছিলেন, বলিলেন একুশ দিন ত' মোটে।···দেখা যাক্ !

কিন্তু চম্পকবরণী ততক্ষণে বাহির হইয়া গেছেন।

পাথেয় উপন্যাস

শ্রীপ্রভাবতী দেবী সরস্বতী
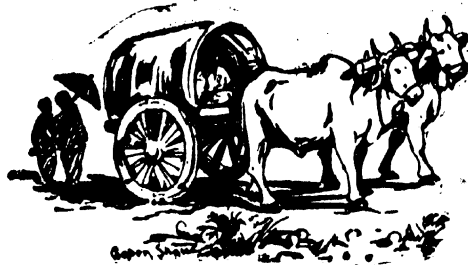
পৌষের একটি সন্ধ্যা।

শুক্লা একাদশীর রাত্রি, শীতের কুয়াসায় জ্যোৎস্না স্পষ্ট হইয়া ফুটিতে পারে নাই। বাড়ীর সম্মুখের ফুলগাছগুলিতে ফুল ফুটিতে পারে নাই; পাতাগুলি শীতে বিবর্ণ হইয়া উঠিয়াছে।

রতিনাথবাবুর সুবৃহৎ অট্টালিকার দ্বিতলে একটী সুসজ্জিত প্রকোষ্ঠে পিয়ানো বাজিতেছিল। খোলা জানালা পথে কক্ষস্থিত বৈদ্যুতিক আলোর রেখা বাহিরে আসিয়া জ্যোৎস্নার সহিত মিশিয়া এক হইয়া গিয়াছিল।

তরুণী কেবল পিয়ানো বাজাইতেছিল, কণ্ঠে তাহার গান ছিল না। অনেকক্ষণ ধরিয়া একটী গৎ বাজাইয়া সে থামিল, দ্বারের কাছে কাহার পদশব্দ পাইয়া সে মুখ তুলিল।

ভৃত্য কৃষ্ণ দরজার বাহিরে দাঁড়াইয়া ছিল, অনেকক্ষণ হইতে সে অপেক্ষা করিতেছিল, গৃহমধ্যে প্রবেশ করিতে পারিতেছিল না। এখন বাজনা থামিতে সে আস্তে আস্তে প্রবেশ করিল।

মনীষা জিজ্ঞাসা করিল, "কি চাই কৃষ্ণ?

কৃষ্ণ বলিল, "একটি বাবু কর্ত্তাবাবুর সঙ্গে দেখা করতে এসেছেন, কর্ত্তাবাবু তো এখনও ফেরেন নি, কি বলব তাঁকে?"

মনীষা বিস্ময়ে বলিল, "বাবা এখনও ফেরেন নি? এই শীত, তার ওপরে সন্ধ্যে হয়ে গেছে। গাড়ী গেছে তাঁকে আনতে?"

কৃষ্ণ বলিল, "মোটর রোজকার মত চারটে না বাজ্‌তেই অফিসে গেছে।"

ব্যস্ত হইয়া মনীষা বলিল, "ছটা পর্য্যন্ত দেখে কাউকে বাবার অফিসে পাঠান উচিত ছিল, কোন একটা দুর্ঘটনা ঘটাও তো বিচিত্র নয়। তুমি নিজে যাও, না হয় বাবুর সেক্রেটারীকে পাঠাও।"

কৃষ্ণ চলিয়া যাইতেছিল, মনীষা আবার ডাকিল,—"যে বাবুটীর কথা বলছিলে—"

কৃষ্ণ বিরক্তভাবে বলিল, "তাকে এত করে বলছি তিনি কথা মোটে কানেই তুলছেন না। অবস্থা দেখে ভারী গরীব বলে মনে হল, হয় তো কিছু সাহায্যের জন্যে বাবুর কাছে এসেছে।"

মনীষা বলিল, "তুমি গিয়ে আগে সেক্রেটারী বাবুকে আফিসে পাঠিয়ে তারপর এই বাবুটীরর নাম ধাম আর কি চায় তা জেনে এসে আমায় বল।"

কৃষ্ণ চলিয়া গেল।

মনীষা উদ্বিগ্ন ভাবে পিয়ানো ছাড়িয়া বাহিরে বারাণ্ডায় আসিয়া দাঁড়াইল।

কলিকাতার পথে দুর্ঘটনা ঘটা কিছু বিচিত্র নহে। রতিনাথবাবু কোনদিন এরূপ সন্ধ্যা করেন নাই, প্রতিদিন তিনি ঠিক পাঁচটার সময়ে বাড়ী ফিরিয়া আসেন, আজ সন্ধ্যা অতীত হইয়া গিয়াছে, এখনও তাঁহার ফিরিয়া না আসা চিন্তার কথাই বটে।

খানিক বাদে কৃষ্ণ ফিরিয়া আসিল। ব্যগ্রকণ্ঠে মনীষা জিজ্ঞাসা করিল, "আফিসে লোক গেছে?"

কৃষ্ণ বলিল, "হ্যাঁ, সেক্রেটারী বাবুকে বলতেই তিনি চলে গেছেন?' নীচের সেই বাবুটী—

মনীষা বলিল, "তিনি চলে গেছেন?"

কৃষ্ণ বলিল, "না, এখনও বসে আছেন, বল্লেন—বাবু এলে দেখা করে তবে যাব।"

মনীষা বিরক্ত হইয়া বলিল, "তিনি কি কিছু সাহায্য চান, না চাকরী চাইতে এসেছেন?

কৃষ্ণ বলিল, "কোন কথাই বল্‌লেন না, বল্‌লেন যা কথা তা বাবুর সঙ্গে হবে।"

মনীষা বিরক্ত হইয়া বলিল, "চল আমি যাচ্ছি। যদি কিছু সাহায্য চায় ওখান হ'তে দিয়ে বিদায় করে দিলেই হবে এখন, বাবা এই সারাদিন খেটে শ্রান্ত হয়ে বাড়ী ফিরছেন এ সময়ে ও লোকটা আবার তাঁকে জ্বালাতন করে মারবে। এখন তুমি এসো তো কৃষ্ণ, একবার দেখি সে কি চায়?"

সিঁড়ি দিয়া নামিতে নামিতে কৃষ্ণ বলিল, "লোকটা এ দিকে তো গরীব, অথচ, চালটুকু আছে ষোল আনা আমি চাকর বলে আমায় কিছু বলবে না, বলতে চায় খোদ কর্ত্তার কাছে।"

মনীষা হাসি চাপিয়া বলিল, "এ তার ভারি অন্যায়। তার জানা উচিত, কর্ত্তাবাবু নামেই কর্ত্তা, আসলে সকল কাজ আমাদের কৃষ্ণবাবুই করে, কাজেই কৃষ্ণের কাছে তার দরবার করা উচিত।"

লজ্জিত হইয়া কৃষ্ণ বলিল,"দিদিমণি তামাসা করছেন।"

মনীষা হাসিয়া ফেলিল, "তামাসা কি করে হল বল দেখি? বাবা সংসারের সব ভার তো তোমার পরে ছেড়ে দিয়েই নিশ্চিন্ত হয়ে আছেন, এটা কি তামাসার কথা?"

নীচে বৈঠকখানা ঘরে একখানা চেয়ারে সঙ্কুচিতভাবে নিরঞ্জন বসিয়া ছিল। এই ঘরের সাজসজ্জার সহিত নিজের পরিচ্ছদের তুলনা করিয়া সে অত্যন্ত সঙ্কুচিত হইয়া উঠিয়াছিল। তাহার ছিন্ন জুতা, অর্দ্ধমলিন জামা কাপড়ের পানে তাকাইয়া এই ধনীর গৃহ যেন বিদ্রূপ করিতেছিল।

ঘরের মেঝে মূল্যবান কার্পেটে আবৃত, তাহার ছিন্ন জুতা পায়ে দিয়া এ ঘরে সে প্রবেশ করিতে লজ্জা বোধ করিয়াছিল, জুতা সে দরজার সম্মুখে খুলিয়া রাখিয়া আসিয়াছিল।

এই গরীব লোকটাকে দেখিয়াই কৃষ্ণ তাহার উপর বিরূপ হইয়াছিল এবং তাহাকে দেখা মাত্র বিদায় করিবার চেষ্টা করিয়াছিল। এরূপ ধরণের লোক ধনী গৃহের চৌকাঠ এপর্য্যন্ত অতিক্রম করিতে পারে নাই, কিন্তু এ লোকটা একরূপ প্রায় জোর করিয়াই ভিতরে ঢুকিয়া পড়িয়াছিল, কৃষ্ণ বাহির হইতে বলাসত্ত্বেও নড়ে নাই।

সত্যই নিরঞ্জন মরিয়া হইয়া উঠিয়া ছিল। বাঙ্গালির ছেলে চাকরীর জন্য সব কাজই করিতে পারে, বড়লোকের বাড়ীর ভৃত্যের অপমান সহ্য করা তো ছোট কথা।

ঘরে যাহার অভাব, তাহার কানে তুলা দিতে হয়, পিঠখানা গণ্ডারের চামড়া দিয়া মুড়িতে হয়, আত্মসম্ভ্রম-বোধ শক্তি বিসর্জ্জন দিতে হয় নহিলে চাকরী মিলেনা, অনাহারে শুকাইয়া মরিতে হয়।

রতিনাথবাবুর অফিসে সে চার পাঁচদিন হাঁটিয়াছে, দ্বারোয়ান তাহাকে ভিতরে প্রবেশ করিতে দেয় নাই, তাহার হাতে নাম লেখা কাগজখানি পর্য্যন্ত বাবুর নিকটে লইয়া যায় নাই। ছাপান কার্ড হইলে হয় তো নিরঞ্জনের নামটাও রতিনাথবাবুর নিকটে উপস্থিত হইত, হাতে লেখা কাগজখানা দ্বারোয়ান ফেলিয়া দিয়াছিল।

আজ জোর করিয়াই নিরঞ্জন রতিনাথের বাড়ীতে আসিয়া প্রবেশ করিয়াছে এবং একখানা মূল্যবান চেয়ার দখল করিয়া বসিয়াছে। আজ সে রতিনাথের সম্মুখে নিজের ব্যথা বলিবে, এবং যেমন করিয়াই হোক, একটা কাজের ঠিক করিবেই।

কৃষ্ণ দরজার পর্দা সরাইয়া বলিল, "বাবুর আসতে কত রাত হবে জানিনে, দিদিমণি এসেছেন, আপনার যা কথা থাকে ওঁকে বলে চলে যান।"

দিদিমণি—

নিরঞ্জন ঘামিয়া উঠিল। নিজের অর্দ্ধ মলিন কাপড় জামার উপর চোখ পড়িতে সে শিহরিয়া উঠিল। না, এখানে আর না থাকাই ভাল, সে কখনও দিদিমণির সঙ্গে কথা বলিতে পারিবে না, সুশিক্ষিতা সুসভ্য ভদ্র মহিলার সম্মুখে সে এই সজ্জায় সজ্জিত হইয়া কথা বলিবে কি করিয়া —তাহার এই বেলা সরিয়া পড়াই উচিত, আর এখানে থাকা ভাল নয়।

সে তাড়াতাড়ি উঠিয়া পড়িল।

ঠিক সেই সময় দরজার কাছে কাহার অতি মধুর কণ্ঠস্বর শুনা গেল—"তুমি একটু বাইরে থেকো কৃষ্ণ, বাবা এলেই আমায় খবর দিয়ো।

দরজার পর্দা সরাইয়া মনীষা প্রবেশ করিল। নিরঞ্জন সবিস্ময়ে এই মেয়েটির পানে তাকাইয়া তখনই চোখ নামাইল। মনীষা নমস্কার করিয়া বলিল, "আপনিই বুঝি বাবার সঙ্গে দেখা করতে এসেছেন?

উঠ্‌লেন কেন—বসুন। বাবা এখনও ফেরেনি তা বোধ হয় শুনেছেন, আপনার যা কথা থাকে আমার বলতে পারেন।"

তাহার কণ্ঠস্বরে এমন একটী সহৃদয়তার ভাব ফুটিয়া উঠিয়াছিল যাহাতে নিরঞ্জন মুগ্ধ না হইয়া থাকিতে পারিল না, সে চোখ তুলিয়া ভাল করিয়া মেয়েটীর পানে তাকাইল।

সুন্দর—অতি সুন্দর। দিদিমণি বলিতে সে যাহা ভাবিয়াছিল, এ মেয়েটীর মধ্যে তাহার কিছুই নাই। সে ভাবিয়াছিল- এখানে এমন কোনও মেয়েকে দেখিবে যাহার পাশ্চাত্য বেশভূষা আগেই তাহাকে আঘাত করিবে। এখন দেখিল এ মেয়েটী তাহারই ঘরের একটী মেয়ে মাত্র। তরুণী বিধবা, শুভ্র একখানি থান তাহার কোমল দেহখানি বেষ্টন করিয়া আছে, সুন্দর দেহ অলঙ্কারশূন্য। বিলাসিতার লেশমাত্র ইহার মধ্যে নাই, তাহার সম্মুখে একটী পবিত্রা ব্রহ্মচারিণী দণ্ডায়মান।

নিরঞ্জন নরমস্বরে বলিল, "হ্যাঁ, তাঁর কাছে আমার খুব দরকার। চার পাঁচদিন তাঁর অফিসে দেখা করতে গিয়েছিলুম, কিন্তু নিতান্ত গরীব জেনেই দ্বারোয়োন আমায় ভেতরে যেতে দেয়নি। এমন কি আমার নাম লেখা কাগজখানা পর্য্যন্ত তাঁকে দেয়নি। সেই জন্যে বাধ্য হয়ে আজ জোর করে এঘরে বসেছি, আপনার চাকর উঠিয়ে দিতে এলেও আমি উঠি নি।"

ছেলেটীর কুণ্ঠাহীন কথায় মনীষা খুসি হইয়া উঠিল, "হ্যাঁ, ও তা আমায় বলেছে। আমিও—"

নিরঞ্জন একটু হাসিয়া বলিল, "আপনিও সেই মতলবেই এসেছিলেন তা বুঝেছি – কি জানেন, গরীব হওয়া মস্ত বড় অভিশাপ, কিন্তু বাধ্য হয়েও, লোককে এ অভিশাপ কুড়োতেই হয়। ধনী হওয়ার ইচ্ছা করে সবাই, কিন্তু সবাই কি হতে পারে? জগতের দিকে ফিরে চান—দেখবেন দরিদ্রই বেশী, ধনীর সংখ্যা খুব কম। তবু মজার কথা কি জানেন, কোনোদিন এই দরিদ্রেরাই আবার হয় তো ধনী হয়, ধনীই হয় তো তাদের মত একমুঠো ভাতের জন্যে হাহাকার করে বেড়ায়। ওই যে একটা কথা আছে না— "চক্রবৎ পরিবর্ত্তন্তে সুখানি চ দুখানি চ" এ কথাটা মানুষ জানে তবু তো বুঝতেও চায় না।"

মনীষার মুখখানা লাল হইয়া উঠিল, সে অস্ফুট কণ্ঠে বলিল, "সত্যিই দুনিয়ার ধারাই এই—বুঝেও তবু বুঝতে চায় না। আজ যে রাজা কাল সে ফকীর, আজ যে ফকীর কাল সে রাজা, বরাবর এই ধারাই পৃথিবীতে চলে আসছে।

নিরঞ্জন চেয়ারের হাতা ধরিয়া দাঁড়াইয়াছিল, বলিল, "আপনাকে আর বিরক্ত করব না, তাঁর আসতে এখনও হয় তো অনেক দেরী হবে, আমি এইবার যাই, অদৃষ্ট নিতান্তই খারাপ নইলে কয়দিন অফিসে গিয়ে দেখা পেলুম না, আজ বাড়ীতে এসেও দেখা পেলুম না। যাই হোক একটা দিন ঠিক করে বলে দিতে পারবেন কি, কোন সময়ে এলে দেখা হবে সেটাও বলে দিলে ভাল হয়, তা হলে সেই দিনে সেই সময়ে এসে তাঁর সঙ্গে দেখা করব।"

মনীষা বলিল, "রবিবার দিনটা তিনি কারও সঙ্গে দেখা করেন না, আর যে কোনওদিনে আপনি সকালবেলায় আসবেন, তাঁর সঙ্গে দেখা হবে। আমি আপনার কথা তাঁকে বলে রাখব, কিন্তু কি দরকারে এসেছেন সেটাও যদি বলে যান, আমি তাঁকে জানাব।"

শুষ্ক হাসিয়া নিরঞ্জন বলিল, "কি দরকার তা এখনও বুঝতে পারেন নি জেনে আশ্চর্য্য হয়ে যাই। বাঙ্গালীর ছেলের দরকার চাকরীর, নইলে তারা না খেয়ে মারা যায়, দয়া করে তাঁকে বলে রাখবেন, যদি একটী কুড়ি টাকার চাকরীও আমায় দেন আমি চিরজীবন কৃতজ্ঞ হয়ে থাকব। তিনটী প্রাণীর ভরণ পোষণের ভার আমার উপরে—একটী পয়সা এ পর্য্যন্ত ঘরে নিয়ে যেতে পারিনি। অথচ ঘরে কোনদিন অর্দ্ধাহার কোনদিন অনাহার—"

থামিয়া গিয়া সে হাতখানা কপালে ঠেকাইল, "নমস্কার, আসি তা হলে। আপনি দয়া করে তাঁকে বলে রাখবেন যেন ভুলবেন না।"

মনীষা কিছু বলিবার আগেই সে তাড়াতাড়ি বাহির হইয়া গেল।

দরজার পাশ হইতে রুষ্টস্বরে কৃষ্ণ বলিল, "লোকটা আস্ত জানোয়ার।"

মনীষা ক্ষীণকণ্ঠে বলিল, "পেটে ভাত না থাকলে অনেক লোকই জানোয়ার হয়।"

(২)

রতিনাথ মিত্র গভর্ণমেণ্টের উচ্চপদস্থ কর্ম্মচারী, সংসারে

প্রতিপত্তি যথেষ্ট লাভ করিয়াছিলেন কিন্তু জীবনের শেষ ভাগে তিনি সুখী হইতে পারেন নাই।

একদিন তিনি সোনার সংসার পাতিয়া ছিলেন, স্ত্রী পুত্র কন্যা লইয়া সুখী হইবার আশা করিয়াছিলেন, আজ তাহাদের মধ্যে কেহই নাই, একমাত্র বিধবা পুত্রবধূ মনীষাই তাঁহার জগতে সম্বল।

পত্নী পুত্র ও কন্যাকে রাখিয়া অনেকদিন পূর্ব্বে ইহলোক ত্যাগ করিয়াছিলেন। অনেকের অনেক অনুরোধসত্ত্বেও পুত্রকন্যার মুখের পানে চাহিয়া রতিনাথ আর বিবাহ করেন নাই।

কন্যাকে তিনি উপযুক্ত রকম শিক্ষিতা করিয়া উপযুক্ত পাত্রের হস্তে সমর্পণ করিয়াছিলেন। জামাতা শশাঙ্ক সুযোগ্য ইঞ্জিনিয়ার, কিন্তু অদৃষ্টে এ সুখ সহিল না, বিবাহের কিছুকাল পরেই করুণা মারা যায়। শশাঙ্ক আর বিবাহ করে নাই, বিবাহ করিবে না বলিয়া দৃঢ়পণ করিয়াছে। এখনও সে পূর্ব্বের সম্বন্ধ বজায় রাখিয়া মাঝে মাঝে শ্বশুরালয়ে আসিয়া দুচারদিন থাকিয়া যায়।

মনীষা রতিনাথ বাবুর বাল্যবন্ধু সুরেশবাবুর কন্যা। বাল্যকালে তাহার বিবাহ হইয়াছিল। যখন তাহার বিবাহ হয় তখন হিরণ্ময় পঞ্চদশবর্ষীয় বালক ও মনীষা মাত্র অষ্টমবর্ষীয়া বালিকা।

এই বিবাহের মূলে ছিল দুই বন্ধুর প্রতিজ্ঞা। পুত্র কন্যার জন্মের বহুপূর্ব্ব হইতে এই দুইটী অভিন্ন হৃদয় বন্ধু বৈবাহিক সূত্রে আবদ্ধ হইয়াছিলেন। পুত্রকন্যা জন্মগ্রহণ করিলে রতিনাথবাবু পুত্রের বিবাহ দিয়া এই মেয়েটীকে কাছে লইবার জন্য ব্যগ্র হইয়া উঠিলেন, সুরেশবাবুর ইহাতে বিশেষ আপত্তি ছিল না, কিন্তু তাঁহার স্ত্রী ইহাতে অসম্মত হইলেন—এতটুকু বয়সে কন্যার বিবাহ দিতে তিনি একেবারেই অনিচ্ছুক ছিলেন।

কিন্তু তাঁহার মত এখানে কিছুমাত্র ফল দিল না, রতিনাথবাবু যখন সুরেশবাবুর হাত দুখানা চাপিয়া ধরিয়া মনীষাকে তখনই প্রার্থনা করিলেন তখন সুরেশবাবু মত না দিয়া পারিলেন না। স্ত্রীর অসম্মতিতেও একদিন মহাসমারোহে মনীষার সহিত হিরণ্ময়ের বিবাহ হইয়া গেল।

কিন্তু বিবাহের ফল হইল অন্যরূপ। রতিনাথের সকল আশা ব্যর্থ করিয়া বালিকা মনীষার নাম হতভাগিনী বিধবার শ্রেণীভুক্ত করিয়া বিবাহের দুই বৎসর পরে হিরণ্ময় ইহলোক ত্যাগ করিল।

এই সময় মনীষা ছিল তাই রতিনাথ বাবু আবার উঠিতে পারিয়াছিলেন, আবার দাঁড়াইতে সক্ষম হইয়াছিলেন। এই মেয়েটী বাল্যকাল হইতে তাঁহাকে পিতার ন্যায় ভালবাসিত, পিতার নিকটে কন্যা যেমন অসঙ্কোচে আবদার করে তেমনিই করিত। বিবাহের পূর্ব্ব হইতে সে রতিনাথবাবুর নিকটে থাকিত। পিতা মাতা ভাই বোনের সহিত তাহার বিশেষ সংস্রব ছিল না। একমাত্র পুত্রের মৃত্যুর পরে রতিনাথ বাবুর অন্তরের পুঞ্জীকৃত—স্নেহ ভালবাসা সকলই মনীষার উপর গিয়া পড়িয়াছিল।

মনীষা বি এ পর্য্যন্ত পড়িয়াছিল, সে এখানেই বরাবর-কার জন্য রহিয়া গিয়াছিল, পিত্রালয়ের সহিত তাহার সম্বন্ধ ছিল না বলিলেই চলে। রতিনাথের উপর অত্যন্ত রাগ করিয়াই সুরেশবাবুর স্ত্রী সুরমা কন্যার সহিত সম্পর্ক রাখেন নাই। তিনি পুরা রকমে পাশ্চাত্য প্রথায় চলিতেন, পুত্র কন্যা সকলকেই তাঁহার মতানুসারে চলিতে হইত। মনীষাকে নিজের কাছে আনিয়া তাহাকে তিনি নিজের মতানুযায়ী গড়িয়া তুলিবার ইচ্ছা করিয়া ছিলেন, কিন্তু মেয়েটী সব রকমেই তাঁহাকে এড়াইয়া গেল, সে কিছুতেই মায়ের কাছে ধরা দিল না।

রতিনাথের প্রদত্ত শিক্ষায় সে শিক্ষিতা হইয়াছিল, মায়ের এতটা বাড়াবাড়ি তাহার একেবারেই অসহ্য মনে হইত, সেই জন্য সে স্বেচ্ছায় মায়ের সংস্পর্শ ত্যাগ করিয়াছিল।

এই বয়সেই কন্যা যে সর্ব্বত্যাগিনী ব্রহ্মচারিণী হইয়া উঠিল, ইহাতে সুরমা মর্ম্মাহতা হইয়াছিলেন বড় কম নয়, ইহার জন্য তিনি স্বামীকে দোষ দিতেন, নিজের ললাটে করাঘাত করিয়া চোখের জল ফেলিতেন।

পিতা মাতার বুক হইতে সন্তানকে বিচ্ছিন্ন করিয়া রতিনাথও বড় কম অনুতপ্ত হন নাই। তিনি সন্তানকে ফিরাইয়া দিতে চাহিয়াছিলেন, কিন্তু মনীষা নড়িল না।

ব্যাকুলভাবে রতিনাথ কেশ বিরল মাথায় হাত বুলাইতেন, কিন্তু প্রতিবিধানের কোনও উপায় তিনি খুঁজিয়া পাইতেন না। মাঝে যে ঘটনা পূর্ণ দিনগুলো আসিয়াছিল

যদি তাহা কোনরূপে মুছিয়া দিয়া তিনি মনীষাকে পিতা মাতার কাছে ফিরাইয়া দিতে পারিতেন, তবে নিজের জীবনে চিরকালের জন্য একাকীত্বের কষ্ট বরণ করিয়া লইতেন, মনীষাকে জড়াইতেন না।

এই মেয়েটীর অন্তর বড় কোমল ছিল, কাহারও দুঃখ কষ্ট দেখিলে বা কানে শুনিলে সে ব্যগ্র হইয়া উঠিত, তাহার জন্য রতিনাথকেও বড় কম ব্যস্ত হইতে হইত না। অনেক সময়ে নিজের কাজের ক্ষতি করিয়াও তাঁহাকে মনীষার আবদার রাখিতে হইত।

সেদিন নিরঞ্জনের মলিন মুখ ও দুঃখপূর্ণ কথাগুলিতে মনীষা অন্তরে সত্যই বেদনা অনুভব করিয়াছিল। ধনীর দুলালী হইলেও সে দরিদ্রের দুঃখ কষ্ট বুঝিত এবং সে দুঃখের বেদনা নিজের হাতে মুছাইয়া দিতে তৎপর হইত।

সংসারে নিরঞ্জনের বৃদ্ধ পিতা ও মাসীমা ছিলেন। একটী মাত্র ভগিনীর সম্প্রতি বিবাহ দিতে তাহাদের যথা সর্ব্বস্ব গিয়াছে, মাথা রাখিবার আশ্রয় দেশের বাড়ীখানি পর্য্যন্ত নাই। পিতা স্থবির বৃদ্ধ, তাহার উপর নিত্য অসুখ লাগিয়াই আছে।

একদিন সৌভাগ্যের তুঙ্গশিরে তিনি আসীন ছিলেন। মফঃস্বলের কোন সহরে ওকালতি করিয়া যৌবনে তিনি প্রচুর অর্থ সঞ্চয় করিয়াছিলেন। বৃদ্ধ বয়সে কর্ম্মত্যাগ করিয়া তিনি সঞ্চিত অর্থ লইয়া ব্যবসায়ে প্রবৃত্ত হন, কিন্তু সৌভাগ্যলক্ষ্মী তাঁহার উপর বিরূপ হইয়া ছিলেন, তাই বিদেশের ব্যবসার সহিত যোগ রাখিতে গিয়া তাঁহার ব্যবসা নষ্ট হইয়া গেল, উপরন্তু দেনার দায়ে যথা সর্ব্বস্ব গেল।

এই সময় হইতে দারুণ মনোকষ্টের দরুণ তাঁহার স্বাস্থ্যও নষ্ট হইয়া গেল, জ্ঞানের বৈলক্ষণ্য ঘটিল, আর কিছুতেই তিনি সুস্থ হইতে পারিলেন না।

নিরঞ্জন বি এ পাস করিয়াও অদৃষ্টের জন্য কোন কাজ পাইতেছিল না, অনেক চেষ্টা করিয়াও সে ব্যর্থ হইতেছিল।

গৃহের অভাব দিন দিন বাড়িয়া চলিতে ছিল, রুগ্ন ও বিকৃত মস্তিষ্ক পিতার নিকটে সংসারের ব্যাপার আর প্রচ্ছন্ন রাখা চলে না। নিরঞ্জন অত্যন্ত উৎকণ্ঠিত হইয়া উঠিয়াছিল।

একখানি ক্ষুদ্র খোলার ঘর ভাড়া লইয়া তাহাতে এই চারিটী প্রাণী কোন রকমে মাথা গুঁজিয়া ছিল। খোলার ঘরের সামান্য মাসিক ভাড়া কিন্তু তাহাই তিনমাস দেওয়া হয় নাই।

মাসিমা উমাসুন্দরী আছেন বলিয়াই কোন রকমে সংসার চলিতেছে। তিনি বাল বিধবা, ভগিনীর নিকটেই বরাবর ছিলেন, ভগিনীর মৃত্যুর পরেও এখানে রহিয়া গিয়াছেন।

(৩)

"মনি—মা—"

কানে এই আহ্বান আসিবামাত্র মনীষা উত্তর দিল, "যাচ্ছি বাবা—"

হাতের বোনাটী টেবিলের উপর ফেলিয়া সে উঠিয়া আসিল।

রতিনাথ শ্রান্তভাবে একখানা ইজিচেয়ারে আড় হইয়া পড়িয়াছিলেন, মনীষা আসিয়া তাঁহার পিছন দিকে দাঁড়াইল।

রতিনাথ বলিলেন, "আজকাল মায়ের আমার কি যে এত কাজ পড়েছে তা বুঝতে পারি নে, ডেকে ডেকে তবে কাছে পাওয়া যায়।"

কুণ্ঠিত হইয়া মনীষা বলিল, "না বাবা শুধু আজকের দিনটাই তো ডেকেছেন, অন্যদিন আমি তো এখানেই থাকি।"

চাপা হাসি হাসিয়া রতিনাথ বলিলেন, "না হয় আজকের দিনটাই, কিন্তু কেন হল বল দেখি মা?"

মনীষা তাঁহার শুভ্র মাথায় হাত বুলাইয়া দিতে দিতে বলিল, "একটা গলাবন্ধ বুনছিলুম বাবা! যার জন্যে বুনছিলুম তার কথা ভাবছিলুম কিনা, সেই জন্যে আপনার আসার কথা একেবারেই ভুলে গিয়েছিলুম।"

রতিনাথ জিজ্ঞাসা করিলেন, "কার গলাবন্ধ বুনছিলে মা?"

মনীষা বলিল, 'পাশের বাড়ীতে একটী বউ আছে তাকে গলাবন্ধ বুনে দেওয়ার জন্যে তার স্বামী হুকুম দিয়েছে। তার হুকুম মত যদি বুনে না দেয় বউটীর লাঞ্ছনার সীমা থাকবে না অথচ বেচারার সারাদিনের মধ্যে এতটুকু অবকাশ নেই। কিন্তু স্বামী তো সেকথা বুঝবেন না, এদিকে ঘড়ি ধরে সব কাজ নিয়মিত হওয়া চাই—একচুল

এদিক ওদিক হলে বউটীর লাঞ্ছনার সীমা থাকে না। বাড়ীতে একটী মাত্র ঝি আছে, তা থাকা সত্ত্বেও সমস্ত কাজ বউটীকে করতে হয়, সে থাকা না-থাকা সমান। এর পর দুটি ছেলেপুলে, এসব নিয়ে স্বামীর হুকুম মত গলাবন্ধ বুনে দেওয়া যে কি হাঙ্গাম তা তো তিনি বুঝবেন না, তাঁর গলাবন্ধ চাই-ই। বউটী কাল সব দুঃখের কথা বলতে গিয়ে কেঁদে ভাসাচ্ছিল, আমি তার সেই গলাবন্ধ বুনে দেওয়ার ভার নিয়েছি।"

রতিনাথ একটু হাসিলেন, তখনই গম্ভীর হইয়া বলিলেন, "জীবনটা শুধু পরের কাজেই কাটিয়ে দিলে মা। কার কি হল, কে খেতে পায় নি, কার সেবা করতে কেউ নেই, এই সব দেখে আর তার প্রতিবিধান করতেই দিন কাটালে, আমার ঘরের কাজ যে এদিকে কিছুই হয় না।"

মনীষা অভিমানের সুরে বলিল, "তা তো আপনি বলবেনই বাবা; আমি ঘরের কাজ করে তবে তো বাইরের কাজে হাত দেই। ঘরের কাজ মানে কেবল আপনাকে দেখাশুনা, আর কি করতে দেন শুনি?"

রতিনাথ হাসিতে লাগিলেন—"পাগলী মা আমার এইবার রাগ করেছে বুঝেছি। না মা, রাগ দুঃখ করো না, আমি শুধু তোমায় রাগাবার জন্যেই এ সব কথা বলছি। আমি কি জানি নে তুমি আমার ঘরের লক্ষ্মী, যে কাজে তোমার হাত না পড়ে তা অসম্পূর্ণ থেকে যায়, দুদিন ছিলে না তাতে আমার খাওয়া হতে আরম্ভ করে সব বিষয়েই দারুণ বিশৃঙ্খলা ঘটেছিল। ডেকে ডেকে একটা চাকরকে পাই নে, খেতে গিয়ে দেখি তরকারী কোনটা নুণে ভরা, কোনটাতে নুণ নেই। অফিসে যাওয়ার সময় এতগুলো চাকর থাকতেও কোথায় জামা, কোথায় জুতো, জামায় হয় তো বোতাম নেই—এমনই হাজার অসুবিধা ভোগ করতে হয়েছিল।"

তিনি প্রচুর হাসিতে লাগিলেন, মনীষা শুধু মলিন মুখে তাঁহার মাথায় হাত বুলাইয়া দিতে লাগিল।

"আচ্ছা বাবা একটা কথা জিজ্ঞাসা করি, আমাদের দেশে অনেক পুরুষে মেয়েদের অভাব বোঝে না কেন, এত নির্য্যাতন করে কেন? আপনি স্বামীত্বের অহঙ্কার নিয়ে মার উপর কোন দিন স্নেহের নামে এ রকম অত্যাচার করে ছিলেন?"

রতিনাথ গোপনে একটা নিঃশ্বাস ফেলিলেন, অতীতের সেই দিনগুলার কথা মনে জাগিয়া উঠিল, ক্ষণেক চুপ করিয়া থাকিয়া তিনি ধীরে ধীরে বলিলেন, "না মা, কোনদিন আমার জ্ঞানে তাঁকে একটা কড়া কথা বলিনি। স্ত্রী যে সহধর্ম্মিণী, গৃহের লক্ষ্মী, আমার সন্তানের মা, তাঁকে কি অপমান করা চলে মা? যে সংসারে নারীর অপমান হয় সে সংসার যে উচ্ছন্ন যায় আমাদের হিন্দুশাস্ত্রও তো এ কথা স্পষ্ট বলে থাকে।"

মনীষা বলিল, "তবে কেন ওরা অমন ধারা অত্যাচার করে বাবা? পাশের বাড়ীর এই বউটী— দেখেছি ভোর হতে রাত অবধি ভূতের মত খাটে, একদণ্ড ওর হাতের পায়ের বিশ্রাম নাই, কতদিন গভীর রাতে আমার ঘুম ভেঙ্গে গেছে, আমার ঘরের জানলা বরাবর ওদের খোলা জানলা পথে দেখেছি স্বামী দিব্য আরামে ঘুমাচ্ছে আর বউটি তার গা টিপে দিচ্ছে, ঘুম আসছে—ঝোঁকে তার গায়ের পরে পড়তেই স্বামীর ঘুম ভেঙ্গে সে গর্জ্জে উঠছে।"

রতিনাথ একটা দীর্ঘনিঃশ্বাস ফেলিয়া ধীরে ধীরে বলিলেন, "এদেশের হাজার করা নয়শ নিরেনব্বই জন মেয়েকে এইভাবে নিজের কর্ত্তব্য পালন করে যেতে হয় মা। তাদের যখন বিয়ে হয় তখনই তাদের নিজের বলতে যা কিছু সব বিসর্জ্জন দিয়ে আসতে হয়, তারপর তাদের আত্মমর্য্যাদা বোধ পর্য্যন্ত রাখা চলে না।

মনীষা একটু চুপ করিয়া থাকিয়া বলিল, "মেয়েরা না হয় তাদের স্বভাব অনুযায়ী সেবা করতে ভালবাসে বলেই সেবা করে, কিন্তু পুরুষেরা কেমন করে অসঙ্কোচে সেবা নেয়, অনেক সময়ে জোর করে সেবা দিতে বাধ্য করে আমি কেবল তাই ভাবি। সেদিন এই বউটীর স্বামী তাকে মেরেছিল, অথচ আপনি বলেন স্ত্রী গৃহের লক্ষ্মী, দেবী, কিন্তু সে কথা এরা কি জানে না বাবা? এ সংসারে পুরুষের পূর্ণ অধিকার রয়েছে—থাকবেও, মেয়েদের কি কোন অধিকার নেই?"

রতিনাথ শান্তকণ্ঠে বলিলেন, "তাই কি হতে পারে মা, আমার তো তা বলে মনে হয় না। আমার মনে হয় সংসারে পুরুষের যেমন অধিকার, মেয়েদের অধিকার বরং তার চেয়েও বেশী, কারণ নারী মা, সংসারের গৃহিণী। পুরুষ বাইরে অক্লান্তভাবে খাটতে পারে, ঘরের মধ্যে সে

দৃষ্টি দেবে কখন, আর বাইরে খেটে এসে ঘরে যদি সে এতটুকু শান্তি তৃপ্তি না পায়, সে খাটবে কি করে? এই দেখ না, আমি কেমন বাইরে সারাদিন ভূতের মত খেটে এসে বাড়ীতে তোমার স্নেহ, যত্ন, আদর পেয়ে খাটনির কথাই ভুলে যাই, এমনই তো সকলেরই মা। তোমরা যে আমাদের বাঁচিয়ে রেখেছ মা, তোমরা যে মা। এই মাতৃজাতিকে যারা সম্মান করে না, তাদের কতখানি আত্মদানে সংসার সুখময় হয় তা যারা ভাবে না তাদেরকে আমি মানুষ বলি নে, তারা পশু। একদিন এ দেশে অসীম শক্তিশালিনী নারীকে দেবীরূপে চিত্রিত করা হয়েছে, পুরুষ প্রকৃতির পূজা করে ধন্য হয়ে গেছে। সেই দেশেই নারীর এই নিত্য নির্য্যাতনে অপমানে শক্তি কি ঘুমিয়েই থাকবে মা, ওকে যে জেগে উঠতে হবেই। একটা কথা আছে জানো অত্যাচার বাড়তে বাড়তে যখন অনেক বেশীই হয়ে যায়, তখন বিপরীত দিকে কেউ তাকে বাধা দিতে দাঁড়ায়। সহশীলা নারীরও এই অবাধ অত্যাচার অসহ্য হয়ে উঠেছে, দিন আসছে মা—দেখতে পাবে সমস্ত নারীসমাজ এই পুরুষ সমাজের বিরুদ্ধে মাথা তুলে দাঁড়াবেই, সে দিনের আর দেরী নেই।"

মনীষা একটী সুদীর্ঘ নিঃশ্বাস ফেলিয়া বলিল, "আপনার আশীর্ব্বাদ সফল হোক, সে দিনের আর দেরী নেই বাবা, দিন আসছে। কারণে বিনা কারণে নারী যে অত্যাচার, যে লাঞ্ছনা সহ্য করছে, তাদের বুকের অন্তঃস্থল হতে যে দীর্ঘনিঃশ্বাস উঠছে, চোখ হতে যে জল ঝরে পড়ছে, এ সবই জমা হচ্ছে। এমনি করে জমতে জমতে এই ক্ষুদ্র নিঃশ্বাস একদিন মহাঝড়ে পরিণত হবে, এই লুকিয়ে ফেলা দু'চার ফোঁটা চোখের জল বিশাল সমুদ্রে পরিণত হবে। সেই মহাঝড়ে পৃথিবীর বুকের অত্যাচার উপদ্রব উড়িয়ে নিয়ে যাবে, অনন্ত চোখের জল সাগরে প্রচণ্ড ঢেউরূপে এসে সমস্ত দেশের বুকে প্লাবন আনবে, সেই প্লাবনে সকল মলিনতা ধুয়ে যাবে। সে দিনের আর দেরী নেই তা জানা যাচ্ছে না বাবা?"

রতিনাথ একটু হাসিলেন।

৪

হাতে লেখা নামের কার্ডখানা দ্বারোয়ানের হাতে দিয়া ভিতরে পাঠাইয়া দিয়া নিরঞ্জন স্পন্দিত দেহে বাহিরে দাঁড়াইয়াছিল। দ্বারোয়ানের নিকটে সে আগেই সংবাদ লইয়াছিল রতিনাথ এখন বাড়ীতেই আছেন, কোথাও যান নাই।

খানিক বাদে দ্বারোয়ান ফিরিয়া আসিয়া তাহাকে বসিতে বলিল, জানাইল বাবু এখনই বাহিরে আসিবেন, তখন দেখা হইতে পারিবে।

সেই বৈঠকখানায় আজও নিরঞ্জন বসিল।

আজ সে কতকটা ভদ্রভাবে আসিয়াছিল। তাহার পায়ে কমদামের একজোড়া স্যাণ্ডাল ছিল, পরণের কাপড়খানা ও জামাটা পরিষ্কার ছিল।

প্রতিদিন কত দরজায় তাহাকে ফিরিতে হয় কোন স্থানে যাইবামাত্র গলাধাক্কা পাইয়াছে, কোন স্থানে এতটুকু বসিয়া বিনয়নম্র কথায় বিদায় পাইয়াছে।

প্রায় মিনিট পনের বাদে রতিনাথ গৃহে প্রবেশ করিলেন।

নিরঞ্জন সসম্ভ্রমে উঠিয়া তাঁহাকে অভিবাদন করিল, রতিনাথ একটু হাসিয়া শুধু মাথাটা একটু নত করিলেন। কুঞ্জ তাড়াতাড়ি আসিয়া একখানা চেয়ার সরাইয়া দিল, তিনি তাহাতে বসিলেন, শান্তকণ্ঠে বলিলেন, "বস।"

নিরঞ্জন বসিল।

রতিনাথ বলিলেন, "আমার মার কাছে শুনলুম তুমি নাকি আরও একদিন এবাড়ীতে এসেছিলে, কিন্তু সেদিন আমি বাড়ী ছিলুম না, তোমার সঙ্গে দেখা হয় নি।"

নিরঞ্জন নম্রভাবে বলিল, "তিনি আমায় রবিবার ছাড়া আর যে কোনদিন আসবার কথা বলে দিয়েছিলেন, বলেছিলেন তিনি আপনাকেও আমার কথা বলে রাখবেন।

রতিনাথ বলিলেন, "হ্যাঁ, আমি সব শুনেছি। কিন্তু আমি একটু মুস্কিলে পড়েছি কেননা আমার অফিসে এখন কোন কাজ খালি নেই তবে হ্যাঁ, মা যখন কথা দিয়েছেন তখন আমায় তোমার একটী কাজ যোগাড় করে দিতেই হবে। আমার একটী বন্ধুর ছেলে সুনীল একটা অফিস খুলছে শুনেছি, সে প্রায়ই আমার কাছে আসে, আজও আসবার কথা আছে। আমি ভেবেছি সে এলেই আমি তার কাছে তোমার কথা বলব, আমার বিশ্বাস তার ওখানে তোমার কাজ নিশ্চয়ই হবে।"

নিরঞ্জন হতাশ হইয়া পড়িল। সে দিন হইতে সে আশা করিয়া আছে, রতিনাথবাবু তাহার একটী কাজ নিশ্চয়ই দিবেন। কে সেই সুশীল, কোথায় তাহার অফিস, কিসের অফিস, সে তাহাকে কর্ম্মে নিযুক্ত করিবে কিনা তাহাই বা কে জানে।

তাহার মলিন মুখখানার পানে তাকাইয়া একটু হাসিয়া রতিনাথ বলিলেন, "তুমি তার জন্যে হতাশ হয়ো না, আমি জানি সুশীল আমার অনুরোধ,—তার দিদিমণির অনুরোধ ঠেলতে পারবে না। কতদূর পর্য্যন্ত পড়েছ, আর কোথাও কাজ করেছ কি না—"

নিরঞ্জন শুষ্ক হাসিয়া বলিল, "বি, এ, পড়েছি—একজামিনে ফার্ষ্ট হয়ে পাশও করেছি, কিন্তু চাকরীর বাজারে তার কোন দাম নেই। এখন মনে হয়—যে পয়সাটা বিশ্ববিদ্যালয়ের এই ডিগ্রি কিনতে ঢেলেছি, সেটা যদি থাকত তবু আজ একটু উপকার হতে পারত। চাকরী দু এক জায়গায় দু'চার দিনের জন্য করেছি মাত্র, স্থায়ী কাজ কোথাও পাই নি।"

রতিনাথ মাথা দুলাইয়া বলিলেন, "তুমি যে বিশ্ববিদ্যালয়ের ডিগ্রির কথা বললে সেটা বাস্তবিক সত্য। বড় চাকরী এককালে ডিগ্রির জোরে মিলত বটে। আর বড় চাকরী পাওয়ার লোভে বাঙ্গালী বাস্তবিক সব কাজ ছেড়ে দিয়ে নিজের স্বাস্থ্য নষ্ট করে—এমন কি পেটে না খেয়ে পর্য্যন্ত ডিগ্রি নেওয়ার চেষ্টা করেছে, এখনও করছে। এত ছেলে যে উচ্চশিক্ষা লাভ করছে এদের সকলেরই লক্ষ্য চাকরী, দাসত্বের নেশা এদের এমন পেয়ে বসেছে যে এরা আর নূতন কোন কিছু করবার কল্পনা পর্য্যন্ত করতে পারে না। দেশের জমিগুলো দিন দিন অনুর্ব্বর হয়ে উঠছে, গো-বংশ ধ্বংস হয়ে আছে,—পেটে খেতে পাচ্ছে না, কাপড় পরতে পারছে না—তবু এরা এদিক পানে চাইতে পারে না। কেন—চাকরী করার চেয়ে সম্মানের সঙ্গে নিজের মাঠে চাষ করা কি মন্দ, কাপড় বোনা কি শক্ত; দেশের ভবিষ্যৎ আশা কচি ছেলেগুলো যে এতটুকু হতে দুধ খেতে না পেয়ে শুকিয়ে যায়, তাদের মস্তিষ্ক অনুর্ব্বর হয়ে পড়ে,—তাদের জন্য গো-পালন করা কি খারাপ?"

নিরঞ্জন খানিক চুপ করিয়া রহিল, তাহার পর হঠাৎ হাসিয়া উঠিয়া বলিল, "দেখুন যা বললেন সবই সত্য; যদি নিরেট মূর্খ হতুম, শিক্ষার বীজ যদি উর্ব্বর মাথায় না বোনা হতো, গরু পুষতে পারতুম, মাঠেও চাষ দিতে পারতুম, চরকায় সুতো কেটে কাপড়ও তৈরী করতে পারতুম। কিন্তু এই পাশ্চাত্য শিক্ষাই না আমাদের জানিয়েছে ও সব ছোটলোকের কাজ, শিক্ষিত ভদ্রলোক চাকরী করে খেতে পারে—মাঠে চাষ করতে যেতে পারে না।"

রুষ্টভাবে রতিনাথ বলিলেন, "পাশ্চাত্য শিক্ষার গুণই ওই। এর কাজটা কি রকম জানো—অতি ধীরে কেন না হঠাৎ যদি কোন সংস্কার উচ্ছেদ করতে যাওয়া যায় তার ফল ভাল হয় না, কিন্তু আস্তে আস্তে দুদিনের জায়গায় দু বছর লাগালে ঠিক ফল দেবেই। পাশ্চাত্য প্রাচ্যের মুখে বিষের বাটী ধরেছে, এ বিষে একেবারে মারবে না, তাকে জর্জ্জর করে ধীরে ধীরে হত্যা করবে। তুমি প্রত্যেক বিষয়ে লক্ষ্য করে দেখ ওদের এই নীতিটা বেশ দেখতে পাবে, ধীরে ধীরে আমাদের যা কিছু একদিন অবশ্য কর্ত্তব্য কর্ম্মের মধ্যে পরিগণিত হতো, তার পরে কি রকম বিদ্বেষ এনে দিচ্ছে, আর ওরা—"

দরজার পর্দ্দাটা একটীবার কাঁপিয়া উঠিল, তাহার পরই পর্দ্দা সরাইয়া একটী ইউরোপীয়ান পরিচ্ছদে সজ্জিত যুবক প্রবেশ করিল। তাহাকে দেখিয়া রতিনাথ বলিয়া উঠিলেন, "এই যে, তুমি এসেছ সুশীল, এই আর একটু আগেই তোমার নাম করছিলুম।"

নিরঞ্জন ঘামিয়া উঠিল, তাড়াতাড়ি সে মুখ নত করিল। তাহার মনে হইতেছিল কোন ক্রমে এ স্থান ত্যাগ করিতে পারিলে সে এখন বাঁচিয়া যায়, পরি িতের সম্মুখে অপদস্থ হইতে হয় না।

সেই সুশীল—সে আজ সৌভাগ্যের উচ্চশৃঙ্গে বসিয়া, আর তাহারই সহপাঠি সে, সে আজ কোথায়? সুশীল তাহার বাল্যবন্ধু স্কুলে তাহারা বরাবর একত্রে পড়িয়াছিল, তাহার পর ম্যাট্রিক পাশ করিয়া একই কলেজে তাহারা দুই বৎসর একত্রে পড়িয়াছিল, আই এ পাশ করিয়া সুশীল বিলাতে চলিয়া গিয়াছিল, সে আজ চার বৎসর পূর্ব্বের কথা মাত্র।

অদৃষ্ট চক্রের কি আশ্চর্য্য পরিবর্ত্তন। সুশীল যেমন ছিল তেমনই আছে, কিন্তু নিরঞ্জনের শুধু ভাগ্যই পরি-

হয় নাই, তাহার আকৃতির পর্য্যন্ত যথেষ্ট পরিবর্ত্তন ঘটিয়া গিয়াছে যাহাতে সুশীল অপরিচিত বোধে হঠাৎ নিমিষের দৃষ্টি লাভে তাহাকে চিনিতে পারিল না।

পরের কাছে দীনতা জানানো তবু সম্ভব বোধ হয়, কিন্তু আত্মীয় বন্ধুর নিকটে কিছুতেই মাথা নত করিতে পারা যায় না। একদিন, যে সুশীলের পার্শ্বে বন্ধুরূপে সে দাঁড়াইয়াছে, আজ তাহাকে প্রভু স্বীকার করিয়া তাহার আসনের নীচে সে বসিবে কি করিয়া, এ কল্পনাও যে অসহ্য।

সুশীল অপরিচিত এই লোকটীর পানে মোটে দৃষ্টিপাত করে নাই বলিলেই হয়। সে রতিনাথকে নমস্কার করিয়া একখানা চেয়ার টানিয়া তাঁহার কাছেই বসিয়া পড়িল, পকেট হইতে রুমাল বাহির করিয়া মুখের ঘাম মুছিতে মুছিতে বলিল, "যাই বলুন—রাজার নিজের দেশটী বেশ, বারমাসই ঠাণ্ডা, গরম কাকে বলে তা কেউ জানে না। এই সকাল বেলাই এ দেশে কি গরম দেখেছেন ঘেমে যেন স্নান করে উঠেছি।"

একটু হাসিয়া রতিনাথ বলিলেন, "বৈশাখ মাস গরম পড়বারই কথা। পল্লীগ্রামের দিকে যাও এখানকার চেয়ে একটু ঠাণ্ডা বোধ হবে। সহরের মধ্যে অসহ্য গরমে টেঁকা যখন দায় হয়ে ওঠে, তখন পল্লীগ্রাম বেশ ঠাণ্ডা মনে হয়।"

সুশীল বলিল,—"অন্য বছর আপনাদের অফিস দার্জ্জিলিংয়ে উঠে যায়, এ বছর গেল না কেন?"

মুখখানা বিকৃত করিয়া রতিনাথ বলিলেন, "কর্ত্তাদের ইচ্ছা, আমাদের কথাতো ওখানে খাটে না, ওরা যা খুসী তাই করে যাবেন আমরা কেবল হুকুম মেনে যাব বইতো নয়, হাজার দু হাজারই মাইনে পাই না, তবু আমরা সেই চাকর, হুকুম তামিল করা ছাড়া ওদের মনস্তুষ্টি করা ছাড়া আমাদের আর উপায় নেই!"

ভ্রূ কুঞ্চিত করিয়া সুশীল বলিল, "যাই বলুন, এমনভাবে নিজের সত্বা বিসর্জ্জন দিতে বাঙ্গালীরা যত বেশী পারে আর কেউ তত পারে না। সমস্ত বাঙ্গালী একসাথে কোন দিন মিলতে পেরেছে—না পারবে? আজকে দেশে এই একটা হুলুস্থুলু কাণ্ড পড়ে গেছে, এতে সকলেই কি যোগ দিয়েছে? যারা সরকারের চাকরী করে তারা ভয়ে জড়সড়, পাছে কিছু হয়, পাছে চাকরী যায়। এমনি করে হুকুম তামিল করতেই এরা অভ্যস্ত, একদিন যদি হুকুম তামিল না করতে পারে—তাদের জীবনটাই দুর্ব্বহ হয়ে ওঠে।"

রতিনাথ একটু হাসিলেন, পরক্ষণে গম্ভীর হইয়া বলিলেন, "তুমি যা বলেছ সেটা বাস্তবিকই ঠিক কিন্তু—

বাধা দিয়া সুশীল বলিল, "আবার মজা দেখুন—ওদের দেশে ওদের সঙ্গে মিশলে এ রকম ভাবটী দেখা যায় না, ওরা ঠিক নিজের মতই আপনাকে দেখবে, কিন্তু এদেশে পা দেওয়ার সঙ্গে সঙ্গে মনের ভাবটা এমন বদলে যায় যে আপনি তখন ভাবতেই পারবেন না তার সঙ্গেই আপনার সেখানে এত ভালবাসা ছিল! এখানে এসেই সে আপনার সঙ্গে প্রভু ভৃত্য সম্পর্কটা জাগিয়ে তুলবে, তার সমান হয়ে পাশে দাঁড়ানোর অধিকার আর আপনার থাকবে না।"

রতিনাথ বলিলেন, "সেটা এদেশের জল হাওয়ার দোষ। আমাদের দেশে একটা প্রবাদ কথা চলন আছে লঙ্কায় যে আসে সেই রাক্ষস হয়, কথাটায় মিথ্যে বাস্তবিকই নেই, তার প্রমাণ আমরাও অহোরাত্র পাচ্ছি। ওদের দেশ স্বাধীন, পরাধীন নয়, তাই নিজের দেশের আব-হাওয়ার মধ্যে থেকে পরের মর্য্যাদা রক্ষা সম্বন্ধে ওরা যথেষ্ট সচেতন থাকে। এদেশ পরাজিত, এদেশের মাটিতে পা দেওয়ার সঙ্গে সঙ্গে পরের ব্যক্তিত্ব সম্বন্ধে সচেতনভাব ওদের দূর হয়ে যায়; পরাজিতের পরে বিজেতার যে হীন মনোবৃত্তির ভাব জেগে ওঠে তার জন্যে ওদের বিশেষ দোষ দেওয়া যায় না, মানুষের স্বভাবজ ধর্ম্মই এই যাকে আমি দু কথা শুনিয়ে দিতে পারি তাকে তা শুনাতে আমি ইতস্ততঃ করিনে। যারা আমার অধীনে কাজ করে তারা আমাদেরই দেশের লোক, তার জাতি ধর্ম্ম, আমার জাতি ধর্ম্ম সবই এক, তবু সে আমার অধীনে কাজ করে বলেই আমি নিজের প্রভুত্বটুকু বজায় রাখতে—নিজের সম্মান-টুকু পূরাদস্তর আদায় করে নিতে ভুলিনে। সেইটুকুই যেন আমার লক্ষ্য আমার বড় কাজের সার্থকতা।"

সুশীল অন্যমনস্কভাবে ঘূর্ণায়মান ইলেকট্রিক পাখার পানে তাকাইয়াছিল। রতিনাথ বলিলেন, "আশা করেছি তোমার জ্ঞান সার্থক হয়ে তোমার মধ্যে এ ভাবটা জাগাবে না। তোমার অফিসে কি রকম চলছে বল দেখি?—"

সুশীল সংক্ষেপে উত্তর দিল, "মন্দ নয়।'

রতিনাথ বলিলেন, "এই ভদ্রলোকটী কাজের প্রার্থী হয়ে আমার কাছে এসেছেন, আমি ওকে আশা দিয়েছি তোমার অফিসে যাতে কাজ হয় সে চেষ্টা করব। বি, এ পর্য্যন্ত পড়েছেন, দুই এক জায়গায় অস্থায়ীরূপে কাজও করছেন। তোমার অফিসে একটু বিচিত্রতা আছে, অত বড় একটা ব্যাপারে তুমি ভারতীয় ছাড়া আর কারও সাহায্য নাও নি সেই জন্যেই আমি একে আশা দিয়েছি, স্বজাতীয় একে তুমি ফিরাবে না।

সুশীল এতক্ষণে মুখ তুলিয়া ভাল করিয়া নিরঞ্জনের পানে চাহিল, সবিস্ময়ে বলিয়া উঠিল—"নিরু না?"

নিরঞ্জনের মুখে বড় মলিন একটু হাসির রেখা জাগিয়া উঠিয়া তখনই মিলাইয়া গেল, ক্ষীণ কণ্ঠে বলিল, "হঁ্যা, আমিই বটে।"

সুশীল লাফাইয়া উঠিল—"আমায় ক্ষমা করতে হবে, আমি তোমায় মোটেই চিনতে পারি নি। না খেয়ে খেয়ে চাকরীর জন্য দরজায় দরজায় ঘুরে যা চেহারা করেছ তাতে আমি কেন—চার বছর পরে যদি তোমার বাবাও তোমায় দেখ্‌তেন চিনতে পারতেন না।"

প্রবল আকর্ষণে নিরঞ্জনকে তাহার প্রশস্ত বক্ষের উপর টানিয়া লইয়া দুই একটা ঝাঁকানি দিয়া সুশীল বলিল, "তোমার মত অকৃত্রিম বন্ধু পেলে আর আমি কাউকেই চাই নে। বস এই চেয়ারটায়।"

নিজের পার্শ্বের চেয়ারটায় সে জোর করিয়া নিরঞ্জনকে বসাইয়া দিল।

রতিনাথ হাসিয়া বলিলেন, "তবে আর কি, তোমরা যখন বন্ধু—" মুখের কথা লুফিয়া লইয়া সুশীল বলিল, "বন্ধু বলে বন্ধু, ওকে আমার জীবনদাতা বলুন। স্কুলে যখন পড়তুম যত অন্যায় কাজ করতুম তার দরুণ যত শাস্তি সব বয়েছে নিরু, আমায় এত তফাতে রাখত যে কেউ জানতেও পারত না যত অকাজ আমার দ্বারাই হয়েছে। ওর পিঠখানা খুলে দেখুন—বোধ হয় হেডমাষ্টারের বেতের দাগগুলো এখনও পিঠে রয়েছে।"

বলিতে বলিতে সে নিরঞ্জনের পিঠ চাপড়াইতে লাগিল।

রতিনাথ বলিলেন, "শুনে সত্যই আমার খুব আনন্দ হল। তা হলে আমি এখন নিশ্চিন্ত—তোমার বন্ধুর জন্যে আর আমায় ভাবতে হবে না,"

উৎফুল্ল মুখে সুশীল বলিল, "কিছু না, কি বল নিরু?

নিরঞ্জন কেবল একটু হাসিল।

(৫)

সুশীল কেবলমাত্র অফিসে পৌছাইয়াছিল, সেই সময় আর্দালী আসিয়া সেলাম দিয়া দাঁড়াইল।

সুশীল জিজ্ঞাসা করিল, "কিছু দরকার আছে?"

বিনীতভাবে সে বলিল, "হঁ্যা সাহেব।"

একখানা কার্ড সে সুশীলের হাতে দিল, তাহাতে নাম লেখা আছে, মিস ইরা দাস।

চকিতে সুশীলের মনে পড়িয়া গেল মিস ইরা দাস দুইদিন আগে টাইপের কাজের দরখাস্ত করিয়াছিল, সে তাহার দরখাস্ত মঞ্জুর করিয়াছে, এবং অবিলম্বে তাহাকে অফিসে আসিয়া দেখা করিতে বলিয়াছে।

নিরঞ্জন অফিসে ছিল, সুশীল আর্দালীর হাতে কার্ড দিয়া বলিল, "ম্যানেজার বাবুকে নিয়ে গিয়ে দাও, আমি ঘণ্টাখানেকের মধ্যে ফিরে আসছি। বাবুকে বল গিয়ে যে মেয়েটী এসেছেন তাঁর সঙ্গে কথাবার্ত্তা বলেন।

বাহিরে কোথায় কাজ ছিল, তাড়াতাড়ি সে বাহির হইয়া গেল, এবং অর্দ্ধ ঘণ্টার মধ্যেই ফিরিয়া আসিল।

হাতের কাগজপত্রগুলা নিজের অফিস রুমের টেবলে ফেলিয়া সে নিরঞ্জনের নিকটে চলিল।

নিরঞ্জনের ঘরে গোল টেবিলটার একপাশে বসিয়া নিরঞ্জন লিখিতেছিল, অপর পাশে বসিয়া একটী মেয়ে সেদিনকার সংবাদপত্রখানা দেখিতেছিল। সুশীল প্রবেশ করিতেই সে সসম্ভ্রমে উঠিয়া দাঁড়াইল এবং হাত দু'খানা কপালে ঠেকাইল। সুশীল প্রত্যাভিবাদন করিয়া শ্রান্তভাবে একখানা চেয়ারে বসিয়া পড়িল, বলিল "বসুন আপনি। কি রকম গরম দেখেছ নিরঞ্জন, পথে বার হওয়ার যো নেই। এইটুকু পথ হেঁটে গেছি, তবু তো পায়ে জুতো আছে—তাতেই প্রাণ বার হয়ে যাচ্ছে। কত গরীব লোক যে শুধু পায়ে পথ হাঁটছে কি করে আমি তাই ভাবছি।"

চাপা হাসি হাসিয়া নিরঞ্জন বলিল, "ওরা হাঁটছে পেটের দায়ে, মটরে উঠে বেড়ানোর অদৃষ্ট তো সবাই নিয়ে আসে না, এমন কি পয়সা খরচ করে ট্রামে বা বাসে উ

ক্ষমতাও সকলের নেই, কাজেই ওই পিচ গলা রাস্তাতে লাফাতে লাফাতেও তাদের হাঁটতেই হয়—নইলে খেতে পাবে না।"

"উঃ কি দুঃখময় জীবন—" সুশীল শ্রান্ত ভাবে চেয়ার হেলান দিল।

নিরঞ্জন হাসি চাপিয়া বলিল, "এখন তোমার ভাব বৈচিত্র্য রেখে দিয়ে আসল কাজের কথা বল। ইনি মিস ইরা দাস, সেদিন টাইপের জন্য এখানে দরখাস্ত করেছিলেন, তুমি এঁর দরখাস্ত মঞ্জুর করেছ। মিসেস ব্রাউনের বিশেষ পরিচিতা তোমার গার্জেন মিঃ রায় তাঁর বিশেষ বন্ধু তিনি একখানি পত্র লিখে পাঠিয়ে দিয়েছেন।"

মেয়েটী বিনীত ভাবে একখানা পত্র বাহির করিয়া টেবিলের উপর রাখিল।

মিঃ দেব নারায়ণ রায় ইংলণ্ডে রহিয়াছেন, তাঁহার কন্যা ইন্দিরাও তাঁহার নিকটে রহিয়াছে। মিঃ রায়ই সুশীলকে, ইংলণ্ডে লইয়া গিয়া শিক্ষা দিয়াছেন, তাহাকে সুশিক্ষিত করিয়া পুনরায় ভারতবর্ষে পাঠাইয়াছেন, নিজের অসীম ধনসম্পত্তি ভবিষ্যৎ জামাতার হস্তে ছাড়িয়া দিয়াছেন।

মিসেস ব্রাউন দেবনারায়ণ রায়ের প্রকৃত হিতাকাঙ্ক্ষিণী ছিলেন। ইন্দিরাকে তিনি স্নেহ করিতেন, ভালবাসিতেন, তাহার জন্য সুশীল তাঁহার স্নেহ আকর্ষণ করিয়াছিল।

সুশীল পত্রখানা তুলিয়া লইল: মিসেস ব্রাউন লিখিয়াছেন মিস দাসকে তিনি সুশীলের নিকট পাঠাইতেছেন তিনি আশা করেণ, এখানে মিস দাস সম্মানের সহিত কাজ করিতে পাইবে। এই মেয়েটী টাইপ এবং সার্টহাণ্ডের কাজ খুব সুন্দর জানে, তিনি আশা করেন ইহার দ্বারা সুশীলের উপকার ছাড়া অপকার হইবে না।

সুশীল অন্যমনস্ক ভাবে পত্রখানা মুড়িতে মুড়িতে মিস দাসের পানে চাহিল।

শ্যামবর্ণা মেয়েটী—বয়স বাইশ তেইশ হইবে, লম্বা—রোগা ধরণের আকৃতি। মাথা ভরা কালো চুল, বেণীর আকারে পিছনে জড়ানো আছে; যদিও মাথায় সামান্য একটু কাপড়ের আবরণে লুকাইত তথাপি উপর হইতে দেখিয়াই তাহার পরিমাণ বেশ বুঝা যায়। বড় বড় দুইটী চোখে শান্ত স্নিগ্ধ সরল দৃষ্টি, সেই দৃষ্টিতেই যেন তাহার অন্তরের পরিচয় পাওয়া যায়। পরণে সাদাসিদা হাত কাটা একটী ব্লাউজ, একখানি কালা ফিতা সাড়ি, পায়ে অল্প মূল্যের লেডিস্ সু। অলঙ্কারের বাহুল্য ছিল না; কানে দুইটী ক্ষুদ্র ইয়ারিং হাতে দুইগাছি করিয়া সরু সোণার চুড়ি।

তাহার বেশভূষা অতি সামান্য কিন্তু ইহাতেই তাহাকে বড় সুন্দর দেখাইতেছিল। সুশীল পলকের দৃষ্টিপাতে তাহাকে দেখিয়া লইয়া চোখ ফিরাইয়া বলিল, "ব্রাউন যখন আপনাকে পাঠিয়েছেন তখন আপনার এখানে কাজের সম্বন্ধে কোনও সন্দেহ করতে হবে না। আপনি আজ হতে এ অফিসে কাজ করতে আরম্ভ করুন। তার আগে আপনাকে একটা কথা জানিয়ে রাখি; আমরা যে কাজটা আরম্ভ করেছি আমি এর প্রকৃত মালিক নই। মিঃ দেব নারায়ণ রায় যতদিন ইংলণ্ড হতে না ফিরে আসেন ততদিন আমিই এর কর্ত্তা, তিনি ফিরে এলে সমস্তই তাঁর হাতে যাবে। আপনার বেতন সম্বন্ধে—"

মিস দাস মৃদুকণ্ঠে বলিল, "মিসেস ব্রাউনের কাছে সে কথা শুনেছি, এখানে চল্লিশটাকা করে বেতন পাবো।"

সুশীল বলিল, "উপস্থিত তাই বটে তবে আমাদের উন্নতির সঙ্গে সঙ্গে আমরা আপনার বেতনও বাড়িয়ে দেব, আমরা—ভরতীয়েরা ব্যবসাবণিজ্যের প্রণালী ইউরোপীয় ধারায় গঠন করে সেই ধারাটা চালাতে চাই। যে নূতন পথে চলেছি—ছয়টী মাস গেলে ঠিক বুঝতে পারব। আমাদের কোম্পানীর নাম মেরিন ট্রেডিং কোম্পানী। এর অংশীদার ভারতীয় কর্ম্মচারীরাও ভারতীয়, বিদেশীকে এর সঙ্গে জড়াতে নেব না। ইউরোপীয় যে কোন জাতি সংঘবদ্ধভাবে কাজ করে—আশাতীত উন্নতিও লাভ করে, কিন্তু এ দেশের লোকেরা কেন তা পারে না আমি একবার সেইটাই পরীক্ষা করতে চাই।"

একটু থামিয়া সে বলিল, "অবশ্য যার কাজ তিনি জানেন না আমি এই নূতনতর ধারায় কাজ করতে আরম্ভ করেছি। যদি উন্নতিলাভ করতে পারি তা হলে তাঁর মনের সংস্কারটা দূর হয়ে যাবে। বুঝেছ নিরু, আমি একদিন তাঁকে আমার কল্পনার এতটুকু আভাস দিয়েছিলুম, কিন্তু তাতে তিনি স্পষ্টই বলেছেন ভারতীয়দের দ্বারা কিছু হয় নি, হবে না। আমি তখন মাড়োয়ারী ভাটিয়া প্রভৃতি জাতির কথা তুলেছিলুম, তিনি বলেছিলেন তবু

ওরা পারবে কিন্তু বাঙ্গালী কোনদিন কিছু পারবে না। আমারও তাই জিদ পড়ে গেছে, আমি আমার কাজ কেবলমাত্র ভারতীয়দেরই দেব, বাঙ্গালী হয়ে বাঙ্গালীকেও বাদ দেব না।"

মিস দাস প্রশংসমান দৃষ্টিতে এই দীর্ঘ দেহ সুপুরুষ যুবকটীর মুখের পানে চাহিল, শান্তকণ্ঠে বলিল, "বাঙ্গালী হয়ে বাঙ্গালীকে মানুষ করবার জন্যে আপনি যে যত্ন চেষ্টা করছেন তাতে যদিও প্রশংসার কিছু নেই কারণ এটা করা সকল বাঙ্গালীরই উচিত তবু প্রশংসা করি কারণ উচ্চশিক্ষিত কেউই এ রকম করে দেশের পানে জাতির পানে তাকান না। আমি খৃশ্চান হলেও বাঙ্গালী, আমার বাপ মা পূর্ব্বপুরুষ সবই বাঙ্গালী। বাঙ্গালা আমার জন্মস্থান, আমি বাঙ্গালাকে আন্তরিক ভালবাসি। আপনি বাঙ্গালীর জাতীয় কলঙ্ক মুছিয়ে দিয়ে যে রকম চেষ্টা করছেন, যে প্রতিষ্ঠানটী গড়ে তুলছেন, আপনার দেখাদেখি আরও পাঁচজন শিক্ষিত বাঙ্গালী এইরকমভাবে এই জাতিকে সংঘবদ্ধভাবে গড়ে তুলবার চেষ্টা করবেন, বাঙ্গালীকে একটা জাতি নামে পরিচিত করবার চেষ্টা করবেন।"

নিরঞ্জন একটু হাসিয়া বলিল, "আপনাদের মনের ইচ্ছা খুবই মহৎ তাতে অনুমাত্র সন্দেহ নেই, কিন্তু কথা হচ্ছে কি, অনেক সময়ে মনের ইচ্ছা কাজে পরিণত করা যায় না। একদিন বাঙ্গালী জাতি নামে পরিচিত হবে কিন্তু তা ব্যবসার দিক দিয়ে নয়—অন্য দিক দিয়ে। ব্যবসার কাজে বাঙ্গালী এখনও নাবালক রয়েছে, মাথা পাকাতে এখনও অনেক দেরী রয়েছে।"

উত্তেজিতভাবে সুশীল বলিল, "তুমি কি চাও বাঙ্গালী চিরদিনই পেছনে পড়ে থাকবে, বাঙ্গালী কোনদিন সগৌরবে মাথা তুলে জগতের মাঝখানে নিজের জাতীয়তা প্রমাণ করতে পারবে না? এই শস্যশ্যামলা বঙ্গদেশ, এই দেশে যতটা আয় এত আর কোন দেশে হয় দেখাতে পার?"

মৃদু মৃদু হাসিয়া নিরঞ্জন বলিল, "ধীরে বন্ধু ধীরে। শস্যশ্যামলা বঙ্গদেশে আর আছে কি? মাঠগুলো ধূ ধূ করছে, নদী খাল বিল কচুরী পানায় ভরে গিয়ে ম্যালেরিয়ার বিষ সঞ্চয় করছে, তবু বলতে চাও শস্যশ্যামলা বঙ্গদেশে নেই কি? হ্যাঁ, তবু এতে আয় হয়। মাঠে ফসল উৎপন্ন না হলেও কৃষককে খাজনা দিতে হয়, পেটে না খেয়েও খাতককে মহাজনের দেনা শোধ করবার জন্যে মাথা গুজবার স্থানটুকু বিক্রি করতে হয়। হ্যাঁ—তবু আয় আছে বই কি, বাংলা সরকারের একটা প্রধান আয়ের যন্ত্র, যত ঘুরায় ততই টাকা পড়ে একথা অস্বীকার করতে পারব না।"

একটা দীর্ঘনিঃশ্বাস ফেলিয়া সুশীল বলিল, "বাংলার প্রকৃত রূপটাকে তুমি দেখলে কোথায় নিরঞ্জন?"

নিরঞ্জন বলিল, "দেখবার অভাব? তোমরা কলকাতার বাইরে হয়তো যাও না, যদিও যাও সেই রকমভাবে যাও যাতে নিজেদের দিক ছাড়া অপর দিকে দৃষ্টি পড়ে না। তোমরা অনেক সময় সখের খাতিরে পল্লীগ্রামে বেড়াতে যাও, কিন্তু সেখানে কতটুকু দেখতে পাও বল দেখি? সবুজ ধানের ক্ষেত দেখতে যাও, পাঁচ ক্রোশ মাঠের মাঝখানে বিঘাখানেক সবুজধানের ক্ষেত দেখে আনন্দে অধীর হয়ে ওঠ কিন্তু সে যে কতটুকু তা তো দেখ না। নদী দেখতে যাও, কলকাতার গঙ্গা দেখে দেশের যাবতীয় নদী সম্বন্ধে ধারণা করে নাও, কিন্তু সে কথাতো ভাবনা নিজেদের স্বার্থের জন্যে সরকার এই দিককার গঙ্গা পরিষ্কার রেখেছে কিন্তু অন্যদিকে এই গঙ্গাই বন্ধ হয়ে এসেছে, অন্য সব নদীর কথা দূরে থাক। তোমরা দেখতে পাও শুধু ওপরটা, ভেতর তো কোনদিন দেখ নি, হয়তো দেখতে পাবেও না।"

সে উঠিয়া দাঁড়াইল—"না, অনর্থক বাক্যব্যয় করার আর দরকার নেই। তুমি বস সুশীল, আমি মিস দাসকে ওঁর কাজগুলো বুঝিয়ে দিয়ে আসি।"

সঙ্গে মিস দাসও উঠিয়া দাঁড়াইল। সুশীল একটা হাই তুলিয়া আড়ামোড়া ছাড়িয়া বলিল, "ওঁকে বুঝিয়ে দিয়ে এসো তারপর তোমার সঙ্গে আমার একটা কথা আছে।"

তাহাকে অভিবাদন করিয়া মিস দাস নিরঞ্জনের সঙ্গে বাহির হইয়া গেল।

মিনিট কুড়ি পঁচিশ পরে নিরঞ্জন ফিরিয়া আসিল। টেবলের উপরিস্থিত ছড়ানো কাগজ-পত্রগুলো গুছাই এক করিতে করিতে বলিল, "মেয়েটী বেশ চালাক

খুব কর্ম্মঠ তা বেশ বুঝতে পারা যাচ্ছে। এর আগে যে টাইপিষ্ট ছোকরাটী ছিল সে কোনকাজ বুঝতে পারত না, কিন্তু একে একবার দেখিয়ে বলে দিতেই বেশ বুঝে গেল দেখলুম।"

সুশীল গম্ভীরভাবে বলিল, "তা তো বুঝল, কিন্তু এই এতগুলো পুরুষের মধ্যে একটীমাত্র মেয়ে টাইপিষ্ট আমার যেন কি রকম বোধ হচ্ছে "

নিরঞ্জন হাসিয়া বলিল, "ভয় হচ্ছে ?"

সুশীল তাহার কথার মর্ম্ম বুঝিয়া হাসিল, গর্ব্বিতভাবে বলিল, "ভয় নয়। জানইতো আমার বিয়ে ঠিক হয়ে আছে, মিস ইন্দিরা আমার বাগ্‌দত্তা পত্নী, আর সেই জন্যেই মিঃ রায় এতটা সম্পত্তি নিঃসঙ্কোচে আমার হাতে ছেড়ে দিয়েছেন। ইন্দিরাকে যদিও তুমি দেখনি, কিন্তু তার ফটো দেখেছতো তার কাছে মিস দাস দাঁড়াতে পারে ?"

নিরঞ্জন বলিল, "তবে ? স্ত্রীলোকের সংস্পর্শে থাকতে হবে বলে কুমার হৃদয় বুঝি সঙ্কুচিত হয়ে উঠছে, অথবা মিস রায় কি ভাববেন সেই ভয়ে—"

সুশীল মাথা নাড়িয়া বলিল, "না, মিস রায় ওকে দেখলে সে ভয় করতে পারবে না। তবুও পাছে আর কেউ কিছু বলে তাই ভাবছি।"

নিরঞ্জন বলিল, "তবে নিশ্চিন্তে থাক। আজ কাল অনেক মেয়েই পুরুষদের সঙ্গে মিশে কাজ করতে যায়, তা হলে সে রকম জায়গায় পুরুষদের কাজ করতে না যাওয়াই উচিত। বিলেতে যে স্ত্রী পুরুষে একত্রে কাজ করে তার বেলায় তোমাদের মনে এতটুকু দ্বিধা ভাব জাগতে পারে না, বরং সেই সাম্যভাবে তোমরা মুগ্ধ হয়ে যাও, যত দোষ হল কি এই দেশের বেলায় ?"

সুশীল উত্তর না দিয়া উঠিয়া পড়িল, বলিল, "তা হলে তুমিই সব দেখা শুনা কোর আমি চললুম।"

সে বাহির হইয়া গেল।

(৬)

আকাশ নিবিড় মেঘে ছাইয়া আসিয়াছে, বহুকাল পরে দারুণ গ্রীষ্মের প্রখর রৌদ্রের পর মেঘের এই ছায়াটুকু বড়ই প্রীতিপদ বলিয়া বোধ হইতেছে।

গেটের সম্মুখে প্রকাণ্ড কৃষ্ণচূড়া গাছটী লাল ফুলে ভরিয়া উঠিয়া অপরিসীম সৌন্দর্য্য বিস্তার করিতেছে। ছোট ছোট পাখীগুলা ফুলের উপর বেড়াইতে কচিৎ দুই একটা পাপড়ি খসিয়া পড়িয়া যাইতেছে। অনতিদূর পথ হইতে চলন্ত ট্রামের মোটরের শব্দ ভাসিয়া আসিতেছিল। মনীষা স্নানান্তে পূজার ঘরে যাইতেছিল, লাল ফুলে ভরিয়া উঠা সুন্দর গাছটীর পানে একটীবার দৃষ্টি নিক্ষেপ না করিয়া থাকিতে পারিল না। রতিনাথ আহারান্তে খানিক আগে আফিসে গিয়াছেন, এতক্ষণে সময় পাইয়া মনীষা স্নানান্তে প্রত্যহ পূজাহ্নিক করিতে যায়। রতিনাথ বাড়ী থাকিতে তিনি তাহাকে শত অনুরোধ করিলেও সে নিজের কাজে যায় না, প্রত্যেক রবিবারে এজন্য সে পিতৃসম শ্বশুরের নিকট তিরস্কৃতও হয় বড় কম নয়।

আসল কথা পূজাহ্নিক সারিতে তাহার প্রায় দুইঘণ্টা সময় লাগে। প্রত্যহ পূজাহ্নিক সারিয়া নিজের অন্যান্য কাজ সারিয়া যখন সে আহার করিতে বসে তখন দুইটা বাজিয়া যায়। বাড়ীর দাস দাসী সকলের খাওয়া হইল কিনা, কাহার অসুখ করিয়াছে এই সব দেখাশুনা তাহার নিত্য কর্ত্তব্য কাজ। রতিনাথ মনে মনে খুসি হইয়া উঠিলেও, মুখে অনুযোগ করিতেন, মনীষা হাসিয়া উত্তর দিত—ওরা পেটের দায়ে চাকরী করতে এসেছে বাবা, আহা,—ওরাও মানুষ তো। ওদের না দেখলে যে ভগবানের কাছে দোষী হতে হবে।"

প্রত্যহ শিবপূজা করা তাহার চিরন্তন নিয়ম। একজন ব্রাহ্মণ প্রত্যহ গঙ্গা মৃত্তিকা, ফুল বিল্বপত্র চন্দন ইত্যাদি আবশ্যকীয় জিনিষ ঠিক করিয়া রাখিয়া যায়, কাজেই মনীষাকে বিশেষ কষ্ট পাইতে হয় না।

আপন মনে স্তোত্র পাঠ করিতে করিতে মনীষা পূজার আয়োজন করিয়া লইল। স্বামীর ফটোখানি শিবলিঙ্গের পার্শ্বে রাখিয়া সে পূজা করিতে বসিল।

পূজা শেষান্তে সবে মাত্র সে প্রণাম মন্ত্র উচ্চারণ করিতেছে সেই সময় হাসির শব্দ কানে আসিল।

আগন্তুক খানিক আগে আসিয়া দরজার পার্শ্বে দাঁড়াইয়া ছিল, সে দিকে পিছন থাকায় মনীষা দেখিতে পায় নাই।

"বাঃ, খাসা পূজো করতে শিখেছ যে মনীষা, তোমার এ বুদ্ধি কে দিলে জিজ্ঞাসা করি—।"

চমকাইয়া উঠিয়া মুখ ফিরাইয়া মনীষা দেখিল দরজার উপর দাঁড়াইয়া শশাঙ্ক।

মনীষার মুখখানা সিঁদুরের মত লাল হইয়া উঠিল, সে বলিল, "ঘরে গিয়ে বস দাদা আমি পাঁচ মিনিটের মধ্যেই আসছি আমার পূজা হয়ে গেছে।"

শশাঙ্ক বলিল, এখানে দাঁড়ালেই বা কি হল? ভয় নেই, এই ম্লেচ্ছ লোকটা তোমার পূজোর ঘরে ঢুকে সব অপবিত্র করে দেবে না, সে বিষয়ে নিশ্চিন্ত থাক।

মনীষা সঙ্কোচের সহিত বলিল, "তা ওঘরে গিয়ে বসলেই বা কি ক্ষতি?

শশাঙ্ক বলিল, "এখানে দাঁড়ালেই বা কি ক্ষতি? অর্থাৎ কি জানো—কোন সেই ছোট বেলায় মায়ের কোল ছেড়ে বিধর্ম্মীদের সঙ্গে থেকে তাদের চেয়েও ঘোর পাষণ্ড হয়ে উঠেছি। তাদের তবুও একটা ধর্ম্ম আছে, আমার কিছু নেই, যে যখন যে দিকে টানে সেই দিকেই আছি—অর্থাৎ দরকার পড়লে খৃশ্চান মুসলমান ব্রাহ্ম হিন্দু—আর যাই বল সবই হই। কিন্তু আসল কি জানো—কোন ধর্ম্মই নেই নি, কাজেই পৈত্রিক ধর্ম্মটা কোন মতে টিকে আছে বলে মানতেই হবে, হয়তো মরব যখন তখন হরিবোল শব্দটাও হবে। সত্যি—পূজো কখনও দেখিনি,—নাস্তিক কিনা—চোখ বুজে কাণে হাত চাপা দিয়ে পালিয়েছি। আজ একটু না হয় দেখ্‌তেই দাও মনীষা পূজো জিনিষটা কি?"

দরজার ওদিকে দুখানা হাত রাখিয়া ঝুঁকিয়া পড়িয়া সে দেখিতে লাগিল, মনীষা লজ্জায় লাল হইয়া উঠিতেছিল।

"ওটা কি ঠাকুর বল দেখি? যা করে আকন্দ ফুল আর ধুতুরা ফুল বেলপাতায় ঢেকে দিয়েছ তাতে তো ঠাকুরকে দেখে চেনার পথ রাখনি দেখছি। কি ঠাকুর বল দেখি?"

মনীষা উত্তর দিল না।—

শশাঙ্ক একটু ভাবিবার ভাণ করিয়া বলিয়া উঠিল, "ওঃ, বুঝেছি, তোমায় বলার লজ্জা হতে মুক্তি দিচ্ছি মনীষা, শিব ঠাকুর ছাড়া আর কোন ঠাকুরই তো বেলপাতা আকন্দ ধুতুরা ফুল ভাল বাসেন, না, কাজেই ওটিয়ে স্বয়ং শিব তা বুঝতেই পারছি।"

মনীষা, একটু হাসিয়া বলিল, "আমার পূজা হয়ে গেছে, চল ও ঘরে যাই।"

সে উঠিয়া পড়িল।—

শশাঙ্ক বলিল, "রোসো রোসো, আর একটু দেখে নেই। অসভ্য ভেবনা মনীষা, নেহাৎ দেখিনি বলেই এমন করে খুঁটিয়ে দেখছি। তারপর—ওখানা কি বই—এখানে নভেল নাটকও আসে নাকি?"

মনীষা বলিল, "নভেল নাটক পড়ার সময় কোথায়, জানই তো সংসারে আমার কত কাজ, কাজ বাড়ছে ছাড়া কমছে না তো। ওখানা নভেলও নয় নাটকও নয়, ওখানা গীতা।"

শশাঙ্ক যেন চমকাইয়া উঠিল—"এঃ, আবার গীতাও পড়তে সুরু করেছ। বুঝলে মনীষা, ও সব এ যুগের বই নয়, ওর যুগ চলে গেছে, ও সব এখন চালিয়ো না।"

মর্ম্মাহত হইয়া মনীষা বলিল, "চলে যায়নি দাদা, ওর যুগ আছে, চিরকাল থাকবেও। তুমি পড়নি এ কথা বলতে পার, পড়বে না এ জোরও করতে পার, কিন্তু আর কেউ যে পড়বে না এ কথা বলা চলে না।"

শশাঙ্ক বলিল "আমি পড়ব না, একথা বলতে পারিনা। তবে—

মনীষা বলিল, "তবে পড়ে ফেল, অনেক কিছুই জানতে পারবে, বুঝতেও পারবে।"

গম্ভীর মুখে শশাঙ্ক বলিল, "হুঁ, এইবার পড়তে হবে। বইখানা ও ঘরে নিয়ে যাবে মনীষা, ওখানা উদরস্থ করা চাই। সব কিছুই তো উদরস্থ করেছি, ওখানা আর বাকি রাখি কেন? এরপর দরকার পড়লে কোন হিন্দু মহাসভায় খানিক খানিক উগরে ফেলতে পারব।"

বলিতে বলিতে সে অত্যন্ত খুসি ভাবে হাসিতে লাগিল।

তাহার হাসিতে মনীষা আদৌ সন্তুষ্ট হইতে পারিল না। অনেক গুলা কথা তাহার ওষ্ঠাগ্রে আসিয়া ফিরিয়া গেল; কয়েক বৎসর পরে শশাঙ্ক আসিয়াছে, এখন কোন শক্ত কথা বলা উচিত নহে।

মনীষা কোন কথা না বলিয়া বাহির হইয়া আসিয়া দরজায় শিকল তুলিয়া দিল, তাহার পর চলিতে চলিতে জিজ্ঞাসা করিল, "একটা কথা জিজ্ঞাসা করি দাদা, সত্যি বল দেখি—সত্যিই তুমি ভগবানকে মান না?"

শশাঙ্ক মাথা দুলাইয়া বলিল, "মানব কি করে, এমন কি প্রমাণ আছে যাতে ভগবান বলে কেউ আছে মেনে নেব ?"

মনীষা বলিল, "তবে এই যে সৃষ্টি---"

বাধা দিয়া শশাঙ্ক বলিল, "সব প্রকৃতির নিজের সৃষ্টি, এর মধ্যে কারও হাত নেই। কল্পনা বাগীশ কতকগুলো লোক এই কতকগুলো সৃষ্টি করছে ; যা স্বভাবতঃ হয়— ওরা দেখতে চায় ভগবান নামে কেউ আছে যে এই সব করছে। আমি একটা কথা জিজ্ঞাসা করছি মনীষা, যদি ভগবানই থাকবে—তবে মরা কেন বাঁচে না ? জীবন দেওয়ার ক্ষমতা বাস্তবিকই যদি ভগবানের থাকে তবে এতটুকু প্রমাণ নাস্তিক কেন পায় না ?

মনীষা স্থিরকণ্ঠে বলিল, "হয়তো কোনদিন এ প্রমাণ মিলতে পারে দাদা। জীবের জীবন যা তাকে দেওয়া হয়েছে তার একটা সীমা আছে, সেই সীমার একচুল এ দিক ও দিক হওয়ার শক্তি জীবের নেই। সেই সীমাটুকুর মধ্যে আমাদের ক্ষণস্থায়ী জীবন ফুরিয়ে যাওয়ার আগেই হয়তো এমন কোন প্রমাণ পেতে পারি যাতে বিশ্বাস করতে বাধ্য হব - ভগবান সত্যিই আছেন, প্রকৃতিও তাঁর হাতের সৃষ্টি, তার হাতে এই কাজের ভার দিয়ে তিনি সর্ব্বদাই দেখছেন ! এখনও যার সত্য নিরূপণ করা যায়নি তার জন্যে প্রস্তুত হতে আমি তোমায় বলিনে। আমার বিশ্বাস আছে প্রমাণ আপনিই আসবে, তাকে জোর করে টেনে আনা চলে না।"

শশাঙ্ক একটু হাসিয়া বলিল, "হয়তো তোমার কথা একদিন ঠিক হতে পারে ; যদি ঠিক না হয় তার জন্যেও আমি ততটা উৎসুক হব না" একটু থামিয়া সে বলিল, "আর একটা কথা জিজ্ঞাসা করি, মনে কিছু করো না। তোমার ঠাকুরের পাশে একখানা ছোট ফটো দেখতে পেলুম ওখানা কার ফটো ?"

মনীষা উত্তর দিল, "আমার স্বামীর।"

তাহার দৃঢ়কণ্ঠস্বরে বিস্মিত হইয়া শশাঙ্ক তাহার পানে চাহিল, হাসিয়া উঠিয়া বলিল, "কবে কার সঙ্গে কোন সেই ছোটবেলায় বিয়ে হয়েছিল, যাকে চিনতে না চিনতে সে চলে গেল তবু তাকেই স্বামী বলে জানতে চাও মনীষা ?"

মনীষার মুখখানা বিবর্ণ হইয়া গেল, চলিতে চলিতে সে ফিরিয়া দাঁড়াইল, দৃপ্তনেত্রের দৃষ্টি শশাঙ্কের মুখের উপর স্থাপন করিয়া শান্ত সংযতকণ্ঠে বলিল, "তুমি নাস্তিক, বুঝতে পারবে না এ রহস্য কি রকম জটিল। তবে তোমায় এইটুকুই বলে রাখছি দাদা যে ধর্ম্মের ছায়ায় তুমি চিরকাল কাটিয়ে এসেছ, চিরদিন যাদের সঙ্গে মিশেছ, আমরা তার ছায়ায় যাই নি, তাদের সঙ্গে মিশলেও নিজেদের বৈশিষ্ট্য তোমার মত বিসর্জ্জন দিতে পারিনি। আজ তুমি যে কথা আমায় জিজ্ঞাসা করছ, এ কথা জিজ্ঞাসা করতে পারতে না যদি তোমার মা থাকতেন। মানুষ অনেক কিছুই তার মায়ের কাছ হতে শিক্ষা পায় এ কথা মান তো ?"

শশাঙ্কর মুখখানা মুহূর্ত্তমধ্যে মলিন হইয়া গেল, প্রায় তখনই স্বাভাবিক ভাব ফিরিয়া আসিল, সে বলিল, "সে কথা খুব মানি। কিন্তু জানোই তো আমার জীবনটা কিভাবে কেটেছে। সাতমাস বয়স যখন তখন মা মারা যান, একবছরের সময় বাবা মারা যান, বাবার বন্ধুর কাছে গেলুম, অচিরে তিনি মারা গেলেন, তখন বয়স মাত্র পাঁচ বছর। তাঁর স্ত্রী আবার বিয়ে করলেন, আমায় বোর্ডিংয়ে দিলেন। আমার জীবনের ঘটনাতো তোমাদের কাছে গোপন নেই মনীষা।"

সে যে কতকটা রূঢ়ভাবেই কতকগুলা কথা বলিয়া গিয়াছে এজন্য মনীষা অনুতপ্ত হইয়া উঠিয়াছিল, কোমল-স্বরে বলিল, "সব জানি দাদা, তোমায় আর সে সব পুরান কথা নতুন করে বলতে হবে না। ওদিকে আবার যাচ্ছো কোথায়, এই ঘরে এসো।"

অপ্রস্তুতের হাসি হাসিয়া শশাঙ্ক গৃহের মধ্যে প্রবেশ করিল।

(ক্রমশঃ)

গয়ায় একদিন

(ভ্রমণ)

শ্রীগিরিবালা দেবী

অগ্রহায়ণের মেঘস্নিগ্ধ সন্ধ্যায় আমরা গয়ার গাড়ীতে উঠিয়া বসিলাম। শীতের প্রারম্ভ—পশ্চিমের গাড়ী একেবারেই জন শূন্য। মাত্র দুইটি মহিলা আমাদের সহযাত্রী হইলেন। একটি তরুণী, অপরা বৃদ্ধা। তরুণীর স্বামী থিয়েটারের অভিনেতা। শরীর অসুস্থ বলিয়া কাশীতে জ্যেঠামহাশয়ের বাড়ীতে বিশ্রাম করিতে যাইতেছেন। সঙ্গের নেজুরটি অভিনেতার মাসীমা

গাড়ী ছাড়িবার পর সঙ্গিনীদের সহিত অল্প অল্প আলাপ করা গেল। বৃদ্ধা প্রতিকথায় "কাশীতে আমাদের বাড়ী আছে।" বলিয়া গর্ব্ব করিতে লাগিলেন। তাঁহার মুখে কাশীর বাড়ীর বর্ণনা শুনিয়া আমি জানালার পাশে আশ্রয় লইলাম।

রাত্রি বাড়িবার সাথে সাথে মেঘের ঘোর কাটিয়া ম্লান জ্যোৎস্না-লোকে চারিদিক হাসিতে লাগিল। পাতলা কুয়াসার আবরণ ভেদ করিয়া প্রকৃতির প্রফুল্ল কান্তি পরিস্ফুট হইল।

ধ্যানমূর্ত্তি বুদ্ধ

মোটা কম্বলে গা ঢাকিয়া আমরা সকলেই শয়ন করিলাম। রাত্রি চারিটায় ট্রেণ গয়া ষ্টেশনে পৌছিবে—কাজেই উৎকণ্ঠার সহিত জাগিয়া কবি সম্রাট রবীন্দ্রের 'যোগাযোগ'খানি পুনরায় পড়িতে লাগিলাম। ভাব সম্পদে ভাষার অপূর্ব্ব ঝঙ্কারে অল্প সময়ের মধ্যেই অভিভূত হইয়া রহিলাম।

তিনটার পর আর যোগাযোগ লইয়া তন্ময় হইয়া থাকা চলিল না। সাথে আমার বৃদ্ধা শ্বশ্রূমাতা, জিনিষপত্র সহকারে তাঁহাকে লইয়া নামিতে হইবে। কাজেই বিছানা বাঁধিতে হইল। রজনী শেষ হইলে তখনও শুক্লপক্ষের জ্যোৎস্নায় চরাচর হাসিতেছে। ঘনবৃক্ষশ্রেণীর শেষ সীমায় কাল পাহাড়গুলি পটে আঁকা ছবির ন্যায় আকাশের গায়ে মিশিয়া গিয়াছে।
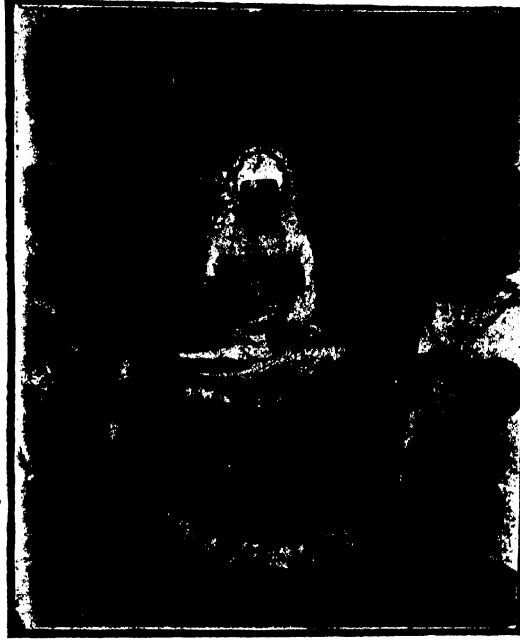
পথের একদিকে অগণিত গিরিমালা, অপর দিকে প্রান্তর—স্থানে স্থানে স্বল্প জলাশয়গুলি রূপার পাতের মত ঝক্‌মক্ করিতেছে।

বাঁশীর তানে চঞ্চল করিয়া রাত্রি চারিটায় ট্রেণ গয়া ষ্টেশনে থামিয়া গেল। আমরা নামিলাম।

গয়ার ষ্টেশনটি ক্ষুদ্র। গাড়ী ঘোড়ার ভিড় যত না-হোক পাণ্ডার জনতা অনেক বেশী। কম্বলে আপাদ মস্তক ঢাকিয়া দলে দলে পাণ্ডা শিকারে বাহির হইয়াছে। ঘৃতে দুগ্ধে পুষ্ট স্বাস্থ্যের জীবন্ত প্রতিমূর্ত্তি গয়ালীরা ক্ষীণদেহী বাঙ্গালীর দেখিবার বস্তু।

একদল পাণ্ডা পরিবৃত হইয়া আমরা একটা শাঁকো পার হইয়া একখানি গাড়ী ভাড়া করিলাম। পাণ্ডার দল চতুর্দ্দিক হইতে আমাদের বংশ পরিচয় জিজ্ঞাসা করিয়া বিরক্ত করিয়া তুলিল। এক বাঙ্গালী পাণ্ডার নাম বলিয়া অতি কষ্টে আমরা তাহাদের নিকটে অব্যাহতি পাইলাম।

ষ্টেশন ছাড়াইয়া আমাদের গাড়ীখানি প্রশস্ত রাস্তায় গিয়া পড়িল। রাস্তার দুই পাশে দোকান, ইস্কুল, কলেজ, আদালত গৃহ দ্বার রুদ্ধ করিয়া নিঃশব্দে দণ্ডায়মান। সমস্ত গয়া সহরটি চন্দ্র কিরণ মাখিয়া মহাসুপ্তিতে মগ্ন। অগণিত তারকা ও রাত্রি শেষের মলিন চন্দ্র আমাদের সঙ্গের সাথী হইয়া সাথে সাথে চলিল।
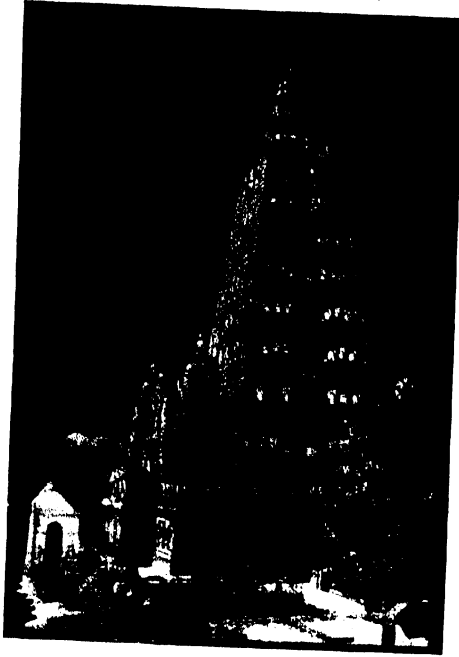
বৌদ্ধ-মন্দির (বুদ্ধগয়া)

ষ্টেশন হইতে আমাদের গন্তব্যস্থান বহুদূর। সেখানে পৌছিতে পৌছিতেই পূর্ব্বাকাশে উষার অরুণরাগ ফুটিবার আয়োজন করিতেছিল।

আমাদের পাণ্ডার নাম রাম ভট্টাচার্য্য, কপর্দ্দক শূন্য অবস্থায় এখানে আসিয়া যাত্রী পরিচালনার কার্য্যে তিনি এখন বহু টাকার মালিক। আমরা যখন পাণ্ডার গৃহে উপনীত হইলাম তখন তাহার নিদ্রাভঙ্গ হয় নাই। তাঁহার পরিচারকগণ আমাদিগকে খাতির করিয়া ঘরে লইয়া গিয়া বসাইল। দাই হাতমুখ ধুইবার জল আনিয়া দিল। দালানে অনেকগুলি নধরকান্তি গাভী বাঁধা দেখিলাম।

হাতমুখ ধুইয়া বস্ত্রাদি পরিবর্ত্তন করিয়া আমি একটি বাতায়নে গিয়া বসিলাম। আমার হৃদয় ভারাক্রান্ত করিয়া কত কথা মনে পড়িতে লাগিল।

দুই বছর পূর্ব্বে আমার স্বর্গীয়া জননী এখানে দর্শনে আসিয়াছিলেন, তিনি এই ঘরটিতে কয়েকদিন বাস করিয়াছিলেন। সেই গৃহ সেই সব আজও তেমনি রহিয়াছে, জগতের কিছুরই পরিবর্ত্তন হয় নাই। কেবল মা আমাদের মধ্য হইতে অনন্ত কাল সমুদ্রে বিলীন হইয়া গিয়াছেন। তাঁহারই পদধূলিলিপ্ত স্মৃতি বিজড়িত কক্ষের সুশীতল মেঝেয় লুটাইয়া একবার 'মা' বলিয়া ডাকিতে ইচ্ছা হইল।

(২)

সকলের মুখ হাত ধোয়ার পর আমাদের পাণ্ডা আসিয়া উপস্থিত হইলেন। আমার পিতৃদেব পূর্ব্বেই আমাদের আগমন সংবাদ জ্ঞাপন করিয়া ইঁহাকে পত্র লিখিয়াছিলেন। আমাদের দেখিয়া রামবাবু খুব আনন্দ প্রকাশ করিলেন।

আমার শ্বশ্রূমাতার ব্যতীত গয়াতে আমাদের করণীয় কিছুই ছিল না। কথা হইল বেলা হইলে পাণ্ডা আমাদিগকে লইয়া স্নান দর্শনাদি করাইবেন।

পাণ্ডাকে বিদায় দিয়া ঘরে তালা লাগাইয়া আমরা তখনই বেড়াইতে বাহির হইলাম। অগ্রহায়ণের প্রথম হইলেও তখনি গয়াতে বেশ শীত পড়িয়াছে, পথে বাহির হইয়া শীতের প্রকোপ বেশ ভাল রূপেই বুঝিলাম।

সহরের চারিদিকে কত মন্দির দেবালয়, দেউড়ির রুদ্ধ দ্বার ভেদ করিয়া প্রভাতের মঙ্গল বাদ্য বাজিতেছে। দোকানীরা দোকানের ঝাঁপ খুলিয়া দ্রব্যাদি সাজাইতে ব্যস্ত। গয়ার প্রসিদ্ধ কষ্টি পাথরের দোকানে স্তরে স্তরে পাথরের বাসন সজ্জিত। এক পাথরের বাসন ভিন্ন এখানকার প্রস্তুত আর কোন দ্রব্য দেখা গেল না। রাস্তাগুলি পরিষ্কার পরিচ্ছন্ন হইলেও ধূলায় ধূসরিত। অনেক দেশের অনেক অধিবাসীর সহিত সাক্ষাৎ হইল। স্থান মাহাত্ম্যে দূর দূরান্তের যাত্রীদলের সমাবেশ হইয়াছে।

চারিদিক বেড়াইয়া বেলা নয়টার সময় আমরা বাসায়

ফিরিলাম। রামবাবু আমাদের প্রতীক্ষায় বসিয়াছিলেন। তাঁহার ওখানেই আমাদের নিমন্ত্রণ করিলেন।

কিয়ৎকাল পর রামবাবুর সহিত বাহির হওয়া গেল। দাই সকলের কাপড় গামছা লইয়া সাথে চলিল।

রামবাবুর বাড়ী হইতে ফল্গু দূর নহে; একটী সঙ্কীর্ণ পথ ধরিয়া আমরা ফল্গুতে উপনীত হইলাম।

সারি সারি সোপানে সজ্জিত বহুদূরব্যাপী ঘাট, ঘাটের চত্বরে দলে দলে লোক মুণ্ডিত মস্তকে নববস্ত্র পরিধান করিয়া পিতৃপুরুষের শ্রাদ্ধ তর্পণ করিতেছে। সাধু প্রজ্বলিত ধুনীর সম্মুখে হাত পাতিয়া বসিয়া আছে। ভিখারীরা উচ্চ চীৎকারে ভিক্ষা চাহিতেছে। কয়েকটা গাভী পরম উৎসাহে মানুষের হস্ত হইতে ফুল বেলপাতা কাড়িয়া খাইতেছে। ভিন্নকান্তি গয়ালীদের হুঙ্কারে, দরিদ্র যাত্রীগণের কাতর নিবেদনের সহিত ভিখারীদের ঐক্যতান মিশিয়া স্থানটী মুখর হইয়াছে।

ফল্গুর পরপারেও বিপুল জনতা, সেখানেও যাত্রীগণ পিণ্ডদান করিতেছে। দুই তীরের কোলাহলের মাঝখানে ফল্গু তরঙ্গ তুলিয়া আপনার মনে বহিয়া যাইতেছে। জল এক হাঁটুর বেশী নহে, স্ফটিক স্বচ্ছ জলের মধ্যে হীরকচূর্ণের ন্যায় বালুকণা ঝিক্ মিক্ করিতেছে। ঝাঁকে ঝাঁকে ক্ষুদ্র মৎস্য জলের উপর ভাসিয়া বেড়াইতেছে। স্থানে স্থানে জল সরিয়া গিয়া শুভ্র বালুকায় ভূষিত ছোট ছোট চরার সৃষ্টি হইয়াছে। চরার পাশ ঘেঁসিয়া এক একটী ক্ষীণধারা সরিয়া গিয়া জলাশয়ে পরিণত হইয়াছে। এই সেই অন্তঃসলিলা ফল্গু কাব্যে কবিতায় চিরসম্পদশালী, অমর। ইহারই তটে একদিন সতীকুলরাণী সীতা দেবী অবস্থান করিয়াছিলেন। তাঁহারই অভিসাপে সলিল বিপুলা তটিনীর বক্ষে আজ অনন্ত বালির শয্যা।

স্নানের জন্য আমরা সকলেই জলে নামিলাম। জল ভয়ানক ঠাণ্ডা, মনে হইতেছিল পা দুইখানি বুঝি কাটিয়া লইবে। ফল্গুর পরিসর বেশী নহে, পরপার হইতে একবার ঘুরিয়া আসা গেল। গামছা দিয়া কয়েকটা চুনা মাছ ধরিয়া আবার ছাড়িয়া দিলাম। জল অল্প হইলেও জলে অনেকটা নিরাপদে ছিলাম, তীরে ওঠামাত্র নানা ব্যবসায়ী নানারূপ লোক আসিয়া হাজির। কাহারো হাতে সিন্দুর, কাহারো ফুল, প্রতি পদক্ষেপে 'দাও পয়সা, দাও পয়সা,' ভিখারীর যেমন অত্যাচার ততোধিক অত্যাচার গৈরিক পরা ভণ্ডদের।

রামবাবু সকলকে হটাইয়া দিয়া আমাদিগকে লইয়া উপরে আসিলেন। সেই স্থানে যার করণীয় যাহা সমাধা করিয়া আমরা মন্দিরে গেলাম।

বিষ্ণুপাদ (গয়া)
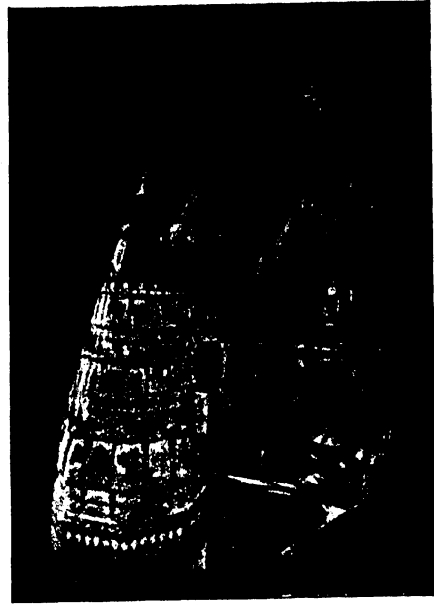
বৃহৎ মন্দির আলোকিত না হইলেও খুব অন্ধকার নহে। দেয়ালের গায়ে কয়েকটী দেবদেবীর প্রতিমূর্ত্তি, সিন্দুর ও পুষ্পমাল্যে আচ্ছাদিত। মন্দিরের মধ্যস্থলে রূপা বাঁধা এক অনতিগভীর গহ্বর। গহ্বরের বিরাট পাষাণ শিলার উপর সেই বিশ্ববাঞ্ছিত, হিন্দুর চির আরাধ্য পবিত্র পদ চিহ্ন। ইহাই গৌরাঙ্গের সাধনাক্ষেত্র, পিতৃলোকের মাতৃলোকের পুণ্যতীর্থভূমি। ভক্তি বিমণ্ডিত হৃদয়ে কত পিতৃমাতৃহীন স্বজনহারা বেদীমূলে উপবেশন করিয়া অশ্রুজলে অভিসিক্ত হইয়া গদাধরের শ্রীপাদপদ্মে প্রিয়জনের তৃপ্তির নিমিত্ত পিণ্ডদান করিতেছে।

দর্শনান্তে বেদী স্পর্শ করিয়া আমরা বাহিরে আসিলাম। বাহিরে অসংখ্য গাভী শ্রীপাদপদ্মের পরিত্যক্ত পিণ্ড খাইতেছে। মন্দিরের অনতিদূরে অক্ষয় বট। অক্ষয়

বটের মূলে পিণ্ডদান প্রশস্ত। অক্ষয় বটের চারিদিকে বেদী। বেদীর পাশে কয়েকটি ক্ষুদ্র কুটীর। কুটীর সম্মুখে দুইটি সন্ন্যাসী ভস্ম মাখিয়া ধ্যানে মগ্ন। তাহাদের কম্বলাসন চাউল পয়সায় ভরিয়া উঠিয়াছে

ফল্গুতীর

অক্ষয় বটের কাছে কাজ সারিয়া প্রদক্ষিণ করিয়া আমরা রাস্তায় আসিতেই অনেকগুলি ভিখারী ও সাধু আমাদের অনুসরণ করিল। সকল দলের মধ্যেই এক একটী দলপতি। উহাদিগকে বিদায় করিবার জন্য রাম বাবুর নিকটে টাকা ধরিয়া দেওয়া হইল। তিনি কয়েক সের প্যাঁড়া কিনিয়া দিয়া উহাদের বিদায় করিলেন। নূতন আর একদল কোথা হইতে ছুটিয়া আসিয়া আমাদের সঙ্গী হইল। বাড়ীর দরজায় তাহাদের টাকা দিয়া বিদায় করিয়া দরজা বন্ধ করা হইল।

সকলেই অতিশয় শ্রান্ত হইয়াছিলাম, বেলাও হইয়াছিল, সামান্য কিছু জলযোগ করিয়া সকলেই শুইয়া পড়িলাম। ক্ষণকাল পর রামবাবু আমাদের আহারের নিমিত্ত ডাকিতে আসিলেন।

রামবাবুর স্ত্রীর সহিত কয়েকটা কথা বলিয়া আমরা খাইতে বসিলাম। সকলেরই ক্ষুধা পাইয়াছিল, রামবাবুর স্ত্রী চমৎকার রন্ধন করিয়াছিলেন। পরিতৃপ্তির সহিত ভোজন করা গেল।

(৩)

গুরু আহারের পর বেশীক্ষণ বিশ্রাম হইল না। সেই দিনই বুদ্ধগয়া দেখিয়া রাত্রের গাড়ীতে আমাদের কাশী রওনা হওয়া স্থির হইয়াছিল। সময় সংক্ষেপ—পানের পরিবর্ত্তে মশলা চিবাইয়া সকলে বাজারের পথ ধরিলাম।

দুই তিন দোকান ঘুরিয়া কতকগুলি পাথরের বাসন কিনিয়া বাসায় ফেরা গেল। তারপর বিছানা-বাক্স বাঁধিবার পালা। বুদ্ধগয়া হইয়া ষ্টেশনে যাইবার নিমিত্ত গাড়ী ভাড়া হইল।

বেলা তিনটায় রামবাবুর নিকটে বিদায় লইয়া আমরা গাড়ীতে গিয়া বসিলাম।

অল্পক্ষণ পর সহর ছাড়াইয়া গাড়ীখানি একটি ছায়াময় বনপথে অগ্রসর হইতে লাগিল। পথটি কাঁচা হইলেও অসমতল নহে, দক্ষিণে কৃষকের শান্তির কুটীর, উপবন, শস্যক্ষেত্র, বামে চির রহস্যময়ী ফল্গু। জলের সহিত তেমন সম্বন্ধ নাই। ক্রোশের পর ক্রোশ বালির চড়া ধূ ধূ করিতেছে। পরপারে হরিদ্বর্ণ শস্যক্ষেত্র, তৎপশ্চাৎ বহুদূরবর্ত্তী শৈলমালা, গাঢ় নীলাকাশের সহিত মিশিয়া গিয়াছে। মেয়েরা দুইতিনটা কলসী পর পর মাথার উপর সাজাইয়া জল লইয়া ঘরে ফিরিতেছে। কেহ কেহ বালি খুঁড়িয়া অঞ্জলি অঞ্জলি জল তুলিয়া কলসী ভরিতেছে। দেখিয়া কবির কথা মনে পড়িল—

যেথানে দু'কর দিয়ে বালুকা খুঁড়ে
জলপান করে লোক আঁজল পুরে।
যে নদী শুকানো মরা,
দেখিবে দুকূল ভরা—
পার হয়ে কিছুদূর আসিতে ঘুরে।

পথের পাশে মহুয়া গাছের তলায় হাট বসিয়াছে। হাটের অধিকাংশ লোকই কোল, উহাদের মধ্যে কয়েকজনাকে দেখিয়া মুগ্ধ হইয়া গেলাম। কালো পাথরের নিখুঁত ছবি, এ কালো রূপে জগত আলো। কোল যুবকদের মাথায় পাখীর পালক, মেয়েদের ফুল। পরস্পর হাত ধরাধরি করিয়া ঘরে ফিরিতেছে। অনেকেই গোচারণ শেষে গান গাহিতে গাহিতে বাড়ীর পথ ধরিয়াছে, তাহাদের গানের কথাগুলি অস্পষ্ট, কিন্তু স্বরটুকু 'কাণের ভিতর দিয়া মরম স্পর্শ করে।'

সন্ধ্যার অনতিবিলম্বে আমরা বুদ্ধগয়ার পাদদেশে উপনীত হইলাম। কত বৌদ্ধ, জৈন, ইংরাজ মন্দির

দেখিতে আসিয়াছে। সুদূর বর্ম্মার অধিবাসীরাও আসিয়াছে।

মন্দিরটি মাটির নীচে অনেককাল আত্মগোপন করিয়াছিল, বহু অর্থ ব্যয়ে তাহাকে লোক-লোচনে প্রতিভাত করা হইয়াছে। মন্দিরের উদ্যানে কুলীরা মাটী কাটিয়া দ্রষ্টব্য স্থান সব বাহির করিতেছে। মন্দিরটি নিম্ন ভূমিতে— মাটী কাটিয়া যাতায়াতের সিঁড়ি করা হইয়াছে।

মন্দির প্রাঙ্গণে পদার্পণ করিতেই শরীর মন যেন জুড়াইয়া গেল। চারিদিকের দৃশ্য বড় সুন্দর রমণীয়। চতুর্দ্দিকেই বুদ্ধদেবের অসংখ্য প্রতিমূর্ত্তি। কোথায় ধ্যানী বুদ্ধ, কোথাও শিষ্য পরিবৃত বুদ্ধ, কোথাও বা বরাভয়-দাতা বুদ্ধদেবের প্রসন্ন মূর্ত্তি।

রাস্তাতেই আমাদের একটি গাইড জুটিয়াছিল, মন্দিরে আর একটি জুটিল।

জুতা বাহিরে রাখিয়া আমরা মন্দিরে প্রবেশ করিলাম। দ্বারে একটি স্ত্রীলোক পদ্মফুল বেচিতেছিল। কয়েকটি পদ্মফুল কিনিলাম। এক মুণ্ডিত মস্তক ভিক্ষু আসিয়া আমাদের মন্দিরে লইয়া গেলেন।

বুদ্ধের বিরাট স্বর্ণময় মূর্ত্তি দর্শন করিয়া বিস্মিত হইলাম। এতবড় প্রতিমূর্ত্তি আর কোথাও দেখিয়াছি বলিয়া স্মরণ হইল না। হাতের ফুলগুলি অঞ্জলি দিয়া সেই—

"বসেছেন পদ্মাসনে প্রসন্ন প্রশান্ত মনে,
নিরঞ্জন আনন্দ মূরতি"র পানে চাহিয়া রহিলাম।

গাইড আমাদিগকে মন্দিরের উপরে লইয়া গেল। মন্দিরের গা দিয়া দুইটি সোপান দ্বিতলে উঠিয়া গিয়াছে। মন্দিরের কারুকার্য্য অতীব সুন্দর, ঘুরাণো বারান্দার চারিকোণে চারিটি ক্ষুদ্র মন্দিরে বুদ্ধের মাতার এবং পত্নীর প্রতিমূর্ত্তি রহিয়াছে।

মন্দিরের পশ্চাতে বোধিদ্রুম, বুদ্ধদেবের চরণ চিহ্নে ভূষিত। দর্শকগণ বোধিদ্রুম স্পর্শ করিতেছে, আমরাও করিলাম। মন্দিরের অনতিদূরে এক স্বচ্ছ সলিলা পুষ্করিণী, তাহার নাম পাতাল গঙ্গা। উদ্যানের স্থানে স্থানে কুটীর নির্ম্মাণ করিয়া 'রামসীতা' "লক্ষ্মী নারায়ণ" প্রভৃতি হিন্দু দেবীর মূর্ত্তি গড়িয়া অনেকেই পয়সা উপার্জ্জন করিতেছে।

চারিদিক দেখিয়া আমরা বুদ্ধদেবের স্তূপমূলে উপবেশন করিলাম। মন্দিরে প্রদীপ প্রজ্জ্বলিত হইল, উদ্যানস্থ পুষ্পকলিকাগুলি তথাগতর শ্রীচরণ উদ্দেশে ভক্তি পুষ্পাঞ্জলি দিবার নিমিত্ত ফুটিয়া উঠিল। দূর এবং নিকটের বিটপী শ্রেণী হইতে বন বিহগ তাঁহারি বন্দনা গান গাহিতেছিল। আমাদের মাথার উপরে জ্ঞানী বুদ্ধের, ধ্যানী বুদ্ধের এবং ত্যাগী বুদ্ধদেবের সন্ধ্যারতির নক্ষত্রের প্রদীপ জ্বলিতে লাগিল।

কলীন্ মূর

(অভিনেত্রী কাহিনী)

শ্রীমনোমোহন ঘোষ বিদ্যাবিনোদ

আজ কলীন মূরের নাম চিত্রপ্রিয়দের নিকট খুবই সুপরিচিত। কিন্তু তাঁর পূর্ব্ব জীবনের আত্মনির্ভরশীলতা, অধ্যবসায় প্রভৃতি গুণের কথা শুনলে শ্রদ্ধায় এই তরুণী চিত্রনটীর প্রতি মন ভরে উঠে; যশ যে কত সাধনার সহজেই তা অনুমিত হয়।

সে আজ ১৯০০ সালের ১৯শে আগষ্টের কথা; যখন মিচিগানের পোর্টহুরন নামক স্থানে কলীন মূর জন্মগ্রহণ করে। তার বাপ ও মা স্কটিস্ ছিলেন। ফ্লোরিডার টাম্পা নামক স্থানের এক কন্‌ভেন্টে লেখাপড়া শেখবার জন্য কলীন মূরকে শৈশবকাল যাপন করতে হয়েছে। তার মা বাপের ইচ্ছা ছিল যে বড় হয়ে কলীন মূর অর্কেষ্ট্রাতে পিয়ানো বাজায়। সেই জন্য পাঁচবছর বয়স থেকে তাঁরা তাকে গানবাজনা শেখাচ্ছিলেন। যখন কনভেন্টের লেখাপড়া কলীন মূর ছেড়ে দিলে তখনো সে "Detroit Conservatory of Music"এ গান বাজনা শিখ্‌ছে।

গানবাজনা কলীন মূর খুবই ভালবাসত কিন্তু সেটা যে আজ জীবিকা স্বরূপ গ্রহণ করে জীবন কাটাতে হবে এ চিন্তা তার অসহ ছিল। দশবছর বয়স থেকে তার মনে অভিনয় করবার স্পৃহা জাগে। সেই সময় নিকটবর্ত্তী

এক ষ্টক্ কোম্পানী থেকে একটা ছোট থিয়েটারের দল খোলা হয়, কলীন সেখানে নায়িকার ভূমিকা অভিনয় করে। প্রথম প্রভাতে, জীবনের যাত্রাপথে মানুষ যদি সুগম পথ, বিশ্বস্ত সঙ্গী আর উৎসাহ উদ্দীপনা পায় ত তার গতি স্বচ্ছন্দ, লীলায়িত ও জয়যুক্ত না হয়ে পারে না। কলীন মূরের এই প্রথম অভিনয় সাফল্যতার প্রাণে নব উৎসাহের বাণ ছুটিয়ে দিলে—আশার স্বপ্নে সে একেবারে মেতে উঠল।

আজ কলীনমূরের দিগন্ত বিস্তৃত প্রতিপত্তির ভিতর কারো কি কল্পনায় আসে যে এই তরুণী প্রথমে 'নগদ কাজ' পাবার জন্য ষ্টুডিওর বাইরের বেঞ্চে একাদিক্রমে ছ'মাস বসে কাটিয়েছে?

এই 'নগদ কাজের', ইতিহাস শুনলে আমাদের দেশের পেশাদার অভিনেত্রীরা পর্য্যন্ত চটে যাবেন। অথচ হলিউড ষ্টুডিওর আশপাসের গৃহস্থ ঘরের মেয়েরা পর্য্যন্ত অবসর মত এই "নগদ কাজ" করে তাদের পকেট খরচ চালিয়ে নেয়।

ব্যাপারটা হচ্ছে এই—ষ্টুডিওতে কোন ফিলিম তোলা হচ্ছে, তার কোন ভিড়ের দৃশ্যে, দোকানের দৃশ্যে বা যে কোন দৃশ্যে দাসী বাঁদি বা যেকোন ভূমিকার জন্য মাঝে মাঝে 'অতিরিক্ত' extra), লোকের দরকার হয় এবং সেই আশায় বাইরে অসংখ্য মেয়ে 'হাঁ-করে' বসে থাকে। যখন প্রয়োজন হবে প্রযোজক এসে পছন্দসই জনকতককে ডেকে নিয়ে কাজ শেষ করেন। যারা কাজ পেলে—তারা দাম নিয়ে, আর যারা পেলে না তারা শুধু হাতেই ঘরে ফিরল! দৈবাৎ এদের ভিতর থেকে দু'এক জনকে মাহিনা দিয়ে দলভুক্ত ক'রে নেয়াও হয়! এত চেষ্টা, যত্ন করে নিজেদের উপযুক্ত করে গড়ে তোলে তাই পাশ্চাত্য অভিনেত্রীদের পায়ে 'জগতজোড়া নাম' 'থলিভরা দাম' লুটিয়ে পড়ে আর আমাদের দেশে যে ক'দিন অভিনয় করে সেই ক'দিন 'অডিটোরিয়ম ভরা' নাম ও দামের অভাবে অভিনেত্রীরা "নেপথ্যে" সরে পড়ে।
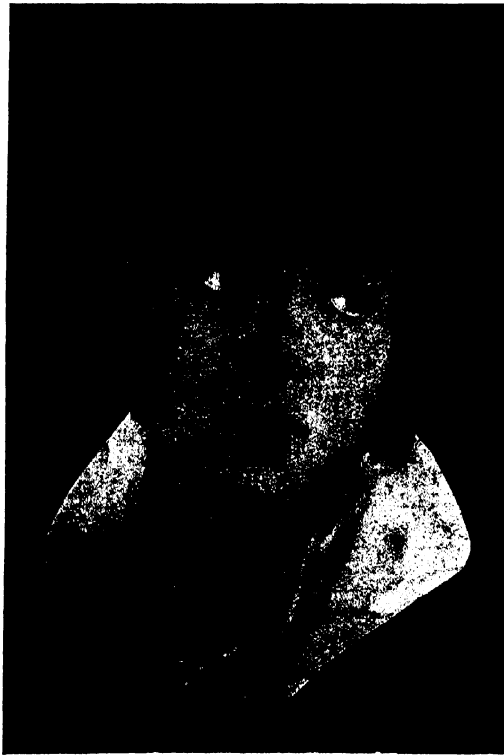
কলিন্ মুর

তারপর,—ছ'মাস কলীন্‌মূর এমনিতর "নগদ কাজে"র আশায় ষ্টুডিওর বাইরের বেঞ্চে বসে কাটিয়েছে। তার এক কাকা বিখ্যাত সংবাদপত্র-সম্পাদক ছিলেন। একদিন তিনি 'ঈষ্টানে কোম্পানী'র অফিসে গিয়ে ভাই-ঝিকে বাইরের বেঞ্চে বসে থাকতে দেখে আশ্চর্য্য হয়ে জিজ্ঞাসা করলেন—'তুমি এখানে কেন?' কলীন তাঁকে সব খুলে বল্‌লে। তাতে তিনি বল্‌লেন—'তা' তুমি আমায় বলনি কেন? আমি তোমায় ভাল জায়গায় কাজ করে দিতুম।' তাতে কলীন জবাব দিলে—'আমি জানি আপনি পারেন; কিন্তু আমি তা চাই না। যদি আমার যোগ্যতা থাকে, আমি নিজেই কাজ পাব—এবিষয়ে কারো সাহায্য আমি চাই না। আপনি বলুন, এখানে আমার জন্য কাকেও কোন অনুরোধ করবেন না!' কাকা রাজী হলেন।

অন্য কেউ হ'লে এ সুযোগ ছাড়ত?

মাঝে মাঝে হতাশায় ক্ষুব্ধ হ'য়ে তার মনে হত

'কাকাকেই বলি' ;-তখনি আবার আত্মসম্মান সজাগ হয়ে উঠত! এর পরেই সে তিন দিনের জন্য কাজ পেলে।

কিছুদিন পরে হঠাৎ একদিন বিখ্যাত প্রযোজক D. W. Griffith কলীনমূরকে তার কাকার বাড়ী দেখে এল, তাতে চিত্রাভিনেত্রীর সাফল্য সম্ভাবনা অনুভব করে সবাইকে বললেন। ফলে এক সপ্তাহের মধ্যেই মিস্ মূর Griffithএর অধীনে অভিনয় করবার জন্য কালিফোর্ণিয়ায় চলে গেল।

কিছুদিন ছোটখাট ভূমিকায় অভিনয় করবার পর, "Fleming youth" চিত্রনাট্য নায়িকার ভূমিকা অভিনয় করবার জন্য "First National" ষ্টুডিও মিস্ মূরের সঙ্গে চুক্তিপত্র সই করলে। সেইথেকে মিস্ মূর উন্নতির সোপান বেয়ে ক্রমশঃই উঠছে।

"So big", 'Sally" "Irene', "The perfect Flapper', 'The Desert flower', 'Pointed people'; "Flirting with love', 'We Moderns', 'Elia cinders', "Twinxletoes,' 'Orchids and Ermine', 'Naughty but Nice', 'Hot wild Oat', 'Love never dies', 'Happiness Ahead',, Oh Joy'

নানা বিখ্যাত ও জনপ্রিয় চিত্রনাট্যগুলিতে প্রধান ভূমিকা অভিনয় করে আজ কলীনমূর চিত্রাভিনেত্রী শিরোমণিদের পার্শ্বে বসবার যোগ্যতা অর্জ্জন করেছে।

এদেশের জনসাধারণকে অভিনেতা ও অভিনেত্রীদের প্রতি শ্রদ্ধা নিবেদন করতে দেখা যায় না কিন্তু ওদেশে যায়। তাও যেমন তেমন করে নয় সমারোহে। কোন বায়স্কোপ অভিনেত্রীরা ছবি দেখতে আসবে, দু'ঘণ্টা আগে থেকে বায়স্কোপের সামনে গাড়ী চলাচল বন্ধ হয়ে এক জন-সমুদ্রের সৃষ্টি হয়ে গেল। কে জানে রোদ, কে জানে বৃষ্টি! শুধু একবার চোখের দেখার জন্য! এদেশের ফুটবল মাঠের মত ও-দেশে অভিনেত্রীদের দেখবার জন্য 'সিট' ভাড়া পাওয়া যায়।

এক জায়গায় কলীনমূর নিজে লিখেছে—"I'll never forget the opening of the Chinese Theatre in May, 1927. It was the greatest crowd that has ever been seen in Hollyword. All the traffic along the Boubevard was diverted for hours before the performance, to make space for the crowd and give the cars a chance to get through. It took 2,500 people over 2½ hours to get inside the theatre, and when we came out we stood on the pavement for exactly 1½ hours before our car came along in its turn. To go and look for it would have been madness, so we simply had to wait."

*　*　*　*　*

"In spite of that awful downpour on immense crowd stood for hours and hours in puddles and ponds some with raincoats, very few with umbrellas"

এদেশে অহীন্ চৌধুরী বাস থেকে নেমে থিয়েটারে ঢুকছে—রাস্তার দু'একজন যারা চেনে, কেউ বললে "এ্যা—চুলগুলো সব ছেটে ফেলেছে!" কেউ বললে—"এইবার ভুঁড়ি বাগাচ্ছে।" মাত্র এই পর্য্যন্ত। আর অভিনেত্রীদের ত কথাই নেই!

১৯২৩ সালের ১৮ই আগষ্ট প্রতিভাশালী প্রযোজক John Macormixএর সঙ্গে মিস মূরের বিবাহ হয়। কলীন মূরের অধিকাংশ চিত্রনাট্যর প্রযোজনা তিনিই করেছেন। প্রায় ছ'বৎসর সুখে স্বচ্ছন্দে 'ঘরকন্না' করবার পর, শতকরা ৮০টি চিত্রনটীর যা হয় কলীনমূরের তাই হয়েছে! বিগত জুন মাসে স্বামীর বিরুদ্ধে গালাগালি ও দুর্ব্যবহারের অভিযোগ করে আদালত থেকে বিবাহ বিচ্ছেদ করেছে।

কলীনমূরের বাৎসরিক আয় গড়পরতায় নব্বইহাজার পাউণ্ডেরও উপর।

খেলা ঘর

শ্রীপূর্ণশশী দেবী

(গল্প)

এক

জমিদার দুহিতা অশোকাদের খেলাঘরে আজ মহাধুম। অন্যান্য দিন তার খেলার ঘর করণার একমাত্র সাথী ও সহকারিণী ছিল ছোট বোন রেণুকা, কিন্তু আজ তার খেলুড়ীর সংখ্যা অনেকগুলি, খুড়তুতো দুই বোন ব্রততী ও তপতি পিস্তুতো বোন গীতা কাজেই খেলাটা বেশ জমেছিল।

জমীদার মহাশয় সম্প্রতি যে পুষ্করিণী খনন করিয়েছিলেন পিতৃ পুরুষদের অক্ষয় স্বর্গ কামনায়—এই পুন্যাহ বৈশাখের অক্ষয় তৃতীয়া তিথিতে তার প্রতিষ্ঠা করা হল, সেই শুভানুষ্ঠানে যোগ দিতে কলিকাতা হতে অশোকার কাকা আর পিসিমাও এসেছেন।

এই সুযোগে অশোকা তার আদরের কন্যা 'ডলি'কে পাত্রস্থা করে ফেলেছে, পাত্র তপতীর বড় খোকা পুতুল শ্রীমান 'মানস মোহন'। এই মানসমোহন জামাতা হবার আগেই বালিকা শ্বশ্রূ মাতার মানস মুগ্ধ এবং লুব্ধ করেছিল কিন্তু স্কুলে প্রাইজ লব্ধ এই পুতুলটীকে হাত ছাড়া করতে তপতী মোটেই রাজি নয়, তবু বিয়ের পর জোড়ে আসার বাহানায় জামাইটাকে কিছুদিন কাছে রাখা এবং নাড়া চাড়া করা যাবে তো!—তাই এ ব্যবস্থা।

সেই শুভপরিণয়ের আজ প্রীতি ভোজ। সেজন্য অশোকা আর অশোকার বোনেরা ভোজের আয়োজনে রীতিমত ব্যস্ত হয়ে পড়েছে। কেউ লুচি বেল্‌ছে কেউ ভাজ্‌ছে, ছোট ছোট খুরীতে সাজিয়ে রাখছে, উৎসাহের অন্ত নেই। সব চেয়ে বেশী ব্যস্ত অশোকা, কারণ সে কনের মা এবং ঘরের গিন্নি।

সামনে ফুলের মালা দিয়ে সাজানো রঙ্গীন্ বেদীতে সুখাসনে বসে নির্জীব বরকন্যা দুটী, তারা নিস্পলক নেত্রে এই সজীব পরিজনদের আগ্রহ ও ব্যগ্রতা দেখে যেন মিটি মিটি হাস্‌ছে।

খেলা ঘরটা পাতা হয়েছিল বাগানে একটা ঝাঁকড়া ফুল গাছের তলায়, সেই গাছের ওধার দিয়ে পায়ে হাটা সরু পথখানি সাপের মত বেঁকে গিয়ে রাস্তায় মিশেছে।

গীতা কুট্‌নো কোটা শেষ করে চাট্‌নির জন্য কাঁচা আম সংগ্রহ কর্‌তে দেখে খানিক তফাতে সেই পথের ধারে দাঁড়িয়ে আছে একটী মেয়ে, তাদেরই সমবয়সী হবে। রোগা রোগা শ্যামবর্ণ মুখখানি মোটের উপর মন্দ নয় বেশ একটু শান্ত শ্রী আছে ; তবে গাল দুটী একটুখানি পুরন্ত হলে ভাল দেখাত।

একখানা আধময়লা বাগ্‌দী ডুরে গাছ কোমর বেঁধে পরা। এলো চুল, গায়ে সেমিজ নেই, গলায় লাল সুতোয় বাঁধা একটী তামার মাদুলী, হাতে একগাছি করে রাঙা 'কড়', কাণে কবেকার ময়লা পড়া পার্শী মাকড়ী তার ছোট মুখখানিতে আদপে মানায়নি।

মেয়েটী সেই অপরূপ খেলা ঘর এবং বিশেষ করে বিচিত্র সাজে সজ্জিত নব বিবাহিত দম্পতীর পানে লুব্ধ অনিমেষ দৃষ্টিতে চেয়ে নিঃশব্দে দাঁড়িয়েছিল—এমন কাণ্ড যেন জীবনে কখনো দেখেনি সে!

তার দিকে হঠাৎ চোখ পড়তেই গীতা একটু এগিয়ে এসে তড়াতাড়ি বললে—

"তুমি কখন্ এলে ভাই?"

বালক বালিকা যেন পরিচয়ের ধার ধারে না।

গীতার অকুণ্ঠিত প্রশ্নের উত্তরে মেয়েটী সঙ্কুচিত ভাবে বললে "এই খানিকক্ষণ হল।"

"ওমা! তা এখানে চুপ্‌টী করে দাঁড়িয়ে কেন? তুমি আমাদের সঙ্গে খেলবে?"

মেয়েটী ঘাড় কাৎ করে একটুখানি হাসলে শুধু, সে হাসিতে খুসী, বিনয় ও ব্যগ্রতা স্পষ্ট প্রকাশ পাইল।

তা হলে এসোনা ভাই! আমাদের খেলা ঘরে, কাল অশোকার মেয়ে ডলির বিয়ে হয়েছে কিনা, আজ তাই নেমন্তন্ন,—ও অশোকা! তোর কে বন্ধু এসেছে দেখ্‌না…"

মেয়েটীর হাত ধরে গীতা কাছে আসতেই মেয়েদের

কুতূহলী দৃষ্টি একসঙ্গে পড়ল নবাগতার দিকে। অশোকা ভুরু কুঁচ্‌কে তাচ্ছিল্যের স্বরে বলে উঠল—"ধ্যেৎ! ও আমার বন্ধু হতে গেল কেন?—গীতাদি যেন কি!"

"তবে ও কে ভাই?"

অপরিচিতার আপাদ মস্তক একবার অবজ্ঞার দৃষ্টিতে দেখে জমীদার নন্দিনী অপ্রসন্ন স্বরে বল্লে "তা কি করে বলব?—আমি কি ওকে চিনি না জানি? অমন মেয়ের সঙ্গে বন্ধুতা করলে মা আমাদের আস্ত রাখ্‌বে কি না! হুঁ! সেদিন চৌধুরীদের লক্ষ্মীর সঙ্গে একটু পুতুল খেলেছিলুম বলে—মা বকে ঝকে কি রকম অনর্থ করে ছিলেন জিজ্ঞাসা করোনা রেণুকে—'

রেণুকা দিদির কথায় সায় দিয়া গম্ভীর মুখে বলে উঠল—"হ্যাঁ মা বড় রেগে যান—আমাদের যার তার সঙ্গে খেলতে দেখলে, বাবাও বলেন ছোটলোকের মেয়ে ছেলের সঙ্গে কখনো মিশতে নেই, তাতে মন ছোট হয়ে যায়—" আর মেয়েটীর মুখে চোখে, দীনতা ও নৈরাশ্যের বেদনা পরিস্ফুট হল।

ক্ষুব্ধকণ্ঠে কুণ্ঠিত স্বরে সে রেণুর কথায় বাধা দিয়ে বল্লে "কিন্তু আমরা তো ছোট লোক নয়—বামুন, আমার বাবা চাটুয্যে—"

"ওঃ! তবে আর কি?"

গীতা ভিন্ন আর সকলেই হেসে উঠ্‌ল।

অশোকা বল্লে—"বামুন হলে কি হয়? তোমরা গরীব তো? গরীব হলেই যে ছোট লোক বলে তাকে। তা নইলে এমন নোংরা কাপড় নিয়ে—ম্যা-গোঃ! গায়ে একটা সেমিজও কি জোটে নি?—"

মেয়েটীর ব্যথাহত ম্লান মুখখানির পানে চেয়ে গীতার কোমল চিত্ত করুণা ও দরদে ভরে গেল, কিন্তু গৃহিণীর সম্মতি না পেলে তো এই অপরিচিতাকে তাদের খেলাঘরে আসন দিতে পারে না? তাই অশোকার দিকে তাকিয়ে মিষ্ট অনুনয়ের সুরে সে বল্লে "তা হোক না ভাই! বেচারী খেল্‌তে এসেছে তখন খেলুক না একটু"—

"হ্যাঁ কি নাম ভাই! তোমার?"

মেয়েটী মাথা নীচু করে বাধ বাধ ভাবে বল্লে—"আমার নাম,—ভাল নাম তো কিশলয়—"

"ওরে বাবা! কি-শ-ল-য়!

অশোকার মুখে কথাটা উচ্চারণের ভঙ্গী দেখে সব মেয়ে কটী খিল্ খিল্ করে হেসে উঠল।

ব্রততী তাদের মধ্যে সকলের বড় বয়সেও এবং বিদ্যাতেও তাই সে শুধু হেসেই শান্ত হল না, মেয়েটীর অপ্রতিভ মুখের পানে চেয়ে সকৌতুকে প্রশ্ন করলে "ও কথাটার তুমি মানেও জানো? কিশলয় কাকে বলে?"

কিশলয় থতমত খেয়ে মাথা নেড়ে ধীরে ধীরে বল্লে "তা কি জানি। ওনাম আমার মাসিমা রেখেছিলেন নিজের পছন্দে ওনামে তো আমাকে কেউ ডাকেনা—"

"তবে কি বলে ডাকে?

"হারাণী। আমি হবার আগে মার অনেকগুলি ছেলে মেয়ে,

ঠিক ঠিক! এই নামই তোমাকে মানায় বেশ, কেমন ভাই অশোক!

আহা! অমন মিষ্টি নামটী—

গীতা আর চুপ করে থাকতে পারলে না, ব্রততীর কথার সজোরে প্রতিবাদ করে সে বলে উঠল—

"এ যে তোমাদের অন্যায় কথা ভাই! নামের আবার তেতো মিষ্টি কি? যার যা ইচ্ছে রাখতে পারে, তাতে কারুর কিছু বলবার তো নেই—"

তারপর সেই কুণ্ঠিতা অপমানিতা বালিকার হাত ধরে সহানুভূতিভরে বল্লে—"তুমি দাঁড়িয়ে থাকবে কতক্ষণ ভাই? বসো না, ঐ ইট্‌টার ওপর বসো, আচ্ছা আমাদের যজ্ঞিবাড়ীতে তুমি কি কাজ করবে বলো দেখি?"

অশোকা ঠোঁট ফুলিয়ে বল্লে—"ও আর কি করবে?

অশোকার বোন তপতী হয়তো প্রত্যাখ্যাতার প্রতি অনুকম্পা দেখিয়েই বল্লে "কেন বোন? ওকে ঝিয়ের কাজ দিলেই তো হয়—ও যদি নেহাৎ খেলতেই চায়···

কিশলয়ের শ্যামল মুখখানি পলকে লাল হয়ে উঠল।

"না, খেল্‌তে আমি চাই না,—আমি শুধু দেখতে এসেছিলুম—খেল্‌তে আসি নি তো!"

ব্যথাবিদ্ধ কণ্ঠে ঝাঁঝালো সুরে কথাক'টী বলেই কিশলয় ফিরে চল্‌ল যে পথে এসেছিল।

তার গমন পথের পানে চেয়ে গীতা ম্লানমুখে একটা নিশ্বাস ফেলে বললে, "না বুঝে সুঝে তোমার ও কথাটা

বলা ভাল হয় নি তপতী! আহা! কত আশা করে এসেছিল—"

তপতী মনে মনে একটু অপ্রতিভ হয়েছিল নিশ্চয় কিন্তু সেটা প্রকাশ না করে মুখভার করে বললে, "আমি আর মন্দ কি বলেছি গীতাদি? অমন মেথরাণীর মত চেহারা ও ঝিয়ের কাজ করবে না তো কি করবে? কলকেতায় আমাদের বুড়ো ঝিয়ের নাৎনী পারুল সেও যে এর চেয়ে ঢের পদে আছে, কি রকম সভ্য ভব্য দেখেছ তো?"

"তা সহুরে আর পাড়াগেঁয়ে একটা তফাৎ থাকবে না?"

"কেন? আমার বেয়ানও তো পাড়াগেঁয়ে মেয়ে কেউ বলুক দেখি?"

অশোককে অসন্তুষ্ট করা গীতার মনোগত অভিপ্রায় বা উদ্দেশ্য ছিল না তাই অশোকের অপ্রসন্ন মুখের পানে আড়ে আড়ে চেয়ে সে কথার সুর বদলে ফেলে তাড়াতাড়ি বলে উঠল—"তুই একটা আধ পাগল তপি! কার সঙ্গে কার তুলনা কর্‌ছিস্ বল্ দেখি? আমাদের অশোকার মত শিক্ষা-দীক্ষা কজন সহুরে মেয়ের ভাগ্যে ঘটে? মামাবাবুটি কম চেষ্টা করছেন কম পয়সা ঢাল্‌চেন ওদের দুটী বোনের শিক্ষার জন্যে?"

ব্রততী উভয় পক্ষেরই মন রেখে বল্লে—"সেতো ঠিক কথা। কিন্তু মেয়েটার কি রকম তেজ দেখেছিস্ ভাই? এক কথাতেই কেমন ফরকে চলে গেল!—"

"তেজ নয় দিদি! ভারি দুঃখ হয়েছে ওর, দেখলে না চোখ ছল ছলিয়ে এসেছিল মুখখানি একেবারে শুকিয়ে—

শুকিয়ে তো যাবেই রে। ওযে কিশলয়!...

আবার হাসি!

সেই সমবেত সশব্দ হাস্যরোল বোধ হয় কিশলয়ের কাণেও গিয়েছিল, কিন্তু সে আর মুখ না ফিরিয়ে হন্ হন্ করে চলে গেল।

দুই

মেয়ের রূপ নেই, মেয়ের বাপের রূপার জোর নেই, কাজেই দুশ্চিন্তায় উদ্বেগে পাড়াপ্রতিবেশীদের পক্ষেও নিদ্রা দুর্লভ হয়ে উঠেছিল, তাই তো! মেয়েটার কি যে গতি হবে!

কিন্তু প্রজাপতির নির্ব্বন্ধে এবং পূর্ব্বজন্মের সুকৃতির ফলে কিশলয় বা হারাণীরও গতিমুক্তি হয়ে গেল কন্যা-কাল উত্তীর্ণ হবার পূর্ব্বাহ্নেই। পাত্রটীর নাম পুলিন কৃষ্ণ মুখুজ্যে, স্বভাব চরিত্র ভাল, অল্প বয়সে পিতৃহীন হয়ে লেখাপড়ায় বেশীদূর এগোতে পারেনি। গ্রামে একখানা মেটে বাড়ী আর কয়েক বিঘা জমি ভাগে দেওয়া আছে, তাতে স্বচ্ছলতা না থাকলেও ভাতের ভাবনা ভাবতে হয় না, তাছাড়া পুলিন সম্প্রতি কলকেতায় একটা প্রেসে কাজ শিখছে মাসে প্রায় টাকা কুড়িক পারিশ্রমিক পায়।

হারাণীর মত মেয়ের পক্ষে তাই যথেষ্ট। সবাই বল্লে হারাণীর বরাত ভাল।

শাশুড়ী রুগ্না, রোগজীর্ণ দেহখানা নিয়ে তিনি সংসারের ঠেলা ঠেলতে আর পারছেন না, কাজেই ধুলো পায়ে দিন করে বিয়ের অব্যবহিত পরেই মা-হারা মেয়েটীকে শ্বশুর বাড়ী পাঠিয়ে দিয়ে হারাণীর পিতা দুহাতে চোখের জল মুছতে মুছতে স্বস্তির নিশ্বাস ফেলে বাঁচলেন।

পাত্র নিজে পছন্দ করে হারাণীকে গ্রহণ করেছে, সুতরাং তার দিক থেকে অসন্তুষ্টি বা অনুযোগের সম্ভাবনা ছিল না। শাশুড়ী একমাত্র পুত্রবধূর রূপ এবং অলঙ্কারের অভাবে একটু মনক্ষুণ্ণ হলেও ঘরের লক্ষ্মীকে আদর করে ঘরে তুল্লেন।

অন্তর থেকে অজস্র স্নেহাশীর্ব্বাদ করে বল্লেন—মা লক্ষ্মী আমার! তোমার লক্ষ্মী ভাগ্যিতেই আমার পুলিনের সংসার যেন...শাশুড়ীর সেই আশীর্ব্বাদ হারাণী তাঁর পায়ের ধুলোর সঙ্গে পরম বিশ্বাসে ও ভক্তিভরে মাথায় তুলে নিয়েছিল।

পুলিনও তার নবপরিণীতার নামের শূন্যতা জ্ঞাপক প্রথম শব্দটী সযত্নে পরিহার করে শুধু "রাণী" নামেই ডেকে ছিল, কিন্তু হারাণী তার আন্তরিক যত্ন সেবা শ্রদ্ধা ভালবাসা দিয়ে শ্বশ্রূ ও স্বামীকে তুষ্ট পরিতৃপ্ত করলেও সংসারে লক্ষ্মী ভাগ্যি আনতে পারলে না। নববধূর প্রথম দৃষ্টিপাতেই দুধের কড়া উপলে পড়লেও তার শ্বশুর ঘর উথলে পড়ার কোনো সম্ভাবনাই দেখা গেল না।

তবু গরীবের মেয়ে হারাণী গরীবের ঘরের বউ হয়ে নিজেকে একদিনের তরেও অসুখী বোধ করেনি। পীড়িতা শ্বশ্রূকে বিশ্রামের অবাধ অবসর দিয়ে সে তার পরিত্যক্ত সংসারের অচল প্রায় চাকা খানা নিপুণ হাতে বেশ সহজেই ঘুরিয়ে নিয়ে চল্ল।

তিন

বছর দুই পরের কথা।

এরমধ্যে হারাণীদের সংসারের অনেক পরিবর্ত্তন হয়েছে।

পুলিনের জননী স্বর্গগতা। বধূ হারাণী এখন ঘরণী গৃহিণী।

মাতার অবর্ত্তমানে হারাণীকে গ্রামে একলা রাখা চলে না, কাজেই পুলিনকে বাধ্য হয়ে কলকেতায় বাসা করতে হয়েছে। তাতে খরচ বেড়ে গেছে বিস্তর। অবশ্য মাহিনাও এই দুবছরে মারকাট্‌ করে, বেড়েছিল দশটী টাকা, কিন্তু কল্‌কেতা সহরে বাসা করে সপরিবারে না হলেও সস্ত্রীক বাস করা বিশেষ ব্যয় সাপেক্ষ, সে ব্যয়ের অনুপাতে এই 'বাড়তি' আয়টুকু যথেষ্ট নয়। তবু হারাণীর গৃহিণীপণা গুণে গরীবের ঘরকন্না স্বচ্ছন্দে না হোক্‌—শান্তিতে চলে যাচ্ছিল!

কিন্তু সংসারীর পক্ষে শান্তিরক্ষা বড়ই দুরূহ ব্যপার, বিশেষতঃ যেখানে অর্থবল নেই।

মাস তিনেক হল, হারাণীর একটী সন্তান হয়ে নষ্ট হয়ে গেছে, ঠিক তার পরই হারাণী আঁতুড় কাটিয়ে উঠতে না উঠতে—পুলিন অসুখে পড়ল।

এই আকস্মিক বিপদপাতে হারাণী তার দুদিনের পাওয়া সন্তানটীর মৃত্যুশোকে একটু কাঁদবার অবকাশও পেলে না। তাড়াতাড়ি চোখের জল মুছে ফেলে সে মনে মনে বল্লে "স্বামীকে ভাল করে দাও ঠাকুর। ছেলেয় তার কাজ নেই..."

পুরো দেড়টী মাস শয্যাগত থাকার পর হারাণীর অশ্রান্ত সেবা, ঐকান্তিক প্রার্থনা এবং অখণ্ড আয়তির বলে পুলিন আরোগ্য লাভ করে আবার কাজে যাচ্ছে। এবং হারাণী স্বস্তির নিশ্বাস ফেলে অগোছাল সংসারটাকে টেনেটুনে কোনো মতে একটু গুছিয়ে নিয়েছে এমনি সময় তার আলাপ হল পাশের বাড়ীর একটী বউয়ের সঙ্গে। হল্‌দে রঙের প্রকাণ্ড তেতালা বাড়ীখানা, ঘন সবুজ রংয়ের ঝক্‌ঝকে দরজা জানালাগুলো তাতে ভারি সুন্দর মানিয়েছে।

দেখলে মনে হয় যেন রাজপুরী।—

সেই রাজপুরীর মালিক কলকেতার একজন মস্তবড় এটর্নী, বউটী তা'র কনিষ্ঠ পুত্রবধূ।—নাম করুণা।

ধনী কন্যা ধনীর বধূ হলে কি হয় বউটী ছিল তার নামের মতই মিষ্টি ও নম্র, ভারি সরল মিশুক স্বভাবটুকু তার।—বাপের বাড়ী থেকে এসে পর্য্যন্তই করুণা তার প্রায় সমবয়স্কা হারাণীর সঙ্গে ভাব করবার জন্য উৎসুক হয়েছিল। কিন্তু সুবিধা হয়ে উঠছিল না শুধু হারাণীর অমনোযোগিতায়—সে যেন দেখেও দেখে না।

পায়রা খোপের মত বাড়ীখানার একাংশে দুখানি ছোট ছোট ঘর নিয়ে হারাণীর সংসার। একটায় রান্না ভাঁড়ার সবই,—আর একখানা শোবার ঘর। সেই ঘরদুখানার সামনের খোলা ছাতটুকুতে হারাণী কাপড় কাচে, বাসন মাজে, চাল ঝাড়ে, বড়ি দেয়, আরো কত কাজ করে।

আবার বৈকালের দিকে ভিজে চুল শুকোতে বা কাচা কাপড়গুলো তুলতে এসে সারাদিনের খাটুনীর পর—মুক্ত আকাশের তলে একটু ক্লান্তির নিশ্বাস ফেলে বাঁচে।

করুণা তাদের তেতলার ঘরের একটা জানলার ফাঁক দিয়ে তাই দেখে।

গরীবের ঘরের ঘরণী হারাণীর আকৃতি ও বেশভূষায় দেখবার মত কিছুই ছিলনা, তবু এই প্রায় সমবয়সী নিরলস মেয়েটীর কাজকর্ম্মে তৎপরতা ও চলা-ফেরার ভঙ্গীটুকু দেখতে বউটীর বেশ লাগত। কিন্তু হারাণী নিজের কাজেই মগ্ন থাকে, কোন দিকে চাইবারও যেন ফুরসৎ নেই তার।

সেদিন দুপুর বেলা আকাশে মেঘ দেখা দিয়েছে, কাল বৈশাখীর মেঘ, স্বল্প হলেও উপেক্ষা করবার নয়।

হারাণী সেই হাতে কাচা ধুতি দুখানা কুঁচিয়ে বাক্‌সের উপর রেখে, স্বামীর সাবান দেওয়া কামিজটা তুলে দেখছিল শুকিয়েছে কিনা—এমন সময় একটু জোরে খট্‌ করে শব্দ হল। সে তাড়াতাড়ি মুখ ফিরিয়ে দেখলে সেই রাজপুরীর খোলা জানালায় একটা কপাট ধরে দাঁড়িয়ে একটী বউ।

বেশ ফরসা মোটা-সোটা নধর গঠন। গোল গাল কচি কচি মুখখানি যেন হাসিতে ভরা। গা ভরা গহনা। পরণে একখানা চওড়া জরীপার খয়ের রংয়ের সাড়ী—এ কাপড় হয়তো আট পৌরেই পরে থাকে......কত বড় ঘরের বউ সে!

হারাণীকে অবাক্ হয়ে চাইতে দেখে বউটী ফিক্ করে হেসে বল্লে—"বাঃ বা! এতক্ষণে হুঁস্ হল! কখন থেকে দাঁড়িয়ে আছি!"

হারাণী বিস্মিত হয়ে বল্লে—"আমার জন্যে?"—

"হ্যাঁগো হ্যা! তোমার জন্যে নয়তো কি পাড়ার—কথার শেষটা শুধু হাস্য চপল চোখ দুটীর ইসারায় সেরে বধূটী উৎফুল্ল স্বরে বল্লে—শুধু আজই নয় কদিন ধরে বাপের বাড়ী থেকে এসে পর্য্যন্তই তোমার সঙ্গে আলাপ করবার জন্যে ছট্‌ফট্ করছি, কিন্তু তোমার যে ফুরসদই হয়না।"

হারানী কামিজটা পাট করতে করতে একটু হেসে বল্লে—"ফুরসৎ কি করে হবে ভাই? সংসারে কাজ করবার লোক আর তো কেউ নেই—"

"তাই তো দেখছি। সংসারে কেবল তোমরাই স্বামী স্ত্রী বুঝি? তোমার বর কি করেন ভাই?—"

হারানী তার শেষ প্রশ্নের উত্তরে ঈষৎ সঙ্কোচের সহিত বল্লে "একটা ছাপাখানায় কাজ করেন।"

"ও! তাই—সেদিন দেখলুম কালিঝুলি মেখে... তোমাদের কলতলা বুঝি ঐ ধারে?—"

"হ্যা, ঐ যে রান্না ঘরের ডান দিক পানে—কতটুকুই বা জায়গা?"

"রান্না তুমি নিজেই করো—?"

"তা না তো কে করবে?"

"আহা তাহলে তোমার ভারি কষ্ট হয়তো! এই গরমে আগুন তাতে দুটী বেলা—"

"নাঃ! কষ্ট আবার কি দুজনের তো রান্না।

"তা হলেও, আমার তো ভাই! আগুন তাতে গেলেই মাথা ধরে ওঠে, আর পারিও না—সামলাতে, সেদিন শাশুড়ীর জন্যে একটু চা তয়ের করতে গিয়ে দুটো আঙ্গুল ফোস্কা পড়িয়েছি—দেখনা?—"

করুণা হাস্‌তে হাস্‌তে ডান হাতখানি বাড়িয়ে দেখালে, সেই শুভ্র নিটোল হাতে 'চেপে' বসা একরাশ উজ্জ্বল স্বর্ণ চুড়ী যেন বিদ্যুতের মত ঝক্‌মকিয়ে উঠ্‌ল।

হারাণী একটা ক্ষুদ্র নিশ্বাস ফেলে বল্লে—

"তুমি আর আমি কি সমান? যার কোনো কালে অভ্যাস নেই···"আচ্ছা, তোমার ও চুড়ীগুলি কি প্যাটার্ণের ভাই? দুরকম নয়? বেশ দেখ্‌তে—

"হ্যা—দু 'সেট', এগুলো ইলেক্‌ট্রিক আর এইগুলো কি বলে—কার্ণিশ্ চুড়ী,-গড়ন মন্দ নয়। কিন্তু বড্ড ভারি করে ফেলেছে, আবার কোথাও নেমন্তন্নে গেলে টেলে এর ওপর জড়োয়া চুড়ী, ব্রেসলেট তাও চাপাতে হয়, আমার ভাল লাগে না ভাই, কিন্তু কি করি বলো? শাশুড়ীর হুকুম, তাঁর ইচ্ছে বউয়েরা সকল সময় এক গাদা গয়না পরে বেড়ায়·· ভাগ্যে—গায়ে গয়না পরা উঠে গেছে।"

এক নিশ্বাসে কথাগুলো বলে ফেলে—বউটী—হারাণীর মুখপানে চেয়ে ফিক্ ফিক্ করে হাসতে লাগ্‌ল।

সে হাসিতে আভিজাত্যের গর্ব্ব এতটুকু ছিল না, ছিল শুধু আদরিণীর পরিতৃপ্ত প্রাণের সরল মধুর—আনন্দোচ্ছ্বাস। তবু—হারাণী সেই হাসিতে যোগ দিতে পারলে না। তার মুখখানি কেমন উদাস হয়ে গেল। তাকে নীরব দেখে করুণা গল্প করবার একটা ছুতো ধরেই যেন বল্‌লে—"তোমার হাতের ঐ চুড়ী কগাছিও বেশ সুন্দর দেখতে—"

হারাণী অপ্রস্তুত হয়ে বলে "ও তো সোণার নয়—কাঁচের—"

করুণা বেশ চালাক মেয়ে, নিজের ভ্রান্তি সংশোধন করে সে তৎক্ষণাৎ বলে উঠল—

"তা' জানি। আজকাল কাঁচের চুড়ী এমন সুন্দর করেছে যে সোণার চুড়ীকে হার মানিয়ে দেয়। আমার ভারি ইচ্ছে করে ঐরকম কাঁচের চুড়ী পরি, কিন্তু পর্‌তে দেয় কে?"

তারপর আরও অনেক কথাই হ'ল।

সেইদিনকার আলাপ পরিচয়ে এই সমবয়সী, ও অসম অবস্থার মেয়ে দুটীর পরস্পর সদ্ভাব জন্মে গেল।

পরম সৌভাগ্যবতী ধনী বধূ করুণার সরল সৌহার্দ্দের তলে দরিদ্র গৃহিণী হারাণীর দীনতা হীনতার সকল লজ্জা, সকল ব্যথা চাপা পড়ে গেল।

কিন্তু তাদের আলাপটা সেই জানলা থেকেই হ'ত নিভৃতে, তৃতীয় প্রাণীর অগোচরে।

চার

"ও দিদি! কাল যে তোমাকে একবার আসতে হবে ভাই!"

"কোথায় গো?"

"এখানে,—আমাদের বাড়ী—"

কথাটা শুনে হারাণীর বড় আশ্চর্য্য বোধ হল।

এদ্দিন, করুণার সঙ্গে আলাপ পর্য্যন্ত এমন কথা সে তো কখনও বলেনি, কতবার যেন বল্‌তে বল্‌তে থেমে গিয়েছে, তার ভাব ভঙ্গী দেখে মনে হ'ত, হারাণীর সহিত সখ্যতা যেন বাড়ীর লোকের কাছে গোপন রাখতে চায়—তবে আজ এ উপরোধ কেন?

উর্দ্ধ দৃষ্টিতে করুণার ফুটন্ত ফুলের মত হাসিতে ঢল ঢল মুখখানির পানে চেয়ে—হারাণী সাগ্রহে জিজ্ঞাসা করলে "কেন? কাল তোমাদের বাড়ী কি ভাই?"

"সে এলেই দেখতে পাবেখ'ন—"

বলে করুণা সলজ্জভাবে মুখখানি নামিয়ে নিলে।

মনে মনে কি একটা অনুমান করে হারাণী সহাস্যে বলে উঠল "ওঃ বুঝেছি! কাল তোমার সাধ বুঝি, না?—"

"বাঃ? ঠিক তো ধরেছ! কি করে বুঝলে ভাই?"

"তোমার মুখ দেখে, আর ভুঁড়িখানির বহর দেখে!"

দুজনেই একসঙ্গে হেসে উঠল। করুণা হাসতে হাসতে কিল্ উঠিয়ে বল্লে—

"যাইরি কি দুষ্টু তুমি! কাছে থাকতে, দিতুন এক ঘা বসিয়ে! ওর যেন আর ভুঁড়ি কখনো হবে না!"

আর হয়ে কাজ নেই! বাবাঃ! যা ভোগটা ভুগেছি—"

করুণা এদিক ওদিক চেয়ে তাকে আস্তে বল্লে

"কিন্তু আমার শাশুরীতো এরি মধ্যে মাথা কোটাকুটি আরম্ভ করে দিয়েছিলেন বলেন—মোটা হয়ে চর্ব্বি হয়ে যাচ্ছে, হয়তো আর—"

"তোমার কথা স্বতন্ত্র। আমাদের গরীবের ঘরে... আচ্ছা ভাই! নিজের সাধের নিমন্ত্রন নিজেই করলে বুঝি?"

উপরে মিষ্টি হাসি হেসে, টুক্‌টুকে ঠোঁট খানি একটু ফুলিয়ে করুণা বল্লে—"বন্ধুকে তাই যদি করে থাকি তাতে দোষ হয়েছে কি?"

"না দোষ হবে কেন, এতো বড় সুখের, বড় আহ্লাদের কথা। কিন্তু—

"না, তোমার ও কিন্তু,কিন্তু আমি মানব না, তোমাকে একবারটী আসতেই হবে বুঝলে, শাশুড়ীও বলেছেন তোমাকে নেমন্তন্ন করতে পাঠাবেন—

"তাঁকে তুমিই বলেছিলে বুঝি?"

"বলি নি, তবে বলিয়েছি বটে! নিজের মুখে কি বলা যায়?"

"কার মুখে বললে? বরের?

করুণা মুখে আঁচল চাপা দিয়ে হাসতে লাগল।

হারাণী একটুখানি মুচ্‌কে হেসে বলে—

"কাল 'সাধ', তাই বুঝি সোহাগিনীর সব সাধই পূর্ণ করতে হবে তাকে?"

'হ্যাঁ গা হ্যাঁ! বেশী চাগাকী করতে হবে না আর! এখন বলো—কাল আসবে তো?— ঠিক?"

হারাণী একটুখানি ভেবে বল্লে—"ঠিক কি করে বলব? তবে দেখি—"

"এতে আর দেখাদেখির কি আছে ভাই? এই তো দোরগোড়ায়—একবাড়ী বল্লেই হয়—তার জন্যে এত··· ওঃ বুঝেছি! কর্ত্তা মশাইয়ের হুকুম নিতে হবে, না? তা আজ রাত্তিরেই নিয়ে রেখো, নইলে···" লক্ষ্মী দিদি আমার! তোমার দুটী পায়ে পড়ি, একবারটী এসো, আরও কত মেয়েরা আসবে, কত আমোদ হবে, তুমি না এলে কিন্তু..."

সরল প্রাণা সখীর সেই অকপট স্নেহানুরোধ, সাদর আমন্ত্রণ হারাণী এড়ায় কি করে? রাত্রে স্বামীকে সমস্ত জানিয়ে সে জিজ্ঞাসা করলে—"যাব একবার? অত করে বলছে··"

সে ব্যগ্র প্রশ্নের উত্তর পুলিন সহসা দিতে পারলে না। ভাবতে লাগল।

স্বামীকে নির্ব্বাক দেখে হারাণী বুঝল স্বামীর মত নেই। তার মনে শুধু অভিমান নয়—একটু দুঃখও হ'ল—

এই কল্‌কাতা সহরে দেখবার মত জিনিস ও জায়গা কত আছে; থিয়েটার বায়োস্কোপ—আরও কত কি! সকলি ব্যয় সাপেক্ষ ও তাদের সাধ্যাতীত বলে—তেমন কোনো আব্দার ও উপরোধ স্বামীর কাছে সে কোনোদিনই করেনি তো!

কিন্তু আজ এই ঘরের দোরগোড়ায় তারপর সখীর সনির্ব্বন্ধ অনুরোধ...তবু—

ক্ষুব্ধকণ্ঠে সে বল্লে "তোমার যদি ইচ্ছে না হয় তবে থাক্—আমি না গেলে তাদের কাজ আট্‌কে থাকবে না তো!"—

পুলিন বিমর্ষভাবে একটা নিশ্বাস ফেলে বল্লে—"আমার ইচ্ছে খুবই আছে রাণী! তুমি পাঁচজন মেয়ের সঙ্গে মিশবে—আমোদ-আহ্লাদ করবে—আমার কি তাতে অসাধ? কিন্তু আমরা গরীব, ওঁরা বড়লোক, তাই ভয় করে—"

হারাণীর বুকটা 'ছ্যাঁৎ' করে উঠল। মনে পড়ল করুণার সাথে প্রথম সাক্ষাতে নিজেদের পরিচয় দিতে গিয়ে কি রকম লজ্জায় পড়তে হয়েছিল, আবার যদি সেই রকম... তার মুখ শুকিয়ে এতটুকু হয়ে গেল। কিন্তু না গেলে করুণা কি মনে করবে? হয়তো ভাব্‌বে—কর্ত্তা হুকুম দেন নি, তাই—স্বামীর অপরিমিত ভালবাসার কথা বলে বন্ধুর কাছে সে যে কত দিন কত গর্ব্ব করেছে—সে গর্ব্ব তার আর রইল কই?

স্ত্রীর শুষ্ক ম্লান মুখখানি আদরে চুম্বন করে পুলিন ব্যথাভরা স্নেহের সুরে বল্লে—"আচ্ছা, তুমি যেও রাণী! একবারটী যেও, নইলে তোমার বন্ধু দুঃখিত হবেন। কিন্তু এই বেশে যাবে? দুদিন এগিয়ে বল্লে, তোমার চুড়ী ক'গাছি আর হার ছড়াটা একবার চেয়ে এনে দিতে পারতুম—"

হারাণীর অলঙ্কারের মধ্যে ঐ হার ও চুড়ী, তাও আঁতুড় তোলা এবং স্বামীর অসুখের খরচে বাঁধা পড়েছিল। তা হোক্‌...

হারাণীর এখন সেই বয়স, যে বয়সে মানুষ সংসারটাকে কেবল সবুজ সমতল দেখে, তার কোনোখানে যে কাঁটা খোঁচা উঁচু নীচু থাক্‌তে পারে তা তলিয়ে দেখে না, দেখতেও চায় না, তাই হারাণী অত সাত পাঁচ না ভেবে স্বামীর সাদর সম্মতি পেয়ে পুলকিত স্বরে বলে উঠল—"থাক্‌,—নাই বা হল গয়না? আমি তো আর সেখানে সাজ দেখাতে যাচ্ছি না যাচ্ছি শুধু বন্ধুর কথা রাখতে—"

পাঁচ

"সাজ দেখাতে যাচ্ছি না—" কথাটা স্বামীর কাছে বড় মুখ করে বল্লেও পরদিন স্বামীকে যথাসময়ে কাজে পাঠিয়ে হারাণী যখন নিজেকে ধনী গৃহে প্রবেশের উপযোগী করে নিতে গেল, তখন শুধু ব্যস্তই নয়—একটু চিন্তিত হয়ে পড়ল। তাদের দীন কুটীরে প্রসাধনের উপকরণ নেই বল্লেই হয়। তবু রোজকার দাঁড়াভাঙা চিরুণীর পরিবর্ত্তে বাক্সে সযত্নে তুলে রাখা নূতন চিরুণীতে বেশ পরিপাটী করে চুল বেঁধে, মিশ্‌ মিশে কালো চুলে প্রায় ঢাকা ছোট্ট কপাল খানিতে একটী লাল সিঁদুরের 'টিপ্‌' পরে আয়নাখানা হাতে তুলে হারাণী কেবল ঘুরিয়ে ফিরিয়ে দেখতে লাগল—নাঃ! মন্দ কি দেখাচ্ছে? কিন্তু কাণের সেই ঢল্‌ ঢলে মাক্‌ড়ী দুটো......আঃ!

হারাণীর আজ ভারি আপশোষ হল, এদ্দিন কলকেতায় এসেছে, এই সেকেলে মাকড়ী দুটো ঘুরিয়ে দুটো আধুনিক ফ্যাসানের দুল কি 'টপ্‌' কিন্‌তে পারত নাকি?—

না, সে বুদ্ধি তার যোগায় নি, কি বোকা মেয়ে সে! কিন্তু হারাণী ভুলে গেল, নিজের দিকে চেয়ে দেখবার অবকাশ সে কবেই বা পেয়েছে? তার জীবন বসন্তের মধুর দখিনা বাতাসটুকু যে আস্‌তে না আস্‌তে নিদাঘের উষ্ণশ্বাসে মিলিয়ে গেছে—মুকুলিত যৌবন নিকুঞ্জের আধ ফোটা কুঁড়িগুলি ফুল হয়ে ফোটবার আগেই......

যাক্‌...

আয়না চিরুণী কুলুঙ্গীতে তুলে রেখে হারাণী আর একবার হাত মুখ ধুয়ে এল। এবার কাপড় ছাড়বার পালা।

একে পল্লীর মেয়ে পল্লীবধূ, তাতে গরীব, হারাণীর কাপড় জামার সংখ্যা অতি অল্পই ছিল। বিয়ের চেলী ছাড়া সিল্কের সাড়ী বলতে বউ ভাতে পাওয়া—একখানি মাত্র কমলালেবু রংয়ের পার্শী সাড়ি, হারাণী সেইখানা নাড়াচাড়া করে দেখতে লাগল, সাড়ীটার জৌলস আছে বটে, কিন্তু রংটা যেন বড্ড গাঢ়, গর্‌ গরে, চোখে যেন বিঁধে যায়! তা হোক্‌—হারাণীর তো রঙীন্‌ কাপড় পরবার বয়স যায় নি এখনো—তার বয়সী মেয়েরা যে...কিন্তু এ কাপড়ের সঙ্গের জামা কই? সিল্কের সাড়ীর সঙ্গে সাদা জামা পরা চলবে না তো! তবে...

ট্রাঙ্কের তলা থেকে একটা মাজেণ্টার রংয়ের সিল্কের হাতকাটা লেশ দেওয়া, আধা ব্লাউস্‌ আধা জ্যাকেট গোছের—জামা বার করে হারাণী মনকে আর খুঁৎখুঁতুনির অবকাশ না দিয়েই পরে ফেল্লে। তারপর কাপড়খানা অনেকটা আধুনিক ধরণে পরে, সেফ্‌টীপিনে আঁচল আটকে স্বামীর একটা কাচা রুমাল কোমরের কাপড়ে গুঁজে প্রসাধিত রূপখানি একবার দেখবার আশায় আয়নাটা আলোর

দিকে ধরে দেখতে লাগল, ক্ষুদ্র দর্পণে সব দিক্ দেখা যায় না তবু—হারাণীর স্বল্প রঙীন্ তরুণ চিত্ত একান্ত সংক্ষুব্ধ আহত হয়ে উঠল। মা গো! একি কিম্ভূত কিমাকার মূর্ত্তি হয়েছে তার! ধ্যেৎ! এ মূর্ত্তি দেখ্‌লে সবাই 'সং' বলে হাস্‌বে যে! মনে করবে পাড়াগেঁয়ে ভূত···সহুরে সভ্য ভব্য মেয়ে তারা···

হ্যাঁ, এই কাপড়জামার ওপর যদি দুচারখানা দামী গহনা হ'ত কিম্বা রূপের 'জেল্লা' একটু থাকত—ভগবান তাও দেন নি তো!

একটা ক্ষুব্ধ নিশ্বাস ফেলে হারাণী সেই সিল্কের কাপড় জামা তখুনি খুলে ফেল্লে। তার মনে হ'ল সখীর নিমন্ত্রণ স্বীকার করে সে ভাল কাজ করে নি। কিন্তু এখন আর অনুশোচনার সময় নেই, গাড়ী এল বলে।

হারাণী এবার একখানা কুচিয়ে রাখা চুড়ীপাড় দেশী সাড়ী আর ফেরিওয়ালার কাছ থেকে সম্প্রতি কেনা গোলাপী ছিটের একটা সাদাসিদে ব্লাউস বার করে সোজা-সুজিভাবে তাড়াতাড়ি পরে নিলে।

হ্যাঁ, এ তবু যেন একটু ভদ্রগোছ পোষাক হয়েছে! এ পোষাকে সুশ্রী না দেখালেও হারাণীকে নেহাত বিশ্রী দেখাচ্ছে না বোধ হয়। কিন্তু বুক কাটা জামা—গলাটা যেন বড় 'ন্যাড়া ন্যাড়া' লাগছে...একছড়া সরু হার যদি...

মরুকগে! খালি নেই—নেই—নেই!—সকলের সব জিনিস থাকে কি? বন্ধুর সাধের নিমন্ত্রণ রক্ষা করতে এই সাজই যথেষ্ট।

ছয়

হারাণীর সে ভুল ভেঙ্গে গেল অচিরে। যখন বড় লোকের বাড়ীর ঝি, গিন্নিমার প্রধান ও প্রিয় সেবিকা শ্রীমতী কুসুম সুন্দরী ওরফে কুসী,—ভারিক্কি চেহারা, দুধের মত সাদা ধপ্‌ ধপে গরদের থান পরে, মাংসল হাত দুখানায় দুগাছা মোটা মোটা সোণার তাগা, গলায় একছড়া ভারি চক্ চকে বিছে হার ঝুলিয়ে,—গাল ভরা পান মুখভরা হাসি নিয়ে, কাশ্মীর সুরভির সুগন্ধে ভুর্ ভুর্ করতে করতে অভ্যর্থনা করতে এলো, তখন বেচারী হারাণী যেন হক্ চকিয়ে গেল।

আধ ঘোমটার ভিতর থেকে সে হতভম্বের মত চেয়ে রইল—এটি ঝি? ঝিয়ের এত···...

তার গায়ে তো সোণার মধ্যে—সেই মাকড়ী আর পাতলা সোণার পাত মোড়া ম্যাড় ম্যাড়ে শাঁখা দুগাছি!

হারাণীর সমস্যা আরও জটিল হয়ে উঠল, যখন সেই ঝিটা তাকে নিমন্ত্রিতা মহিলাদের জন্য নির্দ্দিষ্ট ঘরের একটা পর্দ্দা ফেলা দরজার সামনে পৌঁছে দিয়ে কার্য্যান্তরে চলে গেল।

সুসজ্জিত প্রশস্ত কক্ষ।

ঘর জোড়া পুরু নরম গালিচায় বসে অনেকগুলি মহিলা প্রবীণা, নবীনা সবই আছেন। তবে নবীনার সংখ্যাই অধিক।

তাদের কেশ বেশের পরিপাট্য, মণিমুক্তা খচিত উজ্জল স্বর্ণাভরণের তীব্র দীপ্তি যেন চোখ ঝল্‌সে দিচ্ছিল।

যাদের রূপ নেই বেশ ভূষার বাহুল্যতা তাদের আরো বেশী, রূপের অভাব তারা যেন প্রসাধনে পূর্ণ করতে চায়।

মাথার উপর একখানা নয় দু দুখানা 'ফ্যান্' হস্‌হস্ করে অশ্রান্ত ভাবে ঘুরে ঘুরে তরুণীদের বিচিত্র সাড়ীর রঙ্গীন্ আঁচল চঞ্চল উদ্দাম করে তুলছিল।

সমস্তই হারাণীর অ-দৃষ্ট পূর্ব্ব।

এই ইন্দ্রপুরীর কল্পনাও বোধ হয় সে কোনদিন মনে আনতে পারে নি। পর্দ্দা সরিয়ে ঘরে ঢুকে হারাণী দরজার কাছটীতেই দাঁড়িয়ে রইল নিতান্ত জড়সড় হ'য়ে।

নিমন্ত্রিতারা তখন পরস্পর কথাবার্ত্তা—ও গল্পের মধ্যে নিমগ্ন, কার জামাতা কেমন রোজগার করে—কার বউয়ের বাপের বাড়ী হ'তে বারোমাসে তের পার্ব্বণের তত্ত্ব আসে, কার স্বামী কাকে মাসে একখানা করে গহনা গড়িয়ে দেয়—ইত্যাদি—

বাড়ীর মেয়েরাও যে যার কাজে ব্যস্ত। করুণায় যা এবং ননদেরা বহুদিন অ-দর্শিতা সঙ্গিনীদের সঙ্গে হাস্য পরিহাসে একান্ত মস্‌গুল!

বাড়ীর গিন্নি করুণার শাশুড়ী ঠাক্‌রুণ—বধূর সাধ ভক্ষণের জন্য 'যেচ্' পোয়াতী নির্ব্বাচনে ব্যস্ত ছিলেন। তাতো আবার হারানী সকলেরই অচেনা। কাজেই তার সে ধারে উপস্থিতি কেউ লক্ষ্য করলে না।

"ওমা! মাগো!—সোকার জিজ্ঞাসা করছে সে এখন ফিরে যাবে না কি..."বল্‌তে বল্‌তে একটী সাত আট

বছরের প্রজাপতির মত বিচিত্র রঙীন্ সাজে সজ্জিতা একটী বালিকা হুস্ করে পর্দ্দা ঠেলে প্রায় ঘাড়ে পড়ে—হিল্‌দেওয়া চকচকে জুতার তলায় হারাণীর একখানা পা মাড়িয়ে দিয়ে গট্‌গট্ করে তার মায়ের কাছে ছুটে গেল.

যন্ত্রণায় অস্ফুট স্বরে 'ইঃ। বলে দাঁতে ঠোঁট চেপে হারাণী ভিতরের দিকে খানিক সরে এলো।

ব্যাকুলদৃষ্টি প্রসারিত করে সে দেখতে লাগ্‌ল—এই অপরিচিতাদের মধ্যে সেই চেনা মুখখানি যদি...হ্যাঁ, ঐ যে ওধারে জানলার দিকে বসে তার বন্ধু করুণা—

সাধের জন্য আনা ধূপছায়া রংয়ের নূতন ঝক্‌মকে দামী বেনারসী—আর একগাদা অলঙ্কারের ভারে ভারাক্রান্ত হয়ে সে যেন অতিষ্ঠ হয়ে বসে আছে। তাকে ঘিরে কয়েকটী তরুণী, হাত মুখ নেড়ে হেসে হেসে কি বলাবলি করছিল। কেউবা তারি মধ্যে করুণার নূতন ও পুরাতন গহনাগুলি খুঁটীয়ে খুঁটীয়ে দেখে সমালোচনা জুড়ে দিয়েছিল।

হারাণীর দিকে দৃষ্টি পড়তেই করুণা একটু খানি মুচ্‌কে হেসে হাতছানি দিয়ে ডাকলে। সঙ্গে সঙ্গে তা'র সঙ্গিনীদের এবং আর ও অনেকগুলি চোখের উৎসুক দৃষ্টি পড়ল সেই অতিমাত্র সঙ্কুচিতা, অতি সাধারণ অপরিচিতা মেয়েটীর উপর।

হারাণী কারুরদিকে না চেয়ে নত মুখে কুণ্ঠিত চরণে একধার দিয়ে পাশ কাটিয়ে বন্ধুর কাছে গেল!

করুণা সাগ্রহে তার হাত ধরে হাসতে হাসতে বল্লে—"বসো ভাই!—এতক্ষণে সময় হল বুঝি!—কর্ত্তা যে ছেড়ে দিলেন।

করুণার ঠিক সামনে যে মেয়েটী বসেছিল, হারাণীর আপদ মস্তক তীক্ষ্নদৃষ্টিতে একবার দেখে, সে করুণায় মুখের কাছে মুখ এনে ফিস্‌ফিস্ করে জিজ্ঞাসা করলে "এ কে ভাই?"

"আমার এক বন্ধু, এই পাশের বাড়ীতে ··„

"সর্ব্বরক্ষে!—আমি মনে করেছিলুম ও বুঝি তোদের—শেষ কথাটা সে অতিসন্তর্পণে করুণার কানে কানে বলে খিল্‌খিল্ করে হেসে উঠল।

করুণা হাসি চাপ্‌তে চাপ্‌তে তাকে ঠেলে দিয়ে বল্লে—"দূর!—তা কেন!—"

হারাণীর মুখখানি বৈশাখের প্রখর রবি তাপে আতপ্ত কচি কিশলয়ের মত নিমেষে ম্লান ম্রিয়মাণ হয়ে গেল। চোখ দুটীর কোণে কোণে জল ভরে এলো।

তার স্মৃতিপটে চকিতে ভেসে উঠল - অতীত দিনের একটী বিস্মৃত প্রায় চিত্র।—সেই অশোকের খেলা ঘর!

হায়! – শৈশবের সেই ধূলার খেলা-ঘর হারাণীকে যে খানটীতে আসন দিতে চেয়েছিল - আজ সত্যিকার সংসারও তাকে আসন দিতে চায় সেইখানে—তার চেয়ে এতটুকু উর্দ্ধে নয়.

এখানেও সে কিশলয় নয়—রাণী নয়—শুধু হারাণী!

* * * *

হারাণীর নেমন্তন্ন বাড়ী থেকে ফিরতে দেরী হবে মনে করে পুলিন রোজকার চেয়ে দেরী করেই এসেছিল, কিন্তু এসে দেখলে ঘর বন্ধ নয় খোলা, হারাণী কাপড় ছেড়ে—পরিত্যক্ত আধ ময়লা কাপড়খানা পরে তক্তপোষের ওপর চুপটী করে শুয়ে আছে।

পুলিন একটু ব্যস্ততার সহিত জিজ্ঞাসা করলে "কই—তুমি যাওনি?"

হারাণী তাড়াতাড়ি উঠে ছাড়া কাপড় জামা একপাশে সরিয়ে রেখে বল্লে "গিয়েছিলুম, কিন্তু হঠাৎ মাথাটা এমন ধরে উঠল যে বসতে পারলুম না, যা ভিড়! আমার তো কোনো কালে অভ্যাস নেই··· "

এইমাথাধরার প্রকৃত তথ্য হারাণীর চোখ মুখের ছল ছল ম্লান ভাব দেখে পুলিনের জানতে দেরী হল না—সে বলতে যাচ্ছিল—আমি এই জন্যই তো বলেছিলুম কিন্তু পত্নীর ব্যথিত অপমানাহত চিত্তে পুনর্ব্বার আঘাত দিতে তার প্রবৃত্তি হল না, তাই পুলিন সমবেদনা ভরে স্নেহকোমল কণ্ঠে শুধু বল্লে "তোমার খাওয়া হয়েছে?"

"না, অতবেশী মাথা ধরলে কি খাওয়া যায়?"

"আচ্ছা তাহলে এবেলা আর রান্নার হাঙ্গামে কাজ নেই তুমি শুয়ে থাক, আমি বাজার থেকে—"

"না, না, বাজারের খাবার খাবে কেন?—তোমার জন্যে সব গোছ করেই তো গিয়েছিলুম এক্ষুণি রান্না হয়ে যাবে।—

বলতে বল্‌তে হারাণী হয়তো তার উপ্‌চে পরা চোখের জল সাম্‌লাতেই স্বামীর সান্নিধ্য এড়িয়ে রান্নাঘরে চলে এলো।

তখন করুণাদের বাড়ী অর্গানের সুরে সুর মিলিয়ে কে একটী মেয়ে চন্‌চনে চড়া গলায় গান করছিল—

"আর কাহারো কাছে যাব না আমি
তোমারি কাছে র'ব হে!
আর কাহারো সাথে ক'ব না কথা—
তোমারি সাথে ক'ব হে!"

মহাভারত—স্বর্গের পথে—

শ্রীবলাই দেবশর্ম্মা

পাত্র :—পঞ্চপাণ্ডব।

স্থান :—ইন্দ্রপ্রস্থের—উপান্ত।

সহদেব।—রক্তসিন্ধু মন্থন করা—ঐ ইন্দ্রপ্রস্থ। এখনো চিত্রের মত দেখা যাইতেছে। শুধুই কি দেখা যাইতেছে! যেন মৌন ভাষায়—আকুল বেদনায় আমাদের আহ্বান করিতেছে। বিদেশগামী পুত্রের প্রতি মাতা যেমন সতৃষ্ণ দৃষ্টিতে তাকাইয়া থাকেন, ইন্দ্রপ্রস্থ ঠিক তেমনই বিহ্বল প্রেক্ষণে আমাদের গমনভঙ্গি লক্ষ্য করিতেছে।

নকুল।—ঠিক লক্ষ্য করিয়াছ—সহদেব। এ মূর্ত্তি তো ইন্দ্রপ্রস্থের কখনো দেখি নাই। জড় নগরীর এমন প্রাণ আছে? চলিতে বাধা পাইতেছি। মনে হইতেছে চলিব না—যাইব না, এইখানে মিশিয়া থাকি। এই ধূলির সঙ্গে মিশিয়া যাই! কোথায় যাইব স্বর্গে!

দ্রৌপদী একটু উপবেশন করিলে

সকলেই একটু বসিলেন।

সহদেব যুধিষ্ঠিরকে বলিলেন। দাদা! এই স্বর্গ যাত্রার উদ্দেশ্য কি? সারা জীবন কূল পাইবার জন্য প্রাণান্ত করিয়া, কূল পাইয়া তাহা পরিত্যাগ করিবার কি তাৎপর্য্য।

যুধিষ্ঠির—নিয়তি সহদেব? মানব নিয়তির দাস। নিয়তির পরিচালনায় কুরুক্ষেত্র সংঘটন, নিয়তির নির্দ্দেশেই এই মহাযাত্রা।

ভীম—কিছুই বুঝি নাই; আজও বুঝিতে পারিলাম না। কৌরব সভায় বিবসনা পাঞ্চালীকে দেখিয়া যখন পঞ্চ পাণ্ডব জড় পুত্তলিকার মত বসিয়াছিলাম, যখন দ্বৈপায়ণ হ্রদ হইতে অসহায়, প্রাণভয়ভীত দুর্য্যোধনকে যুদ্ধার্থে আকর্ষণ করিয়া আনা হইল, যখন শ্মশান সমতুল্য কুরু-বংশের সম্রাটত্ব গ্রহণ করা হইল, আবার যখন ধর্ম্মরাজ্য স্থাপন হইবার পর এই মহাযাত্রার সূচনা হইল, এই সমস্ত ঘটনার আদি কি, অন্ত কি কিছুই বুঝি নাই। যন্ত্র আমি যন্ত্রের মতই চলিয়াছি।

পাঞ্চালী অধোমুখে বসিয়া ছিলেন। একবার মধ্যম পাণ্ডবের মুখের দিকে চাহিলেন; তারপর অর্জ্জুনের দিকে লক্ষ্য করিয়া বলিতে লাগিলেন—আমি বুঝিয়াছি—আমি বুঝিয়াছিলাম। যে দিন পাঞ্চালরাজ সভায় লক্ষ্য ভেদ করিয়া তোমরা জয়যুক্ত হইলে, যে দিন জতুগৃহ দাহ হইল, যে দিন পাশায় হারিয়া আমায় পণ রাখা হইল, যে দিন অজ্ঞাতবাস স্বীকৃত হইল, দ্রুপদ সভায় যে দিন আমার অপমান হইল, তারপর প্রত্যেক ঘটনায় বুঝিয়াছি উজ্জ্বল ভাবে প্রত্যক্ষ করিয়াছি রাজসূয় যজ্ঞে, জরাসন্ধ বধে, শিশুপালের শিরশ্ছেদনে, অভিমন্যু বধে বুঝিয়াছি, বুঝিয়াছিলাম কি আমাদের জীবনব্রত।

যুধিষ্ঠির—কি বুঝিয়াছিলে রাজ্ঞি! আর আজ কি বুঝিতেছনা?

দ্রৌপদী—বুঝি নাই মহারাজ! প্রত্যক্ষ করিয়াছি। জননীর পুত্রমুখ দর্শনের মত স্পষ্ট লক্ষ্য করিয়াছি, প্রাতঃ সূর্য্যের মত স্বপ্রকাশ—দীপ্যমান বিভাসিত নিখিল বিশ্বে, নিখিল গগনে, আলোকস্রাবী পঞ্চ পাণ্ডবের শক্তি সৃষ্ট মহাভারত! সব সহিয়াছি; অভিমন্যুর মরণে নয়নধারা ফেলি নাই; রাজসভায় পাপাত্মা দুঃশাসনের কেশাকর্ষণে কাঁদি নাই; উত্তেজিতা হই নাই—ঐ মহা আশায়।

সহদেব—কি তোমার স্বর্ণস্বপ্ন পাঞ্চালী!

দ্রৌপদী—সব্যসাচীকে শুধাও আর্য্যপুত্র।

সহদেব—দাদা!

অর্জ্জুন—ধর্ম্ম রাজ্য ভাই। পাণ্ডবদের আর কি জীবন-ব্রত থাকিতে পারে?

যুধিষ্ঠির—অর্জ্জুন। কিন্তু আমিও বুঝি নাই ভাই! কেবল সাক্ষাৎ নরনারায়ণ শ্রীকৃষ্ণের আদেশ পালন করিয়াছি। হিংসার পরিবর্ত্তে হিংসায় কি করিয়া ধর্ম্ম হইতে পারে, কনিষ্ঠকে হত্যা করিয়া, গুরুহত্যা করিয়া, রাজ্য হইতে পারে, ধর্ম্মরাজ্য কি করিয়া হইতে পারে তাহা কখনও বুঝি নাই। আচার্য্য দ্রোণকে পরাভূত

করিতে "অশ্বত্থামা হত ইতি গজঃ" বলিয়াছি, মূর্ত্তিমান নিয়তির নির্দ্দেশে নারায়ণের অনুশাসনে। ধর্ম্মরাজ্য স্থাপন সে দিনও বুঝি নাই, আজিও বুঝি নাই।

দ্রৌপদী—কেন, তবে এই মহাসমর ঘটিল মহারাজ! আমার ধর্ম্ম, তোমার ধর্ম্ম, গীতার ধর্ম্ম কোথায় কাহার বিরোধ ছিল মহারাজ?

যুধিষ্ঠির—হয়তো ছিল, কিম্বা ছিল না। গীতার ধর্ম্ম হয়তো বুঝি নাই, হয়তো আমি বুঝিবার অধিকারী নই। তবুও পাঞ্চালী আমার ধর্ম্ম আছে; অপরিবর্ত্তনীয় অক্ষয়, ধ্রুব সে ধর্ম্ম। সে ধর্ম্মের দাস—ক্রীতদাস আমি; সে ধর্ম্মের বিনিময়ে আমার কাছে উন্নততর, কিছু শুভতর কিছু, পবিত্রতর কিছু নাই। আমার সে ধর্ম্ম সত্য, অছিদ্র, অখণ্ড, পরিপূর্ণ, অপরিবর্ত্তনীয়। তাহা যুক্তিতর্ক সমস্তের সম্পর্কশূন্য।

ভীম—কেন তবে এই যুদ্ধে সম্মতি দিয়াছিলেন? আপনার মুখ চাহিয়া কি না সহিয়াছি? আরও না হয় সহিতাম। কেন নিরর্থক একটা হত্যাকাণ্ড ঘটিতে দিলেন?

যুধিষ্ঠির—কেন? এ কথা আজিও বুঝ নাই ভীম! সত্য আমার ধর্ম্ম বলিয়া যুধিষ্ঠিরকে কখনো উদ্ধত দুর্ব্বিনীত স্পর্দ্ধিত দেখিয়াছ? সাক্ষাৎ ধর্ম্ম, মূর্ত্তিমান সত্য যেখানে আমার শিয়রে, সেখানে যুধিষ্ঠিরের কি স্বাতন্ত্র্য থাকিতে পারে ভাই। আমি যুদ্ধ করিয়াছি শ্রীকৃষ্ণের ইঙ্গিতে প্রিয়তম!

পার্থ—দাদা! ধর্ম্ম রাজ্য নিরর্থক? একটা কি কল্পনা? মহাদেবতা নারায়ণের উদ্দেশ্যহীন, অর্থ হীন, কার্য্যকারণ পারম্পর্য্য বিহীন শিশুর শৈশব ক্রীড়ার মত বাল্য চাপল্য।

ভীম—তাহা নহে পার্থ! কখনই হইতে পারে না? কিন্তু ধর্ম্মরাজ্য প্রতিষ্ঠিত হইবার পর এই স্বর্গ যাত্রা এতো পরাজয়। ধর্ম্মরাজ্য স্থাপনার ফল কি?

সহদেব—বুঝিয়াছিলাম যখন জরাসন্ধ শিশুপাল প্রভৃতি ক্ষত্রিয়বৃন্দ ভারতের বক্ষের উপর আসুরিক দম্ভে রাজ্য করিতেছিল, তখন ভারত অধর্ম্মের অনলে ভস্মীভূত হইয়া যাইতেছিল, সেই মৃত্যু-অগ্নি হইতে উদ্ধার করাই ধর্ম্ম রাজ্য স্থাপনের উদ্দেশ্য। কিন্তু ধর্ম্মরাজ্য ভারতকে কি দান করিল, তাহা যে বুদ্ধির অগম্য দেখিতেছি।

পাঞ্চালী। রাজপুত্র! আমার মানসনেত্রে ছিল— অত্যাচারী, স্বেচ্ছাচারী রাজন্যবৃন্দকে শক্তির শৃঙ্খলে আবদ্ধ করিয়া পঞ্চভ্রাতা ভারত-সিংহাসনে সমাসীন। গীতার ধর্ম্ম মূর্ত্তিমান; প্রেমের ধর্ম্ম ভারত ব্যাপিত, পাণ্ডব শক্তি দীপ্যমান, ভারত জাতি উন্নত, জীবন্ত, বলবন্ত, স্নিগ্ধ শান্ত তৃপ্ত দীপ্ত।

নকুল—তাহার পরিবর্ত্তে কি দেখিতেছ মহারাণি।

ভীম—আমি তাহার স্থানে দেখিতেছি এক মহাশ্মশান— এক বিরাট নারীরাজ্য, ক্ষাত্র বীর্য্যহীন পতিত ভারত।

সহদেব—তাহা হইলে নারায়ণের ধর্ম্মরাজ্য স্থাপনের চেষ্টা ব্যর্থ। ভারতকে উন্নত করিতে গিয়া পতিত করা হইল।

পার্থ—সহদেব! শ্রীকৃষ্ণের ধর্ম্ম মিথ্যা? গীতার বাণী বিস্মৃত হইলে?

যুধিষ্ঠির। "কর্ম্মণ্যেবাধিকারস্তে মা ফলেষু কদাচন।" চল ভাই! কর্ম্ম করিয়াছি এখন মহা প্রস্থান করি।

পাঞ্চালী—কিন্তু ভারত! ভারতের ধর্ম্ম—ভারতের জাতি—মহাভারত!

পার্থ—পাঞ্চালী! আমরা নির্ম্মোক মাত্র। যন্ত্র মাত্র। কর্ম্মে আমাদের অধিকার! আর কি করিবার সামর্থ্য আছে আমাদের? কিছুই যে নাই। আর তাহা বুঝিয়াছি সেই দিন, যে দিন বন-প্রান্তে নারায়ণের দেহত্যাগান্তে যাদব নারীকে রক্ষা করিতে গিয়া গাণ্ডীব উত্তোলন করিতে অসমর্থ হইয়াছিলাম। যে গাণ্ডীব আমার ক্রীড়নক, সেই গাণ্ডীব আমি তুলিতে পারিলাম না!

ব্যাসদেব গীতা গান করিতে করিতে সেই স্থানে উপস্থিত হইলেন।

যুধিষ্ঠির—মহর্ষি! আজ স্বর্গযাত্রার পথে আমরা দ্বিধা-সঙ্কুল চিত্ত। আপনি চিরদিন আমাদের গুরু। পথভ্রষ্টা! আজ বলিয়া দিন কেন আমাদের এই নিষ্ফল নৈরাশ্য!

ব্যাস—কিসের নিরাশা মহারাজ। দীর্ঘকাল ধর্ম্ম-শক্তিতে বলীয়ান হইয়া পঞ্চভ্রাতা হিমাচলের অপেক্ষা অচল অটলভাবে রাজ্য পালন করিয়াছিলে; অবশেষে জীবন-কর্ত্তব্য শেষ করিয়া মহাপ্রস্থান—এতো উল্লাস! এই তো পরিপূর্ণতা! নিরাশা কোথা হইতে আসিল?

যুধিষ্ঠির—ঠিক নৈরাশ্য—নহে প্রভু! সন্দেহ! মহাভারত কই? সারাজীবন সহস্র দুঃখ বেদনা সহিয়া যাহার জন্য সাধনা করিলাম, তাহা কই?—

অর্জ্জুন—তাত! আমরা শুধু কি সাম্রাজ্যের জন্যই কুরুক্ষেত্র মহাসমর করিয়াছি! শ্রীকৃষ্ণের শিক্ষা আপনার উপদেশ কি পঞ্চভ্রাতাকে একটা উন্নততর আদর্শ দেয় নাই?

ব্যাস—কুরুক্ষেত্রের উদ্দেশ্য—মহাভারত!

পাঞ্চালী—কই সে মহাভারত ঋষিবর! ভারতের ক্ষত্রিয় নিঃক্ষত্রিয়। তাহার স্থানে শুদ্ধশক্তি, পবিত্র তেজ নূতন ক্ষত্রিয় জাতি উঠিল না. সারা ভারতে একটা মৃত্যুময়ী অবসাদ কালিমা! ইহাই কি মহাভারত!

ভীম—পঞ্চপাণ্ডব, শ্রীকৃষ্ণ, ব্যাসদেব কি এই শ্মশান ভারতই চাহিয়াছিলেন। এই কি মহাভারত!!

সহদেব—ভারতের ধর্ম্মরাজ্য মহাভারত সম্ভব শ্মশান-ভারত! যেখানে ভারতের ক্ষাত্রতেজকে নির্ব্বাণ করিয়াই মহাভারত প্রতিষ্ঠার চেষ্টা, সেখানে আর কি হইতে পারে তাহা কল্পনাতীত!

নকুল—ভারতের তরুণ প্রাণ যেখানে বলি প্রদত্ত হইয়াছে, অভিমন্যুকে উৎসর্গ করিয়া যাহার প্রতিষ্ঠা চেষ্টা, তাহা আর কি হইতে পারে?

ব্যাসদেব—গীতা-বাণী ভুলিয়াছ মাদ্রীপুত্র! কিসের জন্য কুরুক্ষেত্র সমর-যজ্ঞ!

নকুল—কিসের জন্য ঋষিবর!

ব্যাস - পরিত্রাণায় সাধুনাং বিনাশায়াচ দুষ্কৃতাম! ধর্ম্ম সংস্থাপনার্থায়..."

ভীম—বুঝিলাম ঋষি! অত্যাচারী রাজন্যবর্গের হাত হইতে সাধুগণ পরিত্রাণ পাইয়াছেন। বুঝিলাম উদ্ধত অত্যাচারী, স্বেচ্ছাচারী, শক্তিমদমত্ত নৃপতিকুলকে উচ্ছিন্ন করিয়া দুষ্কৃত দমন হইয়াছে! কিন্তু ধর্ম্ম স্থাপন?

ব্যাস—ধর্ম্ম যে চিরন্তন মধ্যম পাণ্ডব!

সহদেব—অতএব—

ব্যাস—কুরুক্ষেত্রের অব্যবহিত পূর্ব্বের ভারত পলিত-গলিত মৃত দেহ! তাহা ছিন্ন বিচ্ছিন্ন বিলীয়মান! রাজা, রাজশক্তি, ক্ষাত্রবীর্য্য, ব্রাহ্মণ্য শক্তি, শাস্ত্র, সাহিত্য, সমাজ, সকলের মধ্যে বিনাশের বিষ প্রবেশ করিয়াছিল। এ ভারত এই উপনিষদের ভারত! নিমি, হরিশ্চন্দ্রের ভারত, জনক সনক প্রভৃতিরভারত অচিরেই বিনষ্ট হইত! চির-তরে বিনষ্ট হইত। কুরুক্ষেত্রে তাহার প্রাণ প্রতিষ্ঠা হইল।

যুধি—এই হত্যায়, এই মৃত্যু-যজ্ঞে প্রাণ প্রতিষ্ঠা হইল! সে কেমন কথা মহর্ষি!

ব্যাস—ঠিক তাই। ভারত জীবনের পলিত-গলিত বিষ-দুষ্ট অঙ্গ তাহার ক্ষাত্র তেজ দুর্য্যোধন কর্ণ শিশুপাল জরাসন্ধ! উহা রহিলে সমগ্র দেহ গলিয়া খসিয়া পড়িত! ভারতের ধর্ম্ম প্রাণহীন হইয়াছিল—উহাতে ছিল কেবল কামনার তাড়না। সনাতন ধর্ম্ম মরিতে পড়িয়াছিল! পাশবতা, ভোগতৃষ্ণা, প্রচণ্ড জিঘাংসু অতৃপ্ত লালসাবহ্নি ধর্ম্মের স্থান অধিকার করিয়াছিল! ভগবান্ শ্রীকৃষ্ণ যদি অবতীর্ণ না হইতেন তবে নিশ্চ নাশের একটা মহান্ সৃষ্টি, একটা সুপ্রাচীন বহুসাধনালব্ধ সভ্যতা চিরকালের মত ধরা পৃষ্ঠ হইতে বিলুপ্ত হইত! ধর্ম্মরাজ! ধর্ম্মতত্ত্ব বড় গূঢ় বড় জটিল। নারায়ণের লীলা নির্ণয় মানব বুদ্ধির অতীত। তাই কৃপা সিন্ধু কৃপা করিয়া ভ্রান্ত মানবকে সস্নেহে উপদেশ দিয়াছেন।—

"কর্ম্মণ্যে বাধিকারস্তে
মা ফলেষু কদাচন!"

ক্ষুদ্র চেতা শান্ত পরিমিত মানুষ আমরা বেশী কিছু করিতে যাইলেই অকর্ম্ম করিয়া বসি!

পার্থ—ঋষিবর! গীতার বাণী কর্ণে ধ্বনিয়া আছে, প্রাণের সহিত মিশিয়া যায় নাই! একবার—একবারমাত্র নিমেষের জন্য সেই মহাদেবতার কৃপা করুণায় বিশ্বরূপ দর্শনের সময় গীতা তত্ত্ব অনুভূত হইয়াছিল; তাহার পর আর প্রাণের মাঝে গীতা তত্ত্ব জাগ্রত জীবন্ত সত্য হইয়া মূর্ত্ত হইয়া উঠিতেছে না ঋষিবর।

ব্যাস—পার্থ! সত্যই তাই! ঐ মহাতত্ত্ব নারায়ণের কৃপা ব্যতীত ধারণা করিবার সাধ্য ক্ষুদ্র মানব আমাদের কোথায় বৎস!

পার্থ—ঋষিবর। খাণ্ডব দাহনের সময় ধারণা হইয়া-ছিল পাণ্ডবদের জীবনব্রত কি? বুঝিয়াছিলাম, এই খাণ্ডব সারা ভারত ব্যাপিয়া, আর তাহাই ভস্মীভূত করিয়া আনন্দ মুখরিত, ঐশ্বর্য্য শান্তি পরিপূর্ণ এক মহাসাম্রাজ্য স্থাপন করিতে হইবে। আর তাহাই মহাভারত! কিন্তু একি

হইল? নারায়ণ ব্যাধ শরে দেহ রক্ষা করিলেন; পার্থ আমি, গাণ্ডিব তুলিতে অসমর্থ হইলাম! শক্তির মূর্ত্ত বিভূতি পঞ্চ পাণ্ডব প্রব্রজ্যা অবলম্বন করিলেন। ভারতে ক্ষাত্র শক্তি নির্ব্বাপিত হইল। সমস্তই যেন আজ কুয়াসাচ্ছন্ন!

ব্যাসদেব—অর্জ্জুন! দিব্যদৃষ্টি লাভ করিয়া তুমি একি কথা বলিতেছ বৎস! মহা দেবতা নারায়ণের লীলা আমরা সসীম শক্তি মানুষ আমাদের জ্ঞানের অগম্য। কর্ম্ম করাই আমাদের কর্ত্তব্য; আর কিছু দেখিতে যাওয়া অসঙ্গত।

ভারত মহাভারতই হইল! আজ তুমি দেখিতেছ, আমি দেখিতেছি ক্ষাত্র শক্তি নির্ব্বাপিত হইয়াছে। তাই বলিয়া নারায়ণের লীলা কি ব্যর্থ হইয়াছে?

দ্রৌপদী—কে তাহা বলিবে মহর্ষি! আমরা বিক্ষুব্ধ চিত্ত, বিভ্রান্ত বুদ্ধি, কিছুই যে বুঝি না ঋষিবর! কোথায় সেই মহিমান্বিত মহাভারত!

ব্যাস - দেবি! নারায়ণের লীলা—মানব বুদ্ধির অগম্য। মহাভারতই রচিত হইয়াছে। কুরুক্ষেত্রের রক্তাম্বুধি মন্থন করিয়া ভারতের মহাভারত মূর্ত্তিই উদ্ভূত হইয়াছে।

ভারতের ধর্ম্ম, যাহা শাশ্বত সনাতন, অমৃতময়, যাহা মানুষকে বাঁচায়, ধর্ম্মকে রক্ষা করে, জাতিকে আনন্দময় করে, যাহা সৃষ্টির অমৃত, তাহা চিরকালের জন্য বিলুপ্ত হইয়া যাইত। কুরুক্ষেত্রের পূর্ব্বে ভারতে, ভারতের প্রাণশক্তিতে যে কি ভীষণ বিনাশ-বিষ আক্রমণ করিয়াছিল, ধর্ম্মে সভ্যতায় সমাজজীবনে রাজশক্তিতে একটা জাতি-জীবনের অন্তরে বাহিরে কি যে সর্ব্বনাশী—কি যে কালান্তক আসুরিক ভাব আচ্ছন্ন করিয়াছিল, তাহা ভাবিতেও শরীর শিহরিয়া উঠে। কুরু সভায় রাজ্ঞীর অপমানে, কংশের অত্যাচারে, দুর্য্যোধনের মদমত্তায় তাহা বেশ ফুটিয়া উঠিয়াছিল। আবার ব্রহ্মণ্যশক্তিও তখন কলুষিত। ব্রাহ্মণ জাতির শীর্ষদেশ। ক্ষত্রিয়ের পরিচালক—সেই ব্রাহ্মণ মনীষাও তখন বিকৃত—ব্রাহ্মণ যে কি পর্য্যন্ত ধর্ম্মহীন পতিত হইয়াছিল—তাহা বুঝাইবার উপায় নাই। দ্রোণ কৃপাচার্য্যে তাহা কিয়ৎ পরিমাণে পরিস্ফুট। উপনিষদের ধর্ম্ম—ভাগবর্ত ধর্ম্ম কোথাও ছিল না। ভারত অচিরেই বিধ্বস্ত হইয়া যাইত।

ভীম। ভারতের রহিল কি?

ব্যাস। বৃকোদর! কাল যে অপরিমেয়! ক্ষুদ্র দৃষ্টি কিছুই লক্ষ্য হইতেছে না। ভারতকে অনন্তকালের জন্য অমৃতমন্ত্রে দীক্ষা দেওয়া হইল। কুরুক্ষেত্রে ভারতের রোগমুক্তি মাত্র, ভারতের বাঁচিবার সূত্রপাত। যে ভারত অদূরবর্ত্তী কালের ভিতর ধ্বংস হইয়া যাইত, তাহাকে চিরকালের জন্য জীবিত রাখিবার ঔষধ দান করা হইল!

পার্থ। কি উপায়ে মহর্ষি।

ব্যাস—গীতামৃতে! মানবের ধর্ম্মই শক্তি, ধর্ম্মই প্রাণ, ধর্ম্মই সর্ব্বস্ব। এই ধর্ম্ম আব্যাকৃত রহিল—মানুষ বাঁচে, জাতি অমর হয়। গীতা অনন্ত অমৃত-প্রস্রবন। ভারত-চিত্তে যে আর্য্যোচিত ক্লৈব্য মোহ আসিবে, গীতার স্পর্শে তাহার অপনোদন হইবে। অন্য ধর্ম্ম বিকৃত হয়, গীতার ধর্ম্ম চির শুদ্ধ, চির নির্ম্মল, চিরন্তন কালের জন্য ওজস্বী, প্রাণপ্রদ! অনন্তকাল ধরিয়া "ক্লৈব্য মাস্ম গমঃ" বলিয়া ঐ গীতা-গাথা ভারতকে উদ্বুদ্ধ করিবে। যখনই ভারত-চিত্তে অবসাদ, ক্লৈব্য, মোহ, আর্য্যজনোচিত গ্লানির উদয় হইবে তখনই নারায়ণের বাণীমূর্ত্তি বজ্র নির্ঘোষে নিনাদিত হইবে—

"ক্লৈব্য মাস্ম গমঃ।"

ভারতে যখনই তামস-যুগের আবির্ভাব হইবে তখনই তমো মগ্ন ভারতজাতির কর্ণে বাজিয়া উঠিবে—ক্লৈব্য মাস্ম গমঃ।

মহাভারত কেবল আজিকার জন্য নয়—অনন্তকালের জন্য। এই কুরুক্ষেত্র সমরে ইহার প্রাণপ্রতিষ্ঠা হইল বৎস। ভবিষ্যৎ ভারতে ইহার পূর্ণাহুতি। নারায়ণের ধর্ম্ম রাজ্য কল্পিত নহে; তুমি আমি দেখিতেছি না; কিন্তু একদিন বিস্ময়মুগ্ধ বিশ্ব, আকাশের গ্রহ নক্ষত্র তারা, উদয়াচলের সূর্য্য দেবতা সকলেই দেখিবে মহাভারত! দেখিবে এক মহা সাম্রাজ্য, দেখিবে এক মহাজাতি তাহাদের জীবন যজ্ঞ, কর্ম্মফলহীন মহা যজ্ঞ! তাহা দেবযজ্ঞ ঋষিযজ্ঞ, পিতৃযজ্ঞ অপেক্ষাও মহীয়ান! দেখিবে তাহাদের মহামন—সমত্বযুক্ত সর্ব্বত্র, ব্রাহ্মণ কুক্কুর হইতে তৃণ লতা পর্য্যন্ত সকলের প্রতি সমভাব। আর দেখিবে তাহাদের ভাগবতী বীর্য্যদ্যুতি—যাহা জগতে ধর্ম্ম সৃষ্টি করিবে। আজ নয়, কাল নয়, কত পরিবর্ত্তন, কত বিপ্লব কত অবস্থার স্তর পারম্পর্য্য অতিক্রম করিয়া নারায়ণের এই মহা বাসনা সম্পূর্ণ হইবে। অনন্তের দিক দিয়া দেখ। বিশ্বরূপ দর্শন কর! অহঙ্কার পরিহার করিয়া বল "শিষ্যস্তেহং। শাধিমাং ত্বাম্ প্রপন্নম।"

মহাভারত ধর্ম্ম রাজ্য প্রতিষ্ঠা যে বাসুদেবের ইচ্ছা। ভারত—মহাভারতই হইবে!

আধপয়সার টিকিট।

(গল্প)

শ্রীমাণিক ভট্টাচার্য্য বি-এ

বাঙ্গালীরাম জাতিতে কাহার। বাড়ী চম্পারণ জেলার একটি নগণ্য পল্লীগ্রামে—যাহার নাম বলিলে সেখানকার অধিবাসী ভিন্ন বড় একটা কেহ বুঝিবে না।

বিহারে কাহার দিগকেই কুলিন শূদ্র বলিতে হইবে—কারণ সমগ্র বিহারাঞ্চলে তাহারা ব্যতীত অবস্থাপন্ন উচ্চ জাতীয় হিন্দুর আর অন্য গতি ছিল না এবং এখনও প্রায় নাই, তবে তাহারাও আজকাল সভাসমিতি আরম্ভ করিয়াছে, বাড়ীর মেয়েরা 'দাই'য়ের অর্থাৎ ঝিয়ের কাজ করে তাহাদেরও সন্ধ্যার পরে আর আপন আপন বাড়ীর বাহির হইবার 'হুকুম' নাই। যে যেখানেই কাজ করুক না সন্ধ্যার পূর্ব্বে বাড়ী ফিরিতেই হইবে।

ইহাদের মধ্যে কেহ কেহ—পান ইত্যাদি ছোটখাটো জিনিষের দোকান সুরু করিয়াছে এবং বৈশ্যত্বের দাবীতে তাহারাও একদিন "তেজঃহীন ব্রহ্মণ্যের নির্বিষ খোলস" পরিধান করিবে এইরূপ আভাসও দিতেছে। কাজেই ইহারাও আর বেশীদিন শূদ্র থাকিবে না।

যে সময়ে বিহার ও বাংলা একত্র ছিল ও বিহারে বাঙ্গালীদেরই সবচেয়ে বেশী প্রতিপত্তি সেই সময়ে বাঙ্গালীরাম চাকুরীর চেষ্টায় একেবারে সদরে অর্থাৎ মতিহারী আসিয়া উপস্থিত হয়। সেখানে মাসিক তিনটাকা বেতন ও 'খোরাক পোষাকে' এক বাঙ্গালী ব্রাহ্মণ পরিবারে চাকুরী গ্রহণ করে: তিনি মতিহারীর সেই সময়কার সর্ব্বশ্রেষ্ঠ উকিল ছিলেন। তাঁহার নাম হীরেন্দ্র নাথ গঙ্গোপাধ্যায়। স্বভাবটি বড় মধুর। মনে কিঁছুমাত্র ময়লা নাই। সকল জিনিষের মধ্য হইতে মন্দটি ছাড়িয়া ভালোটি লওয়া অভ্যাস। সংসার পুত্র, কন্যা, ভাগিনেয়, ভাগিনেয়ী, ভ্রাতুষ্পুত্রী ইত্যাদিতে ভরা। সকলের দিকেই কর্ত্তা এবং গৃহিণীর এমন সমদৃষ্টি যে একদিনের জন্যও কাহারও মনে কোন ক্ষোভ হয় না।

বাঙ্গালীরাম বেশ চতুর। প্রথম হইতেই সে প্রভু ও প্রভু পত্নীর মন যোগাইয়া চলিতে লাগিল। কোলের ছেলেটিকে যত্ন করিয়া তাহাকে একান্ত অনুগত করিয়া ফেলিল। ছেলের কান্না আর বড় একটা শুনিতে পাওয়া না। কাঁদিবামাত্র বাঙ্গালীরাম হাতের কাজ ফেলিয়া—ছেলেকে থামায়। প্রভুপত্নী অত্যন্ত সন্তুষ্ট হইলেন। ঘর দুয়ারা বাঙ্গালীরাম আপন মনেই পরিষ্কার পরিচ্ছন্ন করিয়া যায়। বাবুর বসিবার ঘরের টেবিল চেয়ার সযত্নে ঝাড়িয়া পুঁছিয়া রাখে। প্রভুও মনে মনে ভৃত্যের অনুরাগী হইয়া পড়িলেন। এইরূপে অল্পদিনের মধ্যে বাঙ্গালীরাম প্রভু ও প্রভুপত্নী উভয়েরই প্রিয়পাত্র হইয়া উঠিল।

বাঙ্গালীরামের দুপয়সা বেশ উপায়ও হইতে লাগিল। মক্কেলদের দুই এক বাল্‌তি জল দিয়া এক আধটা ফরমাস খাটিয়া তাহাদের নিকট বক্‌শিস্ মিলিত। বাজার হইতে বাছিয়া বাছিয়া ভাল জিনিষ আনার জন্য অন্যান্য ভৃত্য থাকিতেও প্রভুপত্নী বাঙ্গালীরামকে দিয়াই বাজার করাইতেন—ইহাতে তাহার দুপয়সা বেশ থাকিত! বাজারের উপার্জ্জনটা বাঙ্গালীরামের দুই দিক দিয়াই হইত। দোকানীদের নিকট হইতে দস্তরিও আদায় করিত, তাহার উপর আড়াইসের জিনিষের জায়গায় দুইসের দেড় পোয়া লইত। ইহাতেও কিছু বাঁচিয়া যাইত অথচ ধরা পড়িত না। কিন্তু দামে কখন বেশী করিত না। কাজেই তাহার উপর কাহারও সন্দেহ হইত না।

সারা বৎসর ধরিয়া এই রকম টাকা উপার্জ্জন করিয়া বাঙ্গালীরাম হোলীর সময়ে একবার বাড়ী যাইত এবং প্রত্যেক বারেই কিছু না কিছু জমী কিনিয়া আসিত। শেষে ভাল দেখিয়া একজোড়া বলদও কিনিয়া ফেলিল। ক্রমে বাঙ্গালীরামের গ্রামে বেশ প্রতিপত্তি হইয়া গেল। সারা গ্রাম কেন সে দিকের সারা অঞ্চলের মধ্যে কেবল তাহার ছেলে মেয়েরাই 'বাঙ্গালী' অর্থাৎ ইংরাজী ফ্যাসানের জামা গায়ে দিত; অবশ্য বাবুর ছেলেমেয়েদের পুরাণো জামা কাপড়েই তাহার চলিয়া যাইত—আর আলাদা করিয়া কিনিতে হইত না।

এত নাম থাকিতে তাহার নাম বাঙ্গালী রাখা হইয়াছিল কেন জিজ্ঞাসা করিলে বাঙ্গালীরাম বলিত, বাঙ্গালীরাই বড় বড় চাকুরী পায়, সব দেশে হাকিমী করে, ফরফর করিয়া ইংরাজী বলিয়া লোকের তাক্ লাগাইয়া দেয় সেজন্য ছেলের ভবিষ্যৎ ভাল হইবে কামনা করিয়া তাহার পিতা তাহার নাম বাঙ্গালী রাখিয়াছিল।

একবার ফসল কাটিবার সময় বাঙ্গালীরামের এক মাসের ছুটি লইবার ইচ্ছা হইল। কিন্তু যাইবার প্রধান বাধা হইল ছুটি লইয়া। ছুটি যে পাইবে না তাহা নয়। ছুটি পাইবে সঙ্গে সঙ্গে মাহিনাও পাইবে তাহা সে খুব জানিত। কিন্তু উপরি পাওনা? তাহা যে মাঠে মারা যাইবে। ইহার উপর আর এক বিপদ। বাজার করিবার লোভ সকল চাকরের। যাহার উপর বাজারের ভার পড়িবে সে যদি বাজার করাটা পাকাপাকি পাইবার লোভে সাধু সাজিয়া বসে? যদি দস্তুরির পয়সা পর্য্যন্ত মনিবকে ধরিয়া দেয় বা সব কথা বলিয়া দেয়?

তখন পুরা একদিন ধরিয়া বাঙ্গালীরাম উপায় ও অপায় দুই চিন্তা করিয়া প্রভুপত্নীর কাছে আসিয়া কহিল, "আমাকে এক মাসের ছুটি দিতে হবে মাইজী।

'মাইজী' একেবারে শিহরিয়া উঠিলেন। বলিলেন, "সে কি করে হবে, বাঙ্গালী? তোমাকে এখন একেবারে এক মাসের ছুটি কি করে দিই? ছেলেরা তুমি না হলে শান্ত থাকে না; তার উপর খোকা তো তোমাকে ছেড়ে একদণ্ড থাকতে চায় না।"

বাঙ্গালীরাম ইহাতে মনে মনে খুশী হইয়া বলিল, "আমিই কি মাইজী দেশে গিয়া থাকিতে পারি? তা আপনি যদি বলেন আমার ছেলেকে এক মাসের জন্য রেখে যাই। সে খোকাকে দেখ্‌তে পারবে; যদি বলেন বাজারও করবে।"

গৃহিণী বলিলেন, 'তা নেহাৎই যদি যেতে হয়, তাই কর। তোমার ছেলেকে আনিয়ে নিয়ে, কাজকর্ম্ম দেখিয়ে শুনিয়ে তবে যাও।'

গৃহিণীর মত হইবার পর কর্ত্তার মত হইতে আর দেরী হইল না। বাঙ্গালীরাম আর বিলম্ব না করিয়া তাহার চতুর্দ্দশ বর্ষবয়স্ক পুত্র মহাবীরকে দেশ হইতে আনাইল।

মহাবীরকে দেখিলেই মনে হয় ২।১ বৎসরের মধ্যেই সে মহাবীরই হইবে বটে। বেশ দীর্ঘ বলিষ্ঠ দেহ;— পাড়া গাঁয়ের ভাবটা ষোল আনা না হউক চৌদ্দ আনা এখনও বজায় আছে। তাহার কারণ সহরে আসিবার তাহার বড় একটা দরকার হইত না। বাঙ্গালীরাম তাহাকে দুই চারি দিনের মধ্যে এক প্রকার গড়িয়া পিটিয়া লইল দোকানীদের কাছে তাহাকে লইয়া গিয়া চিনাইয়া দিল। বলিয়া দিল মহাবীর তাহারই ছেলে; যেন তাহারা উহাকে ছেলেমানুষ পাইয়া ঠকাইয়া না লয় দস্তুরিটা যেন নিয়ম-মত ছেলেমানুষকে দেয়।

গোপনে ছেলেকে জিনিস কিনিবার মূলতত্ত্ব বুঝাইয়া দিল। সওয়া সের জিনিস কিনিতে দিলে কি করিয়া একসের তিন ছটাক জিনিস কিনিতে হইবে, বাকি এক ছটাকের দামটা কি করিয়া গোপনে কাচার খুঁটে বাঁধিয়া রাখিতে হয়, বেশী পরিমাণে জিনিস কিনিতে দিলে কি করিয়া ঐ হিসাবে অর্থাৎ পাচ পোয়ায় এক ছটাক হিসাবে জিনিস কম কিনিতে হইবে—ইত্যাদি তথ্য পুত্রকে বেশ করিয়া বুঝাইয়া দিল। ইহা ছাড়া দোকানী দস্তুরি দিবে। দস্তুরি ধরা পড়িলেও তেমন ভয় নাই; কারণ উহা প্রায় জানা কথা। সঙ্গে সঙ্গে ছেলেকে ব্যাপারটা কতক অভ্যাস করাইয়া বাঙ্গালীরাম গৃহিণীর নিকট হইতে কিছু অগ্রিম লইয়া এক মাসের ছুটিতে বাড়ী গেল।

(২)

বাঙ্গালীরামের ছেলে মহাবীরও বেশ চট্‌পটে। যে কাজ তাহাকে একবার বলিয়া দেওয়া হয় তাহাই বেশ মন দিয়া করে। তবে সে একটু বেশী মাত্রায় সরল। তাহার বাপ যে বীজ মন্ত্র কানে দিয়া গিয়াছিল তাহার মর্য্যাদা সে প্রাণপণে রাখিয়া চলিত। তবে এক এক সময়ে মাত্রা ছাড়াইয়া যাইত। ইহা লইয়া একদিন একটা বড় হাসির সৃষ্টি হইল।

একদিন গৃহিণী চিঠির কাগজে একখানি চিঠি লিখিতে গিয়া দেখিলেন মাত্র একখানি এক পয়সার টিকিট আছে, আর একখানি দরকার। সে সময় একখানি খামের বা খামের টিকিটের দাম দুই পয়সা ছিল। ডাকঘর কাছেই ছিল। মহাবীরকে ডাকিয়া তিনি তাহার হাতে একটি পয়সা দিয়া তাড়াতাড়ি একখানি টিকিট আনিতে বলিলেন।

মহাবীর তৎক্ষণাৎ বাহির হইয়া গেল ও খানিক পরেই ফিরিয়া আসিয়া তাহার আনীত দ্রব্য গৃহিণীর হাতে দিল।

তাহার দিকে চাহিতেই গৃহিণী বিস্মিত হইয়া জিজ্ঞাসা করিলেন, "হ্যাঁরে মহাবীর, একি আনলিরে?"

ডাকঘরে টিকিটের যে বড় বড় পাত থাকে তাহার চারিদিকে টিকিটের মাঝে যে সকল অপ্রয়োজনীয় অংশ-গুলি থাকে উহা তাহারই একখানা। মহাবীর কিন্তু অম্লানবদনে বলিল, "কেন মাইজী এই তো ডাকঘরের টিকিট।"

গৃহিণী এবার একটু বিরক্ত হইয়া বলিলেন—'টিকিটে রাজার বা রাণীর মুখ থাকে জানিস্ নে? এতে সে সব কই? তুই পাগল হলি নাকি?'

মহাবীরের চোখে মুখে এবার উদ্বেগ ফুটিয়া উঠিল। তথাপি সে মুখের সাহসে বলিল যে ডাকঘরে সে এই টিকিটই তো পাইয়াছে।

গৃহিণী জিজ্ঞাসা করিলেন, "কে দিল তোরে এরকম টিকিট?"

মহাবীর তৎক্ষণাৎ উত্তর করিল, 'খুদ ডাকবাবু।'

গৃহিণী আবার জিজ্ঞাসা করিলেন, "ঠিক করে বল্ পয়সা হারিয়ে ফেলেছিস, তাই ছাই ভস্ম যা হয় একখানা নিয়ে এসেছিস্ না কি—ঠিক করে বল্।"

মহাবীর বেশ একটু ভণিতা করিয়াই উত্তর দিল যে সে ছেলেমানুষ নহে—যে পয়সা হারাইয়া ফেলিবে; সত্য কথাই সে বলিয়াছে।

সেদিন কোর্টের ছুটি। হীরেন্দ্রনাথ আহারাদির পর একটু বিশ্রাম করিতেছিলেন। গৃহিণী গিয়া স্বামীকে উঠাইয়া বলিলেন, "দেখগো, মহাবীর ডাকঘর থেকে এক পয়সার টিকিট এনেছে দেখ। একবার খোঁজ নেও তো ব্যাপার কি।"

হীরেন্দ্র নাথের সহিত পোষ্টমাষ্টারের বন্ধুত্বই ছিল। তিনিও বাঙ্গালী। তৎক্ষণাৎ একখণ্ড কাগজে ঘটনাটা লিখিয়া তিনি ব্যাপার কি জানিতে চাহিলেন। অপর একভৃত্য সেই চিঠি লইয়া পোষ্টমাষ্টারের কাছে গেল।

কিছুক্ষণ পরেই পোষ্টমাষ্টার বাবুর নিকট হইতে চিঠির উত্তর আসিল। তিনি লিখিয়াছেন—বেলা ২টা আন্দাজ আপনার বালক ভৃত্য সটান আমার কাছে আসিয়া বলে, 'আধেলাক ডাক টিকিট দিজীয়ে ডাকবাবু।' আজকালকার দিনে এতটা জ্ঞানের প্রাচুর্য্য বড় একটা দেখা যায় না; তাই এই অপরূপ ক্রেতার দিকে দৃষ্টি আকৃষ্ট হইল। তাহাকে দেখিয়া মনে হইল, পল্লীগ্রাম হইতে সম্প্রতি আসিয়াছে। ভাবিলাম বোধহয় জানে না। তাহাকে বুঝাইয়া দিলাম, আধপয়সায় টিকিট পাওয়া যায় না; পুরা একটা পয়সা লাগিবে। ঐ বাবুর কাছে গিয়া টিকিট লও।

কথাটা তাহার বিশ্বাস হইল না। সে বলিল, না হয় একটু কম করিয়া দিন; কিন্তু আধ-পয়সারই টিকিট চাই। কিছুতেই আপনার ভৃত্যকে বুঝাইয়া পারিলাম না যে আধ পয়সার টিকিট শুধু দুর্ল্লভ্য নহে, একেবারে অলভ্য। সে বেশ গম্ভীর ভাবেই বলিয়া গেল, এক পয়সার টিকিট যদি পাওয়া যায় আধ পয়সার কেন পাওয়া যাইবে না? সে একেবারে গাঁওয়ার (পাড়াগেঁয়ে) লোক নহে; বুদ্ধিসুদ্ধি তাহার আছে; কেহ তাহাকে ঠকাইতে পারিবে না।

"তাহার কাছে কাজেই হার মানিতে হইল। বলিলাম ঠিক ধরিয়াছ বাপু, পাওয়া যাইবে না কেন? যায়। তবে সবাইকে আমরা দিই না। তুমি খুব বুদ্ধিমান তাই তোমাকে দিলাম। লও; কিন্তু কাহাকেও বলিও না। বলিয়া তাহাকে ঐ নূতন আধ পয়সার টিকিট দিলাম। টিকিট লইয়া সে হাত পাতিয়া বলিল, বাবু আধেলা দিন পয়সা দিতেছি। বুঝিলাম পুরা পয়সাটা আমার হাতে আগে দিতে তাহার ভরসা হইতেছে না। তাহাকে বলিলাম "তোমাকে একটু কষ্ট দিয়াছি সেজন্য ওই টিকিট-খানি তোমাকে বিনামূল্যে দিলাম; উহার দাম তোমাকে দিতে হইবে না।"

হৃষ্টচিত্তে সে যাইতে উদ্যত হইলে তাহাকে জিজ্ঞাসা করিলাম সে কোথায় থাকে।

উত্তরে জানিলাম ও রত্ন আপনার। কিন্তু কেন যে সে হঠাৎ আধপয়সার টিকিট কিনিতে আসিল তাহা এখনও ঠিক বুঝিতে পারি নাই। আশা করি আপনার সহিত দেখা হইলে তাহা জানিতে পারিব। জানিবার কৌতূহলও রহিল, কারণ ব্যাপারটায় বেশ মৌলিকত্ব আছে।"

চিঠি পড়িয়া স্বামী স্ত্রী খুব খানিকটা হাসিলেন

মহাবীরকে ডাকা হইল। হীরেন্দ্র নাথ বলিলেন, "বাপু, তুমি তো ছেলেমানুষ, ইহারি মধ্যে এত বুদ্ধি কোথায় পাইলে? একপয়সার টিকিট আনিতে গিয়া আধ পয়সার টিকিট কেন চাহিলে?"

মহাবীর দেখিল বাবু সবই জানিতে পারিয়াছেন। সে তখন হাতযোড় করিয়া ক্ষমা চাহিল ও পিতৃদত্ত উপদেশ হইতে আরম্ভ করিয়া সব কথা বিশদভাবে বলিয়া গেল।

গৃহিণী তো হাসিয়া খুন! বলিলেন, "হাসতে হাস্‌তে যে পেটে খিল ধরে গেল! উঃ বাঙ্গালীর পেটে এত বুদ্ধি ছিল তা জান্‌তাম না। ছেলেটাকে দেখলে তো একেবারে নিরীহ বলে মনে হ'ত। ওরও এত গুণ!

হীরেন্দ্রনাথ হাসিয়া বলিলেন, মহাবীরের তেমন দোষ নেই। দোষ হচ্ছে ওর পূজনীয় পিতৃদেবের যিনি ওকে এই সুপথ দেখিয়ে দিয়ে গেছেন। এবার আসুন একবার তিনি!"

পরে মহাবীরের দিকে চাহিয়া বলিলেন, "খবর্দার, আর কখন আধ পয়সার টিকিট অন্‌বিনে। পুরো একপয়সার টিকিট এনে বরং তোর মাইজীর কাছে ২।১টা পয়সা চেয়ে নিবি। বুঝলি?"

মহাবীরের ভয় হইয়াছিল পাছে বাবু মারিয়া বসেন বা তাড়াইয়া দেন্। দুইটার কোনটিই হইল না দেখিয়া সে অতি কৃতজ্ঞ ভাবে ঘাড় নাড়িয়া জানাইল যে সে বুঝিয়াছে এবং বলিল যে এবার হইতে দরকার হইলে সে এক আধ পয়সা চাহিয়াই লইবে; ওপথে আর কখন যাইবে না।

হীরেন্দ্র নাথ স্ত্রীর পানে চাহিয়া হাসিয়া বলিলেন, "আজকাল হাসি আর আনন্দ দুর্লভ। ছুটির দিনে ও যে বিমল আনন্দ ও প্রচুর হাসির সৃষ্টি করেছে তার জন্য ওকে এবার ক্ষমা করা গেল। কি বল?"

গান

শ্রীসুধীরকুমার সেন

ভোরের ঐ শুকতারাটি
যে বাতি আল্‌লো প্রাণে;
সে আলো উঠ্‌লো ফুটে
আজি মোর নূতন গানে।

ধরণী চেতন হারা,
নিভেছে সকল তারা,
সে কেন একলা জাগে
কি ব্যথায় সেই তা জানে।

সকলেই গেছে চলে
যে ছিল তাহার সাথী;
নিরালায় গগন মাঝে
একা সেই জ্বালায় বাতি;

ছেড়েছে সবাই তারে,
একা তাই বারে বারে,
আসে সে চুপে চুপে
চেয়ে রয় পথের পানে।

আগমন রাতি শেষে
প্রভাতে মিলিয়ে যাওয়া;
বিদায়ের বার্ত্তা বয়ে
আনে তার ভোরের হাওয়া;

তারি সে মৌন ব্যথায়,
আমার এই বুক ভেঙ্গে যায়,
কি জানি কোন মমতায়
নিয়ত আমায় টানে।

পরিশিষ্ট

শ্রীজ্যোতির্ম্ময়ী দেবী

জীবনচরিতটা খুব বেশী বড় নয়,—আরম্ভটা খুবই সংক্ষিপ্ত ; কিন্তু পরিশিষ্ট—তার যেন সীমা নেই—

নিঃসন্তান দম্পতি ; স্বামী ছিল সরকারী বনবিভাগের অফিসের কেরাণী। জঙ্গলে ঘেরা উপত্যকার ঘনবনের সীমান্তে তাদের আপিস। সেখানেই দিনের পর দিন কাটে।

লেখাপড়া হয়ত, শিখেছিল খানিকটা ; কিন্তু ঘন অরণ্যের নীলার নীড়ে—আর কাজের ভিড়ে লেখাপড়ার চর্চ্চা হয়ে ওঠে না। শ্রান্ত দেহে রাত্রে এসে শুধু ঘুমিয়ে পড়ে।

স্ত্রীটিও ছিল তেমনি ; সারাদিন কি করে,—কি করে শ্রান্ত হয় বলা যায় না ; কিন্তু রাত্রে স্বামীর পাশে নিশ্চিন্ত হয়ে শুয়ে পড়ে, একেবারে সকালে ঘুম ভাঙে।

বয়স বেশীও নয় কমও নয়—। কিন্তু আপনাদের নিয়ে অপনারা থাকাতে যে বিশেষ ক্ষোভ বেদনা জাগে মনে, এমন মনে হয় না।

পাহাড়ের কোলে নেমে আসা পাইন দেবদারু বন ; নীচের ঘন নানাবিধ গাছের—বনের দিকে চেয়ে স্ত্রীর সময় কাটে, কি কাজ করে কাটে বলা শক্ত। কিন্তু কাটে বেশ, গুনগুন করে গান গেয়ে—সকালে আফিসের রান্না করে,—সন্ধ্যায় আপিস ফেরতের জলখাবার, খাবারের আয়োজনে—আপনার প্রসাধনে—এমনি করে। নিতান্তই সোজাসুজি ; কিন্তু মাঝে মাঝে তারা কাব্যের মতন কথা কয়—।

নিশ্চিন্ত নির্ভরে স্বামীর বাহুমূলে মাথা রেখে স্ত্রী বলে, 'দেখ, আমার মনে হয় যেন তোমার কাছে একেবারে অসহায়ের মতন হয়ে যাই তো বেশ হয়—

'তোমার কি সহায় আছে নাকি—অসহায়ই তো!' সকৌতুকে স্বামী জবাব দিলে।

স্ত্রীও হাসে। কিন্তু তবু অসহায়তার—বিপুল কি এক গৌরবে সে সহায়কে আপনার সম্পূর্ণ নির্ভর দিয়ে দিতে চায় ;—যে সহায় তারও যেন গর্ব্বের—মধুর কোমল অহঙ্কারের—গৌরবের সীমা নেই যেন।

স্ত্রী আবার বল্লে, 'না এরকম করা নয়—সে যেন কি রকম একটা—'

বুঝতে পারা যায় না যেন।...আনন্দময় বেদনায় দুজনেই চুপ করে ভাবে।—

ঐ টুকুই—নয়ত এই ধরণেরই ;—

'ধূপ আপনারে মিলাইতে চাহে গন্ধে' কি' যৌবন বেদনা রসে উচ্ছল দিন গুলির' ধারণা—অথবা ধূপের ঐ আপনাকে লোপ করে দেওয়ার অপূর্ব্ব বেদনাময় স্বপ্নে অন্তর ভরে ওঠে—কি কেইবা জানে। চোখ ঘুমে ভরে আসে।

পাহাড়ের পেছন থেকে, সূর্য্যোদয় হয় সে দিকে কিন্তু অনেক বেলায় সূর্য্য দেখা দেন। প্রথমে ওপারের ঘন শ্যাম বন রক্তাভায় রঞ্জিত করে ওঠে তারপর ছায়াঘন উপত্যকায় বেলার সূর্য্য প্রসাদ বিতরণ করেন।

রাত্রির পর দিন যায়—।

মজুর নারীরা সন্তানদের ঝুড়িতে বসিয়ে পিঠে করে কাজের ক্ষেত্রে যায়,—দিনের শেষে ফিরে আসে। সুরমা ছোট ছেলের গাল টিপে দেয়, মজুরণীদের দাঁড় করিয়ে ঘর-করণার কথা কয়।

নিজেদের নিয়েই নিজেরা পরিপূর্ণ।—

ছুটীর দিন সকালে স্বামী-স্ত্রী রৌদ্রে বসে কাজের নয়, নিরর্থক কথা কইছিল।

রবিবারটা যেন কবিতার বইয়ের একখানি পাতা। "ক্ষণিকার" মত কবিতার বইয়ের পাতা খুলে যে কোন কবিতা পড়া। "লোভে কম্পমান গানের বুক," "পঞ্চাশোর্দ্ধে বনে যাওয়া," "নিজের লেখা সমালোচনার মতন" নিরর্থক হাসি আর কথায় রান্নাঘরের কাজ মোটেই এগোচ্ছে না ; অথচ কি রান্না হবে তার তালিকা পুরুষের অনভিজ্ঞ নির্দ্দেশে ক্রমশঃ বেড়েই চলেছে, সুরমার হাসিরও শেষ নেই।

শেষ অবধি রাগ করে খিচুড়ী চড়িয়ে—স্ত্রী এসে দাঁড়াল

বনের পথে সহর থেকে একটী ছেলে বেড়াতে এসেছিল। বেশী বড় নয়—ডানপিটে দুরন্ত হাসিমুখ।

মোড়ের মুখে বাঙ্গালীর গলা শুনে সে দাঁড়াল, সুরমার স্বামী তাকে বাঙ্গালী দেখে ডাকলে। পরিচয় পাবার আগে বেশ চেনা হয়ে গেল। যাবার সময় সুরমা জিজ্ঞাসা করলে, "তোমার নাম কি"?

সে বল্লে, 'সুবোধ, বাপ মা নেই দেশে কাকা মামা আছেন ইত্যাদি—এদেশে চাকরী করতে এসেছে।' সুবোধ চলে গেল।

সুরমাদের রবিবাসরীয় আসরে সুবোধের রীতিমত স্থান হয়ে গেল।—যে তৃতীয়জন কোনো দিন ছিল না সে যে এতখানি আত্মীয় হয়ে উঠবে ওরা ভাবেনি। কল্পনা—শতপথে ফুল ফুটিয়ে চলে "—

নিঃসন্তান নারীর মনে যেন জাগে, নিজের সন্তান হলে হয়ত এছেলেটীর চেয়ে একটু ছোট থাকত মাত্র!—

নিশ্চিন্ত হয়ে—শুয়ে আর তার কোনো কথাই মনে পড়ে না যেন—শুধু ভাবে।

—স্বামী ডাকেন, অত্যন্ত সংক্ষিপ্ত ছোট্ট কি একটা নামে, সে জবাব দেয় এক অক্ষরে;—কিন্তু নিশ্চিন্ত তৃপ্তি না নিশ্চিন্ত শ্রান্তি কি বলা শক্ত, তাকে অসহায় তার অসীম লোকে নিয়ে ফেলেছে যেন। সে আপনাকে একেবারে ধূপের মতনই নিঃশেষ করে দিতে চায়। তেমনি যেন কি এক সার্থক বেদনার আগুনে পুড়ে ছাই হয়ে ভস্মাবশেষ হয়ে—অপরূপ সার্থক হয়ে উঠতে চায়।

রবিবারের পর রবিবার চলে যায়। সুবোধ সুরমাদের রবিবারের অবসরে রবিবারে মতনই মিলে গেছে।

সেদিন ছুটী ছিল না, অবসরও ছিল না, সুবোধও আসেনি। স্বামী ফিরলেন সকাল করে।

তারপর আর একটী রবিবার এসে দাঁড়াবার আগেই স্বামী বল্লেন, কিছুই পারলাম না যা রইল তাও পর্য্যাপ্ত নয়, কি করে থাকবে—কোথায় যাবে?

সে একটা কথারও জবাব দিলে না, শুধু ব্যাকুল অসহায় ভাবেই তাঁর বাহুর মূলে মাথাটা গুঁজে চুপকরে রইল। তার যে অসহায়তার সীমাছিল না আজ—তার সঙ্গে আগে কোনো পরিচয় হয় নি। নির্ভরহী বেদনাময় অসহায়তার সীমা নেই।

চাকর বল্লে, "বহুজী আমি তোমার বেটা আছে।" সুবোধ এসে দাঁড়াল খবর পেয়ে—সেও নতমুখে অতিকষ্টে বল্লে, "আপনি কিছু ভাববেন না" আর বলতে পারলে না। ভাববার ছিল অনেক, কিন্তু ভাবতে পারার শক্তির অভাব ছিল।

* * * *

রাত্রি দিনের স্রোত তেমনি বয়ে যায়।

সুবোধ আসে প্রতিদিন। তার ঐ বেদনা পীড়িত ছিন্ন বিচ্ছিন্ন অসহায়া নারীর ওপর করুণার শেষ নেই, হয়ত মায়াও জন্মে।

কথানাই বা পাতা! সুরমা একমনে রোজই পড়ে। এত সময় ছিল? কিন্তু কথা কওয়া তো হয়নি। মনের দিক দিগন্ত এমন আকাশের মতন সীমাহীন? সেই দিগন্তের কোন এককোণে শুধু জীবনের অল্পমাত্র লেখা পড়েছে। তাও খরচপত্র আয় ব্যয়ের মলিন লেখায় ভরা। এত ঘুম? এত কাজ? নিষ্প্রয়োজনের উৎসবময় দিন রাত্রিকে সে কি ফিরিয়ে দিয়েছিল? চোদ্দ পনেরো বছরের মাঝে কটী দিনরাত্রি তার কমলদল মেলেছিল?

সুবোধ এসে দাঁড়ায়।

সুরমা অন্যমনস্কতা পরিহার করে উঠে বসে। কাজ কর্ম্মের কথা কয়। খানিকক্ষণের জন্য সুবোধের স্নিগ্ধ করুণাময় মনখানি তাকে অন্যদিকে নিয়ে যায়।

কিন্তু অতীতে-তন্ময় মন সমুখের জিনিষ সরে গেলে তেমনি কোথায় গিয়ে সেই অনাদ্যন্ত পুরাণ খুলে বসে।

বনের পথে তেমনি মজুর মেয়েরা ছেলে কোলে করে যায়। কেউবা গাছতলায় বসে ছেলেকে ঘুম পাড়ায় খাওয়ায়। জননী শিশুতে নিষ্কারণ পুলকের খেলা চলে।

সুরমা ডাকে, খাবার দেয়, কোলে নেয়। শিশুরা এসে সুরমাকে ঘিরে নেয়। সে আদর করে, সোহাগ করে, কিন্তু জননীর মতন করে সে একটী শিশুকে পায়নি, সেকথা হেমন্তের কুহেলিকাচ্ছন্ন আকাশে আকস্মিক দিগান্তে বিদ্যুৎ প্রকাশের মতন কোথায় গোপন বুকের মাঝে চমকে বিপুল শূন্য দিগন্তর দেখিয়ে দেয়।

* * *

চাকর এসে বল্লে, "মাজী, সুবোধবাবুর অসুখ"।

মাতৃহারা

শিল্পী—শ্রীশিবপদ ভৌমিক

নিজেদের [illegible] ঘরে সুবোধ চুপচাপ শুয়েছিল। সুরমা মৃদু পায়ে ঘরে ঢুকল।

"তোমার অসুখ করেছে ?"

"আমি ভেবেছিলাম, সেরে উঠব," সুবোধ বল্লে।

"ওকি কথা বাবা, সুরমা অপ্রস্তুতভাবে তার মাথায় হাত রাখলে।"

নিঃসন্তানা নারী অপ্রস্তুতভাবে তার সেবা করে। দুধ, ফল, জল, ওষুধ নিয়মিত দেবার চেষ্টা করে।

সুবোধ একমনে তাকে দেখে।

রাত্রির আছন্ন অন্ধকারে সুবোধের মাথার কাছে বসে সে ভাবতে থাকে। আকাশ পাতাল, ভবিষ্যৎহীন দুর্গম দিন, স্বজনহীন পীড়িত সুবোধের কথা, সবটাই নিজের কথা।

দরজার বাইরে চাকরটা বসে ঢুলতে থাকে, নয়ত ঘুমায়।

অসুখ কি তা সুরমা বোঝেও না, জানেও না, জ্বর কখনো বাড়ে কখনো কমে; ডাক্তার কি বলেন, তাও সুবোধ কিছুই বলে না।

সুরমার রাত্রি জেগেই কাটে।

মন দিন রাত্রির হিসাব নেওয়ারও বাইরে থাকে যেন।

ভোরের আলো বাইরে, ঘরে অন্ধকার।

সুবোধ মাথার ওপর থেকে সুরমার হাতখানা টেনে নিলে। সুরমা জিজ্ঞাসা করলে "কি সুবোধ ?"

সুবোধ শুধু তার দুখানা হাতের ভেতর মুখ রেখে বল্লে "মা"।

সুরমার চোখ থেকে জল পড়তে লাগল। নত হয়ে তার মাথার ওপর মুখ রেখে বল্লে, "বাবা তোমার কি কষ্ট হচ্ছে ?"

সুবোধ বল্লে, "মা, তুমি এবারে দেশে চলে যেয়ো"।

সুরমার চোখ থেকে শুধু জল পড়তে লাগল।

সুবোধ চলে গেল।

*

শীতের দিন।

পাশের বাড়ীর হিন্দুস্থানী মেয়েটি তার ছেলেকে ঘুম পাড়াতে চেষ্টা করছিল। অনেক [illegible] তার, [illegible] ভালবাসা, মায়া।

ও সুরমা [illegible] ওপর বসে নিয়মিত পূজায় পদ্ম দিত পড়ছিল। [illegible] ঘুমপাড়ানিয়া গানে ছেলেটার মার খেয়েও বকুনী খেয়েও ঘুম এলো না।

"[illegible] নিরহংকারো"

সুরমার দুঃখ হলো, কেন মারে—আহা!

শিশুর কোমল হাতখানি মার বুকের আঁচলের নীচে আপনার প্রসাদ খুঁজছে; ঠোঁট দুখানিতে তখনো অভিমানের কাঁপন লেগে।

মা আবার বকে, "বজ্জিবজ্জাত"

সুরমা বল্লে, "আমাকে দেবে বহু" ?

বহু সবিস্ময়ে একটু থমকে স্মিতমুখে ছেলে দিয়ে গেল।

"ঐ পাখী" বলে পায়রা কাক ডেকে, "ঐ লালছবি" বলে ঘরের চতুর্দিকে টাঙানো ঠাকুরদেবতার বিচিত্র বর্ণের ছবি দেখিয়ে, চাকি বেলুন আলু বেগুন, বহ্ন্যার ঘরের প্রবীণ প্রাচীনের খেলনায়, সঞ্চয়ের সমৃদ্ধিতে নানাবিধ অপরূপ প্রলাপ আলাপে কখন শিশুর মন মুগ্ধ হয়ে গেল।

ওদিকে বহুর শিল নোড়া রীতিমত কাজে লেগেছে।

সুরমার রান্নার আয়োজন হয়নি, যোগাড় হয়নি, গীতার পঠ্যমান অধ্যায়টা সম্পূর্ণ হয়নি, জপও যেন বাকি; পট্টবস্ত্র ছাড়া হয়নি।

সুরমা ও শিশু দুজনেই খেলায়—নতুনতর খেলনায় আনন্দে মগ্ন।

খানিক পরেই ক্রীড়াশ্রান্ত শিশুর ঘুম এলো।

সুরমা স্তব্ধ নিস্পন্দ ব্যথিত স্নেহে চুপ করে তার ঘুম ভাঙার ভয়ে আড়ষ্ট হয়ে কোলে নিয়ে রইল। নিদ্রাতুর খোকা মাতৃবক্ষ মনে করে তার বুকে হাত রেখে তেমনি নিশ্চিন্ত আরামে ঘুমলো।

কুলহারা ভাবনায় অন্তরের মাঝে কোথায় কোন্ [illegible] বাজে; নিঃসন্তানা নারীর বুকে কোন্ চিরন্তনী জননী অশ্রুসিন্ধু আকুল হয়ে ওঠে যেন।

'মাইজী [illegible] না পাকাবে ?—দেবে ওকে ?'—[illegible] শক্কিধের বসনে জলের হাত মুছতে মুছতে এসে দাঁড়াল।

চকিত হয়ে সুরমা চাইলে—'না' ।—[illegible] তার ছেলে নিয়ে যায়।

[illegible] পূজা [illegible] দিয়ে, গীতার [illegible] অধ্যায় [illegible]।

নাড়াচাড়াতে শিশুর ঘুম তখন ভেঙে গেছে। অপরাহ্ন বেলায় রৌদ্রে ছাতে বসে অবসর প্রাপ্ত জননীর—আর শিশুর নিরর্থক আনন্দের লীলার শেষ নেই।

দুগ্ধপানরত শিশু একবার করে দুগ্ধ খায়—আবার মুখ সরিয়ে মায়ের মুখ পানে চেয়ে হাসে। জননীও হাসে। ছেলের রাঙা ঠোঁটের পাশ থেকে দুধের ধারা গড়িয়ে আসে।

সুরমার মনের কোণ থেকে কখন গীতার পাঠরত অধ্যায়ের পাতা উল্টে গেল।

সমস্ত জীবনচরিতের ১৪।১৫ খানা পাতা উড়ে উড়ে অসংলগ্ন লিপিকাবলী চোখের সামনে ফুটিয়ে তোলে... প্রথম দিকে শরৎ মাধবীর ক'খানা পাতা যেন জাগে ;—কিন্তু যেন চোখের জলে ঝাপসা হয়ে—উঠ্ল...।...লেখা না দৃষ্টি ?

তারপর সুবোধের কথা—সুবোধের 'মা' বলে ডাকা... যতদিন সুবোধ কাছে এসেছিল, ততদিন সুবোধের কথা ভাবার অবসরও যেন সে পায়নি—সে যে নিঃসন্তানার অন্তরের মাঝে কতখানি বেদনাময় স্নেহের সঞ্চার করেছিল —সুবোধ চলে গেলে তাকে সমগ্র ভাবে ভাববার অবসর পেলে। স্বামীহীনার সন্তান থাকলে কি রকম হয়...?—

জীবন চরিতের দ্বিতীয় অধ্যায়ের খান দুই পাতাও সাঙ্গ হয়ে গেল।

সুরমা—পূজার অসমাপ্ত আয়োজন নিয়ে অন্য মনে স্তব্ধ হয়ে বসে রইল—

কোন্ চিরন্তনী বিরহমিলন গঙ্গাসাগর-সঙ্গমের এলো মেলো যেন লোণা বাতাসে সমাপ্তিহীন পরিশিষ্টের পাতাগুলি ক্রমাগত তরতর করে উড়তে থাকে—

———

চিরাগতা

শ্রীবাণী রায়

গগনে আজি কার খুলেছে নীলবাস
কাহার ছোঁয়া পেয়ে দুলিছে শাদা কাশ ?
নদীর কালোজলে কাহার হেরি হাসি
কে মোর হিয়া, পরে পরালো প্রেম ফাঁসি !

জীবনে আজো যারে পাইনি ভালো ক'রে
পড়িনু বাঁধা কিরে তাহার ছল-ডোরে ?
দ্বারের পাশ হতে দেখেছি হাসি তার
তাহারে আজি বুঝি দেখিনু আরবার।

হৃদয় নাচে মোর পুলক-মদিরায়,
নয়ন বার বার সুদূরে ছুটে যায় ;
হিয়ার দ্বারে আজ নূপুর বাজিল রে
মালিকা গলে মোর দিল সে রাঙা করে।

ভারতের ভবিষ্যৎ

শ্রীভারত কুমার বসু

"ইণ্ডিয়া ইন্ বন্‌ডেজ্"—নামক পুস্তকের গ্রন্থকার, ভারতের একান্ত বন্ধু, আমেরিকার যুক্ত রাষ্ট্রের রেভারেণ্ড ডাক্তার জে, টি, সান্‌ডার ল্যাণ্ড কিছুদিন আগে চিকাগোর "ইউনিটি" পত্রিকায় যা লিখেছিলেন, তার-ই মর্ম্মার্থ নীচে দেওয়া হ'লো ;—

লণ্ডনের গোল টেবিল বৈঠক শেষ হবার সময়ে মিঃ ম্যাক্‌ডোন্যাল্‌ড্ এই ঘোষণা ক'রেছিলেন যে, একটা নূতন শাসন-বিধি এবং কতকগুলি প্রয়োজনীয় প্রাথমিক ব্যবস্থা ঠিক হ'লেই, গোটা কয়েক দরকারী রক্ষা কবচের (safe guard এর) সঙ্গে ভারতবর্ষকে দায়িত্বপূর্ণ শাসনের—স্বায়ত্ত-শাসনের অধিকার দিতে ব্রিটিশ গভর্ণমেণ্ট ইচ্ছে করেন। এবং এর অর্থ যদি এই হয় যে, ভারতবর্ষকে বাস্তবিকই স্বায়ত্ত-শাসন দেওয়া হবে, তা হ'লে, ভারতের অসন্তোষের যে শেষ হবে এবং ব্রিটিশ রাজত্ব ও ভারতবর্ষের উপর যে বজ্র এবং বিদ্যুৎ-ভরা ঘন মেঘপুঞ্জ জ'মে র'য়েছে, সে-সব যে স'রে যাবে, এ-কথা বিশ্বাস করবার যথেষ্ট কারণ আছে বলেই মনে হয়।

কিন্তু যে-ইতিহাস-প্রসিদ্ধ বিরাট জাতি বিগত দুই কিম্বা তিন হাজার বছর ধ'রে রক্ষা-কবচ না নিয়েও রাজত্ব চালিয়েছিল এবং পৃথিবীর মধ্যে প্রভাবে ও গৌরবে এমন একটা স্থান অধিকার ক'রেছিল, যা কোনো জাতিই ক'রতে পারেনি, সে-জাতির জন্য রক্ষা-কবচের দরকার কি? এ জাতি কি বর্ত্তমানে নিজেদের শাসন ক'রতে পারে না? যদি পারে না, কেন পারে না? ১৭০ বছর ধ'রে ব্রিটিশের শাসনে এরা এম্‌নি অধঃপতিত হ'য়েছে যে, সেই অধঃপতনের জন্যই এরা তা পারে না,—অথচ তারা তা এককালে পেরেছিল অনেক দিন ধ'রে—রীতিমত সাফল্যের সঙ্গে। ভারতবর্ষ এই সব রক্ষা-কবচের জন্য নিজেকে অপমানিত বোধ করে।—

ভারতবর্ষকে স্বায়ত্ত-শাসনাধিকার দেবার নামে, ব্রিটেন কি এই সব রক্ষা-কবচের দ্বারা ভারতকে বাস্তবিকই উক্ত শাসনাধিকার দিতে অস্বীকৃত হচ্ছে না?

রক্ষা-কবচগুলি কি?

প্রথম :—ভারতের রক্ষী অর্থাৎ ভারতের সৈন্যের উপর গ্রেট্‌ব্রিটেনের কর্তৃত্ব থাকবে। ভারতের সৈন্য প্রচুর আছে। এদের উপর কর্ত্তৃত্বের অর্থ কি? যদি আমেরিকার যুক্ত-রাষ্ট্রে আমাদের প্রচুর সৈন্য থাকে, এবং ফ্রান্স, জাপান, জার্ম্মানী কিম্বা গ্রেটব্রিটেন তাদের উপর কর্তৃত্ব করে, এবং মাত্র একটা সৈন্যের উপরও যদি আমাদের শাসনাধিকার না থাকে, তা হ'লে বাস্তবিক পক্ষেই বলা যাবে কি যে, আমরা স্বাধীন, কিম্বা, স্বায়ত্ত-শাসনাধিকার পেয়েছি? ভারতবর্ষের সৈন্যের উপরে ব্রিটিশের কর্ত্তৃত্বের অর্থ এইতেই বোঝা যাবে। জগৎ কি জানে না যে, যে-কোনো জাতির সৈন্য বিদেশী শক্তির দ্বারা শাসিত হয়, সে-জাতি বাস্তবতঃ স্বাধীন কিম্বা স্বায়ত্ত শাসনাধিকার—প্রাপ্ত না হ'য়ে বিপদ-জনক নিবিড় শৃঙ্খলে বাঁধা থাকে?...

দ্বিতীয় :—যে-নূতন শাসন-বিধি তৈরী হবে, তার মধ্যে ভারতের বৈদেশিক রাজনৈতিক ব্যাপারে ব্রিটেনের কর্ত্তৃত্ব থাকবে। এর মানে কি?—এর মানে, কাগজে-কলমে ভারতবর্ষ অন্য জাতির সঙ্গে পত্র-ব্যবহার, বৈদেশিক সন্ধিতে স্বাক্ষর, কিম্বা যে-কোনো বৈদেশিক কাজ করতে পারবে না। ভারতবর্ষ অন্য জাতির কাছে দূত, মন্ত্রী, পদস্থ কর্ম্মচারী কিম্বা প্রতিনিধি পাঠাতে পারবে না। ভারতবর্ষ অন্য জাতির কাছে একটা জাতি ব'লেই গণ্য হ'তে পারবে না। সমস্ত পৃথিবীর কাছে সে কেবল গ্রেট ব্রিটেনের পদানত প্রদেশ ছাড়া আর-কিছু ব'লেই বিবেচিত হবে না। এর নাম-ই কি স্বরাজ হবে?

তৃতীয়:—ভারতের বৈদেশিক বাণিজ্য, বৈদেশিক পণ্য-বিনিময়—ইত্যাদির উপর ব্রিটেনের কর্ত্তৃত্ব থাকবে। অর্থাৎ, ব্যবসার ব্যাপারে ভারতবর্ষকে সম্পূর্ণভাবে গ্রেট ব্রিটেনের হাতে থাকতে হবে। ভারতীয় ব্যবসাদাররা বলে যে, ভারতের দারিদ্র্যের একটা প্রধান কারণ এই যে, অনেক

দিন থেকেই ভারতীয় বাণিজ্য, ব্রিটিশের শাসনাধীন হ'য়ে আছে। এবং এ-কথা সত্য যে, বাণিজ্যের শক্তি রাজনৈতিক শক্তিকে শাসন করে। সুতরাং যে-কোনো দেশ যে-কোন জাতির বাণিজ্যকে শাসন করে, সেই দেশ সেই জাতিকেও শাসন করে।

চতুর্থ :—প্রস্তাবিত নূতন শাসন-বিধির মধ্যে ভারতের জাতীয় ব্যবস্থাপক সভায় বড়লাটের যথেষ্ট দায়ীত্ব থাকবে এবং প্রকারান্তরে আগেকার অন্যান্য বড়লাটের চেয়ে, ভারতবাসীদের জন্য, তাঁকে অনেক বেশী স্বেচ্ছাধীন, নিরঙ্কুশ ক্ষমতা দেওয়া হবে। অপর কথায়, ব্যবস্থাপক-সভা-শাসনের কিম্বা ব্যবস্থাপক-সভাকে উড়িয়ে দেবার ক্ষমতা তাঁর থাকবে এবং তিনি যথেচ্ছাচার দেশ শাসন ক'রতে পারবেন।

এই-ই শেষ নয়। যেহেতু, গ্রেট ব্রিটেন ভারতের প্রাদেশিক শাসক এবং বড়লাট নিযুক্ত ক'রবেন এবং এ-বিষয়ে ভারতের কোনো কথা বা শক্তি থাকবে না, এই কারণে, ভীষণ অত্যাচারী স্যার মাইকেল-ও'-ডায়ারের মতো লোকের দ্বারা শাসিত হ'তে, ভারতবর্ষ কোনো প্রকারেই বাধা দিতে পারবে না।—এর নামই কি ভারতের স্বরাজ ?—

এই চারটীই হচ্ছে প্রধান রক্ষা-কবচ (আর-ও রক্ষা-কবচ আছে। কিন্তু এই চারটীই বিশেষ দরকারী।) ভারতবর্ষকে গ্রেটব্রিটেন যে-নূতন শাসন-বিধি দয়া ক'রে দিতে যাচ্ছেন, তার মধ্যে ওই কটী রক্ষা-কবচ না থেকে পারেই না!...

এই নূতন শাসন-বিধির দ্বারা ভারতবর্ষ কি বাস্তবতঃ দায়ীত্বপূর্ণ শাসনাধিকার পাবে? অপরপক্ষে, আগেকার মতই সে কি পরাধীন জাতি হ'য়েই থাকবে না? যে-শৃঙ্খলের দ্বারা তাকে বাঁধা হবে, তা হয়ত আকারে তফাৎ হ'তে পারে,—সেটা কিছু লম্বা হ'তে পারে—যার দ্বারা সে বন্দী-জীবনে চলা-ফেরার জন্য কিছু বেশী স্বাধীনতা পাবে, কিন্তু তার বাঁধন ত তখনও শৃঙ্খলের-ই থাকবে,—ইস্পাতের শৃঙ্খলের? —আগেকার মতো এ-শৃঙ্খল ত সেই দৃঢ়, সেই দুঃখের, সেই দুঃসহনীয়?

—— —— ——

কোথা

শ্রীঅমলা দেবী

অচঞ্চল চির দীপ্ত তারার মালিকা
ওরি মাঝে কোন খানে দীপালির শিখা
জ্বালিয়ে তুলিব ধরি? মানসের ধন
কোন দেবালয় মাঝে মোর আয়োজন
নিবেদন করি দেব? ভাবি ক্ষণে ক্ষণে
আজিকার প্রীতি-পুষ্প সে দিন স্মরণে
ম্লান হয়ে যায় যদি! অনন্ত জগতে
কোন চিহ্ন লয়ে আমি চলিব সে পথে?

—উপন্যাস—

(১)

সবে মাত্র শীত পড়তে আরম্ভ হয়েছে, গায়ে লেপ দেওয়াও যায়না ; আবার কিছু গায়ে না দিলেও ভোরের দিকে যেন পায়ে শীত করে, সমস্ত গায়ের ভিতর শির শির্ করে ওঠে। আলসেমির জন্যে নিজ গায়ে কাপড় টেনে দেওয়া যায় না—কেউ দিয়ে দিলে খুব আরাম বোধহয়, এ সেই সময়।

ভোর প্রায় হয়ে এল। কলকাতার একটা বড় রাস্তার ওপরেই, মস্ত গেটওয়ালা বাড়ী—দিনের বেলায় গেটের লোহার শিকের ফাঁক দিয়ে ভেতরের সবুজ মাঠ, খেলবার জায়গা, দরোয়ানদের ঘর, লোকজনের আসা যাওয়া, সবই বেশ দেখা যায় ; কিন্তু এখন সেটা যেন বিরাট দৈত্যের মত, প্রাণহীন হয়ে পড়ে আছে। এর ভেতরে যে কত মানুষের প্রাণ এখন নিশ্চিন্ত নিদ্রায় ঘুমিয়ে আছে তার ঠিক নেই। বাড়ীটার আয়তন ও অবস্থান দেখলেই মনে হয় যে এটা কারো বাসের বাড়ী নয়। হয় কারখানা, না হয় অফিস না হয়তো ছাত্রাবাস চলতি কথায় যাকে বলে বোর্ডিং।

এই বোর্ডিংএ তিনতলার একটা ঘরে খান পাঁচ ছয় লোহার খাট্ পাতা। তাতে নানা বয়সের মেয়েরা ঘুমে আচ্ছন্ন। শ্বাস-প্রশ্বাসের সমতালের একটা শব্দ ছাড়া আর কিছুই শোনা যাচ্ছেনা। রাস্তার গ্যাসের আলোর দুএকটা রেখা ছাড়া ঘর একেবারে অন্ধকার—কারণ ঘরে আলো রাখার নিয়ম নাই। ভোরের পাত্‌লা অন্ধকারেই রাস্তায় ঝাড়ুদারের শব্দ শোনা গেল। গ্যাস নিভে যাওয়ার সঙ্গে সঙ্গে আকাশের পূব দিকটা অল্প লাল হয়ে উঠ্‌ল আর সেই লালের আভা তেতলা বাড়ীর ঘরের খোলা জানালা দিয়ে, জানালার কাছে যে মেয়েটী শুয়েছিল তার মুখের ওপর পড়ল। নিশ্বাস ফেলার ছন্দ পতন হল। চোখের ওপর আলো পড়াতে ঘুমটা তারই আগে ভাঙল। চোখ মুছে নিয়ে ঘরের সব ক'খানি খাটের ওপরেই সে একবার চোখ বুলিয়ে নিল। সবাই নিদ্রামগ্ন। দেখে মৃদু হাসির একটা অতিসূক্ষ্ম রেখা তার প্রসন্ন মুখে ফুটে উঠলো। খাটের নীচ থেকে স্লিপার দুটো পায়ে ঢুকিয়ে, খোলা বিনুনিটা হাত দিয়ে জড়াতে জড়াতে পাশের খাটে যে মেয়েটি পাতলা একখানা ধোয়াটে রংয়ের শাল মুড়ী দিয়ে আরামে ঘুমুচ্ছিল, আচমকা তার গা থেকে সোখানি নিজের গায়ে জড়িয়ে নিয়ে সামনের ছাদে বেরিয়ে পড়ল।

অসময়ে সুখ নিদ্রা ভেঙে যাওয়াতে, নিদ্রকারিণী বিরক্তি ভরা কণ্ঠে বল্‌লে 'আঃ! মীনু কি হচ্ছে? সকাল বেলায় আর জালাতন করিস্‌নে। দে আমার র‍্যাপার ফিরিয়ে দে!'...

"ওঠ ঠাকরুণ! আর রাতি নাই ভোর হইয়াছে। এখুনি উপাসনার ঘণ্টা পড়বে।"—মুখখানাতে দারুণ অসন্তোষের ছাপ নিয়ে মীনার সহপাঠি মাধবী অগত্যা বিছানা ছেড়ে উঠেই পড়্‌ল। কারণ তখন থেকে প্রস্তুত হতে আরম্ভ না করলে, হয়তো সকাল থেকেই, 'সুপরিন্টেণ্ডেণ্ট' মিস হাজরার কাছে বক্তৃতা শোনা ও কর্ত্তব্যে অবহেলার ফর্দ্দ শুনতে শুনতে কান ঝালাপালা হয়ে যাবে।

মাধবী উঠে দেখ্‌লে মীনা তার র‍্যাপারখানা বেশ পাট করে, মাথার বালিশের নীচে রেখে দিয়ে, তার বিছানাটা বেড্ কভারে ঢেকে ফেলেছে। সেও যথা সম্ভব তাড়াতাড়ি এ কাজগুলো সেরে ঘরে আর যে চার জন ঘুমোচ্ছিল, তাদের ঘুম ভাঙিয়ে দিলে। [কারণ এসপ্তাহে সেই ওদের 'মণিট্রেস'। তাদের যত কিছু বিশৃঙ্খলতার জন্যে দায়ী সেই-ই।

ছাদে, তখন আরো দু একজন এসে জুটেছিল—মাধবী গিয়েও সেইদলে মিশলো। মীনা, তখন সুপ্রীতি, তার আর একজন বন্ধুর সঙ্গে মহা উৎসাহে, শেলি ভাল কি ওয়ার্ডসওয়ার্থ ভাল, বায়রণ ভাল কি কীট্‌স ভাল, সংস্কৃত

ভাল কি পালি ভাল এই নিয়ে, সরব আলোচনা লাগিয়ে দিয়েছে। মাধবী তাদের মাঝে গিয়ে দাঁড়াতেই, সে অভিনয়ের ভঙ্গীতে বলে উঠ্‌লো আইয়ে জনাব, হুকুম ফরমাইয়ে।"

কথাটার একটু ইতিহাস আছে। গ্রীষ্মের বন্ধের সময়ে ছুটী হবার দিন, সব বোর্ডার মিলে বিখ্যাত নাটক আবু হোসেন অভিনয় করেছিল; তাতে মাধবী নিয়েছিল বাদশার পার্ট আর রঙ্গময়ী মীনা হয়েছিল দাই। থিয়েটার কবে চুকে গিয়েছে কিন্তু পরিহাসপ্রিয়া মীনা, মাধবীকে কলেজের সময় ছাড়া, আর সব সময়েই 'জনাব' বলেই ডেকে থাকে।

তার পিঠে সশব্দে একটা চড় বসিয়ে দিয়ে মাধবী, নিজের ব্যাপারের একটু আশ্রয় পাবার জন্য মীনার গা ঘেঁসে বসে পড়্‌ল। তাই দেখে সুপ্রীতি বল্‌লে "এই যে পূর্ণিমা, অমাবস্যার মিলন হয়েছে। "এস বঁধু এস, আধ আঁচরে বস"—তার সঙ্গে সুর মিলিয়ে মীনা বলে উঠল "হৃদয় আবরি তোমা রাখি হে।"—মাধবী বল্‌লে "কালো বলে কি এত ঠাট্টা করতে হয়? জানিস্ তো, 'কোকিল যে কালো, তাতে কিবা আসে যায়? থিয়েটারের যত 'মেল' (Male)পার্ট আছে, বেছে বেছে আমিই করি আর কেমন নিখুঁত ভাবে! তোরা তো এগোতে সাহসই করিস্‌নে। কেবল ছিঁচ্‌কাঁদুনের মত "প্রাণেশ্বর! কি কুক্ষণে দাসী তব"—কণিকা এতক্ষণ ছাদের আল্‌সের ঠেস্ দিয়ে এদের কথা শুন্‌ছিল। হঠাৎ ঝুঁকে পড়ে কি দেখে নিয়ে বল্‌লে "আপাততঃ তোমরা চুপ করলেই ভাল হয়। কারণ মিস্ হাজরা এইমাত্র বেরোলেন দেখ্‌লাম।"

মিস্ হাজরার নাম শুনে অত বড় বড় কলেজের মেয়েদের মনেও একটু অস্বস্তির ভাব এলো। এমনি ছিল তাঁর প্রতাপ! মেয়েদের তিনি যে খুব শাস্তি দিতেন তা নয়, কিন্তু কেমন এক আশ্চর্য্য চোখের দৃষ্টি ছিল তাঁর, যে, যে মেয়েই হোকনা কেন ভয় পেয়ে উঠ্‌ত। সে চোখ যেন পাথরের চোখ্ যার দিকে চাইতো, তার বুকের ভিতর পর্য্যন্ত হিম হয়ে যেত। কালো রং এ, পুরু লাল ঠোঁটে তার ওপর ওই আশ্চর্য্য চোখের দৃষ্টিতে তাঁকে মেয়েদের কাছে একটা ভয়ের জিনিস করে রেখে ছিল। ভয় ছিলনা কেবল একটী মেয়ের; তার নাম রেবা। রেবার সঙ্গে মিস্ হাজরার কথা নিয়ে বোর্ডিং শুদ্ধ সব মেয়েরই কথা কাটাকাটি ও মনান্ত চল্‌তই।

সেই মিস্ হাজরার, আসার আশঙ্কায় মীনা তাড়াতাড়ি মাধবীর ব্যাপারটা তাকে একেবারেই ছেড়ে দিয়ে, নিজেরটার সন্ধানে ঘরে ঢুকে পড়্‌লো। রেবা হো হো করে হেসে বল্‌লে "কণা, যা হোক্ একটা কাজ কর্‌লি। মিস্ হাজরার নামে একেবারে পট পরিবর্ত্তন!"

গাল ফুলিয়ে কণিকা বল্‌লে "ফেভারিট" বলে, তোমার না হয় মিস্ হাজরাকে ভয় নেই। আমরা তুচ্ছ প্রাণী-অল্পেই ভয় পাই। একটু ধৈর্য্য ধরে দেখই না কেন, শুধু 'নাম' কি কাম! ঐ শোনো জুতোর শব্দ এগিয়ে আস্‌ছে—তোমার সাহস থাকেতো দাঁড়িয়ে থেকে ওঁর বচনাবলী শোনো। আমার অত সাহস নেই আমি পালাই।'

উত্তরে রেবা বললে "তোমরা ওঁকে যতটা বাড়িয়ে বল, আসলে উনি ততটা নন্।"

"ও বাবারে! গায়ে যে তোর ফোস্কা পড়্‌ল দেখ্‌ছি। কি দেখেই যে মজেছ! ওর চেয়ে যদি সুপ্রভাদিকে পছন্দ করতিস্ তাঁর 'এডমায়ারার' হতিস্ তো, তোর পছন্দর বাহাদুরী আছে বল্‌তাম। তা না, একেবারে "Cut and dried! শুষ্কং,কাষ্ঠং!"

রেবা তবুও হঠল না—বল্লে "রূপেতে কি করে বাপু, গুণ যদি থাকে!"

এমন সময় যে মিস্ হাজ্‌রার কথা নিয়ে সকালবেলাই আলোচনার সভা বসে গিয়েছিল, তিনি সশরীরে হাজির হলেন। কণিকা কোথায় যে লুকাল, তা কেউ টের পেলনা; আর অন্য সব মেয়েরা হুড়োহুড়ি করে পালাবার এত ধুম লাগিয়ে দিলে যে বেচারী রেবা একলাই তাঁর সামনে পড়ে গেল।

রেবার আপাদমস্তক একবার তীক্ষ্ণদৃষ্টিতে দেখে নিয়ে বল্লেন 'রেবা! তোমরা বড় মেয়েরাও যদি, সব কাজ রুটিন-মত না করো, তবে ছোট মেয়েরা শিখ্‌বে কি দেখে?"

একটু লজ্জিত হয়ে রেবা বললে "এখনও তো উপাসনার ঘণ্টা পড়েনি!"

"না, পড়ুক। কাজের মধ্যে আনন্দকে খুঁজে নিতে হয়, তা হলে কাজের মূল্য থাকে। না হলে সে কাজ শুধু

কঠিন কর্ত্তব্যের রূপ ধরে মনকে পীড়াই দেয়। সব সময়ে মনে রাখ্‌বে

"In each duty
Lies a beauty—"

ততক্ষণে মীনা তার কাপড়-চোপর, চুল পরিষ্কার করে, হাত-মুখ ধুয়ে এসেছে। দেখে হাজরা বোধহয় একটু খুসী হলেন। কারণ তাঁর দৃঢ়বদ্ধ ঠোঁটে অল্প হাসির রেখা ফুটে উঠেই যেন মিলিয়ে গেল। মুখে শুধু বল্লেন "বড় খুসি হলাম মীনা যে এতগুলি মেয়ের মধ্যে এক তুমিই যা একটু সময়ের মূল্য বুঝতে শিখেছ।"

হাজ্‌রা তাঁর বক্তৃতা শেষ করে চলে যেতেই, ঘরের মধ্যে থেকে, অদৃশ্য মূর্ত্তিগুলি একে একে দৃশ্যমান হলো। একসঙ্গে পাঁচ সাত জনে মীনাকে বল্লে "কার মুখ দেখে, তুই আজ উঠেছিলি মীনু, রেবার বদলে মিস্ হাজরা আজ তোকে প্রশংসা করে গেলেন ?"

কণিকার গায়ের জ্বালাটা তখনও কমেনি। সে চরকির মত এক পাক ঘুরে নিয়ে, রেবার মুখের কাছে হাতটা নেড়ে উঠ্‌লো "ও রেবা, রেবেকা সুন্দরী! প্রশংসায় যে 'পঞ্চমুখ' হয়ে উঠেছিলে ? কি হোলো এবার!"

রেবার মুখখানা লজ্জায় ও অপমানে কালো হয়ে গেল।—

নীচে ঘণ্টা বাজলো—ঢং—ঢং—ঢং। মুখরোচক আলোচনাটা তখনকার মত স্থগিত রেখে সকলে উর্দ্ধশ্বাসে উপাসনায় যোগ দিতে চল্‌লো।

(২)

পূজার ছুটি হতে আর বেশী দেরী ছিলনা। চারিদিকে ব্যস্ততা, গোলমাল ও আকাশ বাতাসের অপূর্ব্বশ্রীতে সব যেন সজীব হয়ে উঠেছে! যার কিছু নেই, একেবারে নিঃস্ব, সেও যেন 'পূজা' এই অক্ষর দুটী মহামন্ত্র মনে করে জপ করে যাচ্ছে। "দুর্গা নাম মহামন্ত্র, হৃদয় সদা জপ নাম!"

কল্‌কাতার সেই বোর্ডিংটাতেও ব্যস্ততার আর শেষ ছিল না। কেউ কেউ বাড়ী চলেই গিয়েছে, কেউবা শেষ মুহূর্ত্ত পর্য্যন্ত থেকে যাবে। যারা বাড়ী যাচ্ছিল তারা তো খুসী বটেই, কতদিন পরে আত্মীয় স্বজনদের প্রিয় মুখগুলি দেখতে পাবে এই চিন্তা তাদের মনে প্রবল হলেও, সখীদের বিরহ যে তাদের কাতর করে না তুলছিল, এমন নয়! কতদিনে আবার আসবে কি ভাবে আসবে, হয়তো যে মুখগুলি ছেড়ে যাচ্ছে, পুনর্মিলনের দিনে তারা না থাকতেও পারে সব, এই রকম দুশ্চিন্তারও দু একটা কালো ছায়া, তাদের মনের ওপর চকিতে দেখা দিয়ে বাড়ী যাওয়ার আনন্দকে ম্লান করে তুল্‌ছিল।

মীনাদের বোর্ডিং থেকে প্রায় সবাই চলে গিয়েছে, বাকী শুধু তারা জন চারেক। তার মধ্যে তিনজনে মিলে চাঁদা করে গোটা উত্তর ভারত দেখে বেড়াবে, এটা অনেক আগেই ঠিক হয়ে ছিল, অপেক্ষা করছিল শুধু মীনার জন্য। তাকে তার বাবা হাজারিবাগ থেকে নিতে পাঠালেই, অন্য তিনজনে নির্ভাবনায় বেরিয়ে যেতে পারে।

মীনার কোন উপায় না হওয়া অর্থাৎ তার বাবার কাছে রওনা না হওয়া পর্য্যন্ত মিস হাজরাও আটকে পড়েছিলেন। তাঁর এক একটী দিন যাচ্ছিল, আর তিনি মীনার ওপর বিরক্তির মাত্রা বাড়িয়ে তুল্‌ছিলেন। শেষে মীনাকে নিতে তার বাবা লোক পাঠালেন।

লোক যে এল তার নাম যতীশ্বর! তার সঙ্গেই সে নিজের সব কিছু জিনিস গুছিয়ে নিয়ে রওনা হল। কারণ মীনার বাবা রমাপতি বাবু যে চিঠি দিয়েছিলেন তাতে লেখা ছিল যে মীনার বোর্ডিং বাস আপাততঃ শেষ হল। দরকার হলে ছুটির পরে এসে আবার এ্যাডমিশন নেবে।

মিস্ হাজরা যখন গম্ভীর মুখে এই আদেশ প্রচার করে চলে গেলেন, তখন উপস্থিত চারটী প্রাণীরই গভীর বিস্ময়ে কথা আর ফুটলো না। এ পরোক্ষ ইঙ্গিতের যে কী অর্থ তা বুঝে নিতে প্রথম যে কথাটী সকলের মনে হল, তার শুদ্ধ ভাষায় নাম উদ্বাহ, অর্থাৎ বিয়ে! মাধবীই এই নিস্তব্ধতা ভাঙলে। বল্লে "মীনু, আর কি, এবার নীরস নোট লেখা থেকে অব্যাহতি পেয়ে 'প্রেয়সী বধূর' সাজ পরো গে। আর দুকাণ ভরে অনবরত শোনা গে

'তোমারেই ভাল বাসিয়াছি আমি শতরূপে শতবার,
যুগে যুগে অনিবার—"

হেসে মীনা বললে "তুই যে রাম না হতেই রামায়ণ আরম্ভ করলি মাধু! বিয়ে ছাড়া কি আর যুক্তি সঙ্গত কোনো কারণ থাকতে পারে না বোর্ডিং ছাড়বার ?—"

'কোনো কারণই থাকৃতে পারে না মশায়, কোনো কারণই থাকতে পারে না। স্কুল, কলেজ ছাড়বার মত

যুক্তিসঙ্গত কারণ একমাত্র, সেটা হচ্ছে 'বিয়ে'। হিন্দুর মেয়ের তা ছাড়া আর কোনো কারণই থাকে না। বোর্ডিং এই থাক, আর কলেজেই পড়, সেন্‌সাসের সময় 'কাষ্ট' হিন্দুই লেখাতে হবে তো ?"

"বিশ্বাস কর মাধু সে সব কিছু নয়। হয়তো মা জেদ ধরেছেন আর বোর্ডিং এ রাখবেন না—অগত্যা কলেজ ত্যাগ। ও আমার মোটেই মনে হয় না।"—

"ওরে বাস্‌রে! কেন? তুমি কি? আর যদি গিয়ে দেখ যে চেলীর কাপড় আর মাথার 'সিঁথি ময়ুর' শুধু তোমার পরবার পথ চেয়ে পড়ে আছে, তা কি করবে?"—

এবারে মীনা সশব্দে হেসে বল্‌লে তোমার 'কথাতেই তুমি ঠক্‌লে এবার! কারণ আমরা যখন হিন্দু, তখন বিয়েটা যদি হতেই হয়, তবে এ দুমাসে হবে না—আশ্বিন, কার্তিকে কি হিন্দু মতে বিয়ে হয়?—কাজেই 'সিঁথি ময়ুর' আর চেলীর শাড়ী শুধু পর্‌বার অপেক্ষায় নয়, কিনবার অপেক্ষাতেও থাক্‌বে—হয়তো বা তৈরীর অপেক্ষাও তারা করবে।"

"হয়েছে, হয়েছে মীনু দর্প করে অত বলিসনে। জানিস্ তো "অতি দর্পে হতা লঙ্কা"।

"খুব জানি। কিন্তু এও জানিস্ মাধু, যে বিয়েই যদি কর্‌তে হয় আমাকে তো, তোরা তার অনেক আগেই খবর পাবি। আর জুটতেও হবে সবাইকে এসে—না হলে 'শিবহীন যজ্ঞ' হবে নাকি!"

একটু হেসে মাধবী ও সুপ্রীতি বল্‌লে "হাঁ রে মীনু, আগে সবাই বলে থাকে, তারপরে, একেবারে সিঁদুর পরে এসে হাজির হয়। আর ক্রমে ক্রমে সেই নতুন সাথীটার মায়ায় এমন জড়িয়ে পড়ে যে পুরাণোদের কথা আর মনেই থাকে না।"

অনীতা খ্রীষ্টান রোমান ক্যাথলিক। উদাস ভাবে বল্‌লে "বড়জোর একপাতা লুচি খেয়ে তোদের যুগল রূপ দেখে আস্‌ব—এর বেশী আর আমি কি করতে পারি? অবিশ্যি যদি তুই নেমন্তন্ন করিস।—"

হাতের খাতাটা দিয়ে ঠক্ করে অনীতার পিঠে একটা আঘাত করে মীনা উচ্ছ্বসিত হয়ে হাস্‌তে হাস্‌তে বল্‌লে "এত কথাও জানিস্ তোরা?—"—

হাজারিবাগের পথ। ভোরে ট্রেণ থেকে নেমে "প্রেজার কারে" করে মীনা যতীশ্বরের সঙ্গে 'হাজারীবাগ টাউনে' চলেছে। বাড়ী থেকে তাকে ষ্টেশনে নিতে এসেছিল তাদের অনেক দিনের পুরোণো জমাদার। সামনে ড্রাইভার, তার পাশে যতীশ্বর, তার পাশে হীরা সিং এর দীর্ঘ, উন্নত চোহারা মাঝে মাঝে সামনের দৃশ্যগুলোকে ঝাপসা করে তুল্‌ছিল। মীনা ভাবছিল, তার বোর্ডিং থেকে আস্‌বার দিনটার কথা। মাধু, সুপ্রীতি ও অনীতা যদিও তাকে হাসিমুখেই ষ্টেশনে তুলে দিতে এসেছিল, তবুও তারা এবং সে, সব ক'জনেই যেন মনে মনে বুঝতে পারছিল যে হয়তো এমন ভাবে আর মেলা হবে না। কতদিনের কত সুখ দুঃখের সাথী তারা, বালিকা মীনা ধীরে ধীরে পরিণত হয়ে আজ পূর্ণ তরুণী! তার মনের বাসনা পুষ্প এদের কাছেই ধীরে ধীরে দল খুলেছে, এদের সে সখী বলে ভালবেসেছে এদেরই সে বিশেষ করে চেনে! যদিই আর বোর্ডিংএ যাওয়া না হয় যদিই এই চলে আসাই শেষ হয়, তবে পরের দিনগুলো কি করে কাটবে, এই চিন্তাতে মীনা এখনই কাতর হয়ে পড়ছিল। মনে পড়ছিল সখীদের অশ্রু সজল ম্লান দৃষ্টির মধ্যেকার জোর করে মুখে ফুটিয়ে তোলা ম্লান হাসিটুকু আর মনে পড়ছিল ঠোঁটের ভিতর থেকে ঠেলে বেরিয়ে আসা "au revoir!" কথাটা! নিজের মনে এই সব আলোচনা করতে করতে তার মন এমন জায়গায় এসে থামল যেখানে অতি ধীরে ছুঁলেও সমস্ত রক্তাক্ত হয়ে ওঠে। সকালের মাঠের হাওয়া, দীর্ঘ সরল পথ, মোটরের অবাধ গতি কিছুই তার মনকে আকর্ষণ করতে পার্‌লে না। দুধারের খোলা মাঠের মাঝে, রাখালের মেঠো সুরে মন তার কোথায় হারিয়ে গেল।

মোটর চল্‌তেই থাকল। রাঁচি, হাজারিবাগ, জগদীশপুর, গিরিধি, এ সব জায়গায় মোটর চালাবার যে কি সুবিধা তা বলে শেষ করা যায় না। যেমন সুন্দর পথ, তেমনি তার প্রাকৃতিক দৃশ্য। পথে অনাবশ্যক কোনো জীব, জন্তু এমন কি মানুষও নেই। হাট বার না হলে লোক দেখাই যায় না। একটানে, বিনা বাধায় চলে এসে মোটর 'বগোদরে' থামল। এটা হল হাজারিবাগ রোড থেকে হাজারি বাগ টাউনে যেতে হলে প্রায় ৪০ মাইলের মাঝামাঝি একটা 'হল্টিং' ষ্টেশন। দু চার ঘর লোকের

বসতিও আছে। আর আছে একটা আড্ডা। যেখানে মোটর প্রভৃতি অচল হলে তাকে সচল করবার ও তার যত কিছু দরকার হতে পারে সবেরই ব্যবস্থা করা যায়। মোটর থামলে মীনা দরজাটা খুলে নেমে পড়ে একটু পায়ে হাটবার লোভে চল্‌তে থাক্‌ল। হীরা সিং তার লম্বা লাঠিখানা নিয়ে তার অনুসরণ করতেই, সে হেসে বললে "দরকার নেই দরোয়ান—আমি বেশী দূর যাব না।"

সকালের ঝল্‌মলে আলোয় চারিদিকের মাঠ ভরে গিয়েছে—হয়তো দু একটা পাখী এসে একটু বস্‌ছে আবার উড়ে চলে যাচ্ছে, গরুর গলার ঘণ্টাগুলো টুং টাং করে মৃদু মধুর বেজে এক অপূর্ব্ব রাগিণীর সৃষ্টি কর্‌ছে। চারিদিকের সজীবতা ও আনন্দ দেখে মীনার মনে অচলায়তনের পঞ্চকের মত বন্ধন মুক্ত হবার একটা আকাঙ্ক্ষা জেগে উঠল।

পিছন থেকে যতীশ্বর বললে "হেঁটেই কি বাকী পথটুকু শেষ করবে নাকি ?"

"আ! যতীদা, তুমি যে দেখছি 'স্পাই' হয়ে উঠলে! দু পা এসেছি কিনা, অমনি পিছু নিয়েছ ? তোমাদের জ্বালায়, আমরা কি স্বস্তিতে নিশ্বাস ফেলতেও পাব না ?

শান্তস্বরে যতীশ্বর বল্‌লে "পাবে, বাড়ী গিয়ে। তোমার বাবা, যার কাছে তোমাকে সসম্মানে পৌঁছে দিতে আমি বাধ্য এবং অনুরুদ্ধও বটে! সুতরাং বুঝতেই পারছ, যতক্ষণ তুমি আমার দায়ীত্বের মধ্যে আছ, ততক্ষণ তোমাকে খুসীমত চল্‌তে দিয়ে আমি তোমার কিছু অত্যাহিতের দায়ী হতে পারব না।"

"বক্তৃতা দিতে খুব পার তো। হেঁটে বেড়ানর মধ্যে অত্যাহিতটা কি এলো ?"

"কি, তা এখুনি দেখতে পেতে, বলেই যতী চোখের নিমেষে মীনাকে রাস্তার মাঝখান থেকে একেবারে মাঠের মধ্যে ঠেলে দিয়ে, নিজেও তার পাশে গিয়ে দাঁড়াল। মীনা বিরক্ত হয়ে 'আঃ' বল্‌তে গিয়ে থেমে গেল। একখানা মোটর মীনা যেখানে দাঁড়িয়েছিল সেইখান দিয়ে মুহূর্ত্তের মধ্যে উল্কার মত বেগে ছুটে গেল। বিশ পঁচিশ গজ গিয়ে সেখানা একেবারে থামল। গাড়ী থামার সঙ্গে সঙ্গে ড্রাইভার ও আরোহী দুজনেই লাফিয়ে নামল।

গাড়ীটা ছিন্নমস্তার দিক থেকে আস্‌ছিল। মাঝপথে কি একটা যন্ত্র খারাপ হয়ে যাওয়ায় এই গতিবেগের সৃষ্টি। আঘাত বেশী কারোই লাগেনি। গাড়ীটা একেবারে অকেজো হয়ে যাওয়ায় আরোহী খুবই মুস্কিলে পড়লেন দেখে যতী একটু এগিয়ে গিয়ে বল্লে "আপনি কোথায় যাবেন ? আমার দ্বারা আপনার কি কিছু সাহায্য হতে পারে ?"

ভদ্রলোক যেন অকূলে কূল পেলেন। বল্লেন "ছিন্নমস্তা" থেকে হাজারিবাগে ফিরে যাচ্ছিলাম। কিন্তু বোধহয় ফেরা এখন হল না। গাড়ী ঠিক না হলে কি করে যাব ?"

"যদি অসুবিধা মনে না করেন তো আমাদের গাড়ীটায় আসতে পারেন। আমাদের বাড়ী গিয়ে, সেখানে 'ডাল-ভাত "দুটী খেয়ে তার তারপরে আপনার গন্তব্য স্থানে আপনি যেতে পারেন। কি বলেন, আপত্তি আছে ?"

"থাকা উচিত নয়। কিন্তু আপনি তো আমাকে আহ্বান করছেন—বসাবেন কোথায় ? স্থানাভাব তো একান্তই দেখছি।"

যতী একথার জন্য প্রস্তুত ছিল। সে শুধু বল্লে "উঠে বসবার কথাটাই আপনি ভাববেন। স্থানাভাবের কথা তো আপনার নয়। "বলেই সে তাড়াতাড়ি হীরা সিংকে বল্‌লে দরোয়ান তুমি পিছনের লগেজ কেরিয়ারে কিংবা ছাদের উপরে এই বাকী পথটুকু যেতে পারবে ?"

হাতের লাঠিখানা সামনে ঝুকিয়ে সেলাম করে হীরা সিং বল্‌লে "আল্‌বাৎ! হুকুম হলে আমি পায়দলেই এক ক্রোশ পথ যেতে পারি।" বাঙ্গালীদের সঙ্গে ছোটবেলা থেকে, থেকে থেকে সে খুব ভাল বাংলা বল্‌তে পারত।

যতী বল্‌লে "না, অত কষ্ট করতে হবে না—গাড়ীতেই গেলে হবে।"

মীনা এতক্ষণ চুপ করে সব কথা শুনিতেছিল। যতীকে ডেকে এইবার সে বল্‌লে "যতীদা, তুমি গায়ে পড়ে এত আলাপ জমাতে পার, যে এক এক সময় রাগ ধরে যায়!"

"আচ্ছা সে না হয় আমার দোষ বলেই মেনে নিলাম—কিন্তু তোমার বাবার কানে যখন একথা উঠত, আর তিনি আমার বিবেচনার দোষ দিতেন, তখন কি তুমি আমাকে সে বকুনি থেকে রক্ষা করতে ?"

ঝাঁঝালো সুরে মীনা বল্‌লে "নেমন্তন্ন তো করা হল,

এখন বসাবে কোথায়, তোমার মাথায়? দেখ্‌ছ গাড়ী ভর্ত্তি—তবু—"

"আহা চট কেন মীনা—যেখানেই বসাই তোমার মাথায় বসাব না এটা ঠিক।" বলে হীরা সিংকে ইঙ্গিত করতেই সে গাড়ীর ছাদে উঠবার জন্যে ব্যস্ত হয়ে উঠ্‌ল। তা দেখে মীনা বল্‌লে "কি বুদ্ধি! বুড়ো মানুষ রদ্দুরে আমসী হয়ে যাক আর কি! তা হবেনা হীরাসিং তুমি গাড়ীর ভিতরে বসো।"

এক মুখ হেসে হীরা সিং 'খুকী দিদিমণির পায়ের কাছে গাড়ীর মেঝেতে বসে পড়ল। যতী নতুন লোকটীকে ডেকে নিয়ে গাড়ীতে উঠে বস্‌ল। ড্রাইভার ষ্টার্ট দিল।

যতীর এই কাণ্ডে মীনা তার ওপর হাড়ে চটে রইলো। সামনের মনোহর দৃশ্যগুলি তার মনকে কিছুতেই আকর্ষণ করতে পারলনা। নানা এলোমেলো ভাবনার মধ্যে দিয়ে সে এক সময় আবিষ্কার করলে যে নিজেরও অজ্ঞাত সারে সে কখন লোকটীর চেহারা দেখায় মন দিয়েছে। এই খবরটুকু জান্‌তে পেরেই তার কানের ডগা লাল হয়ে উঠল। এই অন্যমনস্কতার ভিতর দিয়ে প্রায় এগারটার সময় মীনাদের গাড়ী তাদের বাড়ীর ফটক দিয়ে সুরকি ঢালা পথের ওপর দিয়ে ঘুরে বারান্দার নীচে এসে থাম্‌ল। আষাঢ়ের মেঘের মত গম্ভীর মুখ নিয়ে সে গাড়ী থেকে নেমেই সামনের হলটায় ঢুকে গেল। যেতে যেতে শুন্‌তে পেলে যতী সেই লোকটীকে বল্‌ছে "আসুন প্রভাতবাবু কাকাবাবু এ সময়টায় বাগানের তদ্বিরে থাকেন। চলুন আপনাকে সেইখানেই নিয়ে যাই। ওরে গোসলখানায় জল দে।"

(৩)

হাজারিবাগ অঞ্চলে প্রায় দোতলা বাড়ী নেই বল্লেই চলে। যা দু-একখানা আছে, তা নিতান্ত সখের খাতিরে। মীনার বাবা রমাপতি বাবুরও এই ধরণের একখানা সখের দোতালা ঘর ছিল। যখন ছুটীতে মীনা আস্‌তো, তখন এই ঘরখানা ব্যবহার হতো—না হলে অন্য সময়ে তালা বন্ধ পড়েই থাক্‌তো।

এবারে মীনা বোর্ডিং থেকেই একটু বিষন্ন মন নিয়ে এসেছিল, তার ওপর পথের মধ্যে যতীর আত্মীয়তায় বাড়ীতে একটী নতুন অতিথির উদয় হওয়ায় সে মনে মনে তার ওপর বিষম চটে ছিল। শুধু খাওয়ার সময় ছাড়া সে আর তার সেই ঘরখানা ছেড়ে নড়ত না। নীচে, বাড়ীর হাতার মধ্যে প্রকাণ্ড বাগান থাকা সত্বেও তার বেড়াবার সীমানা দোতলার ছাদ পর্য্যন্তই বদ্ধ হয়ে রইলো।—

সন্ধ্যার আবছায়ার মধ্যে মীনা একলাই ঘুরে বেড়াচ্ছিল, ভাব্‌ছিল নতুন লোকটীর বেয়াড়া আক্কেলের কথা। সেই যে দু-তিন দিন আগে মোটর ভাঙার সুযোগ নিয়ে এ বাড়ীতে এসে ঢুকেছে, যাওয়ার তো আর নাম নেই! তারপরে সবরাগ গিয়ে পড়ল তার নিরীহ বাবার উপর! বাবা যেন কি! লোক দেখ্‌লে যেন স্বর্গ পান! কবেকার কে, কোথাকার চেনা, অমনি তাঁর কায়েমী বন্দোবস্ত হয়ে গেল এখানে! বাইরের লোক এসে ঘর জুড়ে বসে রইলো, আর তার জন্যে, সে স্বচ্ছন্দ মনে হাঁটা চলা করতে পাবে না! যদিও রমাপতিবাবুর মতটা স্ত্রী স্বাধীনতার খুব পক্ষপাতী ছিল, তবুও মীনা এখন রাগের ঝোঁকে সবটাই তাঁকে দোষ দিয়ে দিল।

অন্ধকার গাঢ় হয়ে এল। সে উঠে নিজের ঘরের আলোটা জেলে সেই আলোর দিকে চেয়ে চুপ করে বসে রইলো। দু-তিন দিন আসা হল, অথচ কেন যে তাকে বোর্ডিং ছাড়ান হল, সে খবরটা আজও সংগ্রহ হয়ে ওঠেনি। তার মনে অবিশ্যি জিজ্ঞাসা করবার জন্যে প্রবল একটা আগ্রহ হচ্ছিল কিন্তু ওই নতুন লোকটীর হঠাৎ এসে পড়ায় তার মন এত বিক্ষিপ্ত হয়ে উঠেছিল যে তার যে কোন বিষয়েই অসুবিধা বা খারাপ বোধ হচ্ছিল সবের জন্যই সে ওই প্রভাতকেই দায়ী করছিল।

নীচে শাঁখের শব্দ শোনা গেল! চমকে উঠে, খোলা চুলটা বাঁ হাতে জড়াতে জড়াতে সে নীচে নাম্‌ল। নেমে দেখলে তার মা তখন হিন্দুস্থানী ঝিএর সঙ্গে বাজারের ফেরত পয়সা নিয়ে খুব বকাবকি করছিলেন। সেদিন ছিল হাটবার। দুপুরে হাট বসে প্রায় সন্ধ্যার সময়ে ভাঙে। একেবারে দু-তিন দিনের মত বাজার করে রাখতে হয়। অনেকক্ষণ ধরে বকাবকি করে মীনার মা শতদল ক্লান্ত হয়ে পড়েছিলেন। তাকে আসতে দেখে পারিত্রাণ পেয়ে বল্লেন "এসেছিল মা মিনি! দাই এর কাছে বাজারের হিসেবটা মিলিয়ে নে তো! আমি যাই, উনি আবার

আজ প্রভাতবাবুকে খাওয়ানো উপলক্ষ্য করে জন কুড়ি, পঁচিশ লোক নেমন্তন্ন করেছেন। না দেখিয়ে দিলে পোলাও আর মাংসটা মহারাজ যা করে রাখবে তার ঠিক নেই! আর হ্যাঁ আর একটা কথা ভুলেই যাচ্ছি—হিসেব মিলিয়ে, তুই যদি মা একবার চপের পুরটা ঠিক করে দিস্!" শতদল কাজের তাড়ায় চলে গেলেন।

হাতের কাছে একটা কাজ পেয়ে মীনার বিমনা মনটা একটু খুসী হয়ে উঠছিল। কিন্তু ফের এই প্রভাতের খাওয়ার কথায়, তার মন দ্বিগুণ বেঁকে বস্ল। কে এই প্রভাত! কোথায় ছিল সে আর কেনই বা ছেলে বুড়ো ঝি, চাকর সবাই মিলে তাকে এমন করে ঘিরে ধরেছে? এ বাড়ীতে অপ্রত্যাশিত, অনাহুত অতিথি তো এই প্রথম নয়? কত এসেছে, কত গিয়েছে। কেউ কিন্তু এমন করে আসন পেতে বসে নি তো! এই হাজারিবাগে এসে কণ্ট্রাক্টর রমাপতিবাবুর বাড়ীতে যে অন্ততঃ একবেলাও না খেয়েছে, তার হাজারিবাগ আসা অসার্থক! আর কি বেহায়া এই প্রভাত! যার সঙ্গে চেনা নাই, যাকে চোখেও একদিন দেখেনি, বিপদে পড়ে তার বাড়ী এসে, দিব্যি দিনের পর দিন কাটিয়ে দিচ্ছে! সব শেষে রাগ হল নিজের ওপর। কেনই বা সে প্রভাতের সামনে বের হয় না। একি রাগ, না লজ্জা, না উপেক্ষা, না অনুরাগ? শেষের কথাটা মনে হতেই মন তার আবার বেঁকে বসল। দাই বললে "দিদি অন্য কাজে যাব, হিসেব মিলিয়ে নেও!" এক ধমকে তাকে চুপ করিয়ে মীনা বল্লে "যা, যা, তুই তোর কাজে যা অন্য সময়ে বলিস্ লিখে নেবঁ।" বলে সে যেন এতক্ষণে মায়ের দ্বিতীয় অনুরোধের কথাটা একবার ভেবে দেখলে—তারপর ঠোঁট উল্টিয়ে বললে "পারবনা আমি—ভারী বয়ে গিয়েছে, আমার করতে। ওই মহারাজই যা পারে করবে না হয় বৌদি দেখাবে'খন।

পাশেই ছোট একটা ভাঁড়ার ঘর ছিল। কাছেই সেই ঘরটা পেয়ে মীনা তাতে ঢুকে পড়ে দেখলে তার বৌদি মলিনা যেন বিশ্বের সঙ্গে সকল সম্বন্ধ চুকিয়ে দিয়ে সেই ঘরে তরকারী কুটতে ব্যস্ত। সেখানে আর একজন ঝি শুধু তাকে সাহায্য করছে। মলিনার ও ঝিএর হাত ও মুখ সমানেই চল্‌ছে দেখে সে হেসে বল্লে "বক্তৃতাটা কিসের? বুঝিয়ে দিলে আমিও কিছু বল্‌তে পারি।"

মলিনাও ছাড়বার পাত্রী নয়—সেও হাই স্কুলে থার্ড ক্লাশ পর্য্যন্ত পড়েছে। বয়সে সে মীনার চেয়ে কিছু বড় হলেও বাড়ীতে আর কোনো সমবয়সি না থাকার দরুণ সম্বন্ধটা তাদের সখিত্বে এসে দাঁড়িয়েছে। হেসে বল্লে "শিখিয়ে পড়িয়ে দেওয়ার পরে যে বাগ্মী বক্তৃতা করতে আসে, তার বক্তৃতা দিয়ে আর বিড়ম্বনা ভোগ করানো—কেন? সভায় ঢুকে যিনি বুঝতে না পারবেন যে সভার উদ্দেশ্যে কি, তাঁর না ঢোকাই ভাল।"—

"আজকের প্রেসিডেণ্ট কে?"

"প্রেসিটেণ্ট এখনও কাউকে করা হয়নি মিনু, তোর জন্যে ঐ পদটা আর আসনটা খালি রেখেছি।" বলে মলিনা মীনাকে বস্‌বার জন্যে একটা চালের বস্তা দেখিয়ে দিয়ে তার দিকে চেয়ে বল্লে "তারপর, এই সন্ধ্যে বেলা পর্য্যন্ত বিদুষী মহিলার হচ্ছিল কি?—চুল টুল কিছুই তো বাঁধা হয়নি দেখছি, কি ভাবে বিভোরা ছিলে?—পড়ার না বিয়ের?"—

মীনা মলিনার ঠিক সাম্‌নে বসেছিল। হাত বাড়িয়ে তার পরিপাটী করে বাঁধা এলো চুলের খোঁপাটাতে একটান দিয়ে সে বল্লে "বিয়ের ভাবনায় আমার তো ঘুমই আস্‌ছেনা তোমার বুঝি তাই হ'ত?"—

"তা, একেবারে যে কিছু হ'ত না, তা কি করে বলি! এই ধর্ মনটা উড়ু উড়ু ঠিক যেন পাখীর মত, প্রাণটা ত্রাহি, ত্রাহি, যেন তপ্ত খোলায় কৈ মাছ, জীবনটা বিফল, যেন ইউনিভারসিটীর সদ্য ফেল করা ছাত্র, তনু অবশ—'সখি ধর, ধর, কাঁপে লো অন্তর মোর' ভাব, হয়েছিল বই কি। এই সব লক্ষণ মিলিয়ে দেখে তবে না আমার বিয়ের 'সময়' এল। তোর যখন এ রকমটী হবে, বুঝ্‌বি 'নিদান কাল' এসেছে—আমাকে বলিস্; ওষুধ দেব।"

"বাবা রে বাবা, এত কথাও জানিস্ ভাই বৌদি। আমার কিন্তু ওসব কিছু না হলেও মনটা বড় খারাপ হয়ে আছে, তাই তোমার কাছে এলাম, তুমি আর দগ্ধিও না।"

"এই হয়েছে—এও একটা লক্ষণ। মাকে বলে, তোমার একটা গতি শীগ্‌গীরই করতে হবে—দেরী নয়।"

"কেন, আমি কি 'অবারের' মড়া যে আমার গতি করবে। তোমার মেয়ে ক'টীর বেশ ভাল করে গতি

করে দেও যে মহা পুণ্যি হবে। আমাকে নিয়ে পড়্লে কেন? বিয়ে বিয়ে করে আমি হেদিয়ে মর্‌ছিনে।"

"চালাক মেয়ে যে! বাইরে মরবে কেন? ভেতরে ভেতরে 'খাবি' খাচ্ছ!"

ঘরের দরজায় মীনার বড়দাদা শুভ্রাংশু দাঁড়ালেন। বল্লেন "'খাবি' খাচ্ছেন কে, খাওয়াচ্ছে বা কে?"

শুভ্রাংশুকে আস্‌তে দেখে মীনা লজ্জায় অস্থির হল এই ভেবে যে হয়তো তার বৌদি এখন কি বেঁফাস কথা বলে তাকে অতিষ্ঠ করে তুল্‌বে। হলোও তাই—মুখরা মলিনা বল্লে "তোমার বোনের তো তোমরা কোন খবর রাখ না—বিয়ের বয়েস হল, অথচ বিয়ে দেওয়ার নামটী নেই। মরা কেটে কেটে, আর দিন রাত মানুষের দেহের কষ্ট বুঝে বুঝে কি আর তুমি জ্যান্ত মানুষের মনের কষ্ট কিছু বোঝ না!" বলা বাহুল্য শুভ্রাংশু ডাক্তার।

স্নিগ্ধ চোখে বোনের দিকে চেয়ে তিনি বল্লেন "ভাঁড়ারে আর রান্নাঘরে তোমাকে ধরে না মলিনা তুমি নারী জাগরণের দোহাই দিয়ে দেশের কাজে নেমে পড়।"

মলিনা বল্লে "যেতে তো চাই—শুধু তোমার দশা কি হবে ভেবে, আমার যেতে ইচ্ছে হয় না"

"মরিব মরিব সখি, নিশ্চয় মরিব—
কানু হেন গুণনিধি কারে দিয়ে যাব!"

মীনা ও ঝি এদের অজ্ঞাতসারে অনেকক্ষণ চলে গিয়েছিল।

ডাক্তার হলেও শুভ্রাংশুর ভিতরটা এখনও শুকিয়ে যায় নি; সেখানে প্রেমিকের প্রাণ তখনো জেগেছিল। সুন্দর সন্ধ্যা, নির্জ্জন ঘর ও অনুপম সুন্দর মুখের আকর্ষণে ডাক্তার শুভ্রাংশু হঠাৎ নব বিবাহিত শুভ্রাংশু হয়ে মলিনার বঁটির পাশে বসে পড়ে তাকে একেবারে কাছে টেনে নিয়ে বল্লেন "এই পঁচিশ, ছাব্বিশ বছরেই মরার কথা কেন? ডাক্তার হলেও, তোমার মরার কথা, আমাকে দুর্ব্বল করে ফেলে। শুধু শুধু এমন করে কষ্ট দিয়ে কি লাভ?"

মলিনাও এক মিনিটের জন্যে তার কাজ বন্ধ রেখে কি বল্‌তে যাচ্ছিল—ব্যস্তভাবে শতদল সে ঘরে ঢুকে যেন অপ্রস্তুত ভাবে বল্লেন "মলিনা, মা, পেলাম না তো সেই মসলার পোঁট্‌লাটা?" বলে ঘরের ভিতরে এটা সেটা নাড়তে লাগলেন।

শুভ্রাংশু মায়ের সাম্‌নে হাতে হাতে ধরা পড়ে কি বল্‌বে ভেবে না পেয়ে বল্লে "মিনি, কোথায় গেল মা বাবা তাকে তৈরী হয়ে নিতে বল্লেন—বাইরে গোটা কতক গান টান করবে।" তাড়াতাড়ি সে ঘর থেকে বেরিয়ে গিয়ে তিনি যেন বাঁচলেন।

ছেলের এই ছলনাটুকু শতদলের চোখ এড়াল না—প্রৌঢ়া শতদল শুধু একটু মুচকে হাস্‌লেন।

(৪)

প্রভাতের কাছে তার পরিচয় নিয়ে রমাপতি বাবু যখন জানলেন যে সে তাঁর বাল্য বন্ধু ও সতীর্থ জগমোহন বাবুর ছেলে, তখন একদিকে বন্ধুর ছেলে বলে ও অন্য দিকে অতিথি বলে তার সমাদরটা তাঁর কাছে খুব বেড়ে গেল। তাঁর এই আনন্দ উচ্ছ্বাস কিন্তু তিনি তাঁর মনে সংযত রেখে, আর একটা যে ধীরে ধীরে অঙ্কুরিত হয়ে শাখা পল্লবে, তাঁর মনকে ঢেকে ফেল্‌ছিল, সেটার কথাই তিনি তাঁর উপযুক্ত পুত্র ও মন্ত্রণা দায়ক শুভ্রাংশুকে জানিয়েছিলেন। শুভ্রাংশু, পিতার কথামত, তাঁর মনের ইচ্ছাটী কাকেও জানালে না।

যে রমাপতি বাবুকে লোকে সংসার বিষয়ে উদাসীন বলেই জান্‌তো তিনি তাঁর একমাত্র মেয়ে মীনার জন্যে অনেকখানি সংসার আসক্তির পরিচয় দিলেন। শতদলকেও না জানিয়ে তিনি প্রভাতের বাবা জগমোহন বাবুকে, তাঁর আসার কথা, মোটর ভেঙে যাওয়ার সব জানিয়ে শেষে লিখ্‌লেন—

"এতদিন দেশ-ছাড়া হয়ে অচিন্তিত ভাবে যখন তোমার ছেলেটীকে দেখ্‌তে পেলাম, তখন থেকেই মনে করছি, একে আপনার করে রেখে দিই। তোমার ছেলেকে যত দেখছি ততই মুগ্ধ হচ্ছি। সহজ ভাষায়, আমার একটী মেয়ে আছে সে বেথুনে আই,এ, পড়্‌ছে—তোমার ছেলের সঙ্গে তার বিবাহ দিতে চাই। মেয়ে সম্বন্ধে বেশী কিছু লিখ্‌বনা—তুমি এলেই দেখ্‌তে পাবে। বুড়ো হয়েছি, কখন ডাক্ এসে পড়বে—ছেলেদের লেখাপড়া শেখাচ্ছি—কপালে থাকে তো ভদ্রভাবে খেতে পাবে—মেয়েটীর ভার যদি তুমি নেও তো এজন্মের মত নিশ্চিন্ত হই। তোমার ছেলে এখানে আছে বলে মনে করোনা, যে আমার মেয়ের সঙ্গে তার কোর্টশিপ চল্‌ছে

মেয়েকে কলেজেই পড়াই আর বোর্ডিংএই রাখি, বাড়ীতে অনাচার ঘটানোর পক্ষপাতী আমি নই। শীঘ্র মতামত জানিয়ে নিশ্চিন্ত করে দিও।

শ্রীরমাপতি মিত্র

যথা সময়ে তাঁর ঈপ্সিত উত্তর এল। জগমোহন খুব উদার ভাবে জানিয়েছেন

প্রিয় রমাপতি,

বহুদিন পরে তোমার চিঠি পেলাম। তোমার খবর আমি প্রায়ই নিয়ে থাকি। কারণ হাজারিবাগ অঞ্চলে যে যায়, এসে বলে, রমাপতি বাবু কন্‌ট্রাক্‌টরের বাড়ীর আতিথ্য যত্ন ও সমাদরের কথা। আমি শুনে মনে মনে হাসি।—থাক্।

প্রভাত বাবাজী তোমার কাছে আছে, বড় সুখের কথা। ছুটির আগে আমাকে লিখেছিল, ছুটি হলে হপ্তা দুয়েক পরে সে কুমিল্লায় আস্‌বে—এ দু হপ্তা সে দেশ দেশ ঘুরে বেড়াতে চায়। আমি অমত করিনি, কারণ ছেলে এখন বড় হয়েছে, মনের খোরাকও চাই। এখনকার ছেলে পিলেরা আর ছুটি হলে আমাদের মত পুকুরে ঝাঁপিয়ে, বাজা রেখে ভাত খেয়ে, বাইচ খেলে, দাঁড় টেনে আমোদ বা তৃপ্তি পায়না—এসব গেঁয়োমি। তারা চায় 'ট্রাভ্‌ল' আর 'রিফ্রেস' হ'তে। দেখছ তো পাড়াগাঁয়ে থাকি বলে, মতটাও আমার পুরোণো বা পচা নয়।

সেদিন যে মোটর এ্যাক্‌সিডেণ্ট হয়েছিল তাও 'বিধিলিপি' দেখ্‌ছি। না হলে এত দেশ থাক্‌তে হাজারিবাগে যাওয়ার মন হবে কেন? আর ঘটনাটা তোমার লোকটীর সামনেই বা হবে কেন? এযে হতেই হ'ত। হিন্দু যখন, তখন অদৃষ্টকে তো মানতেই হবে। তাই আমার ঘরের লক্ষ্মী খুঁজতে প্রভাতকে অতদূরে যেতে হয়েছে।

তার পরে আসল কথা বলি। আমার ছেলেটীর বদলে তুমি তোমার মেয়েটী আমাকে দেবে লিখেছ, এর চেয়ে সুখবর আর কি হতে পারে? আজ বহুদিন আমি বিপত্নীক—সুতরাং লক্ষ্মীছাড়া—বহুদিন পরে বুড়ো বয়সে তুমি আমাকে লক্ষ্মীর পুনঃ প্রতিষ্ঠা কর্‌বার লোভ দেখিয়েছ। আমি একটু আভাস পেয়েই অনেকখানি লোভ করেছি—বুড়ো বয়সে চাকর বাকরের ভরসায় আর থাকতে পারিনা—ইচ্ছে করে ছোট বেলায় মার কোলের ছেলের মত শান্ত ভাবে, নিরুপদ্রবে জীবনের বাকী দিন ক'টা কাটিয়ে যাই। "আজি বড়ই শ্রান্ত আমি—ওমা কোলে তুলে নে না।"

বিপত্নীক হয়ে মাতৃহীন শিশু চারটীকে যে কী করে মানুষ করেছি তা অন্তর্যামী জানেন! বড় হয়ে মেজ ছেলে প্রভাস জাপান যেতে চাইলে, সেজ প্রণব বল্লে দেশে কিছু হবে না বাবা—বিলেত থেকে টেলিগ্রাফি শিখে আসি—সেও গেল। প্রভাতকে বল্‌লাম তুই বা কেন বাকি থাকিস্ বাছা—তুইও হনলুলু কি নিউজীল্যাণ্ড ঘুরে আয়। প্রভাত তখন এম, এ পড়ছে বল্লে "সবাই গেলে চল্‌বে কেন বাবা? ওরা আসুক তো সুবিধা হলে আমি যাব। আপনাকে দেখবারও তো লোক চাই। প্রভাস ও প্রণব ফিরে এসেছে—এখন ছোট প্রশান্ত যেতে চাইছে। কিন্তু প্রভাত যাওয়ার নামও করে নি আর। তোমার মেয়ে খারাপ হবেনা শিক্ষা দীক্ষায়—তাই আমার যে প্রভাত আমারই নিজের উন্নতির দিকটাও দেখ্‌লে না, তাকে তোমার মেয়ে দিয়ে তার জীবন ও আমার সংসারের গোড়া বাঁধতে চাই। অগ্রাণের প্রথমে যেদিন পাবে লিখো—আমি ছেলে নিয়ে হাজির হব।—

প্রভাতকে আমার চিঠি দেখাবে। আমি জানি, আমার ইচ্ছাই তার ইচ্ছা—সুতরাং সে অমত করবে না। তুমি আমার প্রীতি নিও। প্রভাত ও মা লক্ষ্মীকে আমার আন্তরিক আশীর্ব্বাদ জানিয়ো। বেহান্‌কে নমস্কার দিও। ইতি—

শ্রীজগমোহন দে।

রমাপতি যখন এই চিঠি পড়ে শেষ কর্‌লেন, তখন তাঁর আর সে আনন্দ একা মনে ধর্‌ছিল না। প্রথমেই তাঁর মনে হোল শতদলকে এবার বলা যাক্—কিন্তু আবার ভাবলেন, যেমন তিনি তাঁকে সংসার বিরাগী বলেন, তেমনি দেখিয়ে দেবেন যে উদাসী হয়েও, তলে তলে তিনি মেয়ের জন্যে কেমন সুপাত্র ছেঁকে তুলেছেন। শেষে ঠিক হোল প্রভাত যাওয়ার আগে তাকে যখন তার বাবার চিঠিখানি দেখানো হবে, তখনই সবাইকে জানিয়ে দেওয়া হবে যে প্রভাত শুধু পথ থেকে কুড়িয়ে আনা অতিথি নয় সে এবাড়ীর ভাবী জামাতা। মীনার মুখখানি মনে পড়্‌ল—

সঙ্গে সঙ্গে মনে পড়্‌ল একদিন তিনি প্রভাতকে নিয়ে ব্যস্ত ছিলেন বলে, সে যেন অভিমান করেই তাঁর কাছে আসেনি। অনুপস্থিতা মেয়েকে সম্বোধন করে তিনি বল্‌লেন "ওরে বেটি! তোর ঐ মান এবার আমি এমন জিনিস দিয়ে ভাঙব যে তুই আর কোনো দিন মান করে থাক্‌বিনে।"

ক' দিন থেকেই প্রভাত 'যাব' 'যাব' করছে—অফিস তার খুলে গিয়েছে, আর থাকা চলেনা কোনমতেই। রমাপতিবাবু ঠিক কর্‌লেন জন কয়েক বন্ধুলোক নিমন্ত্রণ করে প্রভাতকে তাঁর ভাবী জামাতা বলে তাঁদের সঙ্গে পরিচয় করিয়ে দেবেন। আর ওই সঙ্গে অমনি প্রভাতকেও তার বাবার চিঠিখানি পড়্‌তে দিয়ে তার মতামত জেনে নেবেন।

বাইরে তিনি প্রকাশ কর্‌লেন যে প্রভাত তাঁর বন্ধু-পুত্র। তাকে একটা বিদায় ভোজ দেওয়া একান্তই কর্ত্তব্য। শতদল তাঁর স্বামীকে খুব ভালমতই জান্‌তেন; সুতরাং বিস্মিত হবার কিছু পেলেন না। এ রকম ভোজ তো নৈমিত্তিক হয়ে দাঁড়িয়েছে।

সেদিন রমাপতিবাবু নিজের কাজ থেকে খুব সকাল সকাল ফিরে এলেন। উপযুক্ত ছেলে শুভ্রাংশুর সঙ্গে পরামর্শ করে ঠিক কর্‌লেন যে যদিও প্রভাতের বাবা সব বিষয়ই তাদের ওপর ছেড়ে দিয়েছেন, তবুও বিয়ের কথা পাকা হবার আগে, প্রভাতের একবার মীনাকে দেখা দরকার। যাতে করে বাড়ী গিয়ে প্রভাত তার বাবাকে ভাবী বধূ সম্বন্ধে কিছু বল্‌তে পার্‌বে। কিন্তু মীনাকে দেখান যায় কি করে? দেখ্‌লে প্রভাত যে অরাজী হবে, তা নয়; যে মেয়ে মীনা, ঘুণাক্ষরেও যদি এ চক্রান্তের আভাস পায় তো আর তাকে ঘর থেকে বের করাই যাবে না।

অনেক ভেবে ভেবে শুভ্রাংশু বল্‌লেন "গান শোনাবার নাম করে তাকে ডাকা যাক্‌। এতে তো আর অরাজী হবার কোনো কথা উঠ্‌তে পারে না।"

রমাপতিবাবু এতক্ষণ ঠিক মত 'হাল' ধরে এসে, তাঁর নিজের মেয়ের কাছে যেন হার মেনে যাচ্ছিলেন। কারণ মীনা তাঁর একমাত্র আদুরে মেয়ে। শিক্ষার সঙ্গে, তার দৃঢ়তা মিশে তাকে সকলের কাছেই একটু আলাদা করে রেখেছিল। তাইতে রমাপতিবাবু ভয় পেয়ে যাচ্ছিলেন। শুভ্রাংশুও যে ছোট বোনটীর কথা মোটেই জানতেন না এমন নয়। কিন্তু তিনি একেবারে 'হাল' ছেড়ে দেন নি।

লোক জন এসে পড়্‌ল। শুভ্রাংশু মীনাকে নিয়ে আস্‌বার জন্য গেলেন। প্রায় মিনিট পনের পরে তিনি মীনাকে নিয়ে ফির্‌তে রমাপতিবাবু হাঁপ ছেড়ে বাঁচ্‌লেন। রমাপতি বাবুরই সমবয়স্ক ও সহকর্ম্মী দয়ালবাবু মীনাকে বল্‌লেন "মা, মিনু, তোমার দু একটী গান শুন্‌তেই আমরা এসেছি, যদিও তার পরে খাওয়া দাওয়ার একটা কথা, আছে।" মীনা একটু হাস্‌লে। বল্‌লে "কাকাবাবু, গান যে আমার কত ভাল হয়, তা তো আর আমার নিজের জান্‌তে বাকি নাই-তবে আপনারা যে এই গান শুনেই 'ভাল' বলেন, সে শুধু ভাল গান শোনেন নি বলেই।"

"হোক্‌ মা তাই-ই হোক। তোমার কচি মুখে তুমি যা গাইবে তা-ই আমাদের ভাল লাগবে। অমৃতম্‌ বাল ভাষিতম্‌।"

এক বাড়ীতে থাকা সত্ত্বেও প্রভাত সেই একদিন ছাড়া মীনাকে আর দেখেই নি। তাও সে গাড়ীর সামনের 'সীটে' ছিল বলে ভাল করে দেখার সুযোগই হয়নি। আজ সামনা-সাম্‌নি মীনাকে দেখে সে একটু চম্‌কে গেল ও মনে মনে বল্‌লে এদের বুঝি সবই সাহেবী কায়দা? অনূঢ়া, তরুণী কন্যা, সকলের সঙ্গেই বুঝি মেলা মেশা করে? হবেও বা!"

অচেনা এক তরুণীর আসার সঙ্গে ঘরে অত লোক থাকতেও প্রভাত লজ্জায় ঘেমে উঠ্‌ল। বাতাস চলাচল না হলে যেমন দম বন্ধ হয়ে আসে, তার ঠিক সেই অবস্থা হয়ে এল। উঠে গিয়ে একটু মুক্ত বাতাস পাবার জন্য সে যেন অস্থির হয়ে উঠ্‌ল। শেষ পর্য্যন্ত, থাক্‌তে না পেরে সে সবার অলক্ষ্যে বাইরে যেতে চাইল, কিন্তু রমাপতি বাবুর দৃষ্টি প্রভাতের ওপরেই ছিল। সে বাইরে আসতেই তিনি তাকে তাঁর ঘরে ডেকে নিয়ে গিয়ে তার বাবার চিঠিখানি পড়্‌তে দিয়ে দরজাটা বন্ধ করে বাইরে এসে দাঁড়ালেন। মীনার গান তখন আরম্ভ হয়ে গিয়েছিল, তারই প্রথম লাইনটা বারে বারে এসে প্রভাতের কাণে ঢুক্‌ছিল, মনে নয়।—

গান আরম্ভ করার সঙ্গে সঙ্গে ঘর থেকে প্রভাতের চলে যাওয়া অবধি তার চোখে কিছুই এড়ায়নি। তাকে এড়িয়ে চল্‌বার এই সুস্পষ্ট নিদর্শনে কুঞ্চিত ভ্রূ তার আরো কুঞ্চিত হয়ে উঠ্‌ল। সে কিন্তু বাইরে গেয়েই চলল—

"ওহে সুন্দর, মম গৃহে আজি
পরমোৎসব রাতি।"

(ক্রমশঃ

ভারতবর্ষ—চৈত্র—১৩৩৭

এসংখ্যায় একখানি উপন্যাস "রক্তের টান" শেষ হইয়াছে! কেদারবাবুর "আই হ্যাজ" এবং বহুকাল পরে শরৎবাবুর "শেষ-প্রশ্ন" আবার দেখা গেল। "বিপত্তি" কিন্তু পূর্ব্ববৎ পুরাদমে চলিতেছে।

ছোট গল্পের সমষ্টি এ সংখ্যায় মাত্র তিন। প্রথম গল্প শ্রীপ্রফুল্লকুমার সরকারের "বাজীকর।" গোড়া হইতে শেষ অবধি করুণ রসসৃষ্টির প্রয়াসে রচনাটি জমিয়া উঠিতে পারে নাই। আর্থিক অভাবে মানুষকে যে দারুণ কষ্ট ভোগ করিতে হয়, তারই কতকগুলি সকরুণ বার্ত্তা ও দু'একটী ভাঙা ভাঙা চিত্র। কৌশলের অভাবে কোনটাই তারিফ করিবার মত হইয়া উঠে নাই।

দ্বিতীয় গল্প শ্রীজগৎ মিত্রের "বিংশ শতাব্দী।" সুপ্রাচীন-পন্থী ও অতি নবীন-পন্থীর জীবনধারায়, মত ও পথে যে সুগভীর বৈষম্য থাকে তারই একটী সকৌতুক ছবি লেখক বেশ লঘু হাতে অঙ্কিত করিয়াছেন। কিন্তু স্থানে স্থানে রঙ ও রস যেন অপরিমিত;—ইহাতে সৌন্দর্য্য একটু ক্ষুণ্ণ না হইয়া পারে নাই। যেমন—

"মোহিত গম্ভীর স্বরে বলিল "চট্‌বেন না বাবা, পাত্র সন্ধানে আছে।" "পিতা বলিতেছেন * * * আমার বাড়ীতে হিঁদুর বাড়ীতে 'লভ্‌?" আর এক জায়গায় "জানো আমি হিঁদুর সন্তান, স্কুল মাষ্টার?" মাষ্টার মহাশয়দের প্রতি এমন নির্ম্মম বিদ্রূপ কেন? ইহা কি কেবল অহেতুক কৌতুক না মূলে কোন দুঃখ-স্মৃতি বিজড়িত?

তারপর এমন মস্তিষ্কহীন স্বল্প মাহিনার স্কুল মাষ্টার কি খুঁজিলে মেলে যিনি মেয়ের উদ্বাহে বরপণ দিতে ব্যাকুল হ'ন? না দিলে ভাবেন, প্রাচীন প্রথার একটী বিশিষ্ট অঙ্গের হানি ঘটিতেছে?

লেখকের রসসৃষ্টির শক্তি আছে; প্রকাশ ভঙ্গীও বেশ এবং রচনাটিতে একটু বৈশিষ্ট্যও দেখা যায়।

তৃতীয় গল্প শ্রীঅরুণময় সেনগুপ্ত এম-এ ই:র "নির্ব্বাচন।" একটী বিশেষত্ব বর্জ্জিত অসম্পূর্ণ রচনা—না-মঞ্জুর করিলে পাঠকগণের ভাগ্যে পাঠের দুর্ভোগ ঘটিত না।

এ সংখ্যায় ভ্রমণ আছে একটী ডাঃ শ্রীবিমলাচরণ লাহা এম-এ ই:র "চক্রধরপুর!" সিংহভূম জেলার এই স্থানটি ও তৎসন্নিহিত অপরাপর দর্শনীয় স্থানগুলির সংক্ষিপ্ত খবর ইহাতে মেলে। রচনাটিতে হাস্যরস সৃষ্টির প্রয়াস দু'এক যায়গায় পরিস্ফুটই বলিতে হইবে। তবে মোটের ওপর পাঠে তেমন আমোদ হয় না।

এগুলি ছাড়া আরও একটী রস-রচনা আছে—শ্রীসুধাংশু কুমার হালদার আই-সি-এসের "মৃগদাবের মনস্তাপ।" কিন্তু ভারতবর্ষ যখন এটিকে "জাতকের" পর্য্যায়ভুক্ত করিয়াছেন, তখন ইহা বৌদ্ধগণের অবশ্য পাঠ্য ও পণ্ডিত-গণের অবশ্য জ্ঞাতব্য তথ্য এবং একটা নূতন সৃষ্টি বৈকি।

বাগবাজারের "নীলুখুড়ো" তাঁর ভ্রাতুষ্পুত্র-মহলে স্বীয় বুদ্ধি বিবেচনা ও বিচিত্র কর্ম্মবলে চিরস্মরণীয়। তিনি এক ভ্রাতুষ্পুত্রকে লইয়া হাওড়ার পোল পার হইতেই যে কাণ্ড ঘটাইয়াছিলেন, ভ্রাতুষ্পুত্রগণের মুখে আজও সে কর্ম্ম-মাহাত্ম্য শোনা যায়। আর এক "খুড়ো" তাঁর এক ভ্রাতুষ্পুত্রকে লইয়া প্রয়াগ ঘুরিয়া কাশী হইতে "মৃগদাব" বা সারনাথ অবধি গিয়া ভ্রাতুষ্পুত্রের যে দারুণ মনস্তাপের কারণ হইয়াছিলেন, রচনাটির রসভাগ তাহাই। এই "খুড়োটিও" "নীলু খুড়ো" অপেক্ষা যে বুদ্ধি বিবেচনা ও কর্ম্মমাহাত্ম্যে কম নয়—রচনাটিতে তার পরিচয় ও বার কয়েক অরসিকের মত "সে অনেক কথায়" আভাষ মেলে। যাহা হউক, "খুড়ো ভাইপোর" ব্যাপার—রস আছে!

এ সংখ্যায় ভারতবর্ষ পাঁচটি ও পরিশেষে একটী ছয়টী কবিতা ছাপিয়াছেন।

ষষ্ঠ কবিতাটি কবি উমাদেবীর তিরোধানে শ্রীনরেন্দ্র দেবের হৃদয়োচ্ছ্বাস। বাংলার কবিতা পাঠক-পাঠিকাগণের নিকট উমা দেবীর পরিচয় নিষ্প্রোয়জন। শ্রীনরেন্দ্র ইঁহাকে "বান্ধবী" "সখী" রূপে দেখিতেন। তাই শ্রীনরেন্দ্র খেদ করিতেছেন—

"* * * পেয়েছিনু যে মধুর স্নিগ্ধ পরিচয়
হে বান্ধবী জানি তাহা নহে ভুলিবার * * *"

তারপর "* * * আবার যেদিন টানিয়া আনিল মোরে তবদ্বারে সখী।"

কবি নিরঙ্কুশ কিন্তু চক্ষুষ্মান তাই—

"তথাপি দেখিয়াছিনু সর্ব্বাঙ্গ ব্যাপিয়া
আনন্দ চঞ্চল প্রাণ দুলিছে কাঁপিয়া।"

ইহা এক বর্ষণ-মুখর সন্ধ্যার আঁধারে যখন "কাব্যের কূজন ল'য়ে দু'জনে "নিভৃতে গুঞ্জন করিতেছিলেন, তখন কবির চোখে পড়ে। কিন্তু মোরা অন্ধ হে কবি—

দেখেছিলে কার—ওসে কার প্রাণ সর্ব্বাঙ্গে দুলিতে?

এই হৃদয়োচ্ছ্বাস শেষে গিয়া একেবারে মিলের জন্য কাগজে মাথা ঠুকিয়াছে—

"মুকুল ঝরিয়া গেল ফলে না চুমিতে
রজনী গন্ধার ডাল লুটালো ভূমিতে!"

ফল ফলিলে মুকুল তাতে যে চুমা দেয় এ উপমা অভিনব, অনুপম ও বড় মধুর। ইহাই শ্রীনরেন্দ্রের বিশেষত্ব। রজনী গন্ধার ডাল মাটিতে লুটাইতে দেখিয়া কবি খেদ করিয়াছেন; কিন্তু সে খেদের কোন কারণ নাই! একটা কাটি পুঁতিয়া সে ডাল আবার খাড়া করা চলে। ভাগ্যে ভারতবর্ষ কবিতাটিকে পরিশেষে ছাপিয়াছেন! নতুবা পাঠকমহলে কি কাণ্ড যে ঘটিত ভাবিতেই গা ছম্ ছম্ করে।

চারখানি রঙিন ছবিতে এবার অঙ্গ শোভার আয়োজন করা হইয়াছে।

প্রথম ছবি শ্রীযুক্ত সারদা উকীলের 'অন্নপূর্ণা'। শিব অন্নপূর্ণার দ্বারে ভিক্ষা মাগিতেছেন। ভারতীয় পদ্ধতিতে আঁকা। কাজেই শিবের চেহারা কৃকলাশের মত। তিনি অন্নপূর্ণার সম্মুখে যেমন করিয়া হাত তুলিয়া, পা বাঁকাইয়া বসিয়া আছেন তাতে তাঁর ভাঙের নেশাটা যে বেশ এক চড়িয়াছে এ বিষয়ে সন্দেহ করা যায় না। বোধ কি শিল্পী যখন শিবকে আঁকিতে ছিলেন তখনই নেশার মাত্রাট একটু বেশী ছিল। দেবতারা সোজা হইয়া দাঁড়াইয়া বাহু দিয়া জানু চুলকাইতে পারেন, কিন্তু পা' দুখানা দৈর্ঘ্য বর্ণনা আজ অবধি কোথাও শোনা যায় নাই তবে এই ছবিটি দেখিয়া একটা আন্দাজ পাওয়া যায়— হাঁ, লম্বা বটে। এবং যে দিকে ইচ্ছা সেদিকে তাহ বাঁকানো যায়। আর অন্নপূর্ণার কটিদেশ ও তদোর্দ্ধে বক্ষতা যেন কুঁজার সরুগলা ও পেট।

দ্বিতীয় ছবি "শ্রীযুক্তা হাসিরাশি দেবীর।

'ওরে, ও শ্বেত করবী!
—আজি কি সখী ভাঙলো ঘুমঘোর?"

এক বিলাতি পুতুল শ্বেতকরবীর ডালের আড়ে ফোটা করবীকে আঙুলে চাপিয়া নীরবে ঐ কথাগুলি বলিতেছে! ছবিখানি আড়ষ্ট।

তৃতীয় ছবি "শ্রীযুক্ত কুলজারঞ্জন চৌধুরীর লক্ষ্মণ ও সীতা।" দণ্ডকারণ্যের ব্যাপার ভয়াকুলা সীতা লক্ষ্মণকে বিপন্ন রামের সাহায্যে যাইতে বলিতেছেন। আর লক্ষ্মণসেনও হাত নাড়িয়া বলিতেছেন না—না—না। অবশ্য সীতার ও লক্ষ্মণের ছবি দেখিয়া তা বোঝা যায় না, আন্দাজে ধরিয়া লইতে হয়। ধানকী লক্ষ্মণ বীর ছিলেন; কিন্তু তিনি যে ভাবে ধনুর্দ্ধারণ করিয়া সীতার সম্মুখে দাঁড়াইয়া রহিয়াছেন, তাতে মনে হয়, ধনুকটি ফেলিতে পারিলে যেন বাঁচিয়া যান।

চতুর্থ ছবি "শ্রীযুক্ত নলিনীকান্ত মজুমদারের দিনের শেষে" দুইটি পশ্চিমা মজুর ও মজুরণী মাটি কাটিয়া সম্ভবতঃ ঘরেই ফিরিতেছে। মজুরটির কাঁধে আবার একটা খোকা—খুকীও হইতে পারে। কিন্তু ইহাদের চাঁচর কেশ ও চিকন বেশ দেখিয়া মনে হয়, যেন ছবি আঁকাইতেই দুজনে বাহির হইয়াছে। গায়ে একটুও মলিনতার ছাপ নাই, মুখে চোখে দেহে শ্রমশ্রান্তির আভাষও দেখা যায় না। এমন না হইলে আবার ছবি!"

রুচির কথাও একটু আছে এই যে বাঙালী শিল্পীরা বাংলার নরনারীর মধ্যে সৌন্দর্য্যের উপাদান খুঁজিয়া পান না—তাঁদের পছন্দ উৎকলবাসী অথবা সাঁওতাল বা

অবাঙালী। বাঙালী শিল্পীদের ইহাই বাঙালীত্ব। তাঁরা ঘর ছাড়িয়া পরের দিকেই চোখ দিয়া থাকেন।

প্রবাসী চৈত্র - ১৩৩৭

প্রবসীর এই সংখ্যা প্রবন্ধ গৌরবে অতুলনীয়। ইহা ছাড়া রবীন্দ্র নাথের দুইখানি চিঠি রাশিয়ার শিক্ষা সম্বন্ধে ও গ্রামবাসীদের প্রতি উপদেশ আছে।

গল্পরস পিপাসুগণের জন্যও দুইটি উপন্যাস ও চারটি ছোট গল্প আছে। উপন্যাস দুইটি পূর্ব্বের "মহামায়া" ও "অপরাজিত।" মহামায়া এই সংখ্যায়ই সমাপ্ত; কিন্তু অপরাজিত যে ঠিক কোন অবস্থায় তা বুঝা গেল না:— নীচে "ক্রমশঃ" বা "সমাপ্ত" কোনরূপ নির্দ্দেশই নাই; ইহার সমাপ্তি ও ক্রমান্বয় পাঠকের বুদ্ধির উপরই নির্ভর করিতেছে।

গল্প চারটির মধ্যে প্রথম গল্প শ্রীরামপদ মুখোপাধ্যায়ের "দীপশিখা ও তৈল।" বর্ত্তমান যুগের দীপশিখা যন্ত্র ও তার তৈল মানুষ। মানুষের সবটুকুর ইন্ধনে এই বিশাল শিখাটি লেলিহান জ্বলিতেছে। যারা ইহাকে জ্বালাইয়াছে তাদের কাছে হৃদয় মূল্যহীন—হৃদবৃত্তিগুলিকে তারা উপেক্ষা করিয়া চলে—এই কথাটি লেখক একটী মিলের গল্পে ব্যাখ্যা করিয়াছেন। কিসের মিল তা অবশ্য বলেন নাই, অবশ্য সে দরকারও নাই। Propagandaর উদ্দেশ্য বুঝানো লইয়া কথা। কিন্তু গল্পটি তারিফ করিবার মত নয়।

মাঝে একটু সৃষ্টি রহস্য আছে। আর এক যায়গায় লোক বলিতেছেন "× × × সহসা তরঙ্গশীর্ষ বিদীর্ণ হইয়া গেল। জলধির মধ্য স্থলে জাগিয়া উঠিল—একখণ্ড শ্যামল ভূমি। তিনি যেন অমৃতরূপিণী রমা,—প্রসন্ন হাস্যে মঙ্গলাশীষ বিলাইয়া তৃষ্ণার্ত্ত সৃষ্টির বিশুষ্ক প্রায় অধরে ইত্যাদি।"

তারপর তাঁর "রুক্ষ প্রান্তরে প্রথম অর্ঘ্য রচনা করিল নব-অঙ্কুরিত দূর্ব্বাদল।" ব্যাপার ভূতত্বের—কিন্তু সিন্ধুর তামসাচ্ছন্ন অন্তর তল হইতে যে ভূমি খণ্ড বাহির হইয়া আলোর তোরণ তলে দাঁড়াইল তার বর্ণ কি শ্যামল? আর "তৃষ্ণার্ত্ত সৃষ্টির বিশুষ্ক প্রায় অধর" বস্তুটি কি? সৃষ্টি যদি তৃষ্ণার্ত্ত হয় তবে "রচনাও" চাতকের মত "স্ফটিক জল" বলিয়া কণ্ঠ বিদীর্ণ করিতে পারে। তারপর ঐ ভূখণ্ডের জন্মের পূর্ব্বেও যে সৃজন লীলা নিশিদিন চলিতেছিল। জলধির গর্ভে অতি ক্ষুদ্র দেহী প্রাণীর দেহ স্তরে স্তরে পুঞ্জিকৃত হইয়া ভূমিকে সহসা জাগাইয়াছে। তা হইলে সৃষ্টির বিলুপ্ত প্রায় অধরে নয়, লীলা রসাতুর অধরপুটেই। তবে এ কথা গুলিকে "কবিত্বের প্রয়াস" বলিয়া উপেক্ষা করা যাইতে পারে। এই কবিত্বের মতে "তৈল" কথাটি কয়েক বার বড় অস্থানে সন্নিবিষ্ট হইয়াছে। যেমন "ভূমি লক্ষ্মীর পরমায়ু প্রদীপে নিরন্তর তৈল প্রদান" "পৃথিবীর তৈল বিন্দু" ও "বুকের তৈলবিন্দু পোষণে যাহার পরিপুষ্টি"—এত তৈলাধিক্য ভাল নয়।

দ্বিতীয় গল্প শ্রীবিভূতি ভূষণ মুখোপাধ্যায়ের "হারজিত।" একটী রস রচনা। দাম্পত্য কলহের কাণ্ড —রসটুকু ক্রুদ্ধা পত্নী ও শান্ত পতির কথোপকথনে মন্দ জমে নাই। কিন্তু কলহের কথাগুলি সকল সময় মনে হাসি-উৎসের দরজা খুলিয়া দেয় না।

তৃতীয় গল্প শ্রীদীনেশচন্দ্র গুপ্তের "মেঘ ও রৌদ্র।" দীনেশচন্দ্র কর্ণেল সিমসন হত্যামামলার প্রাণ দণ্ডে দণ্ডিত আসামী। গল্পটি বেশ ঝর ঝরে ভাষায় লিখিত। লেখকের সংযমও আছে। সুযোগ পাইলে তিনি কথা শিল্পেও নিপুণতা লাভ করিয়া যশার্জ্জনে সক্ষম হইতেন।

গল্পটি পুলিশের দারোগা নাম ধেয় কর্ম্মচারীর একটী চরিত্র চিত্র। দারোগা বাবু কেমন ক্ষণে ক্ষণে সূর্যের প্রচণ্ড তেজেরও মেঘের মত ছায়া ফেলিয়া আত্ম প্রকাশ করেন—নিম্নস্থ বা জনসাধারণের সঙ্গে ব্যবহারে তিনি প্রচণ্ড মার্ত্তণ্ড এবং উপর ওয়ালা বা শ্বেতাঙ্গের কেবল মাত্র নাম শ্রবণেই সন্ত্রস্ত শান্ত ও ভূমি বিলুণ্ঠিত হইয়া পড়েন—লেখক একটী ঘটনায় তাই অঙ্কিত করিয়াছেন। মনে হয় গল্পের নামটি "দারোগা চরিত" হইলেই বেশ খাঁজে খাঁজে বসিয়া যাইত।

চতুর্থ গল্প শ্রীঅপূর্ব্বমণি দত্তের "পুরুষস্য ভাগ্যং।" ভাল হয় নাই।

প্রবন্ধগুলির মধ্যে শ্রীনীরদ চন্দ্র চৌধুরীর "বাংলা দেশ ও ভারতবর্ষ"। প্রবন্ধটি আর কিছু না করুক পাঠকের মনে একটু উত্তেজনার সৃষ্টি করিবে। এই হিসাবে ইহা মাসিক সাহিত্যে স্থান না পাইয়া কোন সংবাদ পত্রে বাহির হওয়াই উচিৎ ছিল।

প্রবন্ধটির আগাগোড়াই উষ্মা ও শ্লেষ। বাঙালী জাতির প্রকৃত শক্তি যতটা না থাক তার হাঁক ডাক, প্রাদেশিকতা বোধ ও শক্তির গর্ব্ব আছে তার অপেক্ষা চতুর্গুণ এবং সেই কারণে সে ভারতের অপরাপর প্রদেশকে ছোট করিয়া আপনাকে তাদের হইতে বিচ্ছিন্ন করিয়া রাখিয়াছে। এরূপ হওয়া কেবল জাতির জীবনে কেন কোন ব্যক্তির জীবনেও বড় ভয়ের। কেননা বৃথা গর্ব্ব উন্নতির পরিপন্থী। প্রবন্ধকার তাঁর এই উক্তি সমর্থন করিতে দেশবন্ধু রবীন্দ্র নাথ, প্রমথবাবু প্রভৃতি শ্রেষ্ঠ বাঙ্গালীগণের রচনা ও উক্তি হইতে অনেক বাক্য উদ্ধৃত করিয়াছেন। এমন কি দেশবন্ধুর তদানীন্তন পার্শ্বচর সুভাসবাবুকেও উপেক্ষা করেন নাই, তাঁরও বাক্যাবলী উদ্ধৃত হইয়াছে।

কিন্তু গৌরব প্রকাশ সকল সময়েই যে অহিত ঘটায়- উন্নতির পথে বাধা একথা বলা ভুল। কোন্ জাতি না আত্মগরিমার ধ্বজা তুলে? অরে "প্রাদেশিকতা বোধ" কি কেবল বাঙালীরই "মর্ম্মে জড়িত?" এ কথা একবারে মিথ্যা যে—"ভারতবর্ষের অধিবাসীদের মধ্যে স্থানীয় বৈশিষ্টকে আকড়াইয়া ধরিয়া স্বতন্ত্র হইয়া থাকিবার ইচ্ছা বড় একটা নাই।" "বড় একটা" যে আছে তা তিনি এই প্রবন্ধেরই এক যায়গায় স্বীকার না করিয়া পারেন নাই—"আসামীদের জন্য আসাম, বিহারীদের জন্য বিহার ইত্যাদি" "তাহার অতি জাজ্বল্য মান ও অপ্রীতিকর প্রমাণ," তবে একথা বলার সার্থকতা কি? যাক্, প্রবন্ধটি বিশদ আলো- চনার স্থান আমাদের নাই, এবং তার আবশ্যকও বোধ করিতেছি না।

এসংখ্যায় তিনখানি রঙিন ছবি দেওয়া হইয়াছে। প্রথম ছবি "রাজকুমারী— প্রাচীন চিত্র হইতে।"

দ্বিতীয় ছবি "আর তুর্ত কর্তৃক অঙ্কিত—সিরাজ।" বেশ লাগিয়াছে।

তৃতীয় ছবি শ্রীসারদা "উকীলের—ঘুঘু।" এই সুন্দর ঘুঘু দম্পতিকে কয়েকমাস পূর্ব্বে মডার্ণ রিভিউতে দেখিয়াছি বলিয়া মনে পড়ে। অবশ্য তাতে ক্ষতি নাই, সুন্দর সৃষ্টি চিরদিনই আনন্দের।

বসুমতী—ফাল্গুন—১৩৩৭

এ সংখ্যায় গল্প-উপন্যাসের মহা বন্যা। একসঙ্গে চারখানি উপন্যাস—"মাটির স্বর্গ," "ধর্ম্মদাস," "রহস্যের খাসমহল," "জীবনস্বপ্ন" ও "বিদায়-বাণী" কে বাহির হইতে দেখিয়া পাঠকগণ নিশ্চয়ই হতভম্ভ হইয়া গিয়াছেন! এ যেন বড় লোকের বাড়ী ভোজের আয়োজন। এখন অসুখ না করিলেই মঙ্গল।

গল্পও আছে পাঁচটি। প্রথম গল্প শ্রীচরণদাস ঘোষের "মনের কথা।" নাম শুনিয়া কেহ যেন গল্পটিকে পড়িতে আপত্তি না করেন। ইহা লেখকের মনের কথা নয়—গল্পের নায়িকার পাতানো নাম। এক অসহায়া বিধবার প্রতি গাঁয়ের মোড়ল কেমন নির্ম্মম অত্যাচার করিতে পারে, তার নামে কলঙ্ক দাগিয়া দেয় ও গ্রামবাসীরা নির্লজ্জের মত সেই রক্তযজ্ঞে যোগ দেয় তারই কাহিনী। আর সেই সঙ্গে কলঙ্ক কথায় অবিশ্বাস করিয়া কেহ তাকে মুখে ক্ষমা করিলেও অন্তরে অন্তরে যে তার প্রতি "মারমুখো" হইয়া থাকে, তারও একটু ঘোরালো রঙের ছবি আছে। রচনাটির ঐটুকুই' কৌশল, কিন্তু তেমন কুশলতা পরিস্ফুট হইয়া উঠে নাই।' গল্পের ভাষা বেশ ঝরঝরে কোথাও অনাবশ্যক আড়ম্বর নাই।

দ্বিতীয় গল্প শ্রীধীরেন্দ্র নারায়ণ (কুমার) রায়ের "প্রগতি।" শত চেষ্টায়ও ইহার মধ্যে গল্পত্ব খুঁজিয়া পাওয়া গেল না, পাওয়া গেল বিদ্বেষবহ্নি জ্বালা। বসুমতী নিশ্চয় এটিকে ভাল গল্প বলিয়া ছাপিয়াছেন। অতএব ভালই।

তৃতীয় গল্প শ্রীশরদিন্দু বন্দ্যোপাধ্যায়ের "রক্ত-সন্ধ্যা।" মনে পড়ে কয়েক মাস পূর্ব্বে লেখকের একটী গল্প পড়িয়াছিলাম —"জাতি-স্মর।" সেই গল্পটির সহিত ইহার মিলটা এত স্থূলে যে মনে হয়, লেখক এই ধরণের গল্প বেশী লিখিলে চিত্তাকর্ষক রচনায় সক্ষম হইবেন না। এ রচনায় কিছু নূতনত্ব আছে বটে, কিন্তু ঘটনায় প্রাচীনত্ব অনেক খানি। তা ছাড়া বিবৃতিতে বৈচিত্র্য নষ্ট হয়। বক্ষ্যমান গল্পটি বেশ হইয়াছে—ব্যক্তির জাতিস্মরতায় যাঁদের বিশ্বাস গভীর, বিশেষ করিয়া তাঁদেরই ইহা প্রচুর আনন্দ দান করিবে।

কলিকাতার বহুবাজারের এক মুসলমান মাংসওয়ালা একদিন তার দোকানে কালিকটের এক নবাগত পর্ত্তুগীজ ব্যবসায়ীকে মাংস ক্রয়েচ্ছু হইয়া উপস্থিত দেখিয়াই —"ভাস্কো-ডা-গামা—ভাস্কো-ডা-গামা—"বলিয়া চীৎকার করিতে করিতে মাংসকাটা বড় ছোরা দিয়া খুন করিয়া ফেলে। এযুগে এই ঘটনার সঙ্গত কারণ পাওয়া

ায় না। আসামী তার পূর্ব্বজন্মের কাহিনী টানিয়া ানিয়া এক নিরপেক্ষ দর্শকের কাছে ইহার একটা কৈফিয়ৎ দেয়। কাহিনীটুকু স্থানাবশতঃ দেওয়া সম্ভব ইল না। ইহার শেষে লেখক বলিতেছেন "ক্ষণকাল পরে ান্ধ্য নীরবতা বিদীর্ণ করিয়া ভাস্কো-ডা-গামার জাহাজ-ইতে দামামা ও তূর্য্য বাজিয়া উঠিল।

"সূর্য্য তখন সমুদ্রপারে অস্তমিত হইয়া অন্য কোন নূতন গগনে উদিত হইয়াছে—"অর্থাৎ ভারতে মুসলমান রাজত্বের যবনিকাপাত হইল। গল্পের উদ্দেশ্য সেই ছবিটিকে আঁকা। পরিশেষে একটা কথা—মুসলমানগণ কি পুনর্জন্মে বিশ্বাস করেন?

চতুর্থ গল্প শ্রীপ্রভাবতী দেবী (সরস্বতীর) "পরাজয়।" গল্পটি মৌলিকতায় পরিপূর্ণ—যেমন—" "সাতকড়ি মণ্ডলের বৃদ্ধা মা যখন মারা গেল, তখন বাঁশ যোগাড় করার জন্যই সাতকড়ি বড় ব্যস্ত হইয়া উঠিল।"

"মৃতা মায়ের জন্য শোক করার অবকাশও তাহার অদৃষ্টে জুটিল না। সে মাথায় হাত দিয়া বসিয়া উপস্থিত বিপদ হইতে পরিত্রাণের উপায় চিন্তা করিতে লাগিল।" মায়ের জন্য শোকটা গৌণ করিয়া বাঁশ যোগাড়কে মুখ্য উদ্দেশ্য করায় মৌলিকতা নাই কি? লিপিকৌশল আরও পরিস্ফুট হইয়া উঠিয়াছে—সাতকড়িকে মাথায় হাত দিয়া বসাইয়া ব্যস্ত করায়। কেননা রাখাল তাঁকে বাঁশ দিতে চায় না। আবার সাতকড়িকে এই বাঁশ রাখালের ঝাড় হইতে যোগাড় করিতে হইবে—যদিও হরিদাস মাটি গাঁয়ে আর বাঁশের ঝাড় আছে কিনা, সে কথার কোন উল্লেখ নাই। যাহা হৌক, রাখাল স্বেচ্ছায় সাতকড়িকে বাঁশ না দিলেও, সে ঝাড়ের বাঁশ কাটাইল সাতকড়ির স্ত্রী মন্দা রাখালের অনুপস্থিতিতে। যদি বলেন, স্বামী যেখানে হার মানিল, স্ত্রী কিসের জোরে জয় লাভ করে? বুদ্ধি? না। গায়ের জোর? না। মুখের জোর? তাও না। তবে কি? মন্দার বিবাহের পূর্ব্বে রাখালের সঙ্গে, একটু কি বলে, প্রেমের সম্পর্কের জোরে। মন্দা বাঁশ আনিল বটে কিন্তু রাখালও ছাড়িবার পাত্র নহে। মাঠ হইতে ঘরে ফিরিয়া যখন তার ঝাড়ের বাঁশ লইয়া গিয়াছে শুনিল তখন "দপ্ করিয়া তাহার মাথায় আগুন জ্বলিয়া উঠিল।" সে অবস্থাপন্ন কৈবর্ত্তের সেকেণ্ড ক্লাশ অবধি পড়া ছেলে। "কি সুচেহারায়, কি স্বভাব চরিত্রে, কি বলে বুদ্ধিতে সে সকলকে পরাজিত করিয়াছিল।" কাযেই একটা মোটা লাঠি লইয়া রুগ্ন, শীর্ণ, দরিদ্র, নিরন্ন, শোকার্ত্ত সাতকড়ির মাথা ভাঙিতে আসিল। কিন্তু পথে মন্দার সহিত তার দেখা। মন্দা ঘাট হইতে বাসন মাজিয়া ঘরে ফিরিতেছে। আর যায় কোথায়? তখন রীতিমত হম্বীতম্বী, কথা কাটাকাটি। পরিশেষে মন্দা বলিল—"মনে পড়ে রাখালদা সেই একদিন" ব্যস্। এ যেন জোঁকের মুখে লবণ, পোড়ার উপর স্পিরিট,—রাখাল অমনি জলবৎ শীতলং। তখন আর লাঠির দরকার নাই। রাখাল শরীর চর্চ্চা করে, তাই "হাতের লাঠিটাকে" কাছে নয় "দূর নদীবক্ষে ছুড়িয়া ফেলিল।" কেন এমন হইল? একটু উদ্ধৃত করিলেই কারণটা চট করিয়া বুঝিয়া ফেলা যায়—

"সে আজ অনেক দিনের কথা।

"সেদিন মন্দা ছিল মন্দা ও রাখাল ছিল রাখাল। তাহাদের মাঝখানে সাতকড়ি আসিয়া দাঁড়ায় নাই, মন্দা সেদিন মন্দা বউদি, রাখাল—রাখাল ঠাকুরপো হয় নাই।"

সাতকড়ির এতবড় অপরাধের মূলে ছিল মন্দার পিতা চরণদাসের কন্যা-পাত্রস্থা করার তাগিদ। ইহাতে সাতকড়ির কোন হাত ছিল না বরং রাখালকেই দোষ দেওয়া যায়। কেননা সে মন্দার পিতার অনুরোধের কোন স্পষ্ট জবাব দেয় নাই। কাজেই চরণ দাস সাতকড়ির হাতে কন্যা সম্প্রদান করে। প্রেমিকরা জানেন প্রেম অন্ধ—সুবুদ্ধি কৈবর্ত্তের ছেলে রাখাল তাই সাতকড়ির সর্ব্বনাশে মন দিল। সে নানা মতে সাতকড়িকে জব্দ করিয়া তার বাস্তুখানি পর্য্যন্ত নীলাম করাইল। তখন সাতকড়ি ম্যালেরিয়ায় মরণাপন্ন। সে বেচারী ভিটার মায়ায় কাঁদিয়া আকুল। কিন্তু মন্দা বড় শক্ত মেয়ে। তার সহিত রাখাল পারিবে কেন? সে রুগ্ন স্বামীকে লইয়া গরুর গাড়ীতে চড়িয়া গাঁ ছাড়িল—আর রাখাল?

"সেই দুইহাতে আর্ত্ত বুকখানা চাপিয়া ধরিয়া বসিয়া পড়িল। তাহার মুখ দিয়া একটা মাত্র শব্দ বাহির হইল, "মন্দা"—এখন পাঠক বলুন, পরাজয় কার? গল্পটির সুরু হইতে শেষ অবধি মৌলিকতায় পরিপূর্ণ নহে কি? 'ক' লিখিতে যেমন বয়ে আঁকড় দিলেই চ'লে তেমনি একটি প্লট

যোগাড় করিয়া সেটাকে "develope" করিলেই তা গল্প। আর মাসিক সাহিত্যের বাজারে পয়লা নম্বর, দোস্‌রা নম্বর ছাপ পরিয়া তা বেশ বিকাইয়া যায়।

পঞ্চম গল্প—শ্রীসুরেন্দ্রনাথ গঙ্গোপাধ্যায়ের "রাজা।" বাঙালীর নয়, এক বীর সাঁওতাল যুবকের প্রেমের গল্প। বাঙালীরা ত গল্পে বহুকাল হইতেই প্রেমে পড়িতেছে, তাদের গল্প পুরাণো। এদিকে যদিও কিছুকাল ধরিয়া সাঁওতালিরাও প্রেমে পড়িতেছে, তথাপি ইহার মধ্যে একটু নূতনত্ব আছে; এবং তা' এই যে, নায়ক ভোজুল মাঝি বীর। লেখক বলিতেছেন—"কি জানি কেন, কিন্তু ইহা সর্ব্বকালে এবং সর্ব্বত্রই (পাঠকগণ পৃথিবীর ইতিহাসটা একবার মনে মনে আলোচনা করুন ও আশ-পাশে নজর রাখুন) দেখিতে পাওয়া যায় যে, যে সত্য সত্য বীর, সে একজন গভীর প্রেমিক।" যে সত্য সত্যই প্রেমিক, সে কিন্তু বীর নয়:—তাই "ভোজুল" নায়িকা "মোতিয়ার" জন্য প্রাণ দিতে প্রস্তুত ছিল, যদিও দেয় নাই। প্রেমের এতবড় নিদর্শন তিন লোক খুঁজিলেও পাওয়া যায় না যে! নায়ক বীর বটে কিন্তু তার জাত-জন্মের ঠিক ছিল না; মোতিয়ার বাবা তাকে ভালুকের গর্ত্ত হইতে উদ্ধার করে। এই বীরকে ভালুকে মারিতে পারে নাই, কিন্তু মারিয়াছিল কন্দর্প একটা একটা করিয়া পাঁচটি শরেই। তাই বীর ভোজুল মোতিয়াকে ভাল-বাসিয়া ফেলিয়াছিল। কিন্তু গল্প ত জমানো চাই, সেজন্য মামুলি প্রথামত তার হাতে কন্যাদানে পিতার ঘোর আপত্তি। কিন্তু প্রেমের টান জোয়ারের টানকেও হার মানাইয়া দেয়। তার সঙ্গে আবার প্রেমিক যদি বাঁশী বাজাইতে জানে ত ঘরে থাকে কার সাধ্য। "ভোজুল নদীর ধারে বটতলায় বাঁশী বাজাইত, সে সুর শুনিয়া মোতিয়াও ঘরে থাকিতে পারিত না," কলসী না লইয়াই সে ছুটিয়া যাইত। অবস্থা যখন এমনি সঙ্গীন তখন, বলিতে হৃদয়ে বীর রসের সঞ্চার হয়—"বীর হৃদয়ের প্রেম কোন বিবেচনার অপেক্ষা রাখে না। তাই এক গভীর রাত্রিতে মোতিয়া ভোজুর হাত ধরিয়া ঘর হইতে বাহির হইয়া গেল।" Dramatic situation! লেখকের বাহাদুরী ত এইখানেই! আরও বাহাদুরী যে এই যাওয়ায় বীরের বীরত্বের চেয়ে মোতিয়ার আকুলতাকে স্পষ্ট অক্ষরে লিখিয়া তার Effectটুকু ভোজুলের উপর দেওয়া। তারপর শুনুন—"সর্দ্দার সকল কথাই বুঝিল; কিন্তু সেও ছিল বীর।" অর্থাৎ "হাম্ ভি মিলিটারী, তুম্ ভি মিলিটারী," ফলে—"সেইদিন হইতে সে মোতিয়া মরিয়াছে—এই কথাই—" থাক, আর না। অন্নভোজী বাঙালী, বীরত্বের কাহিনী আলোচনা করিয়া প্লীহা বিদীর্ণ হইতে পারে।

এই বীরত্ব কাহিনী, মাঝখানে এমন এক অদ্ভুত ঘটনায় রূপান্তরিত হইয়া গেল যে পরিশেষে ভোজুল একটী স্ত্রীলোকের মাতৃহীন শিশুকে কোলে করিয়া "ধেই ধেই" করিয়া নাচিতে লাগিল। "মোতিয়া ক্রীড়াচঞ্চল দুটি শিশুর উপর সোহাগ প্রসন্ন দৃষ্টি মেলিয়া অবাক হইয়া রহিল।"

"* * * ভোজু তখনও নাচ থামায় নাই। সে মোতিয়াকে ডাকিয়া কহিল, "দেখ, একেই আমরা রাজা বানাব ইত্যাদি।" আর ঐ সঙ্গে গল্পের নামকরণও হইয়া গেল। তারপরই পত্রিকায় প্রকাশ ও প্রখ্যাতি লাভ! এই নির্জ্জীব রচনার পরিশেষে একটু তৃপ্তিও বোধ করি আসিয়াছিল। কত মেকী যে এমনি করিয়া চলে।

এ সংখ্যায় একখানি নক্সাও আছে—"বায়স্কোপের সিনারিও" লেখক শ্রীঅপ্রকাশ গুপ্ত। নামটি পাওয়া নয়, দেওয়া। কেননা সখ্ করিয়া আর কে নাম রাখে—"ডুবে থাক্।" নামের দিক দিয়া যাই হোক, নক্সাখানিতে সত্যই কতকগুলা ভাবিবার কথা আছে: কেবল ভাবিলেই চলিবে না। বাংলার ছায়া-চিত্রের যথার্থ উন্নতি সাধনে যত্নবান হওয়া একান্ত দরকার। বাংলা ছায়া-চিত্রের বৈশিষ্ট্য হইতেছে মাথা-মুণ্ডহীন কতকগুলা অদ্ভুত ঘটনার সমাবেশ আবার তার মধ্যেও নিতান্ত আজগুবি এমন সব কাণ্ড থাকে ও অভিনেতাগণ এমন বিচিত্র অঙ্গভঙ্গী সহকারে সে গুলিকে অভিনয় করেন যে দেখিলে সারামন "ঘিন্ ঘিন্" করে। এতবড় একটা art এর মূলে যে সাধনা ও শিক্ষার দরকার, বোধ করি তার অভাবই ইহার কারণ। কিন্তু স্বয়ম্ভুদলের সেদিকে দৃষ্টি নাই।

তারপর, নক্সাকার এক যায়গায় বলিতেছেন "আমি লেখক" আর—এক যায়গায় বলিতেছেন "গল্প উপন্যাস রচনায় আমি আনাড়ি এ দুইয়ের কোন্‌টা সত্য? তবে তিনি লেখেন কি? নক্সা? নক্সা আঁকিয়া যদি কেহ

'চিত্র শিল্পী" হইতে পারে, তাহা হইলে অবশ্য নক্সা লিখিয়াও 'লেখক" হওয়া সোজা ও স্বাভাবিক। সে পদ তাঁর বহাল রহিল। তবে যদি কোন সমালোচকের তীব্র কষা তাঁর পৃষ্ঠে পড়ে, ত বিচলিত হইবেন না। শিক্ষার শৈশবে এমন কতদিন হয়ত গিয়াছে যেদিন—যাক্ পুরাতন কথা। বোধকরি কোন নির্দ্দয় সমালোচকের নির্ম্মম আঘাতের স্মৃতি মনে করিয়াই তিনি লিখিয়াছেন—"সমালোচকবর্গ কুক্কুরের মত আর্ত্তনাদ করিয়া উঠে—দারিদ্র্য-মূর্ত্ত ছেঁড়া কানি, ছেঁড়া জুতার লোভে রসনা মেলিয়া লম্ফ দেয় " চমৎকার উপমা! একবারে পায়ের তলা ও আঁস্তাকুড় হইতে তিনি এ ভাবটিকে কুড়াইয়া আনিয়াছেন। দৃষ্টির এই অধোগতি দেখিয়া চমৎকৃত হইতে হয়।

এ সংখ্যায় রঙিন্ ছবি আছে—তিন খানি। প্রথম ছবি স্বামী ব্রহ্মানন্দজীর প্রতিকৃতি।

দ্বিতীয় ছবি শ্রী সতীশচন্দ্র সিংহের "প্রদোষে।" শিল্পী দুইটি অর্দ্ধনগ্ন নারীকে একবারে পাহাড়ের ডগায় বসাইয়া দিয়াছেন—বোধকরি সন্ধ্যাতারার effect দেখাইতে। বিবশা না করিলে Art যে ফোটে না এবং দৃষ্টিও ঠিক-মত খোলে না।

তৃতীয় ছবি শ্রীভুবন মোহন দের "ঐ বুঝি বাঁশী বাজে—।" (রবীন্দ্র নাথ) হায় কবি! বাঁশী তোমায় উন্মনা করিয়া ছিল, আর সেই কথা আজ শিল্পীকে উদ্‌ভ্রান্ত করিয়া কি কাণ্ড যে ঘটাইল—যার ঠেলায় শ্রীরাধার বাম হাতের কল্কি ও তালু ডান হাতে রূপান্তরিত হইয়া গেল! আর বসুমতীর কৃপায় একদম এই খোদার উপর খোদ্‌কারী সকলকে নিরুপায়ের মত দাঁড়াইয়া দেখিতে হইল! ইহাকেই বলে creative genius,

অদৃষ্টের পরিহাস

গল্প

শ্রীসুজাতা দেবী

১

রাত্রি দশটা, মিহির টেবিলের সম্মুখে চেয়ারে বসিয়া পড়িতেছিল। হঠাৎ টেবিলের উপর টাইম-পিস্ ঘড়িটার প্রতি দৃষ্টি পড়ায় বইটা মুড়িয়া রাখিয়া আপন মনেই বলিয়া উঠিল, রাত দশটা? এখনও বীথির আসার সময় হ'লনা—মিহিরের কথা শেষ হইতেই বীথি মিহিরের প্রিয়তমা পত্নী এক মুখ হাসি লইয়া গৃহে প্রবেশ করিয়া বলিল,—বারে তুমি সবই আমার দোষ দেখ? এবার মিহির চেয়ার ছাড়িয়া উঠিয়া বীথির নিকট আসিয়া বলিল, আচ্ছা বীথি তোমার প্রাণে কি একটুও দয়া মায়া নেই? আমি সেই থেকে যে, হাঁ করে বসে আছি, আর ঘড়ির দিকে তাকাচ্ছি কখন তুমি আসবে বোলে—আর তুমি দুষ্টুমী করে কেবল রাত করবে? বীথি হাসিয়া ফেলিল—ও হরি এই জন্য রাত দশটা অবধি বই হাতে করে বসে থাকো? মন তাহলে একটুও বইএর দিকে থাকে না, আমি কোথায় ভাবি যে তোমার সামনে এম, এ, পরীক্ষা—শীঘ্র শীঘ্র তোমার কাছে গিয়ে তোমার পড়ার ক্ষতি কোরব না আর তুমি বুঝি এই করো? বীথি মুখে কাপড় দিয়া জোরে হাসিয়া উঠিল। মিহির বীথির হাসি দেখিয়া লজ্জিত হইয়া বীথিকে কাছে টানিয়া বলিল, যাঃ কেবল তুমি হাসতেই থাকো আর ত কিছুই বোঝনা এদিকে তোমার বাবা লিখেছেন পরশু তোমায় বেনারস নিয়ে যাবেন কাল তোমার দাদা আসছেন, আমার যে কি অবস্থা হবে তা জানিনা। বীথি খানিক-ক্ষণ চুপ করিয়া বলিল, কেন কি অবস্থা হবে শুনি? তোমাকে ত আর একা ফেলে যাচ্ছি না, মা রয়েছেন, তোমার বৌদি রয়েছেন—কথায় বাধা দিয়া মিহির বলিল, যতই মা বৌদি' থাকুন, তোমার অভাব ত কেউই পূরণ কর্ত্তে পারবেন না তাত বোঝ? এবার বীথি স্বামীর হাতটা নিজের হাতের উপর রাখিয়া বলিল—এসময় কি আমার তোমার কাছে থাকা উচিৎ? তা'হলে যে তোমার পড়ার কত ক্ষতি হবে? মিহির জোরে একটা নিশ্বাস ফেলিয়া বলিল, তুমি কাছে না থাকলেই আমার

পড়ায় মোটেই মন যাবে না বীথি, সেই চার বছর আগে তোমায় আমায় মিলে ছিলাম তারপর এর ভিতর সেই বিয়ের পর কিছুদিনের জন্য ছাড়া আর একদিনও তোমায় ছেড়ে থাকিনি, এই আমাদের বলতে গেলে প্রথম বিচ্ছেদ।—কি করে আমি তোমায় ছেড়ে থাকি বল তো? বীথি তাহার স্বামীর মুখের প্রতি চাহিয়া চুপ করিয়া রহিল। স্বামী-স্ত্রী কি মিষ্টি সম্বন্ধ। এর ভিতর কোন ব্যবধান নাই ছাড়া-ছাড়ি লুকোচুরী কিছুই নাই। কিন্তু বীথি ভাবিতেছিল সকলই স্বামী স্ত্রীর ভিতরই কি এইরূপ! তাহার মত স্বামী প্রেমে সুখী কি সকলেই? হঠাৎ কি ভাবিয়া সে শিহরিয়া উঠিল। তাহারই বাল্যবন্ধু মতীর কথা আহা কি দুঃখী সে! বীথিকে চুপ করিয়া থাকিতে দেখিয়া মিহির বলিল, চুপ করে রইলে বীথি কথা বলো, বলে দাও কি করে তোমায় ছেড়ে থাকবো—।" এইবার বীথি আস্তে আস্তে স্বামীর কথার উত্তর দিল, তুমি পুরুষ মানুষ এত অধৈর্য্য হলে কি চলে? কর্ত্তব্যের খাতিরে অনেক কিছু কর্ত্তে হয় আর তুমি সামান্য দু তিন মাস আর আমায় ছেড়ে থাকতে পারবে না? যদিও আমি একথা বলে তোমায় বুঝাচ্ছি আমারও যে কত কষ্ট হবে তোমায় ছেড়ে থাকতে তা বলে জানাবার নয়।—মিহির অধৈর্য্যভাবে বলিয়া উঠিল, আচ্ছা বীথি বলতে পারো যে স্বামী স্ত্রীকে প্রকৃত প্রাণ দিয়ে ভালবাসে সে কি করে ইচ্ছা করে সেই স্ত্রীকে ছেড়ে দূরে সরে থাকে? আমার মনে হয়—তারা প্রকৃত ভালবাসে না বা বাসতে জানেনা। বীথি মৃদু হাসিয়া বলিল ধেৎ দূরে দূরে থাকলেই কি ভালবাসে না, কত লোক যে অসুবিধার জন্যও স্ত্রীকে দূরে রাখতে বাধ্য হয় তা বলে কি তারা নিজের স্ত্রীকে ভালবাসে না? এর কোন অর্থ নেই। মিহির বলিল, না বীথি তুমি জাননা আমি এমন অনেক লোককে জানি স্ত্রীকে ঝঞ্ঝাট মনে করে দূরে ফেলে রাখে আর সুবিধা অসুবিধার খোঁজও লয় না মাঝে মাঝে একটা চিঠি লিখে দেয় ব্যস। নেহাৎ বিয়ে করেছে খেতে পরতেও দিতে হবে তাও সামান্য কিছু দিয়ে নিশ্চিন্ত, নিজে দিব্য ফূর্ত্তিতে কাটায়। বীথি এবার স্বামীর কথায় বলিল, হ্যাঁ আমারও মনে পড়েছে মতীর কথা আহা তার কথা ভাবলে সত্যিই ভারী দুঃখু হয়। মিহির খাটের উপর লম্বা হইয়া শুইয়া পড়িয়া বলিল; কেন তার বর কি তাকে ভালবাসে না? বীথি মিহিরের মাথায় হাত বুলাইয়া দিতে দিতে বলি —ঠিক যে ভালবাসে না—তাত বলতে পারি না তবে তোমা মত কিছুই নয়। মিহির উৎসুক ভাবে বলিল, কেন মতী বেশ মেয়ে। সেই যে তোমাদের বাড়ীতে দেখে ছিলাম সে মেয়েটি ত? বীথি বলিল হ্যাঁ সেই ফর্সা রোগামত মেয়েটী আহা বেচারা তার বাবা মার কি আদরেরই মেয়ে ছি অসময় বাবা-মা মারা গিয়ে পর্য্যন্ত ত মতী দুঃখী হয়ে ছিল। আবার বিয়ে হয়েও সে একদিনের জন্য সুখী হ পাচ্ছে না। মিহির বলিল—অসুখীর কারণটা এক খুলে বলই না শুনি? বীথি বলিল, সুখী আর অসুখী সমস্তই অদৃষ্টে করে না হ'লে আমিত মতীর চেয়ে কোন অংশেই শ্রেষ্ঠ নই—আমারই বা রূপে গুণে সমস্তদিবে ভাল বর হ'ল কেন আর মতিরই বা হয়েও হ'লনা কেন তবুত মতীর বাবা যা টাকা কড়ি রেখে গিয়েছিলেন সামান্য খুব না হলেও দু তিন হাজার ত বটেই। সেই স টাকা ব্যয় করে মতীর বৃদ্ধ ঠাকুর্দ্দা নাতনীর বিয়ে দিলেন আর আমার বিয়েতে ত তোমরা একটা আধলাও নাও নাই হ্যাঁ বুঝতাম মতীর চেয়ে আমি সুন্দরী তাও ত নয় মিহির মৃদু হাসিয়া বলিল, মতীর চেয়ে তুমি সুন্দরী কিনা তা আমি জানিনা তবে আমার চোখে বীথির মত সুন্দর আর কারুকেই ঠেকে না। বীথি এবার মিহিরের প্রতি রোষ ভরে তাকাইয়া বলিল, ঠাট্টা হচ্ছে নয়? মিহিরও সঙ্গে সঙ্গে উত্তর করিল ঠাট্টা নয় তোমার গা ছুঁয়ে বলছি আমি যে দিন থেকে তোমায় পেয়েছি আমার ত মনে হয় তোমার মত দেখতে কেউ নয়—রং ফর্সার কথা বলছি না, চেহারার কথা। আমার আজকাল প্রত্যেকের খুঁত্ কাটা স্বভাবে দাঁড়িয়েছে। বীথি লজ্জিত হইয়া বলিল যাও—তুমি ভারি দুষ্টু। মিহির বীথির একটা হাত নিজের বুকের উপর রাখিয়া বলিল, আচ্ছা আমিত চিরকালই দুষ্টু, তুমি এখন লক্ষ্মী মেয়ের মত মতীর কথাগুলি বল দেখি? বীথি বলিতে লাগিল মতীর ঠাকুর্দ্দা বুড়ো হয়েছেন বলে যাতে তাড়াতাড়ি মতীর বিয়ে হয়ে যায় তাই কচ্ছিলেন। শেষে দূর দেশে একটী ভালছেলে আছে শুনে সেখানেই ঠিক কল্লেন। আত্মীয় বন্ধু কত বারণ কল্লে কিছুতেই শুনলেন না। বল্লেন হলই বা দূরদেশের লোক অমন ভাল ছেলে দেখে দিচ্ছি পয়সাও যথেষ্ট আছে দুই হলেই হ'ল। মতীর

বর ডাক্তার। উপরে যতটা শুনতে ভাল ভেতরে তত মোটেই ভাল নয়। মতীর বর কি একটা যায়গায় প্র্যাকটিস করে, মতী থাকে তার শাশুড়ীর কাছে ফরিদপুর জেলার মধ্যে কি একটা যায়গায়। মতীর শাশুড়ী বুড়ি তায় রোগা। শোনাইত যায় স্বভাবতঃই রুগীরা রাগী বেশী। মতীর শাশুড়ী দেওয়া-থোয়ার কথা নিয়ে অনেক কথা শুনায়, আবার মতী বাসান মাজা বাটনা বাটা এসব কিছুই জানেনা তারজন্য তার শাশুড়ী গালাগাল আরও কত রকম যন্ত্রণা দিতেও ছাড়ে না, এই ত তার শাশুড়ীর কাছে ব্যবহার। স্বামী তার প্রথম প্রথম বেশ ভাল ব্যবহারই কর্ত্ত, পরে সেও যখন বাড়ী আসে নানা কথায় মতীকে খিট খিট করে বিরক্ত করে বলে—তুমি সৎশিক্ষা যাকে বলে সে সব কখনও পাও নাই এরকম জানলে কি আমি তোমায় কি বিয়ে কর্ত্তাম—কি করে শাশুড়ী প্রভৃতির সেবা কর্ত্তে হয় তাও তুমি এতবড় মেয়ে হয়ে শেখনি ইত্যাদি। আবার মতী যদি বলে, বড্ড তোমার কাছে যেতে ইচ্ছা করে, আমায় নিয়ে যাবে? তা ওর বর স্পষ্ট মুখের উপর বলে দেয় যে আমার মা ভাই বোনের যত্ন জানে না আর গৃহস্থালীর বিষয় কিছু জানেনা তাকে আমার কাছে নিয়ে গিয়ে আমি লোকের কাছে মাথা হেঁট কর্ত্তে পারবো না। আর যদি এসব না শিখতে পারো তা'হলে তোমার ঠাকুর্দ্দার কাছেও তোমায় এক দিনও পাঠাব না, সেখানে গেলে তোমার শিক্ষা আরও খারাপ হয়ে যাবে। বীথি এই পর্য্যন্ত বলিয়া থামিয়া পরক্ষণে নিজের মনে বলিয়া উঠিল, যাই বলনা বিয়ের পর একেই কারও কথা সহ্য করা যায় না তার উপর স্বামীর শক্ত শক্ত কথা মোটেই সহ্য করা যায় না। যদিও বুঝি মতীর বর সকল বিষয়ে তাদের মনের মত হবার জন্যই ঐ সব বলে, তবুত সে স্বামী! কেন তুমি যেমন কত মিষ্টি করে আদর করে সব শিখাও তেমন করে কি শেখান যায় না? ও তা'হলে বোধ হয় স্ত্রীর কাছে মান থাকে না শাসনটা ভাল রকম করা হয় না। মিহির বীথির গালটা টিপিয়া বলিল সত্যিই বীথি অনেকে ঠিক ঐ কথাই ভাবে, বৌ ত, কেনা দাসীর সমান। তাকে যত প্রশ্রয় দেওয়া যাবে ততই সে মাথায় চড়ে বসবে। ছিঃ কি ভুল ধারণা তাদের বীথি বলিয়া যাইতে লাগিল, আবার শোন মতীর কাটা ঘায়ে নুনের ছিটা, শরীর খারাপ বলবার উপায় নেই—দুবারের বেশী তিনবার যদি বলে যে শরীরটা বড় খারাপ তা হলে তার রক্ষা নেই, নানান কথা শুনতে হয়। আর একটী কথা শোন মতী যখন যে কাজটা না কর্ত্তে পারল বা কোন একটু অন্যায় কাজ করে ফেল্‌লো ত সব কথা মতীর বরের কাছে পৌছে দেয় তার শ্বশুরবাড়ীর লোক। কি বিশ্রী কাণ্ড! ছিঃ ভদ্রলোকের বাড়ীতেও যে কত ইতরের মত কাণ্ড আছে তা বলা যায় না। মতী কত কাঁদলে কত দুঃখু করলে। মিহির বলিল, আহা বড় কষ্ট ত বেচারীর। পার্শ্বের ঘরের ঘড়িতে টং টং করিয়া দুইটা বাজাতে মিহির বীথিকে বলিল, বাবাঃ অনেক রাত হয়ে গেল এস এবার শুয়ে পড়া যাক্।

(২)

আজ বীথির বেনারস যাওয়ার দিন। বীথির দাদা লইয়া যাইতে আসিয়াছেন।—মিহির সকাল বেলাতেই কোথায় বাহির হইয়া গিয়াছিল। বেলা প্রায় সাড়ে নয়টার সময় কতকগুলি জিনিষ লইয়া ফিরিয়া আসিলে তাহার মা জিজ্ঞাসা করিলেন, সকালেই কোথায় বেরিয়েছিলি মিরু! মিহির বলিল, একটু কাজ ছিল মা। মাতা শুভা দেবী বলিলেন, তোর কি শরীরটা ভাল নেই রে মুখ এত শুখ্‌নো দেখাচ্ছে কেন? মিহির মাথা হেঁট করিয়া বলিল শরীর ত বেশ ভালই আছে মা। মা কি ভাবিয়া মৃদু হাসিলেন। মনে পড়িল তাঁহার যৌবনের কথা, ঠিক মিহিরের ন্যায়ই তাঁহার স্বামীও পিত্রালয় যাইবার নাম হইলেই কিরূপ গম্ভীর হইয়া থাকিতেন কত বাধাই না দিতেন, এক মিনিটও তাঁহাকে চক্ষুর আড়াল করিতে পারিতেন না। পুত্রের ভাব দেখিয়া শুভা দেবী বলিলেন, দেখ মিরু আমার মনে হয় বৌমার দাদা ছেলেমানুষ ওর সঙ্গে ছেড়ে দেওয়া ঠিক নয়—কি জানি কখন কোন বিপদ ঘটে জিনিষ পত্র সব নিয়ে। আমার ইচ্ছা তুইও সঙ্গে যাস্ কি বল? সেই সময় মিহিরের বড় বৌদি আসিয়া পড়ায় মিহির কোন উত্তর করিল না। মিহিরের বৌদি'ই উত্তর দিলেন, হ্যাঁ মা ঠাকুর পোর কি এসময় যাওয়া উচিৎ আর শ্বশুর না লিখলে ও কেন যাবে?—মিহিরের স্নেহময়ী জননী পুত্রের প্রতি চাহিয়া চুপ করিয়া রহিলেন। এবার মিহির উত্তর করিলেন, অসীম ত বলছে পারবে

না, যদি না পারে আমিও সঙ্গে ষ্টেশন থেকেই ফিরতে পারি—শুভা দেবী পুত্রের মন ভাব বুঝিয়া বলিলেন, দূর পাগল ছেলে যদি সঙ্গে যাস ত বাড়ী যাবি না? নাই বা তারা লিখ্‌ল সব বারে কি লিখতে হবে তবে যাবি—না হলে যেতে নেই? মিহির তাহার বৌদির প্রতি চাহিয়া বলিল তা হ'লে বাধ্য হয়েই আমায় যেতে হবে কি বলো বৌদি'। বৌদি' দেওরের কথায় না হাসিয়া থাকিতে পারিলেন না।

* * * *

মিহির একটা সুটকেসে নিজের সামান্য কাপড় জামা গুছাইয়া বীথির বড় ট্রাঙ্কটা গুছাইতে আরম্ভ করিল। চারিদিকে একরাশ জিনিষ ছড়াইয়া বসিয়া মিহির দেখিতে লাগিল কোন জিনিষ বীথির নাই। ঠিক সেই সময় বীথি গৃহে প্রবেশ করিয়া মিহিরের মজা দেখিয়া হাসিয়া বলিল এসব কি ব্যাপার? মিহির গম্ভীর ভাবে প্রশ্ন করিল, বাঃ তুমি ত দেখছি আস্ত বোকা বেশ ট্রাঙ্ক গুছিয়েছ, —দরকারী জিনিষ ত কিছুই নেই দেখছি। বীথি কোন উত্তর না দিয়া নীরবে স্বামীর কার্য্য দেখিতে লাগিল। মিহির ট্রাঙ্কটী বেশ পরিপাটী করিয়া গুছাইয়া দিয়া বলিল, দু মাসের জন্য যাচ্ছ তোমার অনেক কিছু জিনিষ দরকার লাগতে পারে, আমায় বলে দাও আমি নিজে গিয়ে নিয়ে আসি। বীথি লজ্জিত ভাবে মাথা হেঁট করিয়া বলিল, আমার কিছুই দরকার নেই আর যা দরকার হবে মা বাবার কাছ থেকে চেয়ে নিতে পারবো। মিহির একটু হাসিল পরে আপন মনেই বলিল, বীথিটা যে একেবারে বোকা তা জানতাম না, একটুও বুদ্ধি নেই। হাজার মা বাপ দিলেও বিয়ের পর তাঁদের কাছে কিছু চাইতে নেই। তা হলেত স্বামীর অপমান করা হয়ই আর তাঁরাই বা কি মনে করবেন? ভাববেন আমি তোমার কোন খোঁজ রাখিনা। বীথিও স্বামীর কথার উত্তরে বলিল, তুমি ত এখনও স্বাধীন হও নাই তুমি যে এখনও কলেজ ষ্টুডেন্ট। মিহির বলিল, বাবাঃ তোমার সঙ্গে কথায় আমি মোটেই পারবো না, আচ্ছা বীথি বলতো আমার কি সাধ যায় না তোমায় কিছু দিতে? যাও ঐ টেবিলের উপর যে জিনিষগুলি আছে নিয়ে এস, এই বড় দুঃখ রইল যে তুমি কখনও কিছু আমার কাছ থেকে চাইলে না। বীথি চট্ করিয়া উত্তর দিল, তুমি কি আমার চাইবার মত সময় দাও তার আগেই যে সমস্ত হাজির করো। আচ্ছা বলতে পার নিজে এত কষ্ট করে থেকে হাত খরচের টাকাগুলি সব আমার জন্য খরচ কর কেন? মিহির তাহার বড় বড় সুন্দর চোখ দুটীতে পত্নীর মুখের প্রতি চাহিয়া বলিল, তুমি আর আমি কি প্রভেদ আছে কিছু? বীথি পরাস্ত হইয়া চুপ করিয়া গেল। বীথি মিহিরের কথামত জিনিষগুলি আনিয়া মিহিরের নিকট উপস্থিত করিল। মিহির কাগজের মোড়ক খুলিয়া জিনিষগুলি বাহির করিতে লাগিল। বীথি জিনিষের বহর দেখিয়া আশ্চর্য্য হইয়া গেল—প্রায় চল্লিশ টাকার জিনিষ এত টাকা যে কোথা হইতে আসিল? মিহির ত মাত্র পাঁচ টাকা করিয়া মাতার নিকট হইতে হাত খরচ পাইত। শুভাদেবীর স্বামীর মৃত্যুর পরে বিপুল অর্থরাশি তাঁহার হস্তেই পড়িয়াছিল। তিনি টাকাকড়ির বিষয় খুব কড়া ছিলেন একটী পয়সাও বাজে খরচ করিতে দিতেন না—বলিতেন আমার আর কি থাকে ত, ছেলে দুটীরই থাকবে বুঝে চলতে পারলে সাত পুরুষ বসে খেতে পারবে। বীথি দেখিল, মিহির গুছাইতেছে খুব ভাল ভাল আটপৌড়ে সাড়ী, জ্যাকেট সেমিজ ব্লাউজ ইত্যাদি আবার এধারে কোথায় পাউডার সেন্ট ক্রিম খাম পোষ্টকার্ড যাবতীয় দরকারী জিনিষ। বীথি "থ" হইয়া দাঁড়াইয়া দেখিতে লাগিল। হাত বাক্সের ভিতর বাতী দেশালাই হইতে আরম্ভ করিয়া সাবান অবধি গুছাইয়া দিয়া মিহির বলিল, দেখে নাও বীথি আর কিছু দরকার লাগবে কিনা। বীথিত স্বামীর কার্য্য দেখিয়া আশ্চর্য্য হইয়া গিয়াছিল। কই তাহার শ্বশুর বাড়ী আসিবার পূর্ব্বে তাহার মাতাও ত এরূপভাবে গুছাইয়া দেন নাই আর পুরুষ হইয়া কি করিয়া এই সব শিখিলেন? মিহির আবার বলিল, তুমি ত বলবে না জানি এই বাক্সের মধ্যে টাকা দশটা থাকলো যখন যা দরকার লাগে কিনে নিও। বীথি এতক্ষণ পরে বলিল, ভগবান তোমায় কি দিয়ে গড়েছেন বলতে পারো কোনখানে কি এতটুকুও খুঁৎ নেই? মিহির উঠিয়া দাঁড়াইয়া হাই তুলিয়া বলিল, ওঃ তুমি যে আমায় বড্ড বড় করে তুলছ আমি যে আর তাহলে অহঙ্কারে মাটীতে পা-ই ফেলতে পারবো না।

গ্রাম্য দৃশ্য

শিল্পী—শ্রীনেপালচন্দ্র সেন।

(৩)

আজ মিহিরের পরীক্ষা শেষ হয়ে গেল। মিহির বাড়ী ফিরিয়া বরাবর নিজের ঘরে গিয়া শুইয়া পড়িল। আজ কেবল তাহার মনে হইতেছিল কতক্ষণে সে বীথির নিকট যাইবে? শুভাদেবী নীরবে আসিয়া বলিলেন, এমন অসময় শুয়ে কেন বাবা একটু বেড়িয়ে এস না গাড়ী ত খালি রয়েছে? মিহির বলিল, না মা আজ আর কোথাও যাবনা শরীরটা বড় ক্লান্ত মনে হচ্ছে। মিহিরের জ্যেষ্ঠ ভ্রাতা সমীর নাথ আসিয়া গম্ভীর মুখে বলিলেন, কি মিহির কেমন এগ্‌জামিন দিলে—? মিহির উঠিয়া বসিয়া বলিল, ভাল বলেইত মনে হচ্ছে দাদা?—

সমীরনাথ একটা চেয়ার টানিয়া বসিয়া বলিলেন, তোমার কি শরীর ভাল নেই? মিহির উত্তর করিল—হ্যাঁ মাথাটা বড় ধরে উঠেছে। সমীরনাথ তাঁহার শুভ্র বসনা বিধবা মাতার প্রতি চাহিয়া বলিলেন, মা মনে পড়ে আমার এম, এ পরীক্ষার পর শরীর কিরূপ খারাপ হয়েছিল, আমার মতে মিহির একটা স্বাস্থ্যকর যায়গায় দিনকতক ঘুরে আসুক? মিহির তাহার দাদার কথায় মনে মনে যথেষ্ট অস্বস্তি বোধ করিল—তাহার তখন মনে কেবল বীথির কথাই জাগিতেছিল। আজ দীর্ঘ দুমাস সে তাহাকে ছাড়িয়া আছে আবার চেঞ্জে যাইতে হইবে? মিহির বলিল, না দাদা তেমন শরীর খারাপ হয় নি চেঞ্জে গিয়ে বাজে পয়সা খরচ করে কি লাভ? শুভা দেবী পুত্রের কথায় মনে মনে হাসিয়া বলিলেন আমার ইচ্ছা হয় সকলে মিলে কোথাও একটু বেড়িয়ে আসি একঘেয়ে কল্‌কাতা আর ভাল লাগে না মোটেই। সমীর বলিলেন, আমার ত এখন যাওয়া হয় না মা ছেলেদের পরীক্ষার খাতা দেখতে হবে সে নানান ঝঞ্ঝাট। মিহির বলিল, হাঁ অনেক অসুবিধা মা, এখন আর কোথাও গিয়ে কাজ নেই একেবারে পূজার সময় দেশে গেলেই হবে। মাতা পুত্রের মনোগত ভাব বুঝিয়া কহিলেন বেশ তাই ভাল, কিন্তু সমীর ছোট বৌমাকে আনার কি হবে? তার বাবার ইচ্ছে আর কিছুদিন কাশীতে থাকে।" সমীরনাথ কি ভাবিয়া, হুঁ ভেবে দেখি কি করা উচিৎ বলিয়া বাহিরে চলিয়া গেলেন। মাতাও জ্যেষ্ঠ পুত্রের অনুসরণ করিলেন। মিহির বিরক্ত হইয়া আপন মনেই বলিয়া উঠিল, ধেৎ কেউ-ই যেন কিছু বোঝে না—মারও ত এমন দিন গেছে, দাদারত কথাই নাই—সকালে বৌদি বাপের বাড়ী গেলে দাদা ছোটেন শ্বশুর বাড়ী বৈকালে বৌ আনতে। মিহির উঠিয়া তাহার বৌদিদির সন্ধানে গেল। এঘর-ওঘর খুঁজিয়া বৌদি কে না দেখিয়া নীচে নামিয়া গেল—ঠাকুর ঘরে যাইয়া দেখিল বৌদি তখন ঠাকুর ঘরে ধূপ-ধুনা জ্বালিয়া সন্ধ্যা বন্দনা করিতেছেন ডাক দিল, বৌদি—? বৌদি নীলা মৃদুস্বরে উত্তর করিলেন, যাচ্ছি ভাই। মিহির বৌ দিকে সঙ্গে করিয়া একেবারে উপরে গিয়া নিজের ঘরে বসিয়া বলিল, আচ্ছা তোমাদের ব্যাপার কি বলতে পারো? নীলার দেওরের কথায় কিছু আর বুঝিতে বাকি রহিল না। মনে মনে আজকালকার ছেলেদের নির্লজ্জতার জন্য যথেষ্ট বিরক্ত হইয়া সে ভাব গোপন করিয়া বলিল, কেন কি ব্যাপার দেখলে শুনি? মিহির বেশী ভূমিকা না করিয়া স্পষ্টই সোজাসুজি বলিল, বিয়ে যদি দিয়েছই তা'হলে কি বৌকে বাপের বাড়ী ফেলে রাখবার জন্য বুঝি? বৌদি মৃদু হাসিয়া বলিলেন, কেন বাপু তা বলে কি দুমাসও বাপের বাড়ী থাকতে পারবে না, তোমরা কেবল তোমাদেরই সুখ সুবিধাটা দেখ তাদের দিকেও ত চাইতে হয়? মিহির বিরক্তভাবে বলিল, ও তাই বুঝি দাদাকে ছেড়ে একবেলার বেশী দুবেলা থাকতে পার না অথচ বাপ-মাকে দেখবার সাধও ত মনে মনে যথেষ্ট আছে দেখি। যাক বাজে কথা—বীথিকে আনার দিন কবে ঠিক কচ্ছ বল দেখি? তোমার উপরইত সব ভার কাজেই তোমাকেই বলতে হ'ল। নীলার এখন মোটেই ইচ্ছা নয় যে বীথিকে এই মাসে আনা, তার প্রধান কারণ মিহির যেন দিন দিন বৌ পাগলা হইয়া যাইতেছে বলিয়া, আগে মিহির নাকি বৌদি বলিতে সারা হইত আর বিবাহের পর হইতে মিহিরের বৌদিদির উপর আর কিছুই টান নাই—এই জন্য নীলার মনে বিলক্ষণ বিদ্বেষ ভাব আসিয়া ছিল। ইহা অবশ্য স্বাভাবিকই। এই কারণে নীলার বীথির উপরেই রাগটা বেশী হইয়াছিল, কর্ত্তব্যের খাতিরে ছোট যা বলিয়া লোক দেখান আদরটাও না করিলে নয় তাই বাধ্য হইয়া চুপচাপই থাকিতে হয়। নীলা মিহিরের কথায় ঠাট্টারছলে উত্তর দিল, কেন বীথি না হলে কি তোমার চলছে না? কই আগে ত বীথি ছিল না কেমন করে চলত? মিহিরও ঠাট্টা করিয়া প্রত্যুত্তর

করিল, তখন ত আর ও সবের মর্ম্ম জানতাম না কিনা সেই জন্য। তোমার সঙ্গে খুনসুটী করে তোমাকে বেশ বিরক্ত করে একরকম বাড়ীর মধ্যে দিনগুলো কেটে যেত। এখন ত আর তুমি সে বৌদি নেই, তুমি এখন প্রফেসার গৃহিণী ও পুত্রের জননী হয়ে তোমার আর পাত্তাই পাওয়া যায় না। যাক বাজে কথা বীথিকে যাতে এই কদিনের ভেতর আনা যায় তার ব্যবস্থা কোর ভাই।

(৪)

সংসারে যে কত রকম প্রকৃতির মানুষ জন্মায় তাহার ইয়ত্তাই নেই। এমন কতজন আছে যে নিজে যাহা ভাল মনে করিবে সেটা হাজার খারাপ হইলেও পরের বাধা না মানিয়া তাহাই করিয়া যাইবে, আবার এমনও আছে যে, নিজে যে দোষণীয় কার্য্য করিবে অপরকে তাহা করিতে দেখিলে, তাহাকে তাহার দোষের জন্য তিরস্কার করিতেও ছাড়িবে না। নীলাও ঠিক এই প্রকৃতির মানুষ। মিহিরের কথা শুনিয়া গম্ভীরভাবে স্বামীর নিকট যাইয়া বলিল, শুনছ তোমার ভাই যে পাগল, বলছে যে তার আর দেরী সইছে না বীথিকে এক্ষুণিই এনে দিতে হবে? সমীরনাথ মৃদু হাসিয়া বলিলেন এ বয়েসের ধর্ম্মই যে নীনা এইরূপ।" নীলা রাগিয়া বলিয়া উঠিল—তা বলে এতই বা কি বাপু যে দুমাসের বেশী তিনমাস বৌ ছেড়ে থাকলে মাথা ঘুরে যায়? সমীরনাথ সেই একই ভাবে হাসিতে হাসিতে উত্তর করিলেন, নিজেদের দিক ভেবে কথা ব'লতে হয় নীলা, আমি মনে করেছি হিরুকেই কাশী পাঠিয়ে দিই ছোট বৌমাকে নিয়ে আসুক। নীলা তাহার গম্ভীর প্রকৃতির স্বামী প্রভুটীকে বিলক্ষণ চিনিত। সহজভাবে এবার সে বলিল, তুমি কিছু বোঝ না এখন বীথিকে আনা আমার মোটেই ইচ্ছা নয়, ছোটঠাকুরপোর দিনকতক কোথাও যাওয়া উচিৎ - শরীরও ওর খুব খারাপ হয়েছে। যাক আমি বেশী বলতে চাই না তোমরা যা ভাল বোঝ কোর। সমীরনাথ স্ত্রীর কথায় কোন উত্তর না দেওয়াই ভাল মনে করিয়া চুপ করিয়া রহিলেন। নীলা যে কেন বীথিকে দেখিতে পারে না বিচক্ষণ সমীর নাথ তাহা বুঝিতেন। ধনীগৃহের একটীমাত্র বধূরূপে আসিয়া নীলার যে কত গর্ব্ব ছিল সব বিষয়ে, বীথি আসিয়া তাহার ভাগ লওয়াতে প্রথমত সে খুবই মনক্ষুণ্ণ হইয়াছিল, দ্বিতীয়ত তাহার একান্ত প্রিয় দেবরটী তাহার অনেক দূরে চলিয়া যাওয়াতে সে অত্যন্ত চটিয়া ছিল বীথির উপরেই। সমীরনাথ স্ত্রীর মন এত সঙ্কীর্ণ দেখিয়া মনে মনে অত্যন্ত ঘৃণা করিতেন। কিন্তু মুখে সে ভাব প্রকাশ না করিয়া কিসে নীলার মন হইতে ঐ সব ঘৃণিত ভাব চলিয়া যায় তাহারই চেষ্টা করিতেন। এমন কত দিন গিয়াছে নীলা বীথির কার্য্যের কত বিষয় খুঁৎ ধরিয়া তাহার নামে স্বামী ও দেবরের নিকট অভিযোগ করিতেও ছাড়ে নাই। যদিও দুইজনে কেহই নীলার কথায় কর্ণপাত করিতেন না! মিহির ত বৌদিদির সম্মুখেই স্পষ্ট হাসিয়া উড়াইয়া দিত, আর সমীর নাথ গম্ভীরভাবে পাশ কাটাইয়া চলিয়া যাইতেন। কত সুখের সংসারে শুধু এই লাগানোর জন্য অশান্তির সৃষ্টি করিয়াছে তাহা বিদ্বান সমীরনাথের অজানিত নহে! এইজন্য লেখা পড়া-জানা আজকালকার শিক্ষিতা মেয়ে দেখিয়া ভ্রাতার বিবাহ দিয়াছিলেন—রূপও দেখেন নাই অর্থও দেখেন নাই! মাতা তাঁহার স্ত্রীকে যথেষ্ট রূপরাশি ও ধনীর কন্যা দেখিয়া গৃহে আনিয়া ছিলেন কিন্তু ইহা সত্বেও স্ত্রী তাঁহার সব বিষয় মনোমত হয় নাই কেন তাহা তিনিই বুঝিয়া ছিলেন।

* * * *

আজ চারদিন বীথি কলিকাতা আসিয়াছে। মিহিরের ছুটীর দিনগুলো দিব্য স্ফূর্ত্তিতেই কাটিতেছে বীথিকে পার্শ্বে লইয়া। মিহির আজকাল প্রত্যহ স্ত্রী ও ভ্রাতৃজায়াকে সঙ্গে লইয়া বেড়াইতে বাহির হয়, চক্ষু লজ্জার জন্য মাতার নিকটও আব্দার করিয়া বলে, মা তোমাকে একা ফেলে রোজ কি বেড়াতে ভাল লাগে তুমিও চলনা মা? মাতা সস্নেহে পুত্রের মাথায় হাত বুলাইয়া বলেন, তোদের সুখেই আমার সুখ—নেহাত যদি না ছাড়িস্ আমায় সইএর বাড়ীটা একবার ঘুরিয়ে নিয়ে আয় তারপর তোরা বেড়াতে যা। মিহির কোন দিন সইএর বাড়ী কোন দিন কোন দেবালয় প্রভৃতি দেখাইয়া মাতাকে সুখী করিত। এইরূপে মিহিরের দিন বেশ আমোদেই কাটিতেছে।

আজ সকাল হইতে বীথির শরীর অসুস্থ হওয়ার জন্য মিহির কোথাও যায় নাই। নীচে বৈঠকখানা ঘরে বসিয়া কাগজ পড়িতেছিন। সেই সময় মিহিরের বন্ধু অজিত আসিয়া উপস্থিত

হইল। অজিত, মিহিরের যে আজকাল দেখাই পাওয়া যায় না ইত্যাদি বলিয়া ঠাট্টা সুরু করিয়া দিল। মিহির ব্যতিব্যস্ত হইয়া কথা উল্টাইয়া বলিল, আমাদের রেজাল্টের আর কত দেরী বল্‌তো? দুই বন্ধুর কথা হইতেছিল। সেই সময় পিয়ন আসিয়া একটী চিঠি দিয়া গেল। মিহির খামটীর উপরের লেখা পড়িয়া দেখিল, বীথি দেবী। কোন মেয়ের হাতের লেখা। অজিত খামখানা নিরীক্ষণ করিয়া বলিল, খোল্‌না রে চিঠিটা—নিশ্চয়ই তোর বৌএর কোন ফ্রেণ্ড লিখেছে? মিহির মাথা নাড়িয়া বলিল, উহুঁ বীথির চিঠি সে আগে না খুল্‌লে না পড়লে আমি দেখি না। অজিত বিস্ময় সহকারে বলিয়া উঠিল, কেনরে স্ত্রীর চিঠি স্বামী আগে দেখবে তাতে এত কেন? মিহির বলিল, স্বামী স্ত্রী যে প্রভেদ নয় তা জানি, তবে স্ত্রীবলে কি সে এতই পরাধীন যে নিজের নামের চিঠিটাও সে আগে খুলতে পাবে না। আমি ওসব মোটেই পছন্দ করিনা।

ইহার পর কিছুক্ষণ কথাবার্ত্তার কহিয়া অজিত উঠিয়া গেলে মিহির বীথির নিকট আসিয়া দেখিল,সে শয্যার উপর একলা শুইয়া আছে মুখ তার অত্যন্ত বিষণ্ণ চোখ দুটী খুব লাল। মিহির বীথির কপালে হাত দিয়া বলিল, না জ্বর ত হয় নি, তবে তোমার চোখ এত লাল কেন বলো? বীথি কোন উত্তর না দিয়া উঠিয়া বসিল। মিহির বীথির পার্শ্বে বসিয়া বলিল, কি হয়েছে বলবে না? তুমি কাঁদছিলে নিশ্চয়। ও মা বাবার জন্য মন কেমন কচ্ছে—কই আগে ত কখনও কান্না দেখিনি তবে শরীরে কি কোন কষ্ট হচ্ছে? বীথি লজ্জায় মাথা হেঁট করিয়া বসিয়া রহিল। কোন উত্তর না পাইয়া ব্যথিত স্বরে মিহির বলিল, আমি কি কিছু দোষ করেছি বীথি? বীথি স্বামীর মুখের প্রতি চাহিয়া কি বলিতে গিয়া থামিয়া গেল। মিহির বুঝিল যে কোন বিষয় বীথি গোপন করিতেছে। বীথি স্বামীর হাতটা নিজের হাতের মধ্যে লইয়া বলিল, না অন্য কিছু কারণ নেই মাথার যন্ত্রণা হচ্ছিল বড় বেশী তাই চোখ লাল হয়েছে। মিহির কিছু না বলিয়া পকেট হইতে বীথির চিঠিটা বাহির করিয়া বলিল, এই নাও তোমার চিঠি পড় আমি এখনই আসছি। মিহির বরাবর মাতার নিকট গিয়া দেখিল, তিনি কুটনা কাটিতেছেন। গম্ভীর ভাবে পুত্রকে নিকটে দাঁড়াইতে দেখিয়া মাতা জিজ্ঞাসু ভাবে চাহিলেন। মিহির এধার-ওধার চাহিয়া মাতার পার্শ্বে বসিয়া বলিল মা তোমার ছোট মেয়েকে কি কোন অন্যায়ের জন্য বোকেছ? শুভাদেবী একটী নিশ্বাস ফেলিয়া বলিলেন—অন্যায়ের জন্য যদি বকি সে হাসি মুখে বলে আর কখনও করব না মা, শুধু সইতে পারে না বাপ মাকে কোন কথা বলা। তা বাবা কি করি বল্‌ বড়বৌমার এখনও ছেলেমানুষী বুদ্ধি গেল না যখনই সুবিধা পায় ওর বাপের সঙ্গে ছোট বৌমার বাবার তুলনা দেয়। মিহির মুখে বিদ্রূপের হাসি ফুটাইয়া বলিল ওঃ এই কথা? তুমি কিছু বলনি? তাহলেই হ'ল। মা তোমার ছোট বৌ এখনও বড় ছেলেমানুষ—বয়সে দিন দিন বাড়লে কি হয় ও সংসারের কিছুই শেখেনি—তুমি ওকে সব শিখিয়ে নিও মা।

(৫)

মিহির উপরে বীথির নিকট আসিয়া দেখিল, সে দুই হাতে মুখ ঢাকিয়া উচ্ছ্বসিতভাবে কাঁদিতেছে সম্মুখে তাহার একটী খোলা চিঠি। মিহির কোন কথা না বলিয়া চিঠিটা তুলিয়া লইল, দেখিল মতীর চিঠি, সে লিখিয়াছে—

ভাই বীথি

যখন তুমি আমার এই চিঠিটা পাবে আমি তখন অনেক অনেক দূরে পৃথিবীর সহিত দেনা-পাওনা চুকাইয়া কোন এক অজানা পথে শান্তির আশায় ছুটিয়াছি জানি না—আমার অদৃষ্টের শেষ কোথায়? জানি আত্মহত্যা মহাপাপ তবুও আমি সেই কার্য্যে হাত দিলাম। এ পৃথিবীতে আমার দুঃখে সহানুভূতি দেখাবার একমাত্র তুমি ছাড়া আর কেউ নেই, তাই তোমায় আমার জীবনের দুঃখের কথাগুলো জানিয়ে গেলাম। যদিও জানি তুমি খুবই ব্যথা পাবে আমার শোচনীয় মৃত্যু সংবাদ পেয়ে। এতদিন সমস্ত কষ্ট নীরবে সহ্য করে এসেছি শুধু বৃদ্ধ দাদুর কথা ভেবে, এ দুনিয়ায় আমি ছাড়া তাঁর কেউ-ই ছিল না বলে। দাদুও চলে গেলেন আমার পথ পরিষ্কার হয়ে গেল। আর কার জন্য এই নিদারুণ যাতনা সহ্য করে বেঁচে থাকবো? কাল আমার স্বামীর কঠোর বাক্যে পূর্ণ এক পত্র পাই। তাতে লেখা, তুমি আমার আশা ছেড়ে দাও আমি কোনদিনই তোমায় নিয়ে সুখী হতে পারবো না—কারণ তোমার গুণ নেই, তুমি এখন শত্রুরূপেই আমার ঘরে আছ, সেই ভয়েই

আমি বাড়ী যাওয়া বন্ধ করেছি। আমার মায়ের আমি এক সন্তান—মা'ও শুধু তোমার জন্যই সন্তানের মুখদর্শনে বঞ্চিত। একদিন ভেবেছিলাম, তোমায় নিয়ে আমি সুখী হতে পারবো কিন্তু তুমি যখন আমার মা ও আত্মীয়স্বজনের সহিত ভাল ব্যবহার না করো তাহা হলে কি প্রকারে আমি তোমায় নিয়ে সুখী হতে পারি ইত্যাদি। যাক ভাই বীথি তবে আর কেন, আমার তুচ্ছ জীবনের জন্য যদি এতগুলি লোক কষ্ট পায় তাহলে কি আমার বেঁচে থাকা উচিৎ? তোমাকে আর একবার দেখার সাধ মনে ছিল কিন্তু না এ পোড়ামুখ আর কারুকে দেখাব না। ভাই পরের মুখের কথা শুনে নিজের স্ত্রীকে না চিনে যে স্বামী স্ত্রীর প্রতি খারাপ ব্যবহার করে তারা কি মনুষ্য নামের যোগ্য? অনেক স্বামীদের এইরূপ মনের ধারণা—নূতন বিবাহের পরেই স্ত্রীরা কেন তাঁদের এবং তাঁদের আত্মীয়স্বজনের মনের মত হয়ে যায় না। একথা তাঁরা বোঝেন না যে তারা বিবাহের আগে বনের পাখীর মতই স্বাধীনভাবে পিতামাতার কোলে মানুষ হয় সংসারের ভাল মন্দ জ্ঞান তাদের হয় না। স্বামীর কি কর্ত্তব্য নয়, স্ত্রীকে আদরের সহিত সমস্ত বিষয় শিক্ষা দেওয়া? মা বা বোন ভাজের উপর স্ত্রীর শিক্ষার ভার দেওয়া কখনই উচিৎ নয়—তাঁরা আগে বৌএর পিতামাতাকে গালি দেবেন পরে তিক্ততার সহিত শিক্ষা দিয়া বলবেন এত বড় মেয়ে করে বাপ মা রেখেছিল শিক্ষা দিতে পারেনি ব্যস ইহাতে কেউ কখনও ভাল শিক্ষা পায় না। মিষ্ট কথায় বনের পশুও বশে আসে। বীথি আমি জানি তুমি যে স্বামীর হাতে পড়েছ তিনি তোমায় সমস্ত অশান্তির হাত হতে উদ্ধার করে চিরদিন নিজের বুক দিয়েই তোমায় রক্ষা করবেন। ঈশ্বরের কাছে প্রার্থনা করি যেন তোমার মত ভাগ্যব সকল মেয়েই হয়। এতদিনে আমার চোখের জলের অবসা হ'ল। বিদায়—বিদায় বন্ধু। ইতি—দুর্ভাগিনী তোম মতী।

মিহির চিঠি পড়িয়া স্তম্ভিত হইয়া গেল এমন ভাগ্য নিয়ে মতী জন্মেছিল। মিহির আপন মনে বলিয়া উঠিল, শু মতিই বা কেন? আমাদের দেশে কত শত শত মে নিরুপায়ভাবে এই পথ অবলম্বন করেছে শুধু এই আমাদে মত অপদার্থ স্বামীর হাতে পড়ে। মিহির দুই হাতে বীথি মাথাটা তুলিয়া নিজের বুকের মাঝে রাখিয়া সান্ত্বনার সহি বলিল, কেঁদনা বীথি এখন কেবল প্রার্থনা করো যেন পরপারে গিয়ে শান্তি পায়। বীথি ধরা গলায় বলিল, মতি যে বড় ভাল মেয়ে ছিল, তাকে তার স্বামী চিনলে না মিহির বীথির চোখের জল মুছাইয়া বলিল, এ পৃথিবীতে এমন কত লোক আছে যারা ভালর মর্য্যাদা বোঝে না, কি করবে বল, এখন আর কোনই উপায় নেই। সংসার পথ বড় পিচ্ছিল, বড় ভয়ে বড় আস্তে এই সংসারের পিচ্ছিল সোপানশ্রেণী অতিক্রম করে যেতে হয় তবেই মনুষ্য জীবনের শান্তি। বীথি স্বামীর বুকে মাথা রাখিয়া বলিল, একটা কথা আমার গা ছুঁয়ে বলো হাজার আমার দোষ থাকলেও কখনও আমায় তোমার কাছ ছাড়া করবে না, দোষের জন্য ক্ষমা করবে?

মিহির দুই হাতে পত্নীকে বুকে জড়াইয়া বলিল সেই সত্যই করলাম কখনও তোমায় আমার বুক ছাড়া কোরব না। বীথি মিহিরের হাত ছাড়াইয়া গলায় আঁচল দিয়া ভক্তিভরে স্বামীর পদধূলি লইতে লইতে বলিল, সকল মেয়েরই যেন তোমার মত স্বামী হয়।

জোয়ার-ভাঁটা

শ্রীবিশ্বেশ্বর চট্টোপাধ্যায়

সুকুমারের কথা।

খোট্টার দেশে থাকিতাম, ডাল-রুটি খাইতাম, কতরকম কুস্তীর প্যাচ শিখিয়াছিলাম, কত বড় বড় পালোয়ানের সঙ্গে লড়াই করিয়াছিলাম, এই সকল কথায় আসরটি বেশ জমিয়া উঠিয়াছিল। শ্রোতার দলটিও পাইয়াছিলাম ভাল, তাহারা পরম আগ্রহনিবিষ্টচিত্তে বেশ জমাট হইয়া এই সকল কথা শুনিতেছিল। হঠাৎ কে বে-পরদায় ঘা দিল, সরলা বলিয়া উঠিল—আচ্ছা, তুমি কত বড় পালোয়ান দেখি, আমার সঙ্গে পাঞ্জা লোড়্‌বে এস।

কথাটা শুনিয়া ততটা অবাক হইলাম না, যতটা অবাক হইলাম শ্রোতৃবর্গের মুখের দিকে চাহিয়া। এত বড় কথাটায় যে কিছুমাত্র অভিনবত্ব আছে তাহাদের মুখ দেখিয়া তাহা আদৌ বোধ হইল না। সরলা সপ্তদশবর্ষীয়া, তাহাকে যুবতী বলিতে হয় বল, বালিকা বলিতে হয় বল। তাহার বিবাহ হইয়াছিল, স্বামী নিরুদ্দেশ। অপরে বিস্মিত হইল না কারণ তাহারা এ-রূপ ব্যবহারে অভ্যস্ত। আমি দীর্ঘকাল বিদেশে ছিলাম, সুতরাং সরলার ব্যবহার আমার নিকট কেমন ধারা ঠেকিল। কথা বলিয়াই সরলা নিরস্ত হইল না, আমার নিকট অগ্রসর হইয়া তাহার হাতখানা বাড়াইয়া দিল। আমি দুই পা পিছাইয়া আসিলাম। সরলা ছাড়িল না, আমার হাতখানা জোর করিয়া টানিয়া লইয়া তাহার হাতের উপর রাখিল। আমি পাঞ্জা লড়িব কি, আমার পায়ের তলায় মাটী আছে বলিয়া অনুভব হইল না, দাঁড়াইব কোথায়?

এই একদিনের ঘটনা। এমন অনেকদিন অনেক ঘটনা ঘটিল। আর কেহ এরূপ ঘটনায় কুণ্ঠা বোধ করে না। আমি কুণ্ঠিত হই বলিয়াই যেন সরলা দ্বিগুণ উৎসাহে আমাকে লইয়া পড়িল। আমার সর্ব্বাঙ্গে বিদ্যুৎ-প্রবাহ ছুটিয়া যাইত—আমি অবশ, আত্মহারা হইয়া পড়িতাম। একদিন সংযমের বাঁধ ভাঙ্গিয়া গেল, আমি তাহাকে কি একটা কথা বলিয়া ফেলিলাম। কেমন করিয়া বলিলাম, তাহা এখন আর মনে করিতে পারি না। সেদিন লজ্জার যে মর্ম্মান্তিক তীব্রতা অনুভব করিয়াছিলাম, জীবনে আর কখনও তাহা করিয়াছি বলিয়া মনে হয় না। সে-দিন বুঝিলাম, সরলা বালিকাও নয়, যুবতীও নয়। বালিকার পক্ষে এত বড় সমস্যাটা উপলব্ধি করাই অসম্ভব, এক মুহূর্ত্তের মধ্যে এরূপভাবে তাহার মীমাংসা করা ত দূরের কথা! আর যুবতী হইলে, যৌবনের স্পন্দন কি তাহার হৃদয়ে স্থান পায় না?

তারপর আমাদের নামে কত কুৎসা রটিল। তাহার কতক আমার কাণে পৌঁছিল। সরলার কাণে কোন কথা পৌঁছিয়াছিল কি না জানিনা, কিন্তু তাহার মুখে কোনদিন সে চিহ্ন দেখি নাই। ইঙ্গিতে একথা তাহাকে জানাইলাম। সে বুঝিল কি না বলিতে পারি না, কিন্তু সাড়া দিল না। স্পষ্ট করিয়া বলিলাম, একই ফল। আরও স্পষ্ট করিয়া বলিলাম, আরও পীড়াপীড়ি করিয়া ধরিলাম—যখন আমাদের নামে শুধু শুধু এত বড় একটা কুৎসা রোটেছে, কিছু নয় অথচ শুধু শুধু—

বাধা দিয়া সরলা বলিল—কই, আমাদের কারও গায়ে ত পোকা পড়েনি!

ইহার পর আর কথা চলে না, আমাকে নিরস্ত হইতে হইল।

সরলার কথা

আমার স্বামী ফিরিয়া আসিয়াছেন। দীর্ঘকাল যে তাঁহাকে দেখি নাই, এমন ত মনে হয় না। তাঁহাকে চিরপরিচিতের মত, নিতান্ত আপনার মতই ত বোধ হইল। তাঁহার ব্যবহার পর্য্যন্ত এমন চিরাভ্যস্ত ঠেকিল যে, এতদিন তিনি কোথায় ছিলেন, কেন আসেন নাই, সে কথা জিজ্ঞাসা করিতে একবারও ইচ্ছা হইল না। আমার স্বামীরও সে সব কথা বলিবার কোন আগ্রহ দেখিলাম না। মানুষ মরিয়া কোথায় যায়, একথা ভাবিতে ভাবিতে আমার কতবার মনে হইয়াছে, যদি কেহ কখনও সেখান হইতে ফিরিয়া আসে আর আমার সঙ্গে দেখা হয়, আমি তাহাকে স্বর্গের কথা তন্ন-তন্ন করিয়া জিজ্ঞাসা করিব। কিন্তু সত্য-

সত্যই কেহ কি তাহা পারে? যদি কাহারও মৃত প্রিয়জন ফিরিয়া আসে, তাহার সহিত প্রাণ খুলিয়া কত কথা কহিবার থাকে, স্বর্গের অলীক কাহিনী কি তখন কাহারও মনে স্থান পায়? আমি কোন কথা জিজ্ঞাসা করিলাম না, আমার স্বামীও কোন কথা বলিবার চেষ্টা পর্য্যন্ত করিলেন না, আমাকে বক্ষে তুলিয়া লইতে গেলেন। আমি কালামুখি, স্বামীর বক্ষে স্থান অধিকার করিতে সঙ্কোচ অনুভব করিলাম। বাধা দিয়া বলিলাম—ও কি কর কি?

আমার স্বামী আমার দিকে ফিরিয়া চাহিলেন, তাঁহার চোখে মুখে হাসি। হাসিয়া কহিলেন—কিছুই না, যা কর্‌বার—

আমার মেঘভরা মুখ দেখিয়া তাঁহার আর কথা সরিল না, মুখের হাসি মুখে মিলাইল। আমি বলিলাম—আমার নামে কত কি রোটেছে, শোনোনি কি কিছু?

আমার স্বামী উত্তর করিলেন—না। রটুক্ গে।

তাঁহার অস্বাভাবিক ঔদাসীন্য আমার অন্তরে সজোরে আঘাত করিল। আমি একটু উত্তেজিতভাবে কহিলাম—রটুক্ গে কি? মেয়েমানুষের যার চেয়ে বড় দুর্নাম আর হোতে পারে না—

আমার স্বামী আমার কথায় বাধা দিয়া কহিলেন—লোকের রটানোয় কিছু যায় আসে না। তুমি যা তাই থাক্‌বে।

আমি আর স্থির থাকিতে পারিলাম না। আমার মুখ দিয়া বাহির হইল—যা রটে, তার কিছুও বটে।

তারপর আমার স্বামীর মুখের দিকে চাহিয়া তাঁহাকে আর চিনিতে পারিলাম না—এ যে আর একজন লোক, ইঁহাকে স্বামী বলিয়া কেমন করিয়া গ্রহণ করিব? একটা মানুষের আবার ক'টা স্বামী হয়?

আর একবার আমার স্বামী লোকের চক্ষে নিরুদ্দেশ হইয়াছিলেন। আমি কিন্তু আমার অন্তরে তাঁহাকে হারাই নাই। বাহিরেও তাঁহাকে আবার পাইলাম, কিন্তু তাঁহার বক্ষে আপন স্থান অধিকার করিতে পারিলাম না—কি জানি, যদি তিনি আমার আধখানাকে মাত্র আশ্রয় দেন! আগে তিনি আমার সবটাকে নগ্ন করিয়া দেখুন—যদি ভাল লাগে, গ্রহণ করুন। না হইলে—অতটা ভাবিয়া দেখি নাই!

আবার আমার স্বামী লোকের চক্ষে নিরুদ্দেশ হই[illegible] আমার অন্তরেও তাঁহাকে হারাইলাম, বাহিরেও কখনও খুঁজিয়া পাই নাই।

সুকুমারের কথা

সে সরলা আর নাই মরা গাঙে বাণ ডাকিয়া গিয়া যৌবনের পরিপূর্ণ জোয়ার তাহার দেহ মনকে প্রা[illegible] করিয়া ফেলিয়াছে। কখন বাঁধ ভাঙে-ভাঙে—আ[illegible] এই ভরা নদীটাকে কোন রকমে ঠেলিয়া-ঠুলিয়া আ[illegible] পাহাড়ের গর্ত্তে ফিরাইয়া দেওয়া যায় না? যাহা হই[illegible] নহে তাহা হইল না—তরঙ্গের পর তরঙ্গ আসিয়া আম[illegible] আক্রমণ করিতে লাগিল। আমার কিছু বলিবার [illegible] নাই, একদিন আমিও তাহাকে কতদিক দিয়া আক্র[illegible] করিয়া ছিলাম। সে হেলায় তাহা প্রতিরোধ করিয়াছি[illegible] আমি কি আমার সর্ব্বাঙ্গের সমস্ত শক্তি দিয়া তাহ[illegible] নিবারণ করিতে পারিব না?

সরলা বলিল—নিন্দেয় যে দেশ ভোরে গেছে।

আমি বেশ নির্ব্বিকারভাবেই উত্তর করিলাম—[illegible] গে। আমাদের কারও গায়ে ত ফোস্কা পড়েনি।

আমার কথায় কোন উত্তেজনা প্রকাশ পাইল [illegible] বটে, কিন্তু মনের ভিতর ঝড় বহিতে লাগিল। চা[illegible] দেখিলাম, চারিদিকেই ঝড় বহিতেছে। সরলা উত্তে[illegible] ভাবে কহিল—ফোস্কা পড়ে নি! বুকের ভিতর [illegible] জোলে যাচ্ছে!

আমি কোনও উত্তর দিলাম না। ভাবিলাম, বুঝি[illegible] চেষ্টা করিলাম, সেদিন কেন ফোস্কা পড়ে নাই, আজই কেন বুকের ভিতর জ্বলিয়া যাইতেছে, কিন্তু পরিলাম না।

সেদিন এই পর্য্যন্ত। তার পর যাহা হইল সে আখ্যা[illegible] কাতে কাজ নাই। বহুদিন পূর্ব্বে নারীর কাছে প্রত্যাখ্যা[illegible] হইয়া এক মর্ম্মান্তিক লজ্জা অনুভব করিয়াছিলাম। আ[illegible] উপযাচিকা নারীকে প্রত্যাখ্যান করিতে না পারিয়া তাহ[illegible] শতগুণ লজ্জা অনুভব করিলাম। আমি জ্বলিয়াছিলা[illegible] কিন্তু সরলাকে জ্বালাইতে পারি নাই! পরকে জ্বালাই[illegible] কি সুখ—সুখ কি দুঃখ—তাহা জানি না। সরলা জ্বলি[illegible] আমাকে জ্বালাইল। তাহাতে কি সে সুখী হইয়াছে[illegible] যদি হইয়া থাকে, আমার জ্বলিয়াও সুখ। না হইলে[illegible] আমার জ্বলার যন্ত্রণা অতি তুচ্ছ যন্ত্রণা।

বাড়বানল

গল্প

শ্রীপ্রভা দেবী গঙ্গোপাধ্যায়

মানুষের অন্তরে থাকে দুটো জিনিষ—জল আর আগুন।...

জোৎস্না রাতে ঝিরঝিরে হাওয়ায় যখন জলের বুকের আঁচলখানায় মৃদু কাঁপন লাগে তখন একটা অপরিসীম আনন্দের, একটা অগাধ শান্তির ঝরণার মুখ যেন আপ্‌না-আপ্‌নি খুলে যায়...মানুষ হয় তখন সৌম্য, শান্ত নিরীহ, নির্লিপ্ত!

মাঝে মাঝে এর ব্যতিক্রম ঘটে।

...সহসা কালো মেঘ আকাশের প্রান্তটুকু অবধি গ্রাস ক'রে ফেলে, মাতাল বাতাস সৃষ্টিছাড়া তাণ্ডব সুরু করে দেয়, ঝড় আসে, উত্তাল হয়ে তরঙ্গগুলি ফুলে ফুলে দুলে দুলে ওঠে, আর সে তরঙ্গশীর্ষ থেকে ছিট্‌কে পড়ে আগুনের ফুল্‌কি...মানুষ তখন রূপান্তরিত হয় হিংস্র জানোয়ারে, বন্য শার্দ্দূলে!

ঝরণার বুকে তখন পাবকশিখা লক্ লক্ করে ওঠে।

—বাড়বানল!...

* * * *

রায় বাহাদুর কে, সি, রায়, আই, সি এসের একমাত্র পুত্র জীবন রায় লাহোরে হোষ্টেলে থেকে বি, এ পড়ে।

বাপের ইচ্ছা ছেলে মেজিষ্ট্রেট হয়, বোনের ইচ্ছে দাদা বড় ডাক্তার হ'য়ে পরের উপকার করে, পাড়া পড়্‌শীর ইচ্ছে ছেলে বাপের মতই বিচারকের আসনে বসে লক্ষ লোকের দণ্ডদাতা হয়...

—কিন্তু বন্ধু অমলের আকাঙ্ক্ষা—জলের বুকে আগুন জ্বলে!

সেদিন জীবনের জন্মদিন। বন্ধু অমলকে সঙ্গে করে সে চট্ করে সব গুছিয়ে নিয়ে লাহোর একস্‌প্রেসে চেপে বসে।

জন্মদিনের আমোদের সীমা নেই। হাসি নেই। হাসি ঠাট্টা, গান বাজনা, খাওয়া দাওয়া...অনেক রাত অবধি।

মঞ্জুলা ঠাট্টা করে বলে "বি, এ টা পাশ ক'রে যখন দাদা 'বিয়ে' ক'র্‌বে তখন আবার এম্‌নি আমোদ হবে, তাই না দাদা?'

জীবন হেসে জবাব দেয়, 'কিন্তু ততদিন কি আমার জন্যে তোর সবুর সইবে? ততদিনে তুই..."

"যাও, কি সব ছাই বল যে।" ব'লে মঞ্জুলা বেরিয়ে যায়, যেখানে তার সহপাঠিনীরা ব'সে 'রেডিও' শুন্‌চে, সেইখানে।

প্রতিমা আড়চোখে চেয়ে মুচ্‌কি হেসে জিজ্ঞেস করে, "কি রে মঞ্জু, তুই একা এলি যে? 'তোর' সমীর বাবু এলেন না?"

"তোর সঙ্গে আমি কথা কইতে চাইনে।" ব'লে সে ঝপ্ ক'রে কোণের ইজি চেয়ারটাতে ব'সে পড়ে।

সীতা মঞ্জুলার পানে চেয়ে গুন্ গুন্ স্বরে গেয়ে ওঠে,

ওগো মোর নবীন সাথি,
ছিলে তুমি কোন্ বিমানে।...

—সবাই হো হো করে হেসে ওঠে।

এমন সময় জীবন প্রবেশ করে।

নীলিমা জিজ্ঞেস্ করে, "আচ্ছা জীবন বাবু, বলুন তো এতে প্রতিমার কি দোষ হয়েছে? শুধু জিজ্ঞেস্ ক'রেছে, 'তোর' সমীর বাবু কোথায়, আর অমনি মঞ্জুলা ঝাম্‌টা মেরে বলে কিনা তোর সঙ্গে আমি কথা কইতে চাইনে।—"

"বা বাঃ, কি দরদীরে আমার, তাও তো এখনো 'মালা বদল' হয়নি...

আবার এক পশলা হাসি।

জীবনও এ হাসিতে যোগ দেয়।

—ঝরণার বুকে চাঁদের হাসি।...

সহসা কোত্থেকে অমল এসে জীবনকে এ কল-কোলাহলের বাইরে টেনে নিয়ে যায়, বাগানটার এককোণে একটা বেঞ্চিতে বসে দুজনে আলাপ হয়।

হ্যাঁ, আলাপ হয়, অনেক কথা হয়...কি কথা কে জানে।

চারিদিকে চেয়ে নিয়ে অমল মাঝে মাঝে জীবনের চোখের পানে পূর্ণ দৃষ্টি মেলে কি যেন বলে, জীবনের চোখের পলক পড়ে না।

হঠাৎ যেন জীবনের চোখ দুটো জ্বলে ওঠে, ঝলকে ঝলকে ঠিক্‌রে পড়ে আগুনের হল্‌কা...

কিন্তু পরক্ষণেই আবার সেই সরল মেয়েলি হাসি, সেই শান্ত নির্ব্বিকার ভাব!

অমল আগুন ছড়ায়, কিন্তু অঞ্জলি ভরা তুষার শীতল জলে সে স্ফুলিঙ্গ তলিয়ে যায় নিশ্চিহ্ন হয়ে!...

* * * *

বছর দুই পর।

পুলিশের অব্যর্থ সন্ধানে একটা বিরাট ষড়যন্ত্র ধরা পড়েছে। বোমার একটা প্রকাণ্ড কারখানা আবিষ্কৃত হয়েছে...বিভিন্ন প্রদেশ থেকে তেরোজন বাঙ্গালী, পাঞ্জাবী, মারাঠি যুবককে গ্রেপ্তার করা হয়েছে।

রায় বাহাদুর কে, সি রায়ের এজ্‌লাসে আজ তাদের বিচারের প্রথম দিন।

এগারোটা বাজতেই কয়েদীদের গাড়ীখানা কোর্টের দরজায় এসে দাঁড়ালো।...হাতকড়া আঁটা, কোমরে দড়ি বাঁধা, চারিদিকে সশস্ত্র গুর্খাঘেরা ষড়যন্ত্র মামলার আসামীরা ধীরে ধীরে গাড়ী থেকে নেমে হাসিমুখে কাঠগড়ায় এসে দাঁড়ালো।

রায় বাহাদুর কয়েদীদের একবারটি দেখে নেবার জন্য স্প্রিংয়ের চশমাটা নাকে তুলে দিলেন।

—ওকে!

পাব্‌লিক প্রসিকিউটর্ তখন সোৎসাহে ব'লে যাচ্ছিলেন;......"এই প্রকাণ্ড ষড়যন্ত্র পুলিসের প্রাণান্ত চেষ্টায় ধরা না প'ড়লে যে একদিন এরা গভর্ণমেণ্টের বিরুদ্ধে সশস্ত্র যুদ্ধ ঘোষণা কোরতো সে বিষয়ে সন্দেহ নেই। ভারতবর্ষের বহুস্থানে এর শাখা-প্রশাখা আবিষ্কৃত হয়েছে...এদের দলের প্রধান নায়ক জীবনচন্দ্র রায় লাহোরে ধরা পড়েছে; সেখানে সে এম, এ পড়ছিলো..."

রায়বাহাদুরের হাতের কলম ঠক্ ঠক্ ক'রে কাঁপতে থাকে, চোখের সম্মুখে সব ঝাপ্‌সা হ'য়ে যায়...

পাবলিক প্রসিকিউটর্ বলে যান,..."আমি সাক্ষী দিয়ে প্রমাণ করিয়ে দেব যে এই জীবন রায়ই অমৃতসরে পুলিস-সুপারিন্‌টেণ্ডেণ্ট মিঃ রাইনার্‌কে নৃশংসভাবে হত্যা ক'রেছিলো, এই জীবন রায়ের নেতৃত্বেই এদের দল দিল্লীর ইম্পিরিয়েল ব্যাঙ্ক লুঠ করেছিল..."

রায়বাহাদুর আর সইতে পারেন না, বুকের ভেতর তাঁর কোথা থেকে যেন খানিকটা বরফ উছলে উঠে, সারা দেহে হিমানী প্রবাহ ছড়িয়ে দেয়..... সংজ্ঞাহারা দেহখানা তাঁর এলিয়ে পড়ে চেয়ারের হাতলের ওপর......

কিন্তু তখনো তুষার শীতল কানের কাছে পাবলিক্ প্রসিকিউটরের গলা স্পষ্ট শোনা যায়,......

"এই জীবন রায়ই পুণাতে গভর্ণরের মোটরের ওপর বোমা ছুঁড়েছিল......"

—ঝর্ণার বুকে আগুন জ্বলে......অনির্ব্বাণ সীতাকুণ্ড!!

নানা কথা

কংগ্রেসে জনসাধারণের অধিকার

মহাত্মার প্রস্তাব

স্বরাজের অর্থ সকলের পক্ষে সমান সুবিধা, সমান অধিকার এবং সমান ব্যবহার। শ্রমিকগণ, কৃষকগণ, রাজাগণ ও সকলে যে ভাবে বুঝিতে পারে, সেই ভাবে স্বরাজের অর্থ বিশ্লেষণ করিতে হইবে। উহাকে আমরা স্বরাজ, ধর্ম্মরাজ, রামরাজ বা খোদাইরাজ যে কোন সংজ্ঞায় অভিহিত করিতে পারি। এই রাজত্ব কি ভাবে চালান হইবে তাহাও আমাদের বুঝা দরকার। উহা যে মাত্র শাসকগণ ও কর্ম্মচারীগণের স্বার্থের জন্য নহে, তাহা ভাল করিয়া বুঝাইয়া দিতে হইবে। গোলটেবিল বৈঠকে যাইবার পূর্ব্বে আমরা কি ধারা ধরিয়া দাবী পেশ করিব তাহা বুঝাইতে চাহিতেছি। আমি পূর্ব্বেই আমার ১১টী দাবীর মধ্যে তাহা বলিয়াছি। ঐ সব দাবীর মধ্যে যেগুলি বলা হয় নাই সেইগুলিও বর্ত্তমান প্রস্তাবে যোগ করিয়া দিয়াছি। এই গুরুত্বপূর্ণ ও বহু শাখাসমন্বিত প্রস্তাব কি করিয়া আপনাদের কাছে উপস্থিত করা হইল, এই বিষয়ে বিষয়নির্ব্বাচন সমিতিতে অনেক আলোচনা হইয়াছে। অনেকে এই প্রস্তাব সম্বন্ধে ভুলই বুঝিয়াছিলেন, কিন্তু আমরা ডেলিগেটদের হাত ধরিয়া কোন কাজ করিতেছি না। আমরা মাত্র তাঁহাদিগকে পথ প্রদর্শন করিয়া কিরূপ সীমার মধ্যে কাজ করিবেন, তাহাই বুঝাইয়া দিতেছি। কেবল আমাদের পথ নির্দ্দেশের জন্যই নহে—আমরা কি চাই এবং আমাদের আদর্শ কি তাহা জগৎকে বুঝাইবার জন্যও এই প্রস্তাবের প্রয়োজন। আমরা কাহাকেও দ্বিধার মধ্যে রাখিব না। আমরা যে সরলভাবে কাজ করিতেছি এই বিষয়ে যাহাতে কাহারও কোন সন্দেহ না হয় সে ভাবে আমাদিগকে কাজ করিতে হইবে। আমাদের বড়লাট বর্ত্তমানে মাসে ২০ হাজার টাকা করিয়া পাইতেছেন। আমরা তাঁহাকে ২ হাজার টাকার বেশী দিব না (হাস্য)। কোন লোককে আমরা ৫ শত টাকার বেশী বেতন দিতে প্রস্তুত নহি। আমরা এই সব দাবী উপস্থিত করিয়া সকলকে এই জন্য জানাইয়া দিতেছি যাহাতে সকলেই স্বরাজ অর্থে আমরা কি বুঝি তাহা হৃদয়ঙ্গম করিতে পারে। আমরা কাহারও অজ্ঞাতভাবে হঠাৎ কোন কাজ করিতে যাইব না এবং এজন্য তাহাদিগকে অসন্তুষ্ট করিব না। আমাদের দাবী বিবেচনা করিয়া দেখিবার জন্য আমরা তাহাদিগকে যথেষ্ট সময় দিব। আমাদিগকে সকল প্রকারে স্বাধীন হইতে হইবে এই বিষয় যেন আমরা মনে রাখি।

আমাদের সব চেয়ে বড় সমস্যা হিন্দু-মুসলমান প্রশ্নের সমস্যা। হিন্দুরা সংখ্যায় অধিক এবং মুসলমানেরা তাহাদের ভয়ে খুব ভীত। সুতরাং আমাদিগকে মুসলমানদের ভয় দূর করিতে হইবে। আমাদিগকে এই কথা বুঝাইয়া দিতে হইবে যে, আমাদের কাছে তাহাদের ভয় করিবার কোন কারণ নাই—কেন না, আমাদের উভয়ের স্বার্থ অভিন্ন। উভয় ধর্ম্মেরই মূলনীতি এক। আমি পবিত্র কোরাণ পাঠ করিয়াছি এবং গীতার মধ্যে যে শিক্ষা যে উপদেশ রহিয়াছে তাহাই কোরাণের মধ্যেও পাইয়াছি। অবশ্য কোন কোন বিষয়ে আমাদের মধ্যে ভেদ আছে। উহা খুবই স্বাভাবিক। তাহারা উর্দ্দু ভাষা বলে। সুতরাং তাহাদিগকে নানা বিষয়ে বুঝাইবার জন্য এবং তাহাদের মনের ভাব বুঝিবার জন্য আমাদিগকে উর্দ্দু ভাষা শিখিতে হইবে। তাহারা ফারসী অক্ষর লিখে, তাহাও আমাদিগকে শিখিতে হইবে। এই সব ক্ষুদ্র ব্যাপারের মধ্যে কোন বাদ-বিতর্ক হইতে পারে না।

আর একটি বিষয় হইতেছে মহিলাদের অধিকার। পুরুষের যে অধিকার আছে মেয়েদেরও তাহা থাকা দরকার। হিন্দু আইনে পুরুষ ও মেয়ের অধিকারের তারতম্য করা হইয়াছে। আমাদিগকে এই আইন বদলাইতে হইবে। আমরা তাহাদিগকে সমান ব্যবহার, সমান সুবিধা প্রদান করিব। যদি মহিলারা মিউনিসিপালিটীতে প্রবেশ করিতে চাহেন তবে তাঁহাদিগকে সেই সুবিধা দিতে হইবে। পুরুষের মত তাহাদেরও সম্পূর্ণ সমানাধিকার দিতে হইবে। বর্ত্তমানে কেবল পুরুষেরাই ভারতের বড়লাট হইতে পারে। ভবিষ্যতে আমরা মেয়েদিগকেও আমাদের বড়লাট করিব। (হাস্য)। কংগ্রেসে কখনও পুরুষ ও মেয়েদের অধিকারে তারতম্য করা হয় নাই। পূর্ব্বে বেসান্তের মত ও সরোজিনী দেবীর মত মেয়েরাও কংগ্রেসের সভানেত্রী হইয়াছেন। পুরুষ ও মেয়ের অধিকারে যত প্রকার তারতম্য আছে তাহার সমস্ত আমরা উঠাইয়া দিতে চাই। আমাদের মেয়েরা গত আন্দোলনে খুব বড় অংশ গ্রহণ করিয়াছিলেন এবং তাঁহাদের জন্যই অনেকটা এই আন্দোলন সফল হইয়াছে।

মহিলাদের সম্বন্ধে যাহা বলিলাম—বিভিন্ন জাতি সম্বন্ধেও তাহাই বলিতেছি। বিভিন্ন জাতির মধ্যে অধিকারের যত পার্থক্য আছে তাহা দূর করিতে হইবে। সর্ব্বসাধারণের ব্যবহৃত স্থান, দেবমন্দির প্রভৃতি ব্যবহার করিবার সকলের সমান অধিকার থাকিবে। চাকুরী দান ব্যাপারে কোন প্রকার অনুগ্রহ কাহাকেও দেখান হইবে না। কাহারও প্রতি কোন প্রকার পার্থক্যমূলক ব্যবহারও করা হইবে না। চাকুরীতে যোগ্যতাকেই প্রথম স্থান দেওয়া হইবে।

শ্রমিকদের সম্বন্ধে আমি এই বলিতে চাই যে, তাহাদিগকে অন্ততঃ জীবনধারণোপযোগী মজুরী দিতে হইবে। কোন লোক তাহাদিগকে শোষণ করিবে অথবা অন্নবস্ত্র ও গৃহহীন হইয়া তাহারা মারা পড়িবে—উহা আমরা কিছুতেই সহ্য করিব না। তাহাদিগকে কাজ করিয়া

জীবিকা অর্জনের জন্য আমরা সকল প্রকার সুযোগ দিব, কাজের সময় নিয়ন্ত্রিত করিবে। যখন গবর্ণমেণ্ট আমাদের নিজস্ব হইবে তখন আমরা আমাদের স্বার্থের জন্য আইন রচনা করিতে পারিব।

এই প্রস্তাবের প্রত্যেকটী অংশ আপনাদের কাছে বিস্তৃত ভাবে ব্যাখ্যা করিবার আমার সময় নাই। তবে প্রস্তাবটী এত অধিক ভাবিয়া চিন্তিয়া রচনা করা হইয়াছে যে, উহার মধ্যে এমন কোন কথা নাই যাহার সঙ্গে আপনাদের মতভেদ ঘটিতে পারে। শেষের ধারাটী সম্বন্ধে একটী কথা বলিতে চাই। ইছলামে সুদ গ্রহণ হারাম। কিন্তু হিন্দুদের মধ্যে এমন কোন বিধিনিষেধ নাই। কিন্তু অতিরিক্ত সুদ আদায় করা হিন্দুদেরও ধর্ম্ম নহে। বড়ই দুঃখের বিষয় এই যে পাঠানেরাও অত্যধিক সুদ আদায় করিয়া থাকে। আমি জানি যে, মাড়োয়ারী, গুজরাটি বাণিয়ারাও অত্যধিক সুদ আদায় করে। আপনারা শতকরা বার্ষিক ৬টাকা এমন কি ৮টাকা সুদ আদায় করিতে পারেন। ইহার অধিক সুদ আদায় উচিত নহে। যখন আমি আইন ব্যবসা করিতাম তখন কখনও আমি, যে দলিলে শতকরা বার্ষিক ৮ টাকার উপর সুদের কথা থাকিত, তাহা লিখিতাম না বা উহার মুসাবিদা করিতাম না। আমি এই নীতিকে আদর্শ ধরিয়াই চলিয়াছি।

এখন জমিদারের কথা বলিতেছি। তাহারা ধনী লোক। কাজেই তাঁহাদিগকে গবর্ণমেণ্টকে সাহায্য করিতে হইবে আমরা যাহারা ধনী তাহাদিগকে দরিদ্র করিতে চাই না। তবে সর্ব্বসাধারণের হিতের জন্য যাহাদের বেশী আছে তাহারা অর্থ দিবে, অথবা আমরা তাহাদিগকে অর্থ দিতে বাধ্য করিব। কৃষকদিগকে বাঁচাইতে যাইয়া আমরা জমিদারদিগকে উচ্ছেদ করিব না। যাহাতে উভয়েই প্রীতির সহিত বাঁচিয়া থাকিতে পারে তাহারই আমরা ব্যবস্থা করিব। আমরা কাহারও উপর অবিচার করিব না কিন্তু কাহাকেও ভ্রান্ত আশা পোষণ করিতেও দিব না। কোন লোকের কাছে আমরা আমাদের প্রকৃত আদর্শ কি তাহা ভুল বুঝাইয়া তাহাদিগকে আমাদের দলে টানিতে চাই না। স্বরাজ গবর্ণমেণ্টের অধীনে এখনকার মত জমিদারও থাকিবে, কৃষকও থাকিবে। আমার দৃঢ় বিশ্বাস যে জমিদারেরাও আমাদের পক্ষে আছেন। কেননা আমাদের সংগ্রামে তাঁহারা অনেক সাহায্য করিয়াছেন। গত ২৪ ঘণ্টার মধ্যে এই প্রস্তাবটি রচনা করা হইয়াছে। উহার মধ্যে ভাষার বা অন্যান্য প্রকার ভুল থাকিতে পারে। কিন্তু আপনাদিগকে উহা উপেক্ষা করিতে হইবে। এই প্রস্তাবের সংশোধনের জন্য এত প্রস্তাব আসিয়াছে যে হয় আপনাদিগকে প্রস্তাবটী সম্পূর্ণভাবে গ্রহণ করিতে হইবে অথবা উহা বর্জ্জন করিতে হইবে। কিন্তু একথা স্মরণ রাখিবেন যে, আমাদিগকে সকল শ্রেণীর লোকের অধিকার রক্ষার প্রতিশ্রুতি দিতে হইবে এবং সকলের সম্বন্ধে ন্যায় বিচার করিতে হইবে।

* * * *

রাষ্ট্র-ব্যবস্থার মূলনীতি সম্বন্ধে বিষয়-নির্ব্বাচনী সমিতিতে নিম্নলিখিত প্রস্তাব উত্থাপিত হইয়াছে :—

"এই কংগ্রেসের অভিমত এই যে, জনসাধারণের শোষণ বন্ধ করার জন্য রাজনৈতিক স্বাধীনতার মধ্যে বুভুক্ষু জনসাধারণের প্রকৃত আর্থিক স্বাধীনতা থাকা চাই। কংগ্রেস স্বরাজ বলিতে যাহা বুঝে জনসাধারণ যাহাতে তাহার মর্ম্মোপলব্ধি করিতে পারে, তজ্জন্য তাহাদের বোধগম্য করিয়া কংগ্রেসের কথা স্পষ্ট করিয়া নির্দ্দেশ করা বাঞ্ছনীয়। সুতরাং কংগ্রেস ঘোষণা করিতেছে যে, কংগ্রেসের তরফ হইতে যদি কোন রাষ্ট্র ব্যবস্থা স্বীকৃত হয়, তবে তাহাতে নিম্নলিখিত ব্যবস্থাগুলি থাকা চাই, অথবা স্বরাজ গবর্ণমেণ্টকে সে সমস্ত ব্যবস্থা করার ক্ষমতা দেওয়া চাই :—

(১) সর্ব্বসাধারণের কতকগুলি অবিসম্বাদী অধিকার ঘোষণা যথা—

(ক) সমিতিবদ্ধ হওয়া।

(খ) স্বাধীন মত ব্যক্ত করা এবং সংবাদপত্রের স্বাধীনতা।

(গ) সাধারণের সুনীতি ও শান্তি নষ্ট না করিয়া যাহার যেরূপ অভিরুচি তাহাকে সেরূপ মত পোষণ করিতে এবং ধর্ম্মের অনুসরণ করিতে দেওয়া।

(ঘ) জাতি, বর্ণ বা ধর্ম্মের জন্য কেহ কোন সরকারী চাকুরী, অধিকার বা সম্মান অথবা কোন ব্যবসায় বা বৃত্তির অনুসরণ করার অনধিকারী বিবেচিত হইবে না।

(ঙ) পুং-স্ত্রী নির্ব্বিশেষে সকল নাগরিকের সমান অধিকার ও বাধ্য-বাধকতা স্বীকার করা।

(চ) সাধারণ রাস্তা, কূপ এবং সাধারণের ব্যবহারোপযোগী সকল স্থান ব্যবহার করিতে সকল লোকের সমানাধিকার।

(ছ) সাধারণের শান্তিরক্ষার্থ গঠিত কতকগুলি নিয়মাধীনে সকলকে অস্ত্র রাখার ও ব্যবহার করার অধিকার দেওয়া।

(২) ধর্ম্ম সম্পর্কে রাষ্ট্রের নিরপেক্ষতা।

(৩) শ্রমিকদিগকে জীবনধারণোপযোগী মজুরী দেওয়া। সীমাবদ্ধ সময় খাটান, কর্ম্মস্থলের পবিত্রতা রক্ষা, মালিকের লোকসানে শ্রমিককে ক্ষতি গ্রস্ত হওয়া হইতে রক্ষা করা ; বার্দ্ধক্য, রোগ এবং বেকার অবস্থায় জীবিকার ব্যবস্থা করা।

(৪) দাসত্ব বা প্রায়-দাসত্বের অবস্থা হইতে শ্রমিকদিগকে রক্ষা করা।

(৫) নারী শ্রমিকদিগকে রক্ষা করা এবং গর্ভাবস্থায় তাহাদের জন্য যথোচিত ছুটীর ব্যবস্থা করা।

(৬) স্কুলে যাইবার যোগ্য বালক-বালিকাদিগকে কারখানার কার্য্যে নিয়োগ নিষিদ্ধ করা।

(৭) নিজেদের স্বার্থ রক্ষার জন্য শ্রমিকদিগকে সঙ্ঘবদ্ধ হইবার অধিকার দেওয়া এবং শ্রমিকে মালিকে মতান্তর হইলে মিটমাটের জন্য মধ্যস্থের ব্যবস্থা করা।

(৮) ভূমির রাজস্ব বিশেষভাবে হ্রাস করা এবং অজন্মা জমির খাজনা যতদিন পর্যন্তে মকুব করা আবশ্যক ততদিন পর্য্যন্ত মকুব করা।

(৯) একটা নির্দ্দিষ্ট আয়ের উপর কৃষি আয়ে ক্রমবর্দ্ধমান আয়কর ধার্য্য করা।

(১০) ক্রমিকহারে উত্তরাধিকার কর।

(১১) প্রত্যেক বয়স্ক ব্যক্তির ভোটাধিকার।

(১২) অবৈতনিক প্রাথমিক শিক্ষার ব্যবস্থা করা।

(১৩) সামরিক ব্যয় বর্ত্তমান ব্যয়ের অন্ততঃ অর্দ্ধেক করা।

(১৪) দেওয়ানী বিভাগের ব্যয় ও বেতন বহুল পরিমাণে হ্রাস করিতে হইবে। বিশেষভাবে নিযুক্ত বিশেষজ্ঞ ব্যতীত রাষ্ট্রের কোন কর্ম্মচারীই একটা নির্দ্দিষ্ট টাকার বেশী বেতন পাইবে না। ঐ নির্দ্দিষ্ট টাকা সাধারণতঃ মাসিক পাঁচশত টাকার বেশী হইবে না।

(১৫) দেশ হইতে বিদেশী কাপড় ও বিদেশী সূতা বাহির করিয়া দিয়া দেশী কাপড়কে রক্ষা করিতে হইবে।

(১৬) মাদক পানীয় এবং মাদক দ্রব্য সম্পূর্ণ নিষিদ্ধ করিতে হইবে।

(১৭) লবণের উপর কোন কর থাকিবে না।

(১৮) মুদ্রা বিনিময়ের হার রাষ্ট্র কর্ত্তৃক এরূপভাবে নিয়ন্ত্রিত হইবে, যেন ভারতীয় শিল্পের সহায়তা এবং জনসাধারণের সহায়তা হয়।

(১৯) মৌলিক শিল্প এবং খনিজ সম্পদ রাষ্ট্র কর্ত্তৃক নিয়ন্ত্রণ।

(২০) প্রত্যক্ষ বা পরোক্ষ কুসিদবৃত্তি নিয়ন্ত্রণ।

ভারতে বৃটিশ বাণিজ্য

মহাত্মা গান্ধীর মন্তব্য

"যে সমস্ত বৃটিশ সম্প্রদায় ভারতে বাণিজ্য করিতেছেন এবং যাহারা ভারতে জন্মিয়াছেন, তাঁহাদের উভয়ের মধ্যে বাণিজ্যের অধিকার সম্পর্কে কোন বৈষম্য করা হইবে না—এই নীতি হইতেই আলোচনা উত্থিত হইয়াছিল। এই নীতি খুব নির্দ্দোষ বটে; কিন্তু ইহা দ্বারা একটি গুরুতর বিপজ্জনক অবস্থাকে গোপন রাখা হইয়াছে। বর্ত্তমানে অবস্থা হইতেছে এই রকম, ভারতবর্ষে কুকুরের লড়াই চলিতেছে এবং যদিও ভারত ভারতবাসীরই, তথাপি তাহারাই এক্ষণে ইংরাজের তলে পড়িয়া আছে। ইংরাজেরা শাসক জাতি বলিয়া জীবনের প্রায় প্রত্যেক পদেই তাহারা একটি সুবিধাজনক স্থান দখল করিয়া আছে। অতিরঞ্জিত না করিয়াও একথা বলিতে পারা যায় যে, ইংরাজের শিল্প ও বাণিজ্য ভারতের ধ্বংসাবশেষের উপরই উন্নতি লাভ করিয়াছে। ল্যাঙ্কাসায়ারের উন্নতি বিধানের জন্য ভারতের কুটীর শিল্পকে ধ্বংস করিতে হইয়াছিল। বৃটিশ জাহাজ ব্যবসায়ের যাহাতে উন্নতি হইতে পারে এই জন্য ভারতীয় জাহাজগুলিকে ধ্বংস করিতে হইয়াছিল। সুতরাং ভারতীয় ও ইউরোপীয়ানদিগের মধ্যে কোন বৈষম্য না করার অর্থ হইতেছে ভারতের দাসত্বকে চিরন্তন করিয়া রাখা। দৈত্য ও বামনের মধ্যে অধিকারের কি প্রকারের ক্ষমতা হইতে পারে? অসমানের মধ্যে সমান অধিকারের কথা বলিবার পূর্ব্বে আমাদিগকে ভাবিতে হইবে, কি প্রকারে বামনকে দৈত্যের আকার দেওয়া যায়। লক্ষ লক্ষ লোক যখন সমতলক্ষেত্রে বাস করে এবং তাহাদিগকে যখন সিমলার উচ্চ শৈলশৃঙ্গে তুলিতে পারা যায় না, তখন উহার একমাত্র প্রতীকার হইতেছে এই যে, যাহারা সিমলার শৈলশৃঙ্গে আছে, তাহাদিগকে সমতলক্ষেত্রে নামিয়া আসিতে হইবে।"

ভারতের আর্থিক দুরবস্থা

(ভারতীয় বণিক সভার সভাপতি লালা শ্রীরামের অভিভাষণ)

গত বৎসর ভারতের আর্থিক ব্যাপারে বড় দুর্ব্বৎসর গিয়াছে। এদেশে কৃষিজাত পণ্যের মূল অসম্ভবরূপে হ্রাস পাওয়াতে কৃষকদের আর্থিক অবস্থা অতি শোচনীয় হইয়া দাঁড়াইয়াছে। পৃথিবীর কোন দেশে ভারতের মত কৃষিজাত পণ্যের দাম এত কমিয়া যায় নাই। তারপর ভারতের রপ্তানী জিনিষের দাম খুব কমিয়া গেলেও আমদানী মালের মূল্য সেই হারে কমে নাই। এই জন্যই ভারতের আর্থিক দুরবস্থা আরও চরমে উঠিয়াছে। উহার ফলে ভারতের ব্যবসা বাণিজ্যের অবস্থা অতি শোচনীয় হইয়াছে। গবর্ণমেন্টের রাজস্বের অবস্থাও উহার ফলে শোচনীয় হইয়া দাঁড়াইয়াছে।

ভারতের এই দুরবস্থার জন্য গবর্ণমেন্টের কার্য্যকলাপই দায়ী। প্রথমতঃ গবর্ণমেন্ট বাটার হার এমন অস্বাভাবিক করিয়া রাখিয়াছেন, যাহাতে কৃষিজাত পণ্যের ক্রমেই দাম কমিয়া যাইতেছে। কিন্তু গবর্ণমেন্ট কৃত্রিম উপায়ে বাটার হার নিয়ন্ত্রিত করিয়া এই অবস্থার পরিবর্ত্তন হইতে দিতেছেন না।

দেশের আর্থিক দুরবস্থার আর একটী প্রধান কারণ, গবর্ণমেন্টের টাকা ধার করার নীতি। পৃথিবীর অন্যান্য দেশে জিনিষপত্রের দাম সস্তা হওয়ার সঙ্গে সঙ্গে টাকার সুদও কমিয়া যাইতেছে, কিন্তু এদেশের গবর্ণমেন্ট ক্রমেই অধিকতর চড়া সুদে ঋণ লইতেছেন, তাহা খাটাইয়া যদি আয় হইত তাহা হইলে ঋণ দ্বারা ভারতের উপকারই হইত। কিন্তু ঋণের অধিকাংশ টাকারই কোন আয় হইতেছে না। লোক বিপদে পড়িয়া যেভাবে ঋণ লয় ভারত সরকার সেই ভাবেই ঋণ গ্রহণ করিতেছেন।

ভারতের আর্থিক দুরবস্থার আর এক কারণ, গবর্ণমেন্ট কর্ত্তৃক অত্যধিক ট্যাক্স বৃদ্ধি। উহার ফলে দেশের ব্যবসা-বাণিজ্যের বিশেষ ক্ষতি হইতেছে। ১৯১৩-১৪ সনে এদেশে জিনিষপত্রের মূল্য যে প্রকার ছিল এখনও তাহা তদনুরূপই রহিয়াছে। কিন্তু ১৯১৩-১৪ সনে ভারত গবর্ণমেন্ট ও প্রাদেশিক গবর্ণমেন্টগুলি শাসন কার্য্যে মাট ১২৪ কোটী ৩৪ লক্ষ ২১ হাজার ২৮০ টাকা ব্যয় করেন। কিন্তু ১৯৩১-৩২ সনে একমাত্র ভারত সরকারের ব্যয়ই ১৩২ কোটী ৪০ লক্ষ টাকা ধরা হইয়াছে। ১৯১৩-১৪ সনে ভারতের সামরিক ব্যয় ৩১ কোটী ৮০ লক্ষ টাকা আর এখন ব্যয়ের বরাদ্দ হইয়াছে ৫১ কোটী টাকা। এই সব অতিরিক্ত টাকা ট্যাক্স বাড়াইয়া সংগ্রহ করা হইতেছে আর তাহার ফলে লোকের দুর্দ্দশা চরমে উঠিয়াছে। অবশ্য ভারত-সরকার এ বৎসর একটী ব্যয় সংক্ষেপ কমিটী বসাইতেছেন, কিন্তু উহাতে কোন ফল হইবে কিনা সন্দেহ। গবর্ণমেন্টের এই সব কার্য্য কলাপের ফলেই জনসাধারণ দাবী করিতেছে যে, আগামী শাসনতন্ত্রে ভারতের আর্থিক অবস্থা পরিচালনার ভার

ভারতীয় মন্ত্রিগণের উপর ন্যস্ত করিতে হইবে। গবর্ণমেণ্ট এতদিন যে প্রকার অযোগ্যতার সহিত আর্থিক অবস্থার পরিচালনা করিতেছেন, তাহাতে তাঁহাদের আর একথা বলার জো নাই যে, ভারতবাসীর হাতে এই ভার দিলে তাহারা উহা পরিচালনা করিতে সমর্থ হইবে না। ভারত গবর্ণমেণ্টও তাঁহাদের বিবৃতিপত্রে একথা সমর্থন করিয়াছেন। আর্থিক বিলি-ব্যবস্থার ভার ভারতবাসীর উপর না দিলে তাহারা সন্তুষ্ট হইবে না।

অনেক বৃটিশ ব্যবসায়ী বলিতেছেন যে, ভারতবাসীকে এই অধিকার দিলে তাহারা ব্রিটিশ বণিকদের প্রতি পক্ষপাতপূর্ণ ব্যবহার করিবে। কিন্তু তাঁহারা যাহাই বলুন না কেন, ভারতবাসীর হাতে এই ক্ষমতা না আসিলে কিছুতেই ভারতের শিল্প বাণিজ্যের উন্নতি হইয়া ভারতীয় জনসাধারণের দুঃখ ঘুচিবে না এবং কোন আত্মসম্মান জ্ঞানসম্পন্ন স্বদেশ প্রেমিক কোন শাসনপদ্ধতি সমর্থন করিবেন না। আর উহার ফল এই দাঁড়াইবে যে, ইংরাজ ব্যবসায়িগণ যতই শাসনগত অধিকার লাভ করুন না কেন, ভারতে ইংরাজদের বাণিজ্য বিনষ্ট হইবে। সন্তুষ্ট ভারতবাসীই ভারতে ইংরাজদের বাণিজ্যের সবচেয়ে বড় প্রতিভূ হইতে পারিবে।

ভারতের জাহাজের ব্যবসায় সম্বন্ধে বড়লাট একটা মিটমাট করিতে চাহিয়াছিলেন, কিন্তু গোল টেবিল বৈঠকে অনেক ধনী ইংরাজ ব্যবসায়ী ভারতবাসীর জাহাজের ব্যবসায়ে আত্মনিয়োগের পথ একেবারে রুদ্ধ করিতে চেষ্টা করিয়াছেন। আমাদের শাস্ত্রে আছে যে, ব্রহ্মা সমুদ্র মন্থন করিয়া অমৃত উদ্ধার করিয়াছিলেন। সমুদ্র মন্থনে যে ঐশ্বর্য্যের উদ্ভব হয় তাহা আমরা কিছুতেই বিদেশীয়গণকে লুণ্ঠন করিতে দিব না।

উপসংহারে আমি ভারত সরকার ও বৃটীশ গবর্ণমেণ্টকে ভারতীয় বণিকদের প্রকৃত মনোভাব জানাইতে চাই। বর্ত্তমানে ব্যবসায় বাণিজ্যের অবস্থা অতি শোচনীয়। এখনও আকাশ ঘনঘটাচ্ছন্ন। সুখের বিষয়, এখানে সেখানে মেঘ কাটিবার একটু লক্ষণ দেখা যাইতেছে। যদি আগামী গোলটেবিল বৈঠকে একটা মীমাংসা হয়, তবেই আকাশ সম্পূর্ণভাবে পরিষ্কার হইবে। কিন্তু যদি মীমাংসা না হয় যদি গবর্ণমেণ্ট দেশের আর্থিক ব্যাপারে লোককে স্বাধীনতা না দেন, তবে দেশের জনসাধারণের কোন উপকারই হইবে না। তাহা হইলে পুনরায় সংগ্রাম উপস্থিত হইবে। ভগবান সেই দিন হইতে ইংলণ্ড ও ভারতবর্ষকে রক্ষা করুন। আমাদের উদ্দেশ্য কি তাহা পরিষ্কারভাবে বলিতেছি। আমরা ঔপনিবেশিক স্বায়ত্বশাসনের বেশী কিছু চাই না; কিন্তু উহা অপেক্ষা কিছু কমে আমরা সন্তুষ্ট হইব না। আমি বড়লাট লর্ড আরুইনকে অনুরোধ করি—তিনি এদেশে যে ভাবে কাজ করিয়াছেন, অবসর গ্রহণের পরেও যেন তিনি ভারতের ন্যায্য অধিকার লাভের পক্ষে প্রবৃত্ত করেন।

হিন্দু মহাসভার কথা

হিন্দু মহাসভার ওয়ার্কিং কমিটি শাসনতন্ত্র সংস্কার সম্পর্কে নিম্নলিখিতরূপ বিবৃতি বাহির করিয়াছেন :—

হিন্দুমহাসভা বলিতে চাহেন যে, সাম্প্রদায়িক ব্যাপার সম্পর্কে তাঁহারা বরাবরই সম্পূর্ণ জাতীয়তাবাদী। তাঁহাদের বিশ্বাস যে, কোন প্রকার জাতীয়গবর্ণমেণ্টেই সাম্প্রদায়িক নির্ব্বাচন প্রথা দ্বারা সমগ্র দেশ ও জাতির কল্যাণ হইতে পারে না। তাঁহারা নিজেরা সম্প্রদায়িক স্বার্থসিদ্ধির অভিপ্রায় বিসর্জ্জন দিতে প্রস্তুত এবং আশা করেন যে, অন্যান্য সম্প্রদায়ও অনুরূপ ভাবে কার্য্য করিয়া এমন একটি পূর্ণ গবর্ণমেণ্ট গড়িয়া তুলিবেন, যাহা একই রাজনৈতিকদলের লোকদ্বারা একযোগে পরিচালিত হইবে।

নিম্নলিখিত প্রস্তাবগুলি হইতে হিন্দু মহাসভার মতামত বুঝা যাইবে—(১) সমস্ত সম্প্রদায় ও ধর্ম্মের ভোটারগণকে লইয়া নাগরিক ও জাতীয়তা বাদী হিসাবে একটি সাধারণ নির্ব্বাচকমণ্ডলীর সৃষ্টি হইবে। (২) কোন পৃথক সাম্প্রদায়িক নির্ব্বাচন প্রথা থাকিবে না। (৩) ব্যবস্থা পরিষদে কোন বিশেষ ধর্ম্ম সম্প্রদায়ের জন্য কোন সংখ্যা নির্দ্দিষ্ট থাকিবে না। (৪) কোন সংখ্যালঘিষ্ঠ সম্প্রদায়ের জন্য বিশেষ ব্যবস্থার প্রয়োজন নাই। (৫) একই প্রদেশে সমস্ত সম্প্রদায়ের মধ্যে নির্ব্বাচনাধিকার একইরূপ থাকিবে। (৬) কেন্দ্রীয় বা যুক্তরাষ্ট্র ব্যবস্থাপরিষদের জন্য সমগ্র ভারতে নির্ব্বাচনাধিকার একইরূপ থাকিবে। (৭) সংখ্যা লঘিষ্ঠ সম্প্রদায়ের ভাষা, ধর্ম্ম, জাতিগত আচার প্রভৃতি রক্ষাকল্পে আইন করিয়া সাবধানতামূলক ব্যবস্থা রাখা হইবে—তুর্কী প্রভৃতি ইউরোপীয় দেশে যেরূপ ব্যবস্থা অবলম্বিত হইয়াছে। (৮) সংখ্যাগরিষ্ঠ সম্প্রদায়ের জন্য কোনরূপ বিশেষ ব্যবস্থা অবলম্বন করার প্রশ্নই থাকিবে না। (৯) ভাষা, শাসন, অর্থ ইত্যাদি সম্পর্কিত ব্যাপারের অনুসন্ধান না করিয়া প্রদেশ সমূহের বর্ত্তমান সীমা রেখা পরিবর্ত্তন করা হইবে না (১০) সরকারী চাকুরী ব্যবসা ইত্যাদি লইয়া যদি কোন মতবিরোধের সৃষ্টি হয় সেজন্য ভারতের নিজের জন্য প্রস্তাবিত যুক্তরাষ্ট্রে চূড়ান্ত ক্ষমতাই কেন্দ্রীয় বা যুক্তরাষ্ট্র গবর্ণমেণ্টে ন্যস্ত থাকিবে।

মুসলিম সম্মেলনের কথা

মুসলমান সম্মেলনে জিন্নার ১৪ দফার সঙ্গে এই প্রস্তাবগুলিও করা হইয়াছে।

১। ধর্ম্মসংক্রান্ত যে কোন বিষয়ে মুসলমানেরা ব্যক্তিগত আইনের আমলে থাকিবেন।

২। ব্যবস্থাপক সভায় যদি কোন মুসলমানের ব্যক্তিগত আইনের সম্পর্কে খসড়া উপস্থিত করা হয়, তবে তাহাতে কেবলমাত্র মুসলমানদেরই ভোট দিবার অধিকার থাকিবে।

৩। প্রাদেশিক ব্যবস্থাপক সভায় শতকরা যে পরিমাণে মুসলমান প্রতিনিধি থাকিবেন, মুসলমান প্রাথমিক শিক্ষার ব্যবস্থার জন্য শিক্ষা বিভাগের বরাদ্দে উক্ত পরিমাণ অর্থ ই ব্যয়িত হইবে।

৪। ব্যবস্থাপক সভায় শতকরা যে কয়জন মুসলমান সভ্য থাকিবেন শিক্ষাবিভাগেও উক্ত পরিমাণ মুসলমান সভ্য থাকা চাই।

৫। সম্মেলন প্রস্তাব করিতেছেন যে, শাসন ব্যাপারে ভারত সরকার প্রাদেশিক গবর্ণমেণ্ট সমূহের অধিকারের সীমা নির্দ্দেশের পর যে ক্ষমতা অবশিষ্ট থাকিবে তাহা প্রয়োগ করিবার অধিকার প্রাদেশিক গবর্ণমেণ্টগুলির হস্তে প্রদান করিতে হইবে।

৬। সিন্ধু প্রদেশকে পৃথক করা হউক এবং বেলুচিস্থানকে একটী পূর্ণ অধিকারযুক্ত প্রদেশে পরিণত করা হউক।

৭। এই সম্মেলন পৃথক নির্ব্বাচক মণ্ডলীর এবং বাঙ্গালা ও পঞ্জাবের নির্ব্বাচিত প্রতিষ্ঠানসমূহের মুসলমানদের সংখ্যাধিক্য দাবী করিতেছে।

মুসলিম দাবী

কুমারী সফিয়া খাতুন

মুসলমানগণ জাতির মুক্তি সাধনায় এত সামান্য স্বার্থবলি দিয়াছে যে সাম্প্রদায়িক দাবী করিবার তাহার কোনই অধিকার নাই। মিঃ জিন্নার চৌদ্দদফা দাবী কোন জাতীয়তাবাদী মুসলমান সমর্থন করেন নাই। কেননা জাতির স্বাধীনতা রক্ষা করিতে হইলে, হিন্দুমুসলমানের মিলিত দাবী কার্য্যকরী হওয়াই স্বাভাবিক। স্বাতন্ত্র্য জাতিকে হীনবীর্য্য করিয়া তোলে। কেবলমাত্র 'মুসলমান' হওয়ার সুবিধাটুকু লইয়া, আদুরে খোকার মত বায়না ধরিলে জগতের সম্মুখে মুসলমান উপহাসাস্পদ হইবে। ভিক্ষার অন্নে জীবনধারণ করা অপেক্ষা এতবড় দুর্গতি মানুষের আর কিছু নাই। যোগ্যতা অর্জ্জনে অক্ষমতাই আমাদের মানসিক বৃত্তিকে পশুর অপেক্ষা হেয় করিয়া তুলে। আমরা আজ তাই গুণ্ডামী করে, জোর করে চোখরাঙ্গিয়ে পরের হাতের ক্রীড়নক হয়ে, চৌদ্দদফা ভিক্ষার ভাণ্ড হস্তে অপরের অর্জ্জিত সম্পদে বিত্তশালী হ'তে চাইছি। হজরৎ সামান্য কয়েকজন অনুচর নিয়ে নিজের শক্তিতে আরবের রাষ্ট্র ও সমাজ স্বাধীন ক'রে গড়ে তুলেছিলেন। আজ হজরতের অনুচর বলে নিজেদের পরিচয় দিতে লজ্জা করে। মুসলমান ভিক্ষুক নহে। মুসলমান কথাটার অর্থ হচ্ছে স্বাধীন। জাতীয় স্বাধীনতার যুদ্ধে কয়েকজন জাতীয়তাবাদী মুসলমান নিগ্রহ সহ্য করেছেন। হজরতের এই সমস্ত যথার্থ অনুচরগণ যখন পাষাণ কারাগার মধ্যে দিনের পর দিন কাটিয়েছেন, সেই সময় এই সমস্ত চৌদ্দ দফাদার মুসলমানরা খানাপিনা, আমোদ-আহ্লাদ ক'রে "নিউ দিল্লীর" রাজতক্তে সেলাম ঠুকে আনন্দে দিন যাপন ক'রেছেন। বুরোক্রেসীর দল বেশ ভাল করেই বুঝিয়ে দিয়েছে যে, কংগ্রেসই একমাত্র শক্তিশালী জাতীয় প্রতিষ্ঠান। কিন্তু চোরা না শুনে ধর্ম্মের কাহিনী। স্বার্থপর সম্প্রদায় হ'য়ে জগতে বেঁচে থাকা অপেক্ষা মৃত্যুই শ্রেয়ঃ। মনুষ্যত্বের লেশমাত্র যাহাদের মধ্যে নাই, তারাই চৌদ্দ দফাদার হ'য়ে গুণ্ডামি ক'রে ভিক্ষা লয়। এই দক্ষিণ আফ্রিকায় এসে দেখুন, হিন্দু মুসলমানের স্বার্থ কেমন অভিন্ন। পৃথিবীর সর্ব্বত্র ভ্রমণ ক'রে দেখুন 'মুসলমান' কাকে বলে। ইরাকের হোম সেক্রেটারী সিমি বে, ভগৎ সিংহের শোক সভায় বক্তৃতা প্রসঙ্গে বলেন যে, "এই কেপটাউনে যে সমস্ত ভারতীয় মুসলমান আছেন, তাঁদের সঙ্গে স্বাধীন দেশের মুসলমানদের কোন প্রভেদ নাই। কিন্তু ভারতবর্ষে একদল ভিক্ষুক মুসলমান নীচের মত পরের দ্বারে হাত পাতে। ইত্যাদি"

ডাঃ আলমের অভিমত

আমি দৃঢ়ভাবে এই মত প্রকাশ করিতেছি যে, যে, সমস্ত মুসলমান ভারতের স্বাধীনতার সংগ্রামে কিছু কাজ করিয়াছেন, তাঁহাদের মধ্যে প্রত্যেকেই এই বিষয়ে একমত যে, মিলিত ও স্বাধীন নির্ব্বাচকমণ্ডলির ভিত্তি না করিয়া যদি কোন সাম্প্রদায়িক মীমাংসা হয় তবে তাহা তাঁহারা গ্রহণ করিবেন না। তাঁহাদের মত এই যে, পৃথক নির্ব্বাচক-মণ্ডলী সাম্প্রদায়িক ও জাতীয় এই উভয় প্রকার স্বার্থের ঘোর বিরোধী। যদি সমস্ত হিন্দু জাতিও পৃথক নির্ব্বাচক মণ্ডলীর দাবী করে, তথাপি ব্যক্তিগতভাবে আমি উহা গ্রহণ করিব না। এই কথা দ্বারা আমি আমার বন্ধু ও সহকর্ম্মীদের মনোভাবই ব্যক্ত করিতেছি। আমার মনে হয় যে, মিলিত নির্ব্বাচক মণ্ডলীই দুর্ব্বল পক্ষের অস্ত্র এবং মুসলমানেরা দুর্ব্বল বলিয়াই তাহাদের সাম্প্রদায়িক সার্থকতার জন্য এই মিলিত নির্ব্বাচক মণ্ডলী প্রথা প্রয়োজন। অনেকের ভুল ধারণা এই যে, মিলিত নির্ব্বাচকমণ্ডলীর ফলে দুর্ব্বলপক্ষের অসুবিধা উপস্থিত হইয়াছে। কার্য্যতঃ দুর্ব্বলপক্ষ তাহার স্বার্থরক্ষার জন্য মাত্র এই অস্ত্রই সর্ব্বাপেক্ষা সফলতার সহিত প্রয়োগ করিতে পারে। যদি অন্যান্য সম্প্রদায় পৃথক নির্ব্বাচকমণ্ডলীর সমর্থনও করে, তাহা হইলেও আমি উহার বিরুদ্ধে লড়িব।

জাতীয় দলের মুসলমানদের বহু সমর্থক আছেন এবং প্রকৃত প্রস্তাবে তাঁহারাই সমগ্র মুসলমান সমাজের নেতা। উঁহাদের নেতৃত্বে সমগ্র ভারতে ১২ হাজারেরও অধিক

মুসলমান বিগত আইন অমান্য আন্দোলনে কারাবরণ করিয়াছেন। উহা হইতেই জাতীয় দলের মুসলমানের প্রভাব বুঝা যায়। উহাই চরম নহে। আমাদিগকে আমাদের প্রভাবের আরও পরিচয় হিসাবে একথা প্রকাশ করিয়া দিতে হইবে যে, মুসলমান সমাজ রাজভক্তদের দ্বারা গঠিত তথাকথিত সর্ব্বদল মুসলমান সম্মেলনের সমর্থন না করিয়া আমাদিগকেই সমর্থন করে। যে নীতির ফলে নিজেদের মধ্যে শোচনীয় দাঙ্গা-হাঙ্গামায় ও নিষ্ঠুর রক্তপাত হইয়া থাকে, তাহার মূল্য কতটুকু তাহা আগামী কয়েক মাসের মধ্যেই মুসলমান সমাজ বুঝিতে পারিবে এবং এই বিষয়ে মীমাংসা করিবে। ভেদ নীতির ফল কি তাহা বর্ত্তমানে এত সুস্পষ্ট হইয়া উঠিয়াছে যে তাহা বুঝিতে আর বিলম্ব নাই। মুসলমান জনসাধারণ মিলিত স্বাধীন নির্ব্বাচকমণ্ডলী প্রায়ই সমর্থন করে। কিন্তু তাহারা কি ভাবে মনোভাব ব্যক্ত করিতে হয়, তাহা জানে না এবং তাহাদের কথা কেহ শুনিতে পারিতেছে না। যদি তাহাদের সহকর্ম্মিগণ এই বিষয়ে আন্তরিকতার সহিত চেষ্টা করে, তবে তাহারা সুস্পষ্ট ভাষায় নিজেদের মত ব্যক্ত করিতে পারিবে এবং যে সব লোক তাহাদের স্বার্থসাধনের অছিলায় অন্য স্বার্থ সাধনের চেষ্টা করিতেছে তাহারা তাহা শুনিয়া আশ্চর্য্যান্বিত হইবে।

অভিমান

শ্রীবিমলা দেবী

প্রভাতের আলো, সন্ধ্যা শ্যামলরাত্রি অন্ধকার
ধরণীর ধূলি, শ্যাম কিশলয়, বসন্ত সম্ভার,
ওগো পল্লব চঞ্চল বাহু, নির্জ্জন বনভূমি
দূর নীহারিকা, হে মহা আকাশ নত প্রান্তর চুমি,—
চপল নির্ঝর, প্রবাহিনী ধারা, উন্নত হিমালয়
জনম প্রভাতে তোমাদের সাথে, হ'য়েছিল পরিচয়;
রুদ্র দুপুরে দুরন্ত বায়ু, ঝঙ্কার কলরোল,
শ্রাবণের গাঢ় স্নেহবারিধারা, বসন্ত চঞ্চল,
বন্ধু যে আমি, সাথী ছিনু সাথে, ভুলে যাবে চিরতরে
মনে জাগিবে না স্মরণ আমার চঞ্চল ব্যথা ভরে?
ভুলে যাও যদি, ভুলে যেও তবে, কোন ক্ষোভ নাই আর
ঘুম পাড়ানীয়া গান গাবে যবে, মরণের আঁধিয়ার,
সে সুপ্তি মাঝে ক্ষণে ক্ষণে মোর চমকি জাগিবে চিতে
তোমাদের প্রেম—হয়ত সে ভুল ক্ষণিক—আচম্বিতে।

কংগ্রেসে অশান্তি

নওযোয়ান ভারত-সভা ও কোন কোন যুবাদলের অত্যাচারে মহাত্মাকেও বিব্রত হইতে হইয়াছিল। ভগৎ সিং প্রভৃতির ফাঁসীতেই এইসব যুবদল বিক্ষুব্ধ হইয়াছিলেন এবং শান্তির প্রতীক মহাত্মার গলায়ও ইঁহারা কৃষ্ণমাল্য পরাইয়াছিলেন ও মহাত্মাবাদ্ নিপাত যাউক্ চীৎকার করিয়াছিলেন। মহাত্মা ইঁহাদের ব্যবহারে অসম্ভব কিছু দেখেন নাই—শান্ত স্থির প্রেমভরা চিত্তে ইহাদের মনের বিক্ষোভ ঘুচাইয়া দেশের সার্ব্বজনীন মঙ্গলকার্য্যে আহ্বান করিয়াছেন। কংগ্রেসে বামপন্থীদের ক্ষীণ প্রতিবাদ উঠিতেই মিলাইয়া গিয়াছে—সর্ব্বত্র মহাত্মারই জয় বিঘোষিত হইয়াছে। বর্ত্তমান অসহযোগ সংগ্রামের আরম্ভ, দিল্লীর সন্ধির সূচনা, করাচী কংগ্রেসের সকল ব্যাপারে মহাত্মা একাকীই (অবশ্য সকলেরই সহযোগে) পরিচালনা করিয়াছেন, কার্য্যকরী সমিতির সদস্য নিয়োগ পর্য্যন্তও ইনি সবই নিজ দায়িত্বে Dictatorএর মতই করিয়াছেন। ইহাতে কেহ কেহ বিস্মিত হইতেছেন এবং যিনি কায়মনে গণতন্ত্রের সাধক তাঁহাকেই এরূপ করিতে দেখিয়া সন্ত্রস্ত হইতেছেন। সন্ত্রস্ত হইবার কিছু নাই—পুরা গণতন্ত্রের আদর্শ লইয়া বিশ্বে যে সব রাষ্ট্র চালিত হইতেছে তাহার মূলাধার এখন প্রায় সর্ব্ব রাষ্ট্রেই এক্ একজন ডিক্টেটর। আর যে দেশে পুরা অধীন রাষ্ট্র সেই দেশকে আবার নিজেদেরই সহস্র বিক্ষোভের ভিতর দিয়া একটা স্বাধীনতার রূপ দিবার চেষ্টা হইতেছে—এই স্বাধীনতা মুখে ও মনে উচ্চ আদর্শ হিসাবে অনেকে ভাবিলেও তাহাকে হাতে কলমে বাস্তবে পরিণত করিতে চাহিতেছেন মহাত্মা। সুতরাং জনগণের জন্যই যে তাঁহাকে জনগণ অধিনায়ক হইতে হইবে তাহাতে আর সন্দেহ কি? আর জনগণ-মন-অধিনায়ক কেহ স্বেচ্ছাচার করিয়া সাজিতে পারে না—জনগণ স্বেচ্ছায়ই কোন ভাগ্যবানকে এই অসীম অধিকার দেয়। মহাত্মার নামেই প্রকাশ তিনি ভারতীয় জনগণের নায়ক হইয়াছেন—করাচী কংগ্রেসের এই অশান্তি আগমে কার্য্যতঃ তিনি আরও প্রমাণ করিয়া দিলেন—যে একমাত্র তিনিই যুগপৎ ভারত মহাসাগরের ভীষণ ঝঞ্ঝাবাৎ, চোরা পাহাড়ের আক্রমণ ও হিমালয়ের হিম প্রবাহকে স্বচ্ছন্দে অঙ্গে ধারণ করার শক্তি রাখেন। নেতৃত্বের দাবী মহাত্মা করেন নাই, ভারতই তাঁহাকে ইহা উদ্ধার পাইবার জন্য দিয়াছে,—কংগ্রেসে ঝটিকা উঠিবে, ওঠে যদি উঠুক—মহাত্মা তাহা ধামা-চাপা দিয়া রাখিতে চাহেন নাই, নির্ভীক সত্যাগ্রহীর মত তাহার সম্মুখীন হইয়াছেন—অপর কেহ হইলে বানচাল হইয়া যাইত, ভারতও স্বখাত-সলিলে এই মুহূর্ত্তেই হাবুডুবু খাইত—স্বাধীনতার স্বপ্ন বিংশ হইতে ত্রিংশ শতাব্দীতে চলিয়া যাইত। কিন্তু মহাত্মার প্রেমে এ অশান্তি শান্তি আনিয়াছে—আবার সত্যাগ্রহী ভারতের অখণ্ড সত্যের ভিত্তিতে দাঁড়াইয়া আপন অধিকার বুঝিয়া লইবার অটুট জোর আসিয়াছে।

করাচী কংগ্রেস—বিষয় নির্ব্বাচনে মহাত্মা

এই ইতিহাস বিশ্রুত কংগ্রেসের ৪৫শ অধিবেশনে পূর্ণ স্বাধীনতা ও গোলটেবল বৈঠকে যোগদান সমস্যার আলোচনা প্রথম কথা ছিল। কংগ্রেসের প্রাক্কালে ভগৎ সিং প্রভৃতির ফাঁসী হওয়ায় একদল দেশবাসী দিল্লীচুক্তি নাকচ করিবারও প্রয়াসী ছিলেন। কিন্তু মহাত্মা তাঁহার অসীম ব্যক্তিত্বে ও যুক্তি প্রভাবে ভারতের বর্ত্তমান অবস্থায় কি কর্ত্তব্য ও মঙ্গল তৎসম্বন্ধে প্রতিনিধিদের প্রভাবান্বিত করেন। মহাত্মা বলেন—'পূর্ণ স্বরাজই আমাদের লক্ষ্য।

গোলটেবল বৈঠকে আমাদের যাহা দিবার কথা হইয়াছে তাহা পূর্ণ স্বরাজ এমন কি ঔপনিবেশিক স্বায়ত্তশাসনাধিকারও নহে। কিন্তু আগামী গোলটেবলে পূর্ণ স্বরাজই দাবী করা হইবে। বর্ত্তমানে তাঁহারা আমাদের পরামর্শে আহ্বান করিতেছেন ও আমাদের দাবী তাঁহাদের নিকট উপস্থিত করিতে বলিতেছেন। আমরা কি চাই, এ কথা বলিতে আপত্তির কোন কারণ দেখি না।' মহাত্মাজীর প্রস্তাবে কেহ কেহ আপত্তি ও উষ্মা প্রকাশ করিলেও অধিকাংশ তাহাতেই মত দেন। সুতরাং এ ক্ষেত্রে গোলটেবল আলোচনায় যদি সুফল পাওয়া সম্ভব হয় তবে তাহা পাওয়া যাইবে সে বিষয়ে সন্দেহ নাই। যদি গোলটেবলে যোগদান করা হয় তবে সম্ভবতঃ মহাত্মা গান্ধী একাই ওয়ার্কিং কমিটির সদস্যদের সহযোগে কথাবার্ত্তা চালাইবেন।

সভাপতির অভিভাষণ

কংগ্রেস সভাপতি সর্দ্দার বল্লভ ভাই প্যাটেলের অভিভাষণ সংক্ষিপ্ত ও কাজের কথায় পূর্ণ হইয়াছে। সভাপতি পণ্ডিত মতিলাল ও মৌলানা মহম্মদ আলির মৃত্যুতে শোকপ্রকাশ করিয়া সেই সমস্ত বীরদের প্রতিও সশ্রদ্ধ সমবেদনা জানাইয়াছেন—যাঁহাদের কোন খ্যাতি ছিল না—যাঁহারা খ্যাতির জন্য লালায়িত না হইয়া গত ১২ মাসের অহিংস সংগ্রামে প্রাণ দিয়াছেন।

ভগতসিং প্রভৃতি ফাঁসী

ইঁহাদের ফাঁসীতে দেশময় গভীর ক্ষোভ সঞ্চার হইয়াছে। তাঁহাদের অবলম্বিত পথ আমি সমর্থন করি না, রাজনৈতিক হত্যাকাণ্ড আমার মতে অন্যান্য হত্যাকাণ্ড অপেক্ষা কম নিন্দনীয় নয়, কিন্তু তাঁহাদের দেশপ্রীতি, আত্মত্যাগ ও সাহসের প্রশংসা করি। তাঁহাদের প্রাণদণ্ড রদ্ করিবার জন্য সমগ্র জাতির আকুল আবেদন অগ্রাহ্য করিয়া তাঁহাদের ফাঁসী দেওয়ায় বিদেশী গবর্ণমেণ্টের হৃদয়হীনতার চরম পরিচয় পাওয়া গিয়াছে। আমরা যেন ক্ষোভে, ক্রোধে আমাদের অভীষ্ট হইতে বিচ্যুত না হই। সশস্ত্র শক্তির এই ঔদ্ধত্য প্রাণহীন শাসন পদ্ধতিরই পরিচায়ক। যদি আমরা আমাদের সরল সহজ পথ হইতে বিচ্যুত না হই তবে তাঁহাদের কার্য্যে আমাদের আত্মপ্রতিষ্ঠার শক্তি বৃদ্ধি পাইবে।...

অহিংসা স্বপ্ন নহে

ত্রুটি বিচ্যুতি সত্বেও কার্য্যতঃ ভারত জগৎ দেখাইয়াছে—যে, সার্ব্বজনীন অহিংসা স্বপ্ন নহে। ই অসীম সম্ভাবনায় পূরিত অতি বাস্তব সত্য। মানব আ বিশ্বাসের অভাবেই হিংসার ভারে রুদ্ধশ্বাস হইয়া উঠিয়াছে অহিংস কার্য্যে কৃষক সংঙ্ঘবদ্ধ হইয়াছে, নারী এবং বালক বালিকারাও সাহায্য করিয়াছে। অহিংসার দিক্ দিয় আমাদের সংগ্রাম সমগ্র পৃথিবীর সংগ্রাম বলা যায়। বিভিন্ন জাতি বিশেষতঃ আমেরিকা আমাদের সহানুভূতি দ্বারা সাহায্য করিয়াছে।

গান্ধী আরউইন চুক্তি

এ সম্পর্কে সভাপতি এই মর্ম্মে বলেন—'আমরা যদি এ আপোষ না করিতাম তবে দোষী হইতাম ও গত বর্ষের ত্যাগের সুফল নষ্ট করিতাম। সত্যাগ্রহীর মত বরাবর বলিয়াছি যে আমরা শান্তির জন্য ব্যগ্র, সুতরাং শান্তির পথ উন্মুক্ত দেখিয়া সেই পথই ধরিয়াছি। যুদ্ধ বিরতির সর্ত্তানুযায়ী আমরা পূর্ণ স্বরাজ দাবী করিতে পারিব। দেশরক্ষা, সৈনিকদের উপর এবং অর্থবিভাগ প্রভৃতির উপর কর্ত্তৃত্ব দাবী করিতে পারিব। আমাদেরই স্বার্থের জন্য কতকগুলি সাবধানতা সংরক্ষণ থাকিবে!' এই ব্যাপারগুলি বিষদভাবে বুঝাইয়া সর্দ্দার বল্লভ ভাই বলিতেছেন—আমরা লাহোরের প্রস্তাব হইতে ভিন্ন প্রস্তাব করিতেছি না। কেননা স্বাধীনতার অর্থ ইংরেজ বা অন্য কোন জাতির সহিত খামখেয়ালীভাবে অসহযোগিতা বর্জ্জন নহে। স্বাধীনতার অর্থ পরস্পরের মঙ্গলের জন্য, সম্পূর্ণ সমান হিসাবে পরস্পরের সঙ্গে সহযোগিতা ইহাও হইতে পারে। এই সহযোগিতা ইচ্ছা করিলেই যে কোন পক্ষ বর্জ্জন করিতে পারিবে। ভারতকে যদি আলোচনা ও চুক্তির মধ্য দিয়া স্বাধীনতা পাইতে হয় তবে ইংরেজের সঙ্গে সহযোগিতা স্বাভাবিক।'

ফেডারেশন

যুক্তরাষ্ট্রের আদর্শ চিত্তাকর্ষক হইলেও উহাতে শাসন যন্ত্রে নূতন জটিলতা সৃষ্টি সম্ভব। সামন্তরাজগণ কোন অধীনতার প্রস্তাবে রাজী হইবেন না। কিন্তু ঠিক আদর্শ লইয়া ইহাতে আসিলে তাঁহাদের সাহায্যে গণতন্ত্রের আদর্শ খাটো না হয় তাহাও তাঁহাদের দেখিতে হইবে।

তাঁহারা স্বেচ্ছায় যুগধর্ম্ম পালন করিলে ও প্রজাগণকে ভারতের অন্যান্য প্রজাদের সমান অধিকার দিলে যুক্ত-রাষ্ট্রের সকলের অধিকারই সমান হইবে। সামন্তরাজদের অধিকার ক্ষুণ্ণ হইলে তাহা মীমাংসার জন্য একটি সর্ব্ব-ভারতীয় আদালত গঠন করিতে হইবে।

ব্রহ্ম দেশ

ব্রহ্মদেশ ভারতেই থাকিবে না বিচ্ছিন্ন হইবে এ প্রশ্নের মীমাংসা ব্রহ্মবাসিরাই করিবে। একদল মিলিত থাকিবারই পক্ষপাতি এবং তাহাদের সংখ্যাও ক্রমশঃ বাড়িতেছে। এ সম্বন্ধে সমগ্র ব্রহ্মের অভিমত জানার ব্যবস্থা দরকার।

সম্প্রদায়িক সমস্যা

সকল সমস্যার বড় এই সমস্যা। লাহোর কংগ্রেস স্বীকার করিয়াছেন যে সংখ্যা লঘিষ্ঠ সম্প্রদায়গুলি যে মীমাংসায় রাজী না হইবেন সে মীমাংসা কংগ্রেস স্বীকার করিয়া লইবে না। যাহারা সংখ্যায় বেশী তাহারা যদি সাহস অবলম্বন করে এবং নিজেরা সংখ্যা লঘিষ্ঠদের স্থান অধিকার করে তবে প্রকৃত একতা হইতে পারে। যে ভাবেই হউক এই একতা না হইলে লণ্ডন সম্মেলনে উপস্থিত হইয়া কোন লাভ নাই। একতার জন্য কোন চেষ্টার বাকী রাখিলে চলিবে না।

বিদেশী বস্ত্র বর্জ্জন

ইহা না করিলে ভারতের কোটি কোটি লোক না খাইয়া মরিবে। জিনিষ পত্রের অভাবের জন্য নহে কাজ পায়না বলিয়াই ভারতের কোটি কোটি লোক অনাহারে থাকে, যদি দেশী মিলগুলিও খদ্দরের সঙ্গে প্রতিযোগিতা আরম্ভ করে তবে তাহাদের বিরুদ্ধেও বিলাতী কাপড়ের মতই জনমত সৃষ্টি করিতে হইবে। বিদেশী বস্ত্র বর্জ্জন একটা রাজনৈতিক মন্ত্রই নহে, আর্থিক ও সামাজিক উন্নতির জন্য উহার স্থায়ী মূল্য আছে। ভারতকে সাহায্য করিবার ইচ্ছা থাকিলে ব্যবসায়ীদের বিদেশী বস্ত্রের ব্যবসা ছাড়িতে হইবে।

পিকেটিং

এ ব্যাপারে কেহ কোনরূপ জোর জবরদস্তি করিতে পারিবে না। লোককে বুঝাইয়া কাজ করিতে হইবে। এ কার্য্যে মেয়েদের কৃতিত্ব বেশী। ইহাতে তাঁহারা জাতির কৃতজ্ঞতা ও অনশনক্লিষ্ট দেশবাসীর আশীর্ব্বাদ লাভ করিবেন।

বৃটিশপণ্য

আলোচনা ও মীমাংসা দ্বারা দেশে শান্তি আনিতে হইলে বৃটিশপণ্য বর্জ্জনে ঝোঁক না দিয়া স্বদেশী প্রচারেই মনোযোগী হইতে হইবে। স্বদেশীতে প্রত্যেক জাতিরই জন্মগত অধিকার আছে। দেশে যাহা পাওয়া যায় তাহা দেশীই ব্যবহার করিতে হইবে।

সমানাধিকার

উন্নত ও অবনতের মধ্যে সমানাধিকারের প্রশ্ন উঠিতে পারে না। এরূপ স্থলে সমানাধিকার প্রতিষ্ঠা করিতে হইলে যে বড় তাহাকে একটু নামিয়া ছোটর সঙ্গে মিলিত হইবে। ইংরেজদের তুলনায় ব্যবসা-বাণিজ্য ক্ষেত্রে আমরা অনেক পশ্চাতে আছি। সুতরাং তাহাদের হাত হইতে যদি আমরা দেশী ব্যবসা-বাণিজ্য রক্ষার অধিকার না পাই তবে আমাদের জাতীয় জীবনের অস্তিত্ব থাকিবে না। বৃটিশ সাম্রাজ্যের মধ্যেও ইহা নূতন কিছু নাই। প্রত্যেক উপনিবেশই প্রয়োজনমত এই পন্থা অবলম্বন করিয়াছে।

মাদক বর্জ্জন

দেশের কোটি কোটি লোকের অন্নের জন্য যেমন বিদেশী বস্ত্র বর্জ্জন দরকার তেমনি জাতির নৈতিক উন্নতির জন্য মাদক দ্রব্য বর্জ্জন দরকার। ইহার সঙ্গে রাজনীতির কোন সম্পর্ক নাই।

স্বরাজের মূল

কংগ্রেস স্বর্ণাক্ত কলেবর কোটি কোটি লোকের স্বার্থের জন্যই কাজ করিতেছে। লোভ বা ক্ষমতার বশবর্ত্তী না হইয়া মানব জাতির সেবার জন্য কাজ করিলে উহা বিপুল শক্তিশালী হইবে। হিন্দুধর্ম্ম অস্পৃশ্যতা দ্বারা মলিন থাকিলে স্বরাজের কোন মূল্য নাই। সভাপতি মহাশয় প্রবাসী ভারতবাসীদের প্রসঙ্গে বলিয়াছেন—ভারত শীঘ্রই তাহার অধিকার ফিরিয়া পাইবে—সুতরাং প্রবাসী ভারত-বাসীদের প্রতি সুবিচার করিলে সকল দেশের পক্ষেই মঙ্গলজনক। আমরা স্বাধীন হইলে বিদেশী গবর্ণমেণ্টের অধীনস্থ লোকেরা আমাদের নিকট যে ব্যবহার প্রত্যাশা করেন, তাঁহাদের দেশেও ভারতীয় সেই অধিকারই চায়। ইহা আমাদের বেশী কিছু দাবী নয়।

অভ্যর্থনার অভিভাষণ

কংগ্রেস অভ্যর্থনা সমিতির সভাপতি ডাঃ চৈৎরামের অভিভাষণ অতি সংক্ষিপ্ত সুস্পষ্ট কাজের কথায় পূর্ণ। ইনিও সাম্প্রদায়িক ঐক্যের উপর বিশেষ জোর দিয়া বলিয়াছেন —'আমরা কি হিন্দু, মুসলমান, শিখ, খৃষ্টান, পার্শী, ইহুদী ও অন্যান্য সম্প্রদায়ের মধ্যে এমন এক বা একাধিক সৎ ও সত্যনিষ্ঠ ব্যক্তি পাইব না, যাঁহারা এই দেশকে স্বীয় মাতৃভূমি বলিয়া মনে করিতে পারেন, যাঁহার বিচার বুদ্ধির পরিপক্কতার উপর ও পক্ষপাতশূন্য দৃষ্টি শক্তির উপর আমরা অবিচলিত বিশ্বাস রাখিতে পারি। এমন লোকের নিকট আমাদের দাবী উপস্থিত করিয়া তাঁহাদের সিদ্ধান্ত স্থির চিত্তে মানিয়া লইয়া এ সমস্যার সমাধান করি।'

নূতন কংগ্রেস কার্য্যকরী সমিতি—

এবারকার কংগ্রেসের কার্য্যকরী সমিতি ইহাঁদের লইয়া গঠিত হইয়াছে :—মহাত্মা গান্ধী, ডাঃ আন্সারী, মৌলনা আবুল কালাম আজাদ, বাবু রাজেন্দ্র প্রসাদ, শ্রীযুক্ত যতীন্দ্র মোহন সেনগুপ্ত, এম, এস, এ্যানে, কে, এফ, নরিম্যান, শ্রীমতী সরোজিনী নাইডু, সর্দ্দার শার্দ্দুল সিং, ডাঃ আলম, ও পণ্ডিত জহরলাল নেহেরু, জয়রাম দাস, দৌলতরাম, ও সৈয়দ মামুদ জেনারেল সেক্রেটারী ও যমুনালাল বাজাজ কোষাধ্যক্ষ নিযুক্ত হইয়াছেন।

নমাজের ছুটি

কোন সাধারণ কাজেও নমাজের সময় ছুটি লইয়া সেকাজ তখনকার মত বন্ধ রাখা মুসলমানদের একটা প্রথা হইয়া দাঁড়াইয়াছে। এ সম্পর্কে বিগত করাচী কংগ্রেসের অধিবেশনে মৌলানা আবুল কালাম আজাদ যাহা বলিয়াছেন তাহা প্রণিধান যোগ্য—মৌলানা বলেন—সে দিন নমাজের জন্য সমিতির অধিবেশন স্থগিত রাখার প্রস্তাব করিয়া মৌলানা জাফর আলি সভা ত্যাগ করিয়া যান। তাঁহার দাবী ন্যায় সঙ্গত ছিল। কিন্তু পারিপার্শ্বিক অবস্থায় মৌলানার দাবী সভার অধিবেশন স্থগিতের দাবীরই অনুরূপ হইয়াছিল। সভাস্থগিতের দাবী আমার মতে ইস্লাম ধর্ম্ম বিরোধী। ইস্লাম কখনই মুসলমানকে অন্যের কাজে বাধা দিতে প্ররোচিত করে না। বরং, ইশলামের নির্দ্দেশ এই যে অন্যের কাজের সুবিধার সঙ্গে খাপ খাওয়াইয়া প্রার্থনার সময় ঠিক করিয়া লইতে হইবে এবং ঐ প্রার্থনাই পবিত্রতর হইবে। প্রত্যেকের প্রার্থনার সময়ই যদি সভার অধিবেশন স্থগিতের দাবী করা হয় তবে উহা হাস্যোদ্দীপক ব্যাপারই হইবে। মহাত্মার প্রার্থনার সময়ও প্রেসিডেন্টের সভাধিবেশন স্থগিত রাখা কর্ত্তব্য নহে!

ভগৎ সিং প্রভৃতির প্রাণদণ্ড

১৯২৯ সালের ৮ই এপ্রিল ভারতীয় ব্যবস্থাপক সভায় বোমা নিক্ষিপ্ত হইয়া কয়েকজন সদস্য সামান্য আহত হন, এই সম্পর্কে ভগৎ সিং ও বটুকেশ্বর দত্ত গ্রেপ্তার হইয়া যাবজ্জীবন দ্বীপান্তরে দণ্ডিত হন! ঐ অবস্থায়ই তাঁহারা লাহোর ষড়যন্ত্রের মামলায় অভিযুক্ত হন। ১৯২৮ সালের ১৭ই ডিসেম্বর লাহোর পুলিশের স্যাণ্ডার্স ও চন্দন সিং গুলিতে নিহত হন। এই সম্পর্কে ১০ই এপ্রিল লাহোরের এক বোমা কারখানায় শুকদেবকে গ্রেপ্তার করা হয়। রাজগুরুও ধৃত হন গত ৭ই অক্টোবর ইহাঁদের ফাঁসীর হুকুম হয়। এলাহাবাদে পুলিশের গুলীতে নিহত চন্দ্রশেখর আজাদও এই মামলার ফেরারী আসামী ছিলেন। ভগৎ সিংয়ের পিতৃব্য সর্দ্দার অজিৎ সিং ব্রেজিলে নির্ব্বাসিত জীবন যাপন করিতেছেন। ভগৎ সিং প্রভৃতির ফাঁসী না হইয়া যাবজ্জীবন দ্বীপান্তর হয়, ইহারই জন্য দেশের জনমত বহু আবেদন নিবেদন করিয়াছিল। ভগৎ সিংয়ের ফাঁসীর কথা শুনিয়া মহাত্মা বলিয়াছেন—"ভগৎ সিংয়ের মত বৈচিত্র্যপূর্ণ জীবনের কথা আমি আর কোথাও শুনি নাই।... তাঁহার মৃত্যুতে আজ বহু সহস্র লোক ব্যক্তিগত বিয়োগ ব্যথা অনুভব করিবেন। এই সব যুবক স্বদেশ প্রেমিকের স্মৃতিতে যে শ্রদ্ধাঞ্জলি প্রদত্ত হইতে পারে তাহার সহিত আমিও যোগ দিতেছি। কিন্তু তাঁহাদের দৃষ্টান্ত অনুসরণ না করিতে আমি দেশের যুবকদের সতর্ক করিয়া দিতেছি। তাঁহাদের আত্মোৎসর্গ, অধ্যবসায় ফলাফলে ভ্রূক্ষেপহীন দুর্দ্দম সাহস অনুকরণীয়। কিন্তু ঐ ক্ষমতাকে তাঁহারা যে ভাবে প্রয়োগ করিয়াছিলেন আমরা যেন তাহা না করি! নরহত্যার পথে এ দেশের স্বাধীনতা কখনই লভ্য হইতেপারে না। ...গভর্ণমেণ্ট এই ব্যাপারে বিপ্লবীদলকে হাত করিবার বড় সুযোগ হারাইলেন। ......কিন্তু জাতির

কর্ত্তব্য সুস্পষ্ট। কংগ্রেস তাহার নির্দ্দিষ্ট কর্ম্মপন্থা হইতে এতটুকু বিচ্যুত হইবে না ......ক্রোধান্ধ হইয়া আমরা যেন ভ্রান্ত পথে পতিত না হই।' ভগৎ সিং প্রভৃতির ফাঁসীতে প্রবল উত্তেজনার মধ্যেও জাতি মহাত্মা কথিত ভ্রান্ত পথে পতিত না হইয়া করাচী কংগ্রেসে মহাত্মা-প্রদর্শিত পন্থাই মানিয়া লইয়াছে।

কলিকাতা বিশ্ববিদ্যালয়ে মুসলমানের দান

কলিকাতা বিশ্ববিদ্যালয়ে সাম্প্রদায়িক পক্ষপাতিত্ব হয় কিনা এই প্রসঙ্গে বাংলা কৌন্সিলে শ্রীযুক্ত শ্যামাপ্রসাদ মুখোপাধ্যায় বলেন—১৯০৬ সন হইতে কলিকাতা বিশ্ববিদ্যালয় হিন্দুদের নিকট হইতে ৫০ লাখের উপর টকা পাইয়াছে। অথচ ঐ সময় মধ্যে মুসলমান সমাজ বিশ্ববিদ্যালয়কে দশ হাজার টাকাও দিয়াছে কিনা সন্দেহ। সাধারণ কলেজগুলির ২০,০০০ ছাত্রের মধ্যে মুসলমান ছাত্রের সংখ্যা ২,৮০০ মাত্র! হিন্দু বালিকার সংখ্যা ৩০০ মুসলমান বালিকা মাত্র ৫ জন। ডাক্তারী বা আইন কলেজে হিন্দুছাত্র সংখ্যা ৪,৫০০, আর মুসলমান মাত্র সংখ্যা মাত্র ৮০০! ১৬৬ জন এম-বি পাশ করিয়াছে তার মধ্যে ১০ জন মাত্র মুসলমান। ১ জন মাত্র মুসলমান বি-ই পাশ করিয়াছে। কোন মুসলমান ছাত্র বি-কম বা এম-এস্-সি পাশ করে নাই।

কানপুর দাঙ্গা

যুক্ত প্রদেশের কয়েকটি সহরে পর পর যে ভীষণ দাঙ্গা-হাঙ্গামা হইয়াছে সম্প্রতিকার কানপুরের দাঙ্গা তার মধ্যে সব চেয়ে ভয়াবহ। যে কারণেই এই দাঙ্গার উদ্ভব হউক পরিশেষে ইহা হিন্দু-মুসলমান বিরোধেই রূপান্তরিত হইয়া বহু হিন্দু মুসলমাম হতাহত হইয়াছে! এ সব দাঙ্গা কাহারা বাধায় জানি না—কিন্তু যাহারা দাঙ্গা করে তাহাদের চেয়েও ইহারাই বেশী দোষী তাহাতে সন্দেহ নাই। দু'সম্প্রদায়ের হৃদয়ের পরিবর্ত্তন হইলেই এরূপ দাঙ্গা বন্ধ হইতে পারে তাহা সত্য কথা—কিন্তু এ হৃদয়ের পরিবর্ত্তনেও যাহারা দাঙ্গা করে তাহাদের চেয়ে অন্তরালে যে সব উস্কানোর জন্য নেতা বিরাজ করেন তাহাদের হৃদয়ের পরিবর্ত্তন দরকার। কারণ এরূপ দাঙ্গার মূল তাহারাই। এই সব প্রচ্ছন্ন নেতাদের কবল হইতে দু'সম্প্রদায়ের জনসাধারণকেই রক্ষা করিতে হইলে দু'সম্প্রদায়ের সত্য নেতাদের আরো আলোকে আসিয়া দাঁড়ানো কর্ত্তব্য। সম্প্রদায়গত কোন স্বার্থ এইরূপ দাঙ্গা ও খুন জখমে সাধিত না হইলেও ব্যক্তিগত হীন স্বার্থসিদ্ধি হইতে পারে। দেশের স্বার্থও ডুবানো যাইতে পারে। আর এক কথা এসব দাঙ্গা হাঙ্গামা অবিলম্বে দমন সম্ভব পুলিশ প্রভৃতি দ্বারা—কারণ রাজ-তক্‌মা তাহাদের আছে—কিন্তু দাঙ্গা-হাঙ্গামা জটিল হইবার সময় প্রায়ই তাহার যথোপযুক্ত ব্যবস্থা হয় না—এ কথা অনেক স্থান হইতেই শোনা যায়। এ সম্বন্ধে সরকারের আরো অবহিত হওয়া প্রয়োজন।

গনেশশঙ্কর বিদ্যার্থী

কানপুরের দাঙ্গায় 'প্রতাপ' সম্পাদক মহামনা গনেশশঙ্কর নিজ জীবনাহুতি দিয়াছেন। পণ্ডিত গনেশশঙ্কর হিন্দু মুসলমান সর্ব্বসম্প্রদায়ের প্রিয় ছিলেন। দাঙ্গা থামাইতে গিয়া, আততায়ীর ছুরিকাঘাতে তাঁহার প্রাণ বিয়োগ হয়। করাচী কংগ্রের মণ্ডপ হইতে দেশের প্রায় সর্ব্বত্রই পণ্ডিতজীর এই আত্মদানে সকলেই অশ্রু বিসর্জন করিয়াছে। গনেশ-শঙ্করের প্রাণদানে দেশের হিন্দু-মুসলমান এই হীন সাম্প্রদায়িক কলহ মিটাইবার জন্য আপ্রাণ চেষ্টা করিলেও তাঁহার আত্মা শান্ত হইবে।

সাম্প্রদায়িক সমস্যা

সাম্প্রদায়িক সমস্যা লইয়া মহাত্মার মত পূর্ণ আশাবাদী লোকও আশা-নিরাকার মধ্যে দোল খাইতেছেন। করাচীতে জমিয়ৎ-উল-উলেমা-হিন্দের অধিবেশনে মহাত্মা গান্ধী মুসলমানদের বলিয়াছেন—সাদা কাগজে তাঁহাদের কি দাবী তাহা লিখিয়া দিলে তাঁহারা তাহাই পাইবেন। উলেমার সভাপতি মৌলানা আজাদও বলিয়াছেন তাঁহারা মহাত্মার সহিত মিলিত হইয়া তাঁহারা বাণী মানিয়া চলিবেন। তারপর দিল্লীতে মুসলিম্ সম্মেলন হইয়াছে মৌলানা সৌকত আলীর সভাপতিত্বে! ইহাতে মিঃ জিন্নার ১৪ দফা সাম্প্রদায়িক দাবী সমর্থিত হইয়াছে ও অনেক উষ্ণ বক্তৃতা হইয়াছে।

মহাত্মাজী এ সম্বন্ধে বলিয়াছেন—গত ৪ঠা তারিখ মুস্লিম দলের সম্মেলনে কংগ্রেস-প্রতিনিধিদের নিকট যে প্রস্তাব উপস্থিত করা হয় তাহা সর্ব্ববাদী সম্মতিক্রমে নিম্নদাবী নহে। জাতীয়তাবাদী মুসলমানগণ বলিয়াছেন—যুক্ত

নির্ব্বাচন প্রথা এবং প্রাপ্তবয়স্কদের ভোটাধিকার ভিত্তির উপর যাহা প্রতিষ্ঠিত নহে আমি তেমন কিছু যেন মানিতে রাজী না হই। খোলাখুলি ভাবে সাম্প্রদায়িকতার উপর ভিত্তি করিয়া সমস্যার যে সমাধান, অথচ তাহাতেও কোন সম্প্রদায়ের সর্ব্বাদিসম্মত সমর্থন নাই, তাহার সঙ্গে আমি কোনরূপে সংশ্লিষ্ট থাকিতে পারি না।...সাম্প্রদায়িক সমস্যার সমাধান না হইলে আন্দোলনের পরবর্ত্তী গতি ভিন্ন আকার ধারণ করিতে পারে—কিন্তু লক্ষ্য একই থাকিবে।' ভারতের এই জাতীয়-সঙ্কট-সমস্যার সময় জাতীয়তাবাদী মুসলমানগণ কোনরূপেই কি সম্প্রদায়িকতার উর্দ্ধে জাতীয়তাকে প্রতিষ্ঠা করিতে পারেন না ?

ডগলস্ ফেয়ার ব্যাঙ্কস্

প্রসিদ্ধ অভিনেতা ডগ্‌লাস্ ফেয়ার ব্যাঙ্ক্‌স্ ভারতে আসিয়া সামান্য কিছুদিন থাকিয়া বিপুল অভ্যর্থনা পাইয়া আবার স্বদেশে ফিরিয়া গিয়াছেন। জাহাজে উঠিবার সময় বলিয়া গিয়াছেন এবার সস্ত্রীক আসিতে পারেন।

আর্ণল্ড বেনেট

প্রসিদ্ধ ইংরাজ সাহিত্যেক আর্ণল্ড বেনেট সম্প্রতি পরলোকগমন করিয়াছেন। ইনি বহু বিখ্যাত উপন্যাসের লেখক ও সংবাদপত্রের নানাবিষয়ের বিশিষ্ট লেখক ছিলেন। ইঁহার মৃত্যুতে সাহিত্য ক্ষতিগ্রস্ত হইল সন্দেহ নাই।

বাঙ্গলায় সবাক্ চিত্র

ম্যাডান কোম্পানী সবাক্ বায়স্কোপ ক্রাউন সিনেমায় দেখাইতেছেন। প্রথম প্রচেষ্টা হিসাবে ইহাকে সার্থক বলিতে হইবে এবং ক্রমশঃ ভারতীয় অভিনেতারা সবাক চিত্রে সাফল্য অর্জ্জন করিতে পারিবেন আশা হয়। নোবেল পুরস্কার প্রাপ্ত অধ্যাপক সার সি-ভি রমণও প্রথম টকিতে টকির উজ্জ্বল ভবিষ্যত সম্বন্ধে কিছু বলিয়াছেন। কবি কাজী নজরুল ইসলাম, শ্রীযুক্ত দুর্গাদাস বন্দ্যোপাধ্যায়, পেসেন্স কুপার ও দু'একজন পার্শী অভিনেতার ভবিষ্যৎ বিশেষ উজ্জ্বল মনে হইল। টকিতে কণ্ঠের স্বর ও সঙ্গীতে যতটা দৃষ্টি দেওয়া হইয়াছে ভাবাভিব্যক্তির দিকে তেমন দৃষ্টি দেওয়া হয় নাই—তাই দু'চারজন ছাড়া কাহারও কণ্ঠ শুনিলেও জীবন্ত মনে হয় না। ভবিষ্যতে ম্যাডান কোম্পানী ও অভিনেতৃগণ এদিকে দৃষ্টি দিবেন আশা করি।

সাম্প্রদায়িক সমস্যায় সংবাদপত্র

সাম্প্রদায়িক সমস্যা মিটাইবার জন্য অথবা তাহাতে ইন্ধন না দেওয়ার জন্য বাংলার সংবাদপত্র-সেবী-সমিতি সম্প্রতি কতকগুলি প্রস্তাব করিয়াছেন। সাম্প্রদায়িক বা ঐ ধরণের রাজনৈতিক বিষয় বিশেষ বিবেচনার সহিত ধীর ভাবে আলোচনা করিতে হইবে। কোন সম্প্রদায়কে আঘাত করিয়া কোন কথা বলা হইবে না, কোন সম্প্রদায় ভীষণ অপরাধ করিলে তাহা অপক্ষপাত ভাবে আলোচিত হইবে। সম্প্রদায়ের বিরুদ্ধে পূর্ণ সংবাদ না পাওয়া পর্য্যন্ত তাহার উপর কোন মন্তব্য করা হইবে না। সংবাদের শিরোনাম সাবধানে দিতে হইবে ইত্যাদি। এই উপলক্ষে হিন্দু-মুসলমান বহু সাংবাদিক একত্র হইয়াছিলেন। বাংলার হিন্দু-মুসলমান সাংবাদপত্রগুলির সহযোগিতায় দেশে হিন্দু-মুসলমান সদ্ভাব বর্দ্ধিত হইলে ভাল। সংবাদপত্রসেবী-সমিতিএজন্য ধন্যবাদার্হ।

মেদিনীপুর ম্যাজিষ্ট্রেটের হত্যায় মহাত্মাজী

মেদিনীপুরের ম্যাজিষ্ট্রেট্ মিঃ জেমস্ পেডি আততায়ীর গুলীতে নিহত হইয়াছেন। এই হত্যাকাণ্ড সম্পর্ক মহাত্মাজী বলিয়াছেন—যে সব যুবক এইরূপ নরহত্যা সাধন করে তাহার দেশের কোন উপকার করে না। তাহাদের বুঝা উচিত যে গত অহিংস সংগ্রামে দেশ অসামান্য লাভবান হইয়াছে। যদি কোন হিংসাত্মক কার্য্য ও হিংসা প্রচার না হইত তবে দেশ আরো উন্নতি লাভ করিতে পারিত। যাহারা রাজনীতিক হিংসা কার্য্যে বিশ্বাসী তাহাদিগকে আমি বলি—যতদিন পর্য্যন্ত কংগ্রেস অহিংস ও সত্যের নীতিতে দৃঢ় থাকিবে ততদিন পর্য্যন্ত তাহাদের হস্ত সংযত রাখুক। যদি তাহারা অধীর হইয়া উঠিয়া থাকে তবে তাহাদের সময়ের একটা মেয়াদ বাঁধিয়া দিক, তাহারা যেন সেই সময়ের মেয়াদ ধর্ম্ম বিশ্বাস সহকারে মানিয়া চলে।

"সুরের প্রাণ"

(Wynne O Apperley R. I. অঙ্কিত)

৫ম বর্ষ | জ্যৈষ্ঠ, ১৩৩৮ | ২য় সংখ্যা

সঙ্কট-কালে

গত বর্ষে রাজনৈতিক ব্যাপারে ভারত অসামান্য সাফল্য লাভ করিলেও আর্থিক ভাবে তাহাকে সর্ব্বদাই বিশেষ বিব্রত থাকিতে হইয়াছে। সাময়িক সন্ধির সঙ্গে অনেকেই আশা করিতেছে এই সন্ধি যদি স্থায়ী সন্ধি হয় তবে অবস্থাও ক্রমশঃ উন্নত হইবে আর তাহা যদি না হয় তবে ব্যবসায়-বণিজ্য সব তো রসাতলে যাইবেই, ভারতীয়দের অবস্থা তখন এখনকার চেয়েও আরও সঙ্কটাপন্ন হইবে। অবশ্য ভারতে এই রাজনৈতিক অশান্তি-বিক্ষোভ চলাতে ভারতের অর্থ-সঙ্কটের সঙ্গে জাগতিক অর্থসঙ্কটও চলিয়াছে—বিশেষত ইংলণ্ডের যে সব ব্যবসায়-পণ্য ভারতের উপর নির্ভর করিয়াই চলে তাহাদের অবস্থা তো অতি সঙ্কটাপন্ন। কিন্তু তাহা হইলেও ভারতের সঙ্গে সে সব দেশের তুলনা ঠিকমত হয়না—কারণ তথাকার লোকজনের অর্থসঙ্কটে গবর্ণমেণ্টকে যেমন রীতিমত বিব্রত হইতে হয়,—এখানে তেমন মোটেই হইতে হয় না। তাহা ছাড়া অর্থসঙ্কট তেমন ব্যাপকভাবে দেশব্যাপী হইলে গবর্ণমেণ্টের পক্ষেই বা কতটা কি করা সম্ভব?

দেশে রাজনৈতিক অশান্তির সূত্রপাত হইতে মহাত্মা গান্ধী বারংবার দেশবাসীকে এ বিষয়ে সাবধানতা অবলম্বন করিতে বলিতেছেন। বিলাস্-ব্যসন একেবারে বর্জ্জন করিয়া যাহা একান্ত না হইলে নয় তেমনি ভাবে খাওয়া-পরা চালাইয়া জীবনধারণ করিতে লোককে উপদেশ দিয়াছেন। কিন্তু গত রাজনৈতিক সংঘর্ষেই দেখা গিয়াছে যেমন-তেমন ভাবে চলিয়াও অর্থের জীবন কষ্ট হইতে অনেকে মুক্তি পান নাই। সুতরাং বর্ত্তমানে এ সম্বন্ধে আরও সুনির্দ্দিষ্ট পন্থা দেশ-নেতাদের দেওয়া কর্ত্তব্য—যাহাতে ভারতের সকল শ্রেণীই নিজেদের অস্তিত্ব বজায় রাখিয়া এই সংঘর্ষের ভিতরেও চলিতে পারে। অবশ্য কষ্ট আসিবেই কিন্তু তাহাতে ডুবিয়া যাইতে না হয় এই জন্যই নির্দ্দেশ প্রয়োজন।

এবার দেশে অর্থ-সঙ্কটের সঙ্গে প্রয়োজনীয় প্রায় সব রকম দ্রব্যাদির মূল্যই কমিয়া গিয়াছিল—অনেক স্থলে পুরাণো কালের অর্থের পরিবর্ত্তে বিনিময়ে দ্রব্যাদি লওয়াও আরম্ভ হইয়াছিল। ইহাতে ক্ষতির কিছু নাই, এ-দিক দিয়াও আমাদের দেশ আত্মতৃপ্ত থাকিতে পারে। কিন্তু ভূমি রাজস্ব প্রভৃতি না দিয়া তো উপায় নাই—এদিকে কি উপায় অবলম্বনীয় তাহাও বিশেষ চিন্তার বিষয়। বাংলায় প্রজা ও জমিদারবর্গের এ-বিষয়ে সম্মিলিত বৈঠক হওয়ায় প্রয়োজন, এবং যাহাতে কেহ বিশেষ ক্ষতিগ্রস্ত না হইয়াও বাঁচিতে পারে তাহা দু'য়েরই দেখা কর্ত্তব্য।

রাজনৈতিক আন্দোলন দেশের স্বাধিকার না আসা পর্য্যন্ত চলিবেই—ইহা যদি আপোষে আসে তবে ভাল, যদি না আসে, তবে রাজনৈতিক বিক্ষোভ আরও বিপুলভাবে আসিয়া ভারতকে বিক্ষুব্ধ করিবে সন্দেহ নাই। বিলাসিতা প্রভৃতি বর্জ্জন এদিকে পূর্ণ জোর রাখিতে হইবে—তা ছাড়া অন্যান্য কিরূপ উপায় অবলম্বন করিতে হইবে সে সম্বন্ধেও দেশের লোককে প্রতিদিন সতর্ক করা প্রয়োজন।

প্রভাতের আলোক

শ্রীমাণিক ভট্টাচার্য্য বি-এ

—গল্প—

শরতের প্রভাত।

তখনও অরুণোদয় হয় নাই। স্নিগ্ধ শুভ্র শিশির তখনও তৃণের উপর ফুলের মত ফুটিয়া আছে; কাহারও চরণের ঘায়ে, রৌদ্রের তাপে গলিয়া মাটিতে লুটায় নাই। বিন্দু বিন্দু শিশির বৃক্ষের উপর দিবসের রৌদ্রতপ্ত কিশলয়কে সারারাত্রি স্নিগ্ধ রাখিয়া প্রভাতে বিদায়ের অশ্রুবিন্দুর মত পত্রপ্রান্তে ছল ছল করিতেছে ও মাঝে মাঝে দুই একটি করিয়া তৃণাস্তীর্ণ মৃত্তিকার উপর নীরবে ঝরিয়া পড়িতেছে।

দেশপ্রাণ দীনদাস গ্রামে গ্রামে পদব্রজে যাইতেছেন। ধনী নির্ধন, অভিজাত কৃষক, বালক যুবা—সকলকে আহ্বান করিয়া দেশ সেবা সম্বন্ধে অতি সরল কথায় দুই একটি উপদেশ দিয়া যাইতেছেন।

সুপ্তিগ্রামে তাই সকলে আজ এত প্রভাতে জাগিয়াছে। গ্রামপ্রান্তে বৃক্ষলতা বেষ্টিত বিস্তীর্ণ প্রান্তরে সকলে একত্রিত হইয়াছে।

দীনদাস বলিলেন, "তোমাদের নূতন কথা শুনাইব এমন জ্ঞান আমার নাই। শুধু কয়েকটি পুরাতন কথা তোমাদের বলিতে আসিয়াছি। অলস হইওনা, কাহাকেও অলস হইতে দিও না। মাদক দ্রব্য ব্যবহার করিও না—যাহাতে কেহই ব্যবহার না করে তাহার জন্য স্নেহের সহিত প্রীতির সহিত চেষ্টা করিবে। তোমার ভাইকে অন্যায় করিতে নিষেধ করিবার অধিকার যখন তোমার আছে, তোমার দেশবাসীর উপরও সে অধিকার তোমার কেন থাকিবে না? তোমার দেশের তাঁতি, দেশের কামার, দেশের মুচি অন্নাভাবে তোমার মুখপানে চাহিয়া আছে। তাহাদের মুখের গ্রাস বিদেশীকে দিওনা। যে দিবে তাহাকে নিষেধ কর।

"অন্যায়ের কাছে মাথা নীচু করিও না। বীরের মত তাহার প্রতিবাদ করিবে। বিলাসিতা ত্যাগ করিয়া সরল জীবন যাপন কর। দেশের হিতের জন্য প্রতিদিন ভগবানের কাছে প্রার্থনা করিবে—আন্তরিক প্রার্থনায় সব হয়। প্রতিদিন নিয়ম করিয়া-যত সামান্য ক্ষণই হউক্—দেশের কথা ভাবিবে, দেশের কাজ করিবে। আপনার সন্তানদের দেশকে ভালবাসিতে শিখাইবে।

"স্মরণ রাখিও এপথ ত্যাগের পথ, শক্তির পথ, প্রেমের পথ। এপথ মহিমামণ্ডিত হইলেও কুসুমাস্তীর্ণ নহে। এপথে আঘাত সহিতে হইবেই - সেজন্য প্রস্তত হইয়া থাকিও। হয় ব্রহ্মচারী থাকিয়া দেশের সেবা করিবে, না হয় বিবাহিত হইয়া দেশের কাজ করিবে।

"মরণের ভয় রাখিও না—বাঁচিতে চাহিলেই বাঁচিয়া থাকা যায় না।

সাধারণ উপদেশ—অসাধারণত্ব কিছুই নাই, বাগ্মিতা বা বলিবার কোন আড়ম্বর নাই। তথাপি এমনই আন্তরিকতার সহিত কথাগুলি দীনদাস বলিলেন যে, তাহা সকলেরই হৃদয় স্পর্শ করিল। অনেকেই মনে মনে প্রতিজ্ঞা করিল, যেমন করিয়া হউক তাহারা দেশের সেবা করিবে। কেহ বাড়ী ফিরিয়া তাহা ভুলিল, কেহ কিছুদিন পরে ভুলিল, কেহ বা চিরকাল মনের মধ্যে তাহা গাঁথিয়া রাখিল

২

সুপ্তি গ্রামের একটি বালকের মনে এই উপদেশ চিরকালের মত গাঁথা হইয়া গেল। সে বালক ধ্রুব।

ধ্রুবের বয়স ১৬ বৎসর—ইংরাজী স্কুলে প্রথম শ্রেণীতে পড়ে। পাঠে সে সতীর্থদের মধ্যে সর্ব্বশ্রেষ্ঠ, সৎকর্ম্মে পরম উৎসাহী, সেবায় সর্ব্বদা উদ্যত।

ধ্রুব মধ্যমাকৃতি, গৌরবর্ণ, শান্ত কিশোর মূর্ত্তি, মুখে সর্ব্বদা দৃঢ়তা ও প্রসন্নতা ফুটিয়া আছে।

ধ্রুব বাড়ী আসিয়া মায়ের কাছে সভার সব বর্ণনা করিয়া বলিল, মা, তুমি যদি অনুমতি দাও আমি দেশের সেবা করিব।'

মাতা পুত্রের গায়ে হাত বুলাইয়া বলিলেন, 'বাবা, ইহাতে যে বিপদ্ আছে; যদি তোর বিপদ্ ঘটে?

ধ্রুব বলিল, "মা, অলস ও অকৃতজ্ঞ হইয়া বসিয়া থাকিলেও তো বিপদ ঘটিতে পারে। তোমার দুঃখে দুর্দ্দিনে

তোমার সেবা না করিলে যেমন পাপ হয়, দেশের দুরবস্থায় দেশের সেবা না করিলেও তেমনি পাপ হইবে। আমি জানিয়া শুনিয়া এই পাপ করিব ?'

মা বলিলেন, 'না বাবা, পাপ করিও না।

সেইদিন হইতে ধ্রুব দেশের কার্য্যে ব্রতী হইল।

বিলাতী কাপড়ের দোকানের সম্মুখে আসিয়া ধ্রুব অবাক্ হইয়া গেল। এত লোক অম্লানবদনে বিলাতী কাপড় কিনিতেছে? কোন কষ্ট ইহাদের মনে হইতেছেনা? দীনদাস এই যে সেদিন এত করিয়া বলিয়া গেলেন,—যাহা এখনও তাহার কানে বাজিতেছে—তাহা কি এত সহজে লোকে ভুলিয়া গেল? দেশের শীর্ণ, ক্ষুধার্ত্ত শিল্পিগণ এক মুষ্টি অন্নের জন্য সতৃষ্ণ নয়নে সকলের মুখের পানে চাহিয়া রহিয়াছে—আর এই রাশি রাশি অন্ন হাসিমুখে সবাই হৃষ্ট-পুষ্ট বিদেশীর বিরাট মুখের কাছে ধরিয়া দিতেছে, একটুও ব্যথা বাজিতেছে না ?

ধ্রুবের চোখে জল আসিল। সে সকলের কাছে করযোড়ে বিনয় করিয়া বলিল, লোকের পায়ের কাছে মাথা রাখিয়া অনুরোধ করিল—বিলাতী জিনিষ তাহারা যেন আর না কেনে।

পরণে মোটা খদ্দরের ধুতি, গায়ে খদ্দরের চাদর জড়ানো, নগ্নপদ, গৌরবর্ণ স্থির অচঞ্চল বালকের ক্লিষ্ট মুখের পানে চাহিয়া কাহারো কাহারো মায়া জন্মিল। দুই একজন সত্যই স্বদেশী কাপড় কিনিতে সুরু করিল

মদের দোকানে অসম্ভব ভীড়। কতজন আসিতেছে, দোকানে বসিয়া নির্লজ্জভাবে মদ খাইতেছে। তাহারা চলিয়া যাইতে না যাইতে সে স্থান অপরের দ্বারা পূর্ণ হইতেছে। কি তাহাদের মুখ, কি তাহাদের ভাষা, কি তাহাদের বলিবার ভঙ্গী—দোকানের ভিতর প্রবেশ করিবার কি সে দুর্দমনীয় আগ্রহ।

ছেলেরা নিষেধ করিতে বিদ্রূপ শুনিল, হাতযোড় করিতে গালি খাইল। তখন তাহারা পথ যুড়িয়া শুইয়া পড়িল। দুই একজন ফিরিয়া গেল। বেশীর ভাগ লোক ছেলের দলকে ডিঙ্গাইয়া, তাহাদের দলিত করিয়া ব্যাকুল আগ্রহে দোকানের মধ্যে ঢুকিল।

ক্রমে দোকানীদের অসহ্য হইয়া উঠিল। ইচ্ছা করিয়া ছেলেদের রাগাইয়া তাহারা একটা গণ্ডগোল বাধাইয়া দিল।

পুলিশ আসিয়া ছেলেদের ধরিয়া লইয়া গেল।

(৩)

বিচার হইল। অনেকেই আর কখন এরূপ করিবে না বলিয়া নিষ্কৃতি পাইল। ধ্রুবও তাহারই মত ৪।৫টি ছেলে এ প্রতিজ্ঞা করিল না। তাহারা হাসিমুখে কারাবাসে গেল।

ছয় মাসের কারাবাসে ছেলেদের সেই নবীন উৎসাহ ও দীপ্ত তেজ ম্লান হইল না। কারাগার হইতে ফিরিয়া আবার তাহারা নূতন উৎসাহে এই কার্য্যে ব্রতী হইল। সহরে যাহাও বা স্বদেশী দ্রব্যাদির সামান্য কাট্তি আছে, পল্লীগ্রামে তাহাও নাই। তাহারা মাথায় স্বদেশী কাপড়ের ছোট ছোট মোট্ লইয়া গ্রামের পথে গাহিতে গাহিতে চলিল

"মায়ের দেওয়া মোটা কাপড়
মাথায় তুলে নে রে ভাই,
দীনদুঃখিনী মা যে তোদের
তার বেশী তো সাধ্য নাই।"

লোকের দুয়ারে, পথের মাঝে, হাটের মধ্যে, গাছের ছায়ায় সুকুমার কিশোরগুলি এই গান গাহিয়া বেড়াইতে লাগিল। ঘরের সম্মুখে কাপড় পাইয়া কেহবা কিনিল, কেহবা ফিরাইয়া দিল, কেহবা শুধু গান শুনিয়া লইল, কেহবা তাহাও শুনিতে চাহিল না।

আবার তাহারা ধরা পড়িল। আবার কারাগার বরণ করিয়া লইল। ফিরিয়া আসিয়া এবার ধ্রুবের সঙ্গীরা সকলেই একে একে সে পথ ত্যাগ করিল।

তখন ধ্রুব একাকী এই পথে চলিল। আপনার সাধ্যমত দুইচারিখানা কাপড় লইয়া সে পল্লীর পথে পথে ঘুরিল, হাটের মাঝে বসিল। যেখানে জনকয়েক লোককে একত্রিত দেখিল, সেখানেই সে তাহাদের ডাকিয়া বলিতে লাগিল, "দেশকে ভালবাস। দেশের জিনিষ মাথায় কর। দেশের দুঃখ দূর কর। কত মহাপুরুষ দেশের জন্য প্রাণ দিয়াছেন, প্রাণ দিতেছেন—তোমরা একবার চাহিয়াও দেখিবে না ?"

অলক্ষ্যে কে তাহার বক্ষে শক্তি দিলেন, কে তাহার কিশোর কণ্ঠে ভাষা দিলেন কেহই বুঝিল না।

ধরা পড়িতে ধ্রুবের দেরী হইল না! এবার দুই বৎসরের জন্য তাহার সশ্রম কারাদণ্ড হইল।

সশ্রম কারাবাসেও ধ্রুবের মুখের হাসি ম্লান হইল না। তাহার মধুর স্বভাবে কঠোরহৃদয় প্রহরী পর্য্যন্ত মুগ্ধ হইয়া গেল। যাহার সহিত দেখা হইত তাহারই সহিত সে হাসিমুখে কথা কহিত। আপনার কার্য্য শেষ করিয়া প্রহরীর অনুমতি লইয়া—যে পারিতেছে না ধ্রুব তাহার কার্য্য করিয়া দিত। কেহ মাটি কাটিতে কাটিতে হাঁফাইয়া উঠিয়াছে, ধ্রুব তাহার হইয়া মাটি কাটিতে লাগিল। জল তুলিতে তুলিতে কেহ মাথায় হাত দিয়া বসিয়া পড়িয়াছে, সে পাত্র লইয়া তাহার বদলে জল তুলিতে লাগিয়া গেল।

জেলখানার বন্দিগণের কদর্য্য আহার, তাহাদের প্রতি প্রহরীগণের হৃদয়হীন ব্যবহার ও সর্ব্বোপরি তাহাদের নিরাশার ভাব ও পাপের প্রসার দেখিয়া ধ্রুবের কোমল হৃদয় অবিরত ব্যথিত হইতে লাগিল।

একদিন এক বৃদ্ধ পীড়িত বন্দীর চোখে জল দেখিয়া ধ্রুব অস্থির হইয়া পড়িল। কারাধ্যক্ষ ধ্রুবকে তাহার মধুর স্বভাবের জন্য ভালবাসিতেন। ধ্রুব তাঁহার নিকট অনুমতি লইয়া পীড়িত বন্দীর শুশ্রূষায় রত হইল।

বৃদ্ধ বলিল যে, তাহার একমাত্র পুত্র বাড়ীতে অসহায় হইয়া পড়িয়া আছে। প্রথমে সে লোভে পড়িয়া চুরী করে; মুক্তি পাইয়া ভাবে আর কখন চুরী করিবে না। কিন্তু দাগী বলিয়া কোথাও চাকুরী না পাওয়ায় অভাবের জন্য আবার চুরি করিয়া জেলে আসে। দুই বৎসর পরে সেবারও মুক্তি পাইল। কিন্তু সেবার চাকুরী দূরে থাক মজুরের কার্য্য পাওয়াও তাহার পক্ষে দুষ্কর হইয়া উঠিল। শেষে রাগে নিরাশায় আবার সে চুরী করে। এইবার পাঁচ বৎসর জেল হইয়াছে। এইবার যেরকম তাহার শরীরের অবস্থা, পাঁচ বৎসর জেল খাটিয়া আর তাহাকে বাড়ী ফিরিতে হইবে না।

ধ্রুবের শুশ্রূষা তুচ্ছ করিয়া বৃদ্ধ পুত্রের কথা ভাবিতে ভাবিতে একদিন মরিয়া বাঁচিল।

অতিরিক্ত পরিশ্রমে ধ্রুব দুর্ব্বল হইয়া পড়িয়াছে। তাহার উপর বৃদ্ধের রোগ ছিল একপ্রকার সংক্রামক। ধ্রুব ক্রমে বৃদ্ধের রোগে শয্যাশায়ী হইয়া পড়িল। শেষে তাহার আর জীবনের আশা রহিল না।

কারাধ্যক্ষ বড়ই ক্ষুব্ধ হইলেন। একদিন তিনি ধ্রুবকে জিজ্ঞাসা করিলেন, কাহারও সহিত তোমার যদি দেখা করিবার ইচ্ছা থাকে, কিম্বা কাহাকেও যদি কিছু বলিতে চাও আমাকে বল।

ধ্রুব বলিল, আমি মরিয়া গেলে আমার মাকে সংবাদ দিবেন যে আমি কোন কষ্ট পাই নাই, সুখে মরিয়াছি। বলিবেন, আবার আমি ফিরিব, আবার ঐ মায়ের কোলে জন্মিব, মায়ের কাছে দেশকে ভালবাসিতে শিখিব। শিখিয়া দেশে জন্য মরিব।"

বলিতে বলিতে ধ্রুব উত্তেজিত হইয়া উঠিল। কারাধ্যক্ষ বলিলেন, "আমি সব কথা বলিব, তুমি শান্ত হও তুমি যদি আরো কিছু আমাকে করিতে বল, তাহাও আমি তোমার জন্য করিব।"

কক্ষের চারিদিকে একবার চাহিয়া ধ্রুব ধীরে ধীরে বলিল, "আমাকে একটু বাহিরে লইয়া চলুন; একটু আলোকে একটু মুক্তির মাঝে মরিতে দিন্।"

কারাধ্যক্ষের আদেশে কক্ষ হইতে শয্যাসহ ধ্রুবকে অতি সাবধানে প্রাঙ্গণে আনা হইল।

প্রাঙ্গণের চারিদিকে উচ্চ প্রাচীরে ধ্রুবের মুক্তিপ্রয়াসী দৃষ্টি আহত হইয়া ফিরিয়া আসিল। ধ্রুব ক্লিষ্টকণ্ঠে কহিল, এখানেও যে আমি নিঃশ্বাস পাইতেছিনা। যদি একটিবার আমাকে বাহিরে লইয়া যান!—আমি তো আর ইচ্ছা করিলেও বাহিরে পলাইতে পারিব না।"

ইহা নিয়মের বহির্ভূত। কারাধ্যক্ষ একটু ভাবিলেন; পরে আপনি সঙ্গে থাকিয়া ধ্রুবকে বহিরে আনিবার ব্যবস্থা করিলেন।

বাহিরের মুক্ত বায়ু অঙ্গে লাগিতে ধ্রুবের মুখে প্রফুল্লতা ফুটিয়া উঠিল।

মাথার উপর অনন্ত বিরাট নীলাকাশ, পায়ের দিকে স্বচ্ছতোয়া স্রোতস্বতী, পরপারে সুদূর প্রসারিত শস্যশ্যামল প্রান্তর—দূর দূরান্তরে চক্রবালপ্রান্তে রক্তসূর্য্য অস্তপ্রায়।

ধ্রুব একবার মেঘলেশহীন মুক্ত আকাশের পানে চাহিল, একবার দুকুল প্লাবিনী নদীর শুভ্র বারিরাশির পানে চক্ষু মেলিল, একবার পশ্চিমাকাশের শেষ প্রান্তে তরঙ্গায়িত সুবর্ণ সমুদ্রের উপর শেষ দৃষ্টি রাখিল। একবার বলিল, "ভগবান্ আরো আলো, আরো মুক্তি দাও।"

তারপর তাহার স্নিগ্ধ শান্ত নয়নদুটি ধীরে ধীরে মুদিয়া আসিল—বুঝি দীপ্ততর আলোক ও প্রিয়তর মুক্তির উদ্দেশে ধাবিত হইল।

সূর্য্য অস্ত গেল। ম্লান সন্ধ্যা ধীরে নামিয়া আসিল। ক্রমে আকাশ, বাতাস, প্রান্তর, নদীতট—সব অন্ধকারে ডুবিয়া গেল।

এই অন্ধকারাচ্ছন্ন আকাশের বক্ষঃ ভেদ করিয়া কতক্ষণে আবার প্রভাতের আলোক ফুটিয়া উঠিবে?

হে আমার কল্পলোক বিলাসী সুন্দর

শ্রীঅমলা দেবী

জীবনের সাথী নহ ক্ষণিক স্বপনে
কখন রাঙালে ওগো আমার গগনে!
হে আমার কল্পলোক বিলাসী সুন্দর
তোমার কল্যাণ হস্ত মোর বাহু পর
কখন রেখেছ ওগো আজো নাহি জানি!
মানস সুন্দর ওগো স্বপনে দেখানী
তোমার অরূপ রূপ। সুদূর গগনে
তোমারি লেখনি যেন কবে আনমনে
কি কথা লিখিয়া দেছে তারকা আখরে।
তোমার আহ্বান ওগো বনে বনান্তরে
বসন্তের মঞ্জরিত শাখায় শাখায়
দু'বাহু বাড়ায়ে যেন খুঁজিছে আমায়।
সন্ধ্যার বিনম্র শান্ত ম্লানিমা আলোকে
গাঁথিছ বসিয়া মালা কোন দূর লোকে
আমার লাগিয়া। বৃথা গাঁথা মালা, শেষে
তারার কুসুম গুলি ম্লান হাসি হেসে
ছিঁড়ে ফেলে দাও এই ধরিত্রীর পানে।
হে চির বিরহী মোর, বিরহের গানে
এবার সমাপ্তি দাও। আন আর বার
তোমার পরশ খানি শান্ত সান্ত্বনার
নিদ্রাতুর আঁখি। দাও গো নয়নে
চিরতরে মহাঘুম অতি সযতনে।

ক্ষণিকা

শ্রীঅমলা দেবী

সেত নহে অজিকার কালিকার কথা!
কত যুগ যুগান্তের বিস্মৃত বারতা
ভোলা সে কাহিনী। আজ কেন মনে হয়
ঘুরে ফিরে, সেদিনের ক্ষণ পরিচয়
ক্ষণিকের মায়া। বসন্তের সাঁঝে
'হবনা বিস্মৃত তোমা' মিলনের মাঝে
হয়ত বলিয়াছিনু। হে মোর কল্যাণী
তবুত ভুলিয়া গেছি সেদিনের বাণী।
রজনী ঘনায়ে আসে ঘোর অন্ধকার
তোমার কোমল স্পর্শ আজি বার বার
মনে পড়ে! হে মোর ক্ষণিকা
কোন সে সুদূরলোকে তব দীপ শিখা
জ্বালায়ে তুলেছ ওগো। কোন দিন শেষে
নবীন পথিক আমি সে নূতন দেশে
অজানা সে তীর্থে যদি পথ খুঁজে মরি,
তব মন বন মাঝে উঠিবে গুঞ্জরি
ক্ষণিকের পরিচয়? অথবা স্বপন
নিমেষ নিদ্রার কোলে লীলা অগণন
জাগরণে গেছ ভুলে! তাই যদি হয়
আমারো স্বপন মোহ ভাঙিবে নিশ্চয়!

সূচনা

শ্রীবিমলা দেবী

—"পাঠশালা পালায় জানি, স্কুল পালানও শুনেছি, কিন্তু কলেজ অফিস পালানটা তোমারই প্রথম আবিষ্কার" পরিহাস সূচক কণ্ঠে কলহাস্যে বিজলী বল্লে।

স্বামী অপরেশ স্ত্রীর কথার সুরে, অপ্রতিভ হয়ে পড়েছিল, বই খাতাগুলো এলোমেলো ভাবে টেবিলের উপর ছুঁড়ে ফেলে মৃদুহাস্যে বল্লে "কি আশ্চর্য্য, মাথাটা যে ধরা ধরেছিল তাই চলে এলাম।"

অপরেশ শয্যার উপর বসে পড়ল. বিজলী পাশে এসে দাঁড়াল, "সত্যি! ভাগ্যিস মাথা ধরাটা সম্বন্ধে লোকে প্রমাণ চেয়ে বসে না। কিন্তু ভাবছি, তোমার মাথা ধরার কৈফিয়ৎটা আমার কাছে যতই সহজ সচল হোকনা বাড়ীশুদ্ধ সাবারি কাছে সেটা আড়ষ্ট অচলই হয়ে রইবে, বিশেষ সেজ ঠাকুরঝির যে মুখ!"

আবরণটা খসেই যখন গেল, সেটাকে আর টানাটানি করে, ঢাকা দেবার বৃথা চেষ্টা না করে-অপরেশ হেসে উঠল। বিজলীর একখানা হাতধরে নিজের পাশে আকর্ষণ করে বল্লে "কে মিনু ত? আচ্ছা ঠাট্টা যখন, করবে আমাকে ডাক দিও, আমি অচলকে সচল করে দেব। আমিত মাথা ধরলে বাড়ী আসি, নরেশ শ্বশুর-বাড়ী আসত যে।"

—"আহা কি সচলই হ'ল। যাও!"

—"খুব যে তেজ করছ, যেতে পারিনা যেন! আচ্ছা দেখ।" অপরেশ একটু খানি নড়ে বসল। বিজলী তাড়তাড়ি তার একখানি হাত চেপে ধরে বল্লে—"যাওনা, কেমন যেতে পার—এখুনি এমনি বিষ্টি আসবে।"

অপরেশ এইবার লম্বা হয়ে-বিছানায় শুয়ে পড়ল, হেসে বল্লে—"আচ্ছা সত্যি কথা বলতে তোমাদের এত কষ্ট হয় কেন বলত? স্বামীরা যদি কলেজ অফিস পালায়, স্ত্রীরা তাতে বেশ রীতিমত খুসি হয়ে ওঠে, অথচ বলবার সময় ঠিক উল্টোটি বলে বসে থাক।"

—"তোমরা কোন সত্যি কথা বল!"

—"বলি না!"

—"না"

—"যথা—"

—"যথা তোমার মাথা ধরেনি।"

—"না তাত ধরেইনি—তুমি যে রকম মাষ্টারী করছিলে, বেচারীর না ধরে উপায়?"

বিকেল বেলায় ভাঁড়ার ঘরে বসে মিনু ফল কাটছিল, বিজলী এসে দাঁড়াল - "আমি কুটবো ঠাকুরঝী!"

—"না থাক আমি কুটে দিচ্ছি, ছোড়দার বুঝি আজো একটা কোন রকম বিপর্য্যয় অসুখ করেছিল?"

কৌতুক হাস্যে মিনু প্রশ্ন করলে।

অপরেশ সেই পথে বাইরে যাচ্ছিল—মিনুর কথায় দ্বারের কাছে এসে দাঁড়াল—"কি জিজ্ঞেস করছেন শুনি?"

অপরেশ হাসলে।

—"তোমার অসুখ করেছিল বুঝি?"

—"হুঁ।"

—"মাকে বলি।" কৃত্রিম ব্যস্ততায় মিনু বলে।

—"আজ্ঞে না মাকে আর বলতে হ'বে না, হয়েছে। তোর ত ভারি বাড় বেড়েছে দেখতে পাই, বলে দেব সেই নরেশের কথাটা?"

মিনু অকস্মাৎ রণে ভঙ্গ দিয়ে উঠে পড়ল—

—"যাও ছোড়দা; কি যেন—হ্যাঁ! ও বৌ ফলগুলো তুলে রেখ ত ভাই।" মিনু হাসি মুখে বেরিয়ে গেল।

নির্জ্জনতার সুযোগে বিজলীর মাথাটা একবার নেড়ে দিয়ে অপরেশ চলে গেল।

২

—"কোথায় যাওয়া হয়েছিল! রাত তেরটা অবধি তোমাদের আড্ডা আর ভাঙ্গেনা।" বিজলী এসে বসল।

অপরেশের তখন তন্দ্রা আসছিল; বল্লে "হুঁ"। বিজলী হাতের পানগুলো টীপায়ের ওপর রেখে একবার বিনিদ্রিত খোকার দিকে, একবার তন্দ্রাচ্ছন্ন স্বামীর দিকে চাইল; পাশের খোলা জানলা দিয়ে, শীতের বাতাস আর চাঁদের

আলো একসঙ্গে ঘরে ঢুকছিল। বিজলী বল্লে—"তুমি কি কেবলি ঘুমুবে?"

—"না"

—"ওকি রকম হল! আচ্ছা দাঁড়াও না দিচ্ছি খোকাকে জাগিয়ে।"

তন্দ্রা ব্যস্ত হয়ে উঠল—অপরেশ বল্লে—

"লক্ষীটি না দোহাই তোমার—ভারি ঘুম আসছে।

—"আমার যে আসছেনা, দেখনা কি সুন্দর চাঁদের আলো, কী তুমি!"

শীত করছিল বেশ—অপরেশ লেপটাকে কান অবধি টেনে নিল, চোখ মেলে চাইল,—

—"বুড়ো হয়ে গেছি, কেন আর জ্বালাও? লেপের মধ্যে ঢুকে শুয়ে শুয়ে যত পার চাঁদের আলো দেখ! এখুনি মাতা পুত্রে এমনি যুদ্ধ বাধাবে যে আপনিই ঘুম পালাতে পথ পাবেনা।"

—"আচ্ছা বেশ।"

বিজলী রাগ করে উঠে দাঁড়াল।

অপরেশ চোখ বুজেই বল্লে—"রাগ কোরনা লক্ষিটী, ভারি ঘুম আসছে।"

বিকেলে বিজলীরা কোথায় বেড়াতে যাচ্ছিল; ছোট ননদ রাণী বেরিয়ে এল—"ওমা ওকি, না বৌদি তবে আমিও এমন সং সেজে যাব না। তুমিত বেশ!"

—"নে নে বুড়ো হচ্ছি না, এখন কি তোর সঙ্গে সমান হ'লে মানায়? এই বেশ হয়েছে।"

—"আমি বুঝি খুকি? না বৌদি ওকি ভাই, আমার লজ্জা করছে।"

বিজলী হাসলে—"নতুন বিয়ে হয়েছে না! এখন লজ্জা সজ্জা দুই মানাবে।"

অপরেশ সেই পথে যেতে যেতে একবার বিজলীর দিকে চাইল—"পুরোণতেও বিশেষ বে মানান হ'বেনা।"

—"আচ্ছা থাক হয়েছে; বোক না! তোমার চা ঘরে রেখে এসেছি বুঝলে? আর হ্যাঁ আর আমাকে কিছু টাকা দিতে হ'বে শুনছ?"

—"শুনছি, নাওগে।"

অনেক কাল পরে। রাত্রে অপরেশ আহারে বসেছে—বিজলী এসে বসল—"দীনুর কলেজ খুলতে এখনও ত দেরী আছে, ওর বন্ধুরা সব দল করে পশ্চিমের দিকে বেড়াতে যাচ্ছে দীনুও যেতে চাইছে, যাক না; যাবে?"

অপরেশ মুখ তুলে চাইল—"কে কে যাবে?"

—"তা কি জানি, সন্তোষ, শৈলেশ, মিহির—ওরাও যাবে শুনেছি, তোমার আপত্তি আছে?"

—"না আমার আর—আপত্তি কিসের, যাক।"

—"মাছের ডালনাটা আরটু এনেদি?

দুখানা লুচি আরো নাও, কিছু খাওয়া হ'লনা যে। ও বুলু মিষ্টির রেকাবীখানা নিয়ে আয়ত। বিন্দু ঠাকুঝি, সেদিন বুলুর সম্বন্ধের কথা বলছিল, নিতাই বাবুর ছেলের সঙ্গে, ছেলেটিত ভালই না? বেশ পড়শুনো করছে।"

প্রশ্নোত্তর বিজলী আপনা আপনিই করছিল। রাত্রের আহারাদি সেরে, বিজলী পান চিবুতে চিবুতে বারাণ্ডায় এসে বসল।

গ্রীষ্মকাল অন্ধকার প্রায় বারাণ্ডা—

ইজিচেয়ারের উপর অপরেশ চুপ করে শুয়েছিল, —"তোমার পান দেয়নি! বুলুকে বল্লাম যে।"

—"দিয়েছে ত।"

—"দেখ মণ্টুটা এমনি দুষ্ট হয়েছে রোজ ইস্কুল পালিয়ে আসে।" চিন্তিত বিরক্ত সুরে বিজলী বল্লে।

অনেক কালের হারান দিনের একটী স্মৃতি অপরেশের মনে পড়ে গেল, ঠোঁটের কোণে হাসির রেখা ফুটে উঠল

—"ছেলে মানুষ এখনও।"

—"হুঁ"

ছেলেমানুষ! এখন থেকে শাসন না করলে শেষে, কোন কালে বুড়ো মানুষ হ'বেনা।"

অপরেশ সশব্দে হেসে উঠল—"হ'বে হ'বে ওর বাপও কলেজ পালাত কিনা! ওটা বুড়োমানুষির সূচনা।"

(পূর্ব্বপ্রকাশিতের পর)

(৭)

"আচ্ছা দাদা, আসার আগে কি একখানা পত্র দিয়েও আসতে নেই ?"

শশাঙ্ক টেবিলের উপর ঝুঁকিয়া ফুলদানিতে রক্ষিত গোলাপ ফুলের তোড়াটী হাতে তুলিয়া লইয়া ঘুরাইতে ঘুরাইতে বলিল, "শোন, হঠাৎ আসায় কি তোমায় কোন অসুবিধা ভোগ করতে হল ?"

তাহার কণ্ঠস্বরে রাগের আভাস পাইয়া মনীষা হাসিল, বলিল, "কি যে বল দাদা, অসুবিধা বিশেষ তো নেই বরং কথা বলবার মত একটী লোক পেয়ে আমি যেন বেঁচে গেলুম মনে হচ্ছে।"

শশাঙ্ক কপট গাম্ভীর্য্যের সহিত বলিল, "তোমামোদে তোমরা—মেয়েরা যতটা পারদর্শীতা দেখাও ততটা যদি আর কিছুতে দেখাতে, হয় তো একটা কাজের মত কাজ হতো।"

মনীষা তাহার চেয়ে বেশী গম্ভীর হইয়া বলিল, "হ্যাঁ, ইতিহাসে হয় তো নামও থাকত। ঠাট্টা তামাসা ছেড়ে দাও, বল দেখি কত কাল এখানে এস নি ?"

শশাঙ্ক হিসাব করিয়া বলিল, "তা বছর চার পাঁচ হবে।"

মনীষা বলিল, "বাবা কি কম দুঃখ করেন! বলেন শশাঙ্ক আমাদের সঙ্গে সকল সম্পর্ক তুলে দিলে, আর সে আসবেও না, পত্রও দেবে না।"

"আর তুমি কিছু বল নি, কিছু ভাব নি মনীষা ?—শশাঙ্ক কপট গাম্ভীর্য্য ত্যাগ করিয়া হাসিমুখে মনীষার পানে তাকাইল ?

মনীষা বলিল, "বলি বই কি দাদা, তোমার কথা আর মনে হবে না ? আমি তো ভাই নই, আমি যে বোন, বোনের স্নেহ মায়া যে বড় বেশী রকমই হয়। মাঝে একবার একদিনের জন্যে তোমায় পুরীতে দেখেছিলুম, বললে শিগ্‌গীরই এখানে আসবে, তার পরে আর তো এলে না। আজ যদি দিদি বেঁচে থাকতেন, তা হলে কি এমনই করে আমাদের সকলের মায়া কাটাতে পারতে ? আজ দিদি নেই কিনা, সেই জন্যে আমাদের সঙ্গে তোমার আর কোন সম্পর্কই নেই।"

শশাঙ্ক বলিল, "ঠিক তাই নয় মনীষা, অনেক দূরে ছিলুম, এবার আবার ফিরে তোমাদের কাছেই এসেছি, বোধ হয় এবার তোমাদের কাছেই থাকতে পারব। প্রতি সপ্তাহে একবার করে আসবই আর রবিবার দিনটা যে এখানেই কাটাব এ ঠিক কথা।"

মনীষা জিজ্ঞাসা করিল, "কোথায় এসেছ ?"

শশাঙ্ক বলিল, "এই খড়্গপুরে।"

মনীষা আনন্দিত হইয়া বলিল, "বাবা একথা শুনে ভারি আনন্দ পাবেন। বাস্তবিক তাঁর কথা ভাবলে আমার বড় দুঃখ হয়। যাঁর আজ উপযুক্ত ছেলে উপযুক্ত মেয়ে জামাই বর্ত্তমান থাকবার কথা—তাঁর রয়েছে বিধবা পুত্রবধূ—আর রয়েছে জামাই। নিজের যা তা তাঁর কেউই রইল না—রইল কেবল পর।"

অন্যমনস্কভাবে শশাঙ্ক বলিল, "তাই বটে।"

মনীষা বলিল, "নিজে একলাই এলে দাদা, বউদিকে আনলে কি ক্ষতি হতো ? এবার যেদিন আসবে বউদিকে সঙ্গে করে এনো। বাবার তাতে একটু দুঃখ হবে না, বরং আনন্দেই হবে। আর সেখানে নতুন জায়গা, কোথায় এখন রাখবে, এখন দিনকত এখানে আমার কাছে থাক না কেন ?"

শশাঙ্ক চাপা হাসি হাসিয়া বলিল, "তাকেও তো তোমারই মত আদর্শ হিন্দু মেয়ে করে গড়ে তুলবে, অমনি করে পুতুল পুজো শেখাবে ? এর পরে আমি যখন মরব তখন আমার ফটোখানা নিয়ে বসে থাকবে তো ?"

মনীষা মুখ ভার করিয়া বলিল, "ভয় নেই গো ভয় নেই,

তোমার বউকে আমি কিছু শেখাব না, তাকে মেমসাহেব করেই না হয় রেখে দেব। তুমি এক হপ্তা তাকে রেখে দেখ—সে বদলায় কিনা, যদি বদলানোর ভাব দেখতে পাও - তাকে নিয়ে যেতে তোমার কতক্ষণ লাগবে?"

শশাঙ্ক গম্ভীরমুখে বলিল, "হ্যাঁ, ওসব আমি মোটেই ভালবাসি নে, দিব্যি মেমসাহেব হয়ে থাকবে, কেবল ইহ-কালটাই দেখবে - পরকাল মোটেই দেখবে না—আমি তাই চাই। এখন যে যুগের হাওয়া বইছে, এ হচ্ছে স্ত্রী-স্বাধীনতার যুগ, এ যুগে মেয়েদের মনে দাসত্ব ভাব জাগিয়ে রাখা কোনমতেই উচিত নয়। আমরা শিক্ষিত সংঘ, আমরা ইচ্ছা করি নে—যদিই আমরা মরে যাই, আমাদের স্ত্রী আমাদের ফটো নিয়ে পূজো করে তার জীবন দারুণ ক্লেশে ক্ষয় করবে। আমরা বলি—পুরুষের যেমন পূর্ণ মাত্রায় অধিকার আছে নারীরও তেমনি আছে। স্ত্রী মারা গেলে কয়জন পুরুষ তার ফটো দিনরাত পূজো করে জীবন কাটিয়ে দেয় বল দেখি? তারা যখন তা করে না তখন নারীই বা কেন করবে? তাদের মনের বাসনা কামনা বৃত্তিগুলো সমূলে উৎপাটিত করে সংসারে লক্ষ অভাব অনাটন, দুঃখ কষ্টের মধ্যে জোর করে সংযম নিষ্ঠা বজায় রেখে নারীদের আমরা দেবী সেজে থাকতে বলি নে।"

মনীষা বিস্ময়ে শশাঙ্কের পানে তাকাইয়া রহিল, শশাঙ্কের কথা সে বুঝিতে পারিতেছিল না।

তাহার মুখের উপর অবিচল দৃষ্টি রাখিয়া, শশাঙ্ক বলিল, "আমি বেশ বুঝেছি তুমি আমার কথা বুঝতে পারনি। কিন্তু আমিও ঐ কথাটা তোমায় স্পষ্টভাবে বুঝিয়ে দিতে চাই। আমাদের দেশে অকালমৃত্যুর সংখ্যা কত বেশী তা তুমি জানো; অল্পবয়স্ক যে সব ছেলে মারা যায় তাদের মধ্যে অধিকাংশই বিবাহিত। যাদের তারা পেছনে ফেলে রেখে যায়, সেই সব তরুণীদের কথা ভাব দেখি। এদের আশা আকাঙ্ক্ষা কিছুই মেটে না, উন্মেষেই ধ্বংস হয়ে যায়। জোর করে এই সব তরুণীদের দিয়ে ব্রহ্মচর্য্য পালন করালেও সেটা কি প্রকৃত নিষ্ঠার সঙ্গে প্রতিপালিত হয়? এমনই কত তরুণী বিধবা নিঃশব্দে ব্রহ্মচর্য্য পালন করে যাচ্ছে শুধু দেশাচারের মর্য্যাদা রাখতে—নিজেদের ধর্ম্ম বা ব্রত বলে নয় এটা বোধ হয় তুমি আজ স্বীকার করবে মনীষা?"

মনীষা অন্যমনস্কভাবে জানালা-পথে বাহিরের পানে তাকাইয়া ছিল, এইবার মুখ ফিরাইল, বলিল, "কিন্তু সকলেই কি বাস্তবিক দেশাচারের মর্য্যাদা রাখতেই ব্রহ্মচর্য্য পালন করে যায় দাদা? আমি যদি আজ জোর করে বলি তুমি ভুলের পথে চলেছ, সত্য পথ দেখতে পাওনি, সত্যকে চিনবার চেষ্টাও করনি, তুমি তর্ক করতে পার?"

শশাঙ্ক বলিল, "যতক্ষণ না প্রমাণ পাব ততক্ষণ তর্ক করতেই হবে। তুমি বলবে এই সব মেয়েরা বাস্তবিক আন্তরিকতার সঙ্গেই ব্রহ্মচর্য্য পালন করে, কিন্তু সে প্রমাণ আজকে দাও নইলে আমি বিশ্বাস করব কি করে, কেমন কার জানব যে তারা কেবল দেশাচার রাখতেই ব্রহ্মচর্য্যে পালন করছে কিনা।"

ক্ষুন্নস্বরে মনীষা বলিল, "আমি বলছি বাস্তবিক আন্তরিকতার সঙ্গে একটা কাজ সকলেই করতে পারে না। ধর্ম্ম বিশ্বাস বাবার আছে, তোমার নেই কেন, অবশ্য তোমারও তো থাকা উচিত ছিল কারণ ধর্ম্ম মানুষমাত্রেরই নিজস্ব জিনিস। তা যে রকম নেই, সেই রকম ব্রহ্মচর্য্য নিয়ম পালনের প্রতিজ্ঞা ও সকলের মধ্যে নেই। কিন্তু তাও আবার বলি দাদা শিক্ষিত ছাত্রকে যে বিষয় শিক্ষা দেন সে বিষয়ে তাঁর অভিজ্ঞতা থাকা চাই, তাঁর নিজেকে দৃষ্টান্তস্বরূপ করা চাই। এতটুকু যে সব মেয়েরা বিধবা হয় তাদের শিক্ষা দেওয়ার জন্যে, তাদের সামনে আদর্শ ফুটিয়ে তুলবার জন্যে এখনকার দিনে কয়জন লোক আমার শ্বশুরের মত নিজের ভোগ বিলাস ত্যাগ করে নিস্পৃহ থাকতে পারে বল দেখি? বিধবাদের মনে এভাব কয় জন লোক জাগিয়ে তোলে? তারা আর কেউ নয়, তারা দেবতার উৎসৃষ্ট ফুল, তারা মা, তারা সংসারের হিতের জন্যে সৃষ্ট, সংসারের হিতই করে যাবে। আমার মনে হয় অনেক বিধবা কেবল দেশাচারের বশেই তাদের ব্রত পালন করে না দাদা, বাস্তবিক ধর্ম্ম ব্রত জেনেই আজীবন ব্রহ্মচর্য্য পালন করে যায়। ওদের এই ব্রহ্মচর্য্যের কষ্টের পেছনে যে মহান ত্যাগ আছে তার মধ্যে কতখানি শুভ কামনা নিহিত আছে তা তুমি বুঝতে পারবে না। তবে একদিন হয় তো বুঝতে চেষ্টাও করবে, সত্য যেদিন তোমার সামনে প্রকাশ হবে সে দিন সবগুলোর আসল মূর্ত্তি দেখতে পাবে।"

শশাঙ্ক খানিক চুপ করিয়া রহিল, তাহার পর হঠাৎ হো হো করিয়া হাসিয়া উঠিয়া বলিল, "যাক্, এতকাল পরে প্রথম দর্শনেই মনান্তর ঘটে গেল। কিছু মনে করো না নণি, ও সব কথা যেতে দাও এখন অন্য কথা বলা যাক্ এসো।

মনীষা প্রসন্ন মুখে বলিল, "মনান্তর যাই হোক না, তুমি যদি কথাটা বুঝতেও পারতে তোমার মনের ধারণা যদি একটুও বদলে যেত, সত্যিই আমি সুখী হতুম। থাক, ওসব কথা, তা হলে বউদিকে তুমি এখানে আনতে চাও না, আমার কাছে রাখতে চাও না কেমন ?"

শশাঙ্ক হাসিমুখে বলিল, "বিয়েই করিনি বউ পাব কোথায় ? কেন তোমাদের স্বামী মারা গেলে তোমরা ব্রহ্মচর্য্য পালন করতে পার আমাদের বউ মরে গেলে আমরা বুঝি ব্রহ্মচর্য্য পালন করতে পারিনে ? তবে এটা ঠিক কথা তোমাদের মত তার ফটো সামনে রেখে বসে থাকিনে, পূজোও করিনে, ওগুলো তোমাদের মেয়েদের একচেটে পুরুষের নয়।"

সে প্রচুর হাসিতে লাগিল। মনীষা বিস্মিত হইয়া বলিল, "বিয়ে করনি ? তোমাদের পুরুষদের মধ্যে যখন বিয়ে করার নিয়ম আছে।"

বাধা দিয়া শশাঙ্ক বলিল, "ওই দেখ, আবার সেই ভুল করছ। শোন মনীষা, মনে করো না তোমাদের শাস্ত্রগুলো আমি কিছু পড়ি নি—সব উদরস্থ করেছি, বাকি কিছু রাখিনি। সেকেলে যোগী ঋষিরা যে আইন তৈরী করে গেছেন, সেগুলো কেবল যে মেয়েদের জন্যে নয় পুরুষদের জন্যও বটে একথা তো অস্বীকার করতে পারবে না। তখন মেয়েরা বিধবা হলে যার ইচ্ছে হতো বিয়ে করত, অর্থাৎ আজকালকার মত বিধবা বিবাহ সেকালেও প্রচলিত ছিল, পুরুষদেরও তেমনি ছিল, কেউ কেউ আর বিয়ে না করেও জীবন কাটিয়ে গেছে। তুমি ব্রহ্মচর্য্য পালন করে যাচ্ছ, আমার বেলায় কি সেটা দোষের হবে ?"

মনীষা একটু হাসিয়া বলিল, "দোষের নয় বরং গৌরবের, কিন্তু যে তুমি একটু আগে এতবড় বক্তৃতাটা দিয়ে ফেললে—"

শশাঙ্ক মাথা দুলাইয়া বলিল, "ঠিক কথাই বলেছি, ওর মধ্যে বেঠিক কিছু পাবে না। আমি যা করি বা করছি তা খুসির খেয়ালে মাত্র, হয় তো কোনদিন আবার বিয়েও করে বসতে পারি—আমার বেলায় সেটা কিছু দোষের নয়, কিন্তু তুমি যদি বিয়ে কর সেটাই বা কেন দোষের হবে ? তুমি কি বলতে চাও না তোমার সমাজ তোমার চারিদিকে সংস্কারের বেড়া দিয়ে বাইরে বসে চোখ রাঙিয়ে তোমার পানে চেয়ে নেই, বেড়া ভাঙ্গবার চেষ্টা করলেই সে তোমার গায়ে লাফিয়ে এসে পড়বে না ? কিন্তু আমি পুরুষ, আমার জন্যে যদিও আইন আছে তবু সে আইন ভাঙ্গলে কেউ আমায় একটী কথাও বলবে না ; দেখ দেখি তোমার আমার মধ্যে কতখানি পার্থক্য আধুনিক সমাজ জাগিয়ে রেখেছে ?"

মনীষা কি বলিতে যাইতেছিল, শশাঙ্ক বাধা দিয়া বলিল, "না, আর কথা নয়। বুঝেছি তুমি এখনও জল পর্য্যন্ত খাও নি, তোমার মুখ শুকিয়ে গেছে। বেলা আড়াইটে বেজে গেছে, যাও খেয়ে এসো।"

মনীষা হাসিল, "ও আমার সহ্য হয়ে গেছে,—জল খাওয়ার জন্যে বিন্দুমাত্র কষ্ট হচ্ছে না।"

শশাঙ্ক মাথা নাড়িয়া বলিল, "হঁ, তাতো সহ্য হচ্ছে, যাদের মাসে দুটো করে একাদশী করতে হয় তাদের সহ্য না করা ছাড়া উপায় কি ? কিন্তু যাও মনীষা, তোমার কোন কথা আর আমি শুনতে চাই নে, আমি ততক্ষণ খানিক বিশ্রাম করি, তুমি খেয়ে এসো।"

সে একখানা সোফার উপর শুইয়া পড়িল।

মনীষা বলিল, "তুমি খেয়েছ ?"

শশাঙ্ক বলিল, "তোমার মত পূজো আহ্নিক নিয়ে তো থাকি নে, দশটা না বাজতে অগ্নিদেব জ্বলে ওঠেন, কিছু উদরস্থ করতেই হয়। তোমার গীতাখানা বরং খানিকক্ষণের জন্যে আমায় দিয়ে যাও, একটু নেড়ে চেড়ে দেখি যদি কিছু উদরস্থ করতে পারি,—তাতে বোধ হয় বিশেষ দোষ হবে না।"

মনীষা গীতা আনিয়া তাহাকে দিয়া গেল।

৮

বৈকালে প্রবল বৃষ্টি হইয়া আকাশের ঘনঘটা প্রায় দূর হইয়া গিয়াছিল, এখনও দুই এক খণ্ড মেঘ বাতাসের বেগে আকাশে ইতস্ততঃ ঘুরিয়া বেড়াইতেছিল। পঞ্চমীর ক্ষীণ চাঁদখানি পশ্চিমের আকাশে ভাসিয়া উঠিয়া পৃথিবীর

গায়ে আলো ছড়াইয়া দিয়াছে। চাঁদের উপর দিয়া মেঘের টুকরা মাঝে মাঝে ভাসিয়া চলিতেছিল, মুহূর্ত্তের জন্য ধরার গায়ে তাহার ছায়া আসিয়া পড়িতেছিল; মেঘ সরিয়া যাইতেই চাঁদের হাসি আবার ভাসিয়া উঠিতেছিল। পৃথিবী ও চাঁদে আজ যেন লুকোচুরী খেলা চলিতেছে, দর্শক পৃথিবীর অধিবাসী এবং চাঁদের রাজ্যে যদি কেহ থাকে তবে এই লুকোচুরীর আনন্দ উপভোগ করিতেছে তাহারাই।

রতিনাথ ছাদে শুইয়া পড়িয়াছিলেন, মনীষা তাঁহার পার্শ্বে বসিয়া মাথায় হাত বুলাইয়া দিতেছিল। অনতিদূরে শশাঙ্ক বসিয়াছিল, ইউরোপীয়ান পোষাক ছাড়িয়া এখন সে বাঙ্গালীর পোষাক পরিয়াছে।

মনীষা বলিতেছিল, "যাই বল দাদা, যার যা জাতীয় পোষাক তাকে তাতেই মানায়, বাঙ্গালী কেউ যদি ইউরোপীয়ান পোষাক পরে আমার তাই দেখে কথামালার সেই ময়ূরপুচ্ছধারী দাঁড়কাকের কথা মনে পড়ে," বলিতে বলিতে সে হাসিয়া উঠিল।

রোষের ভাব দেখাইয়া শশাঙ্ক বলিল, "আমায় তা হলে তুমি তাই মনে কর? তুমি তো তা ভাববেই। তুমি যে সেকেলের ঠাকুরমা, চিরন্তন নিয়মের এতটুকু ব্যতিক্রম দেখলে মনে কর—সব গেল, ধর্ম্ম আর রইল না।"

মনীষা একটু হাসিয়া বলিল, "নিজের স্বাতন্ত্র্য বিসর্জ্জন দেওয়ায় বুঝি পৌরুষত্ব আছে? কি জান দাদা মানুষের বাইরের আবরণটাকে আমরা শুধু খোল্‌স বলে উড়িয়ে দিতে পারি নে, ভেতরের ভাবটাই বাইরে প্রকাশ হয়ে যায় বলে মনে করি। তুমি সন্ন্যাসীর পোষাক পর, ত্যাগের পথে অন্ততঃ ভাণ করেও চল দেখি—তোমার মনের ভাবও আস্তে আস্তে তোমার অজ্ঞাতসারে বদলে যাবেই।"

ব্যঙ্গপূর্ণ কণ্ঠে শশাঙ্ক বলিল, "ও, সেকেলের মুনি ঋষিরা বাইরের ত্যাগ দ্বারা সংযম শিক্ষার জন্যেই তা হলে গাছের বাকল পরতেন, ফল মূল খেয়ে জীবন ধারণ করতেন?

মনীষা শান্ত স্বরে বলিল, 'সত্যই তাই। আমাদের শাস্ত্রে বলে, তিন রকম ভাব আছে, সাত্ত্বিক, রাজসিক আর তামসিক, খাওয়া-পরা জীবন ধারণ সবাই এই ভাবে চলতো। যাঁরা সাত্ত্বিক ভাবে দিন কাটাতেন তাঁরা গাছের বাকল পরতেন, ফল মূল খেতেন, তা বলে তাঁদের মস্তিষ্ক অনুর্ব্বর হয় নি, বরং তাঁরা যে সব জ্ঞান লাভ করেছিলেন তারই কতকটা আমরা আজ জানতে পেরে স্তম্ভিত হয়ে যাই। তাঁরা অনেককাল বাঁচতেন, অনেক কিছু তাঁরাই শিখতেন, যা কিছু মানবের হিতকর কাজ তা তাঁরাই করতেন। আজ তোমরা বল যারা মাছ মাংস খায় না তাদের জীবনীশক্তির হ্রাস হয়ে যায়, সেকালের মুনি ঋষিরা রীতিমত গাঁজাখোর ছিল, গাঁজায় দম দিয়ে তাঁরা যাতা লিখে গেছেন—"

শশাঙ্ক বাধা দিল,—"থাম," রতিনাথের পানে তাকাইয়া বলিল," আপনার মত কি বলুন দেখি?"

রতিনাথ মাথায় হাত বুলাইতে বুলাইতে একটু হাসিয়া বলিলেন, "আমি ও ওসব বিষয় নিয়ে কোন দিন মাথা ঘামাই নি শশাঙ্ক, যা শুনি তা শুনেই যাই মাত্র, তা নিয়ে কোনদিন ভাবি নি।"

শশাঙ্ক বলিল, "হ্যাঁ, তুমি যা বলছ তা ঠিক তবু সম্পূর্ণ বিশ্বাস করা আমার স্বভাব বিরুদ্ধ বলেই আমি বিশ্বাস করতে পারলুম না।"

কৃষ্ণ আসিয়া খবর দিল মিঃ চক্রবর্ত্তী আসিয়াছেন, শীঘ্র একবার দেখা করিতে চাহেন।

রতিনাথ আড়ামোড়া ছাড়িয়া উঠিলেন, "নাঃ, আমার অদৃষ্টে এতটুকু বিশ্রাম নেই। তোমরা কথাবার্ত্তা বল, আমি চট্ করে আসছি।"

তিনি চলিয়া গেলেন; শশাঙ্ক নির্ব্বাকে আকাশের পানে তাকাইয়া রহিল! পশ্চিম আকাশের শেষে টুক্‌রা টুক্‌রা মেঘগুলা জমিয়া বিরাটরূপে পরিণত হইতেছিল, চুম্বকের মত ছোট ছোট মেঘগুলাকে টানিয়া লইয়া আরও বড় হইয়া উঠিতেছিল।

মনীষা জোৎস্নাধারায় সিক্ত প্রকৃতির পানে তাকাইয়া ছিল। চাঁদের স্ফুট আলো যাহা কিছু স্পর্শ করিয়াছে তাহাই হাসাইয়া তুলিয়াছে।

'দাদা—"

মনীষার আহ্বানে চমকাইয়া শশাঙ্ক মুখ ফিরাইল; চাঁদের আলো স্ফুটতর হইয়া মনীষার অনিন্দ্য সুন্দর মুখখানার উপর পড়িয়াছিল।

মনীষা শান্তকণ্ঠে জিজ্ঞাসা করিল, "তুমি আমার পরে রাগ করেছ দাদা?"

আশ্চর্য্য হইয়া গিয়া শশাঙ্ক বলিল, "রাগ করব কেন মণি, তুমিত রাগ করবার মত কিছু করনি।"

মনীষা বলিল, "করেছি বই কি, তোমায় অনেক কথা বলেছি। আমি বুঝতে পেরেছি আমার কোন ব্যবহারে বা কথায় তোমার মনের কোনও নিভৃতস্তরে আঘাত করেছে, নইলে যখন এলে তখন তোমার মধ্যে যে সহজ সরল উচ্ছ্বাস ছিল, সে উচ্ছ্বাস চলে গেল কেন ? তুমি বলবে, না, আমি তো কোন আঘাত পাইনি, কিন্তু সে কথা বললে কি আমি শুনি দাদা ? কিন্তু আমি যে তোমার বোন দাদা, যদিই কিছু অন্যায় করি বোন বলে ক্ষমা করবে না ?"

তাহার চোখ হইতে অশ্রুবিন্দু ঝরিয়া পড়িল, চাঁদের আলোয় তাহা চকচক করিয়া উঠিল।

"একি মনীষা, কাঁদছ তুমি—? ছি ছি, একটা সামান্য ব্যাপারে অমনি চোখের জল এল ?"

মনীষা চোখ মুছিয়া গাঢ়স্বরে বলিল, "সামান্য ব্যাপার নয় দাদা, সামান্য হলে তোমার মনের সে সরল উচ্ছ্বাস দূর হয়ে যেত না। কাল সকালেই তুমি চলে যাবে তাই আজকের মধ্যেই আমি এর মিটমাট করে নিতে চাই, নইলে তুমি যে আর আসবে না তা আমি বেশ জানি।"

জোর করিয়া হাসিয়া শশাঙ্ক বলিল, "ক্ষেপেছ মণি, আমি আসব না এমন কথাই হতে পারে না। এবার এসে আগের আলাপ ঝালিয়ে গেলুম, দেখবে প্রতি সপ্তাহ এসে বিরক্ত করব।"

মনীষা খানিক স্তব্ধ থাকিয়া বলিল, "আবার তুমি কবে আসবে ?"

শশাঙ্ক বলিল, "এইতো জুন মাস যাচ্ছে, জুলাইয়ের প্রথম হপ্তা হতে নিয়মিত আসা সুরু করব যাতে তোমাদের বিরক্ত হয়ে উঠতে হবে। এরপরে নিজেই কোন দিন বলবে, বাপ রে আপদটা গেলেই বাঁচি।"

বলিয়া সে অপর্য্যাপ্ত হাসিতে লাগিল। মনীষা একটু হাসিয়া বলিল, "ভগবানের ইচ্ছায় এ রকম মনের ভাব আমার কোনদিনই হয়নি মনে হয়, হবেও না, তুমি যদি বারবাস এখানে থাক তাতেও সত্যি আমি ভারি খুশী হব দাদা।"

"কিন্তু পূজোর সময়ে—"

মনীষা এবার স্পষ্ট হাসিয়া ফেলিল, বলিল "পূজোতে লুকানোর তো কিছুই নেই দাদা, তবে পূজোর সময়ে তুমি থাকলে মুস্কিলই বা হবে কিসে ?"

শশাঙ্ক বলিল "যাক্ ও সব বাজে কথা। তোমার গীতাখানা অর্দ্ধেকটা পড়ে ফেলেছি, বাকি অর্দ্ধেকটা এইবার গিয়ে পড়তে আরম্ভ করে দেই। আজকের মধ্যেই ওখানা শেষ করা চাই তো—"

মনীষা জিজ্ঞাসা করিল, "কি রকম লাগছে, নিশ্চয়ই রাবিসের মত—?"

শশাঙ্ক চিন্তিতমুখে বলিল, "কি জানি, এখনও ঠিক বলতে পারিনে, নাস্তিকের মনে প্রত্যয় জন্মানো বড় শক্ত কিনা। হয়তো পড়তুম না কিন্তু তোমার কাছে ও বইখানা কি গুণে এতখানি শ্রদ্ধাভক্তি অর্জ্জন করলে দেখে ওর পরে দারুণ হিংসা হয়েছিল—সেইজন্যেই পড়তে নিয়েছি ?"

মনীষা গম্ভীর মুখে বলিল, "কিন্তু চোখের পড়া আর মনের পড়ায় অনেক পার্থক্য আছে—তা মানো ?"

শশাঙ্ক বলিল, "মানি বই কি ? আমি রীতিমত মন দিয়ে পড়ছি, চোখের পড়া নয়।"

মনীষা জিজ্ঞাসা করিল, "যতটুকু পড়েছ তার মধ্যে কতটুকু কি পেলে আমি তাই জিজ্ঞাসা করছি।"

শশাঙ্ক বলিল, "আমি আগেই তো বলেছি এখনও আমি সম্যক ধারণা করতে পারি নি। আমি সবখানি পড়ব, তোমার মতের সঙ্গে নিজের মত মিলানোর চেষ্টা করব, তাতে যা ফল হয় তোমায় জানাব। আমার নিজের যে ব্যক্তিত্ব আছে তাকে তো মানতেই হবে—উড়িয়ে দিলে তো চলবে না। আমার নিজের জ্ঞান আমায় যা সত্য বলে দেবে আমি তাই মানব, আর সেই সত্যই অসঙ্কোচে ব্যক্ত করব।"

পশ্চিমের কোল বহিয়া সোঁ সোঁ শব্দে ঝড় ছুটিয়া আসিতেছিল, সমস্ত আকাশ তখন নিকষ কালো মেঘে ছাইয়া গিয়াছে, চাঁদ তারা অন্ধকার আকাশে বিলীন হইয়া গিয়াছে। মেঘখানা এত শীঘ্র সারা আকাশ ছাইয়া ফেলিয়াছিল, অন্যমনস্ক থাকায় জন্য কেহই জানিতে পারে নাই।

ঝড়ের সোঁ সোঁ শব্দে চমকাইয়া মনীষা আকাশের পানে চাহিল—"ইস, বড় ঝড় এসে পড়ল যে দাদা, নীচে চল।"

শশাঙ্ক বলিল, "এই তো বেশ আছি মনীষা, ঝড় আমার ড় ভাল লাগে। তুমি নীচে যাও, আমি এখন খানিক ময় এই খোলা ছাদে থাকি।"

মনীষা বলিল, "এখনই বৃষ্টি আসবে যে।"

চোখ ঝলসাইয়া আকাশের এককোণ হইতে আর এক কোণ পর্য্যন্ত বিদ্যুৎ ছুটিয়া গেল, প্রায় সঙ্গে সঙ্গে কড় কড় করিয়া মেঘ ডাকিয়া উঠিল, সোঁ সোঁ শব্দে একটা ভীষণ দমকা আসিয়া নিমেষে সমস্ত পৃথিবীর বুকে প্রলয়-কাণ্ড বাধাইয়া তুলিল।

মনীষা শিহরিয়া উঠিল—"দাদা—"

শশাঙ্ক একটু হাসিয়া বলিল, "ওতে আমি ভয় পাই নে। জানতো বিলেতে থাকতে ফ্রান্সের যুদ্ধে গিয়েছিলুম, অনেক গোলাগুলি এড়িয়েও বেঁচে আছি, বাজ বা বিদ্যুৎ ঝলসানি আমার একটা চুলও কাঁপাবে না। তুমি ঘরে যাও মনীষা, এখানে থেক না।"

মনীষা একটু হাসিয়া বলিল, "তোমার জীবনের ভয় নেই, জীবনের ভয় হবে কি আমার মত বিধবার? তবে বস, দুজনেই এখানে থেকে মেঘের খেলা ঝড়ের নাচ দেখি।"

চোখ ধাধিয়া আর একবার বিদ্যুৎ চমকাইয়া গেল, প্রায় সঙ্গে সঙ্গে আবার কড় কড় করিয়া ডাকিয়া উঠিল এবং সম্মুখে একটু দূরে নারিকেল গাছের উপর বজ্র পড়িল। গাছের মাথার উপর শুভ্র বিদ্যুতের রেখা দেখা গেল, তাহারই প্রায় সঙ্গে সঙ্গে শুষ্ক পাতা জ্বলিয়া উঠিল।

শশাঙ্ক শশব্যস্তে উঠিয়া পড়িল, "ঘরে চল মনীষা।"

মনীষা বলিল, "আমার ভয় হয় নি দাদা, বড় সুন্দর দেখাচ্ছে।"

শশাঙ্ক বলিল, "আর সাহসে দরকার নেই, যথেষ্ট হয়েছে, এখন চল।"

অন্ধকারের বুকে মুহুর্মুহু বিদ্যুৎ চমকাইতেছিল, সেই আলোকে তাহারা অগ্রসর হইল।

(৯)

মিস্ ইরাদাস নিয়মিতভাবে নিজের কাজ করিয়া যাইতেছিল।

সে ঠিক সাড়ে দশটার সময় আফিসে উপস্থিত হইত, কোন দিন তাহার আসার সময়ের এতটুকু এ-দিক ও-দিক হইত না। কাজ শেষ হইতে কোন দিন চারটা কোনও দিন পাঁচটাও বাজিয়া যাইত, পাঁচটার পরে যতই কেন না কাজ থাক সে আর একমিনিট আফিসে অপেক্ষা করিত না।

যাইবার সময়ও সে নিরঞ্জনকে বলিয়া যাইত, নিরঞ্জন সন্ধ্যার পরে সকলকে বিদায় দিয়া আফিস বন্ধ করিয়া বাসায় চলিয়া যাইত।

নিরঞ্জনের সহিত ইরার বেশ আলাপ হইয়া গিয়াছিল, উভয়েই ছিল গরীব, যদিও বিভিন্ন ধর্ম্মাবলম্বী তথাপি গরীব ছিল বলিয়াই তাহাদের আলাপের মধ্যে এতটুকু সঙ্কোচ জমিতে পারে নাই। ইরার সরল মার্জ্জিত আচরণে কথাবার্ত্তায় নিরঞ্জন বড় খুসি হইয়া উঠিয়াছিল এবং তাহাকে নিজের ভগিনীর মত ভাবিয়াছিল। নিজের কাজ করিয়া জ্যেষ্ঠ ভ্রাতার মতই সময়ান্তে ইরাকে সে গম্ভীরভাবে সংসার সম্বন্ধে, ধনী লোকেদের অদ্ভুত আচরণ সম্বন্ধে সতর্ক হইবার জন্য অনেক উপদেশ দিত।

ইরাও তাহাকে নিজের জ্যেষ্ঠ সহোদরের মত দেখিত, অসঙ্কোচে তাহার কাছে বসিয়া তাহার উপদেশ শুনিত; যাহা বুঝিতে পারিত না তাহা তাহাকে জিজ্ঞাসা করিত।

ইরার সহিত ঘনিষ্ঠ পরিচয়ের সুযোগ সুশীলের হয় নাই। বিশেষ কার্য্যে তাহাকে রেঙ্গুণে যাইতে হইয়াছিল, মাসখানেক পরে সে কলিকাতায় পদার্পণ করিল।

পত্র পাইয়া সন্ধ্যার সময় তাহার সহিত দেখা করিবার জন্য নিরঞ্জন তাহার বাড়ীতে গিয়াছিল।

স্নানাহার শেষ করিয়া সুশীল তখন বিশ্রাম করিতেছিল, নিরঞ্জনকে দেখিয়া সাগ্রহে তাহাকে পার্শ্ববর্ত্তী চেয়ারে বসাইল।

"তারপর খবর কি, সব ভাল তো?"

নিরঞ্জন মৃদু হাসিয়া বলিল, "মালিক যদি অনুপস্থিত থাকে কি করে সব ভাল হবে বল দেখি?"

সুশীল হাসিল, বলিল, "প্রকৃত মালিক তবু এখনও কিছুই দেখেন নি, আমি তো তাঁর পরিবর্ত্তে মালিক হয়ে রয়েছি। যাক গিয়ে, আফিস ভাল রকম চলছে তো, কাজকর্ম্ম বেশ হচ্ছে?"

নিরঞ্জন বলিল, "বেশ চলছে, সে জন্যে তোমার কোন ভাবনা নেই। কাল আফিসে গিয়ে সব নিজের চোখে দেখতে পাবে, কাজেই আজ বেশী বলা নিষ্প্রয়োজন। আমি তোমায় প্রতি হপ্তাতেই তো পত্র লিখে জানাতুম কখন কি রকম বাজার দর উঠছে নামছে।"

সুশীল ইজিচেয়ারে হেলিয়া পড়িয়া একটা হাই তুলিয়া বলিল, "হ্যাঁ, কর্ত্তব্য পালনে তুমি কিছুমাত্র অমনোযোগী হও নি, প্রাণপণে যে মনিবের মনস্তুষ্টির চেষ্টা করেছ, এর জন্যে ভারি খুসি হয়েছি—বুঝলে?"

তাহার কথার ভিতরে যে খোঁচাটুকু ছিল তাহা অতি সহজেই নিরঞ্জন ধরিতে পারিল; কিন্তু সে ধৈর্য্য না হারাইয়া মৃদু হাসিয়া বলিল, "বুঝেছি, রাগ করেছ। কিন্তু শোন সুশীল, যদিও আমরা বন্ধু কিন্তু সে বন্ধুত্ব আফিস সীমার বাইরে থাকাই শ্রেয়, বলে মনে করি, অফিসের সীমানায় তুমি আমার মনিব, কাজেই আফিস সংক্রান্ত কাজে আমি তোমায় মনিব জেনেই পত্রাদি লিখে থাকি। আমার মতে এ কাজ কখনই খারাপ হয় নি।"

সুশীল খানিকক্ষণ মুখ ভার করিয়া রহিল, তাহার পর বলিল, "যাক ও সব কথা, মিস দাস রোজ আসেন, কাজকর্ম্ম কেমন করেন?"

নিরঞ্জন বলিল, "তাঁর কাজ তিনি রোজই শেষ না করে ওঠেন না, কাজের তাড়া তাঁর এক একদিন এত বেশী হয় যে বাধ্য হয়ে আমাকেই তাঁকে তাড়া দিয়ে উঠিয়ে দিতে হয়। মেয়েটী বেশ, হাসি খুসি সর্ব্বদাই মুখে আছে, কয়দিনের মধ্যে অফিসের সকলকে বাধ্য করে ফেলেছে।"

সুশীলের মুখখানা মুহূর্ত্তের জন্য উজ্জ্বল হইয়া উঠিল, তখনই সে স্বাভাবিক সুরে বলিল, "ভালই হয়েছে। আমি প্রথমটা তাঁকে দেখে ভেবেছিলুম অন্য রকম।"

একটু থামিয়া সে বলিল, "কি কষ্টেই যে এই একটা মাস কেটেছে সেখানে তা আর বলতে পারি নে। ওদের দেশের ভাষাও বুঝি নে—আর এমন নোংরা সব বাড়ী ঘর যে বলা যায় না। কয়েকজন বাঙ্গালীর সহায়তা পেয়েছিলুম, তার পর সাহেবদের সঙ্গে আলাপ হয়ে গেল, ওদিকে মিঃ রায় বড় সাহেবকে পত্র দিয়েছিলেন, কাজেই যে কাজে গিয়েছিলুম সে কাজটা শেষ হল।"

নিরঞ্জন বলিল, "মিঃ রায় এখানেও পত্র দিয়েছেন, শুনলুম তিনি এই সেপ্টেম্বর মাসেই দেশে ফিরে আসছেন।"

বিস্মিত হইয়া গিয়া সুশীল বলিল, "কই তাতে ত তিনি কিছুই আমায় লেখেন নি, বরং লিখেছেন—কবে আসতে পারবেন তার কিছু ঠিক নেই।"

নিরঞ্জন বলিল, "হয় তো তোমায় যখন পত্র লিখেছিলেন তখন আসার স্থিরতা ছিল না, কিন্তু রতিনাথ বাবুকে যে পত্র দিয়েছেন—ডাকে সেখানা এসেছে, তাতে লিখেছেন তিনি শিগগীরই কন্যাসহ চলে আসছেন।"

মিঃ রায়ের পরিচয় নিরঞ্জন পাইয়াছিল। মিঃ দেবনারায়ণ রায় সুশীলের পিতার অকৃত্রিম বন্ধু ছিলেন, সেই জন্যই অতুলবাবু মৃত্যুকালে তাঁহার একমাত্র পুত্রের ভার মিঃ রায়ের হাতে দিয়া যান। তাঁহার বড় ইচ্ছা ছিল মিঃ রায়ের কন্যা ইন্দিরাকে পুত্রবধূ করিবেন, মিঃ রায়েরও বড় ইচ্ছা ছিল, সুশীলের সহিত ইন্দিরার বিবাহ দিয়া তাহাকে একেবারে আপনার করিয়া লইবেন। সুশীল দরিদ্র পিতার পুত্র ছিল, মিঃ রায় তাহার অর্থ সম্পদের দিকে কোনদিন চাহেন নাই; তিনি তাহার সুন্দর শক্তিশালী আকৃতি দেখিয়াছিলেন, তাহার শিক্ষা ও গুণ চাহিয়াছিলেন। অর্থের অভাব তাঁহার ছিল না, কমলা তাঁহার ভাণ্ডারে স্বয়ং বাঁধা ছিলেন বলিলেও অত্যুক্তি হয় না। তাঁহার বিশাল সম্পত্তি সকলই তাঁহার কন্যা জামাতা পাইবে, সকলেই তাহা জানিত।

সুশীল ইন্দিরা বাল্য হইতে জানিত তাহারা একদিন বিবাহিত হইবে। বাল্য হইতে একত্রে প্রতিপালিত হওয়ায় উভয়েই উভয়কে বড় ভালবাসিত।

মিঃ রায় সুশীলকে আই-এ পর্য্যন্ত পড়াইয়া বিলাতে পাঠাইয়াছিলেন। তাঁহার নিজের ব্যবসা বাণিজ্যের দিকে অত্যন্ত ঝোঁক ছিল, নিজের সামর্থ্যে কিছু হয় নাই, এই ক্ষোভটা তাঁহার মনে জাগিয়া ছিল, সেই জন্যই তিনি সুশীলকে ব্যবসা শিখিতে দিয়াছিলেন। চাকরী করা তিনি ঘৃণা করিতেন, স্পষ্টই বলিতেন চাকরী করিয়াই এ

দেশবাসী উচ্ছন্ন যাইতে বসিয়াছে, দেশের ধ্বংস হইতেছে।

মিঃ রায় আসিতেছেন শুনিয়া সুশীলের যতটা উৎসাহিত হওয়ার আশা নিরঞ্জন করিয়াছিল, সুশীল ততটা প্রফুল্ল হইয়া উঠিতে পারিল না। একটুখানি চুপ করিয়া থাকিয়া সে বলিল, "সেপ্টেম্বর মাস, তার এখনও অনেক দেরি আছে। আমি ভাবছি তিনি আমায় একখানি পত্র দিয়ে জানালেন না, অথচ রতিনাথ বাবুকে পত্র দিলেন। জানি নে তাঁর মনের ভাব কি—"

নিরঞ্জন বলিল, "হয় তো তোমার পত্র কালই এসে উপস্থিত হবে।"

আর খানিক বসিয়া কথাবার্তা বলিয়া নিরঞ্জন বিদায় লইল।

পরদিন এগারটার সময় সুশীল অফিসে গিয়া উপস্থিত হইল।

অফিসের কাজ তখন নিয়মিত চলিতেছে। চারিদিক ঘুরিয়া সমস্ত দেখিয়া শুনিয়া সুশীলের মুখ আনন্দে উজ্জ্বল হইয়া উঠিল, সে নিরঞ্জনের পিঠ চাপড়াইয়া হর্ষোৎফুল্ল-কণ্ঠে বলিল, "আমি ঠিক বলছি নিরু, তোমায় যদি না পেতুম আমার কাজ এমন সুশৃঙ্খলার সঙ্গে চলতে পারত না। কি সৌভাগ্য যে সেদিনে অভাবনীয় রূপে তোমার সঙ্গে আমার দেখা হয়ে গিয়েছিল, নইলে আমার কল্পনা কল্পনাতেই মিশিয়ে যেত, সত্য হতে পারত না।"

নিরঞ্জন মৃদু হাসিল, বলিল, "সেটা আমার যোগ্যতা কিনা তাই আগে দেখ তারপর প্রশংসা কোর। এটা সত্যি কথা—কাজ করার উপযুক্ত ক্ষেত্র না পেয়ে আমাদের মত গরীব লোকদের উৎসাহ চিরকালের মতই নষ্ট হয়ে যায়। আমাদের মাথায় যে বুদ্ধি থাকে আমরা তার চালনা না করতে পারায় তা ধ্বংস হয়। মনে করে দেখ—যদি দিনরাত অন্নের চেষ্টায় হাহাকার করে ঘুরে বেড়াতে হয়, আমাদের শিক্ষা কোন কাজে তখন লাগে? গরীব ছেলেরা হয়তো মহৎ হতে পারত—তারা অনেক কাজই করতে পারত যদি তারা উপযুক্ত ক্ষেত্র পেত। তাদের প্রতিভা দাসত্বের যাঁতায় পিষে কাদা হয়ে যাচ্ছে, তারা অবশেষে জানাচ্ছে—শিক্ষার দরকার কেবল মাত্র চাকরীর জন্যে—কোনরকমে ভরণপোষণ নির্ব্বাহ করার জন্যে—আর কিছুর জন্যে নয়।"

সুশীল একটা নিঃশ্বাস ফেলিল, বলিল, "ঠিক, তোমার কথাই সত্যি মেনে নিচ্ছি। বনের মধ্যে কত সুন্দর ফুল ফুটে বাতাসে গন্ধ ছড়িয়ে ঝরে পড়ে যায়, সাগরের অতল গর্ভে কত মণি উজ্জ্বল দীপ্তি বিকাশ করে, কিন্তু কেউ তা দেখতে পায় না, আমাদের দেশের ছেলেদের প্রতিভা চাকরীর যাঁতায় কাদা হয়ে যায়, যে অসাধারণ কোন কাজ করবার কল্পনা কোনদিন করেছিল, তার কল্পনা অবশেষে স্বপ্ন হয়েই মিলিয়ে যায়।"

অন্যমনস্ক ভাবে সে নিজের কক্ষে প্রবেশ করিয়া কাগজপত্র দেখিতে বসিল; নিরঞ্জন নিজের কাজে চলিয়া গেল।

ঘড়িতে অবিশ্রান্ত টিক টিক শব্দ হইতেছিল, উপরে ফ্যান চলিতেছিল, সুশীল নিবিষ্ট মনে নিজের কাজ করিতে লাগিল।

দরজার পর্দা একটু সরাইয়া ইরা একবার উঁকি দিল, মৃদুকণ্ঠে জিজ্ঞাসা করিল, "আমি কি একবার ঘরে আসতে পারি?"

সুশীল মুখ তুলিল, হাতের কলমটা নামাইয়া রাখিয়া বলিল, "আসুন।"

গৃহে প্রবেশ করিয়া কতকগুলা কাগজপত্র সুশীলের সামনে টেবলের উপর নামাইয়া রাখিয়া ইরা কুণ্ঠিতভাবে বলিল, "আজ অনেক টাইপ করবার কথা ছিল, কিন্তু আমি সব শেষ করতে পারলুম না, মাত্র অর্দ্ধেক করতে পেরেছি। আজ আমায় এখনই বাড়ী যেতে হবে, কাল আমি নটার সময় এসে বাকিগুলো টাইপ করে দিলেই চলবে বোধ হয়।"

সুশীল আশ্চর্য্য হইয়া গিয়া বলিল, "এই দুপুরে রোদে আপনি বাড়ী যেতে চান? ঘরের মধ্যে রয়েছেন বুঝতে পারছেন না বাইরে কি রকম গরম, কিন্তু একবার—"

ইরা একটু হাসিল, বলিল, "কিন্তু আমায় না যাওয়া ছাড়া উপায় নেই মিঃ মুখার্জ্জি। রোদকে অতটা ভয় করতে গেলে কি আমাদের চলে, পরের কাজ করতে গেলে রোদ বৃষ্টি সবই সইতে হয়। যারা পরিশ্রম করে

জীবিকার্জ্জন করে তাদের রোদ বৃষ্টিতে সুখ দুঃখ বোধ করা চলে না মিঃ মুখার্জ্জি—"

তাহার কণ্ঠস্বর বড় করুণ হইয়া উঠিয়াছিল।

সুশীল ক্ষণকাল নীরবে সামনের কাগজপত্রগুলো নাড়াচাড়া করিতে লাগিল, তাহার পর বলিল, "কিন্তু এই দুপুর বেলায় কেন চলে যাচ্ছেন সে কথা শুনতে পাব কি?"

ইরা বলিল, "আমার মায়ের বড় অসুখ সেই জন্যেই যেতে হবে। আজ কয়দিনই তাঁর অসুখ করেছে কিন্তু আজ বড় বাড়াবাড়ি হয়েছে। আগে ভেবেছিলুম আসব না কিন্তু আপনি আসছেন জেনে আসতে হয়েছে। বাড়ীতে আর কেউ নেই, আমি যাব তবে মা ঔষধ পথ্য পাবেন।"

তাহার চোখ দুইটী ধীরে ধীরে অশ্রুপূর্ণ হইয়া উঠিতেছিল, সে তাড়াতাড়ি মুখ ফিরাইল।

সুশীল বলিল, "আপনার না আসাই উচিত ছিল মিস দাস, একখানা পত্র লিখে পাঠাইলেই হতো। আমি আপনাকে এখনই ছুটি দিচ্ছি, যে কয়দিন আপনার মায়ের অসুখ থাকবে সে কয়দিন আপনার আসার দরকার নেই। আমি টাইপ জানি, দরকারী কাজগুলো চালিয়ে নিতে পারব।"

অভিবাদন করিয়া ইরা প্রস্থানোদ্যত হইল, সুশীল জিজ্ঞাসা করিল, "আপনার বাসা কোথায়? এখান হতে কাছে কি?"

ইরা বলিল, "আমার বাসা কলুটোলায়।"

সুশীল বলিল, "বাসে বা ট্রামে যাবেন তো, এক কাজ করুন, আমার মোটরে যান, আমি শোফারকে বলে দিচ্ছি।"

তাহাকে উঠিতে দেখিয়া মিস দাস ব্যস্ত হইয়া বলিল, "আপনি বসুন, আমি বাসে সোজা চলে যাব এখন।"

সুশীল বলিল, "আমাকেও এখনি একবার খিদিরপুর ডকে যেতে হবে, বিশেষ দরকার। আপনাকে কলুটোলায় নামিয়ে দিয়ে আমি চলে যাব।"

নিরঞ্জনকে ডাকিয়া দুই একটা কথা তাহাকে বলিয়া দিয়া মিস দাসকে সঙ্গে লইয়া সে মোটরে উঠিল। কলুটোলায় মিস দাসের বাসার সামনে তাহাকে নামাইয়া দিয়া সে বলিল, "নমস্কার, আমি চললুম।"

প্রতি নমস্কার করিয়া ইরা বলিল, "আপনাকে নামতে বলবার যোগ্যতা আমার নেই নইলে—"

বাধা দিয়া একটু হাসিয়া সুশীল বলিল, "বন্ধু হিসাবে যোগ্যতা যথেষ্ট আছে, যদিও মনিব হিসাবে নেই। বাসা চিনে গেলুম, আবার একদিন আসতে বিশেষ কষ্ট করতে হবে না। চাইকি কালও আসতে পারি, সে জন্যে অনুরোধ করতে হবে না।"

শোফার মোটরে ষ্টার্ট দিল।

(১০)

ইরার পিতা এককালে হিন্দু ছিলেন। এক সময়ে তিনি খৃষ্টধর্ম্ম গ্রহণ করেন এই ধর্ম্মান্তর গ্রহণ তাঁহার কেবলমাত্র ঝোঁকের বশে কিনা তাহা আজ বলিতে পারা যায় না।

ইরার আজও স্বপ্নের মত বাল্যের কথা মনে পড়ে। মনে পড়ে কোন একটী লতায় পাতায় ঘেরা শান্ত পল্লীতে সে মায়ের সহিত আত্মীয় স্বজনের নিকটে ছিল। তাহার পিতা তখন কলিকাতায় ছিলেন এবং সেই সময়েই তিনি খৃষ্টধর্ম্ম গ্রহণ করেন।

ইরার মনে পড়ে তখন তাহাদের দিনগুলো কি আনন্দে দশ জনের সঙ্গে মিলিয়া মিশিয়া কাটিয়া যাইত। প্রতি বৎসর আশ্বিন মাসে পার্শ্বের বাড়ীতে দুর্গোৎসব হইত, অন্য দশ জনের মত সে ও তাহার মাও সেখানে যাইত, সমাজের দ্বার তখন তাহাদের সামনে চিররুদ্ধ হইয়া যায় নাই, কারণ ইরার পিতা খ্রীষ্টান হইলেও তাহারা মাতাপুত্রী হিন্দু ছিল।

কিছুদিন বাদে ইরার পিতা গ্রামে আসিয়া যখন স্ত্রী কন্যাকে নিজের কাছে লইয়া যাইবার প্রস্তাব করিলেন, তখন ইরার মাতা সম্মত হন নাই। নিজের আজন্মার্জ্জিত সংস্কার ধর্ম্মজ্ঞান ত্যাগ করিয়া খৃষ্টান স্বামীর সঙ্গ তিনি চান নাই। ইরার পিতা জোর করিয়া কন্যাকে কলিকাতায় লইয়া গেলেন, কন্যার ভবিষ্যৎ তিনি এখানে রাখিয়া নষ্ট করিতে চান নাই।

স্বামীকে ছাড়িয়াও স্ত্রী নিজের ধর্ম্মমত লইয়া তফাতে ছিলেন, কন্যাকে ছাড়িয়া মা থাকিতে পারিলেন না, বাধ্য হইয়া তাঁহাকে সমাজ ছাড়িয়া স্বামীর নিকটে কলিকাতায় আসিতে হইল।

তিনি কলিকাতায় রহিলেন, ধর্ম্মান্তরও গ্রহণ করিলেন, এই পরিবর্ত্তন তাঁহার কেবল মনে নয় আকৃতির উপরও দাগ রাখিয়া গেল। তাঁহার মনের আনন্দ মুখের হাসি সব ঘুচিয়া গেল, নিজের সব বিসর্জ্জন দিয়া তথাপিও তিনি বাঁচিয়া রহিলেন।

স্ত্রীর পরিবর্ত্তন স্বামী লক্ষ্যও করেন নাই, মায়ের পরিবর্ত্তন সন্তান লক্ষ্য করিল, কিন্তু প্রতিবিধানের কোনও উপায় সে লইল না।

ইরা স্কুলে পড়িতে লাগিল, ম্যাট্রিকে সে উচ্চ প্রশংসার সহিত বৃত্তি পাইয়া উত্তীর্ণ হইতে সেই দিনটিই কেবল সে মায়ের মুখে আনন্দের হাসি বিকসিত হইয়া উঠিতে দেখিয়াছিল।

ইরা পিতার ইচ্ছানুসারে আই এ পড়িতে আরম্ভ করিল, এই সময়ে তাহার পিতা মিঃ দাস হঠাৎ মারা গেলেন।

লোকটী জীবিতাবস্থায় উপার্জ্জন করিয়াছিলেন বড় কম নয়, কিন্তু পানদোষের জন্য এক কপর্দ্দকও সঞ্চয় করিয়া রাখিয়া যাইতে পারেন নাই। পত্নী ও কন্যাকে পথের ভিখারিণী করিয়া তিনি নিজে সরিয়া গেলেন।

ইরা ও তাহার মাতা অকূল পাথারে পড়িলেন। মিঃ দাস যথেষ্ট দেনা করিয়া রাখিয়া গিয়াছিলেন, তাঁহার মৃত্যুর সঙ্গে সঙ্গে পাওনাদারেরা আসিয়া তাঁহাদের ঘিরিয়া ফেলিল। উপায়ান্তর না দেখিয়া মিসেস দাস মিশনের শরণাপন্ন হইলেন। মিশন হইতে যে সামান্য সাহায্য পাওয়া গেল তাহাতে মিঃ দাসের দেনা কতকটা শোধ হইল।

মিসেস ব্রাউনিং মিশনারী মিশনের কর্ত্রী ছিলেন। তিনি ইরা ও তাহার মাকে মিশনারী ছোকে আসিয়া থাকিতে বলিলেন কিন্তু ইরা তাঁহার সে প্রস্তাবে রাজি হইতে পারিল না।

খৃষ্টধর্ম্মাবলম্বিনী হইলেও এককালে সে যে হিন্দু ছিল সে সংস্কার তাহার মন হইতে যায় নাই। খৃষ্টান হইয়াও সমাজ হইতে অনেক দূরে সরিয়া ছিলেন! খৃষ্টানদের আচার ব্যবহার আহার বিহার কিছুই তাঁহারা অন্তরের মধ্যে গ্রহণ করিতে পারেন নাই।

লেখাপড়ার আশায় জলাঞ্জলি দিয়া ইরা মিশনারী স্কুলে সামান্য বেতনে টিচারের কাজ লইল এবং মিসেস ব্রাউনিংয়ের পরামর্শে সকালের দিকে টাইপ শিখিতে লাগিল। কিছুদিন মধ্যেই টাইপ করা সে বেশ ভাল রকম শিখিয়া ফেলিল, ঠিক এই সময় মিসেস দাস পীড়িতা হইয়া পড়িলেন।

সে ধাক্কা তিনি কোনক্রমে সামলাইয়া উঠিলেন বটে, স্বাস্থ্য আর ফিরিয়া পাইলেন না। ইহার পর প্রায়ই তাঁহার অসুখ হইতে লাগিল, আজকাল তিনি চলচ্ছক্তিবিহীনা হইয়া পড়িয়াছেন। ইরার সাহায্য ব্যতীত তাঁহার কিছু করিবার ক্ষমতা নাই।

একখানি মাত্র ঘর, পার্শ্বে আর একখানি ছোট ঘর আছে, সেখানিতে রন্ধনাদি হয় ও জিনিসপত্র থাকে। দাসদাসী রাখিবার ক্ষমতা ইরার নাই তাহাকে নিজের হাতেই সব কাজ করিতে হয়।

সেদিন সুশীল যখন হঠাৎ গিয়া উপস্থিত হইল তখন ইরা মায়ের পথ্য তৈয়ার করিতেছিল। সদর দরজায় আঘাত ও সুশীলের কণ্ঠস্বর শুনিতে পাইয়া সে তাড়াতাড়ি আসিয়া দরজা খুলিয়া দিল।

সুশীল তাহাকে সম্পূর্ণ নূতন মূর্ত্তিতে দেখিল। স্নানান্তে ভিজা চুলগুলি এলোমেলো ভাবে পিঠে বুকে লুটাইতেছে; পরণে একটা সাদা সেমিজ ও একখানি সরু কালাপেড়ে ধুতি মাত্র। তাহাকে এই স্বাভাবিক বেশে সত্যই বড় সুন্দর দেখাইতেছিল।

সুশীল একবার মুহূর্ত্তের জন্য তাহার মুখের উপর দৃষ্টি নিক্ষেপ করিয়া তখনই চোখ নামাইয়া লইল, একটা নমস্কার করিয়া কুণ্ঠিত হাসিয়া বলিল, "বড় অসময়ে এসেছি, হয় তো বিরক্ত হয়ে উঠেছেন। কাল বিকেলে আসব ভেবেছিলুম কিন্তু জরুরী দরকারে এণ্ডারসন কোম্পানীর কাছে যেতে হল, ইচ্ছা থাকলেও এখানে আসা হয়ে উঠল না, আজও একটা কাজে এই পথ দিয়ে যেতে মনে হল—সেদিন কথা দিয়ে গিয়েছিলুম আজ সে কথাটা রাখা যাক, আপনিও কয়দিন অফিসে যান নি, আপনার মা কেমন আছেন, সে খোঁজটাও নেওয়া যাবে।"

ইরা সঙ্কুচিত ভাবে বলিল, "মায়ের অসুখ এখনও নরম পড়ে নি, মিঃ মুখার্জ্জী। এমন কেউ নেই যে যার কাছে রেখে কাজে যাই। বাড়ীওয়ালা ভদ্রলোকরা তো ডেকেও সাড়া দেন না, দেখছেন না—মায়ের দরজাটা বন্ধই থাকে।

পাছে এদিকে এলে ওঁদের হিন্দুয়ানীর শুচিতা নষ্ট হয়ে যায়, সেটাও তো বড় কম কথা নয়।"

বলিয়া সে হাসিল।

সুশীল বলিল, "যেতে পারেন নি সে জন্যে অত সঙ্কুচিত হওয়ার কারণ তো দেখছি নে মিস দাস। অসুখ-বিসুখ সবারই আছে, আর প্রত্যেকের সে দিকটা বিবেচনা করেও দেখা দরকার। আর ওই যে হিন্দুয়ানীর শুচিতার কথা বললেন ওটা বাস্তবিক সত্য। আমিও নিজের চোখে এরকম ঢের কাণ্ড দেখেছি—যাতে বুঝতে পেরেছি হিন্দুর হিন্দুত্ব বড় কম জিনিষ নয়।"

সে প্রচুর হাসিতে লাগিল।

ইরা বলিল, "ঘরে চলুন, এখানে দাঁড়িয়ে হয় তো এখনই চলে যাবেন।"

সুশীল বলিল, "না, এসেছি যখন তখন আপনার মাকে না দেখে যাচ্ছি নে। আপনি একটা ঝিও রাখেন নি বোধ হয়, কিন্তু আমার মনে হয় একটা ঝি দিনরাতের জন্যে রাখা উচিত। সংসারের কাজ, রোগীর সেবা করে আবার পয়সার চেষ্টায় বাইরের কাজ করতে যাওয়া মানে নিজের স্বাস্থ্য নষ্ট করে ফেলা। আর দেখুন, আপনার মা না সারা পর্য্যন্ত আপনার কাজে যাওয়ার দরকার নেই। কাজের জন্যে গোলমাল হবে না, আমি অস্থায়ী ভাবে আর একজন টাইপিষ্ট রেখে চালিয়ে নেব এখন। আপনার বেতন তা বলে কাটব না যেমন সম্পূর্ণ বেতন পান তেমনই পাবেন।"

ইরা মাথা নত করিয়া বলিল,—"ধন্যবাদ, ঘরে আসুন।"

সামান্য এই একটা "ধন্যবাদ" কথার মধ্যে তাহার অন্তরের যে উচ্ছ্বাস ঝরিয়া পড়িল তাহা অনেকখানি কৃতজ্ঞতা ভাষায় প্রকাশের চেয়েও বেশী।

ইরা সুশীলকে গৃহমধ্যে লইয়া গেল।

একখানি ক্যাম্পখাটে রোগিণী মিসেস দাস শুইয়া পড়িয়াছিলেন। ঘরখানি যদিও ছোট তথাপি বেশ পরিষ্কার, ঝর ঝরে, কোথাও এতটুকু ময়লা নাই, ছোট এই ঘরখানির পানে চাহিলে গৃহস্বামিনীর সুরুচির স্পষ্ট পরিচয় পাওয়া যায়। একপার্শ্বে একটী ছোট গোল টেবল, তাহার উপর খানকত বই, দোয়াতদানি, প্যাড প্রভৃতি, নিকটে একখানি মাত্র চেয়ার। তাহারই পার্শ্বে একটী আলমারি, তাহাতে বই ঠাসা রহিয়াছে; ইহাতে বুঝা যায় গৃহস্বামিনীর পাঠে অনুরাগ আছে।

চেয়ারখানা সরাইয়া দিয়া ইরা বলিল, "বসুন"—তাহার পর মায়ের কাছে সরিয়া গিয়া তাঁহার কানে কানে কি বলিল।

মিসেস দাস উঠিবার চেষ্টা করিলেন,; সুশীল ব্যস্তভাবে বলিল, "না না, আপনাকে উঠতে হবে না, আপনি শুয়ে থাকুন, আমি বসছি।" চেয়ারখানা টানিয়া লইয়া সে মিসেস দাসের সম্মুখে বসিল।

শীর্ণ হাত দুখানা কপালে উঠাইয়া মিসেস দাস ক্ষীণ-কণ্ঠে বলিলেন, "আমার বড় সৌভাগ্য যে আপনি আমার বাড়ীতে এসেছেন। ইরার কাছে আপনার যে পরিচয় পেয়েছি তাতে শুনেছি আপনার হৃদয় অতি উচ্চ, কিন্তু আমার—" তিনি থামিয়া গেলেন, দুর্ব্বলতায় হাঁফাইতে লাগিলেন।

ইরা বলিল, "একটু আস্তে আস্তে কথা বল মা, জান তো, ডাক্তার তোমায় বেশী কথা বলতে বারণ করেছেন, ওতে তোমার হাঁপানি আরও বাড়বে।"

সুশীলের পানে তাকাইয়া সে বলিল, "ক্ষমতায় কুলায় নি বলে বেশী ঘরও নিতে পারি নি মিঃ মুখার্জ্জি, একটা ছাড়া আর ঘর নেই বলেই আপনাকে এঘরে আনতে ইতঃস্তত: করছিলুম রোগীর ঘরে রোগীর কাছে—"

সুশীল একটু হাসিয়া বলিল, "সে জন্যে আপনাকে এতটা কুণ্ঠিত হয়ে উঠতে হবে না—মিস দাস আমি আপনার অবস্থা অনেক আগেই বুঝতে পেরেছি। জগতে সবাই কিছু ধনীর ঘরে জন্মায় না, সবাই অট্টালিকায় বাস করে না। আমিও আপনারই মত দরিদ্রের সন্তান, ভাগ্যবলে বিপুল ঐশ্বর্য্যলাভ করলেও দারিদ্র্যের স্মৃতি মন হতে মুছে যায় নি। আমি দরিদ্র ছিলুম বলেই দরিদ্রের কষ্ট বুঝি, নইলে হয় তো বুঝতুম-না।"

ইরা বলিল, "কিন্তু অনেকের সাংসারিক অবস্থা পরিবর্ত্তনের সঙ্গে সঙ্গে মনের অবস্থাও পরিবর্ত্তন হয় এটা বোধ হয় জানেন?"

সুশীল বলিল, "খুব জানি, কিন্তু আমায় যেন তাদের দলে কোনদিন ফেলবেন না; বিপুল সম্পত্তি আমার হাতে

এলেও আমি জানি এর কিছুই আমার নয়। একটা শাপ আছে জানেন পরের সম্পত্তিতে কোটিপতি হওয়া ভাল নয়, পরের প্রাসাদে বাস করাও শান্তিপ্রদ নয়, যতটা শান্তি পাওয়া যায় নিজের কুঁড়ে ঘরে বাস করে মাথার ঘাম পায়ে ফেলে জীবিকার্জ্জন করতে পারায়। যারা মানুষ তারা প্রার্থনা করে আমরা যেন মানুষ হয়েই যেতে পারি—আমরা যেন নিজে খেটে খাই, পরের ধন নিয়ে বড়মানুষ না হই। আপনি কায়িক পরিশ্রম করে যে উপার্জ্জন করছেন তাতেও আপনি সুখী মিস দাস, আর আমি—আমার কথা ভাবলে আমার কষ্টের শেষ থাকে না। জীবনটাকে স্বেচ্ছায় পরের হাতে তুলে দিয়েছি, নিজের এরপর কিছুমাত্র অধিকার নেই।"

তাহার কথার মধ্যে এমন এমন একটা সুর বাজিয়া উঠিল যাহা অতি সহজে ইরা—এমন কি রুগ্না ইরার মাও ধরিতে পারিলেন। পীড়িতা নারী বিস্ফারিত নেত্রে তাহার পানে তাকাইয়া রহিলেন।

ইরা খানিক সুশীলের পানে তাকাইয়া থাকিয়া চক্ষু ফিরাইল, বলিল, "একটু বসুন মিঃ মুখার্জ্জি, আমি চট করে মার খাবারটা নিয়ে আসি।"

তাড়াতাড়ি সে বাহির হইয়া গেল। মায়ের দুধ উনানে বসানো ছিল, উথলাইয়া পড়িয়া গিয়াছে সেই বিশ্রী দুর্গন্ধটা ও ঘর পর্য্যন্ত গিয়াছিল। তাড়াতাড়ি দুধ নামাইয়া জলন্ত উনানে ভাতের হাঁড়ি বসাইয়া দিয়া দুধ সাগু লইয়া বাহির হইল।

ফিরিয়া দেখিল মিসেস দাস ও সুশীল তাহাদেরই পারিবারিক কথাবার্ত্তা বলিতেছেন। তাহাকে দেখিয়া সুশীল বলিল, "আপনার এখনও রান্না হয় নি শুনলুম, আমার জন্যে আপনার কাজের অনেক ক্ষতি হয়ে যাচ্ছে তো?"

মায়ের পাশে বসিয়া চামচে করিয়া তাঁহাকে দুধ সাগু খাওয়াইয়া দিতে দিতে ইরা বলিল, 'কিছু ক্ষতি হয়নি—আমি রান্না চড়িয়ে দিয়ে এলুম, ভাত হতে অনেকটা দেরী লাগবে।"

সুশীল বলিল, "আপনি একটা কাজ করুন মিস দাস, একটা ঝি রাখুন, নইলে এত খাটলে শীগগিরই বিছানায় পড়বেন এ আমি ঠিক বলে দিচ্ছি।"

মিসেস দাস একটা দীর্ঘনিঃশ্বাস ফেলিয়া বলিলেন, "আমি বারবার ওকে সে কথা বলছি বাবা, নইলে কি করে চলবে?"

সুশীল বলিল, "ওঁর কথা শুনুন মিস দাস—"

ইরা বাধা দিয়া বলিল, "আমায় ইরা বলে ডাকবেন।"

উঠিতে উঠিতে সুশীল মৃদু হাসিয়া বলিল, "সেই ভাল কথা। আজ আমি যাচ্ছি, পারি যদি আবার একদিন আসব, সে দিন যেন দেখতে পাই কাউকে কাজে রেখেছেন।" (ক্রমশঃ)

ব্যর্থতা

—কবিতা—

জেবুন্নেসা খাতুন

তোমার তরে-দুয়ার খুলি-
রাখিনু-সারারাতি-।
তোমারই-তরে-আঁধার ঘরে
জালিয়ে ছিনু বাতি-।
সদ্য ফোটা যূথির রাশে-
ভরানু-গৃহ-কোণ-
তাহারই-মাঝে-পাতিনু তব-
স্বর্ণ-সিংহাসন-।
উঠিল শত ধূপের ধোঁয়া-
সারাটি-গৃহমাতি-
কনক মণি পাত্র পুটে-
জালিনু শত বাতি-।
নিশীথরাতে কীচকবন
মর্ম্মরিয়া উঠে—
তোমার পায়ের নূপুর শুনি'
চলিনু আমি ছুটে।
গহীন রাতে একতারাতে
বাউল গাহে যেন—
"দুয়ারে তব বাজিছে বাঁশী
শুনিছ নাকো কেন?"
ছুটিয়া দেখি শূন্য দ্বার
গুমরে আকুলতা।
বুকের পরে আছাড়ি মরে
হিয়ার যত ব্যথা।
হৃদয় মাঝে আশার দীপ এখন নিবু নিবু
ব্যর্থ আমার সকল সাজ আসিলে না গো প্রভু।

বিজয় সিংহ

অধ্যাপক শ্রীযোগেশচন্দ্র পাল

—ইতিহাস—

বিজয় সিংহ লঙ্কা জয় করিয়াছিলেন এ কথা সত্য, তবে তিনি বাঙ্গালার বীর বিজয় সিংহ না সিন্ধু দেশের বিজয় সিংহ ছিলেন তাহা লইয়া কথা উঠিয়াছে। কেহ কেহ বলেন, যে, লঙ্কা-বিজয়ী বিজয় সিংহ সিন্ধু দেশের অধিবাসী ছিলেন। আবার অধিকাংশ ঐতিহাসিক বলেন যে, বিজয় সিংহ কলিঙ্গ দেশের রাজকন্যা এবং বাঙ্গালার রাজা সিংহবাহুর পুত্র ছিলেন এবং তিনি বাঙ্গালা হইতে জাহাজে চড়িয়া গিয়া লঙ্কা জয় করিয়াছিলেন। ঐতিহাসিকগণের এই দ্বৈত মতের সমাধান এখনও হয় নাই।

দ্বিতীয় কথা কোন্ সময় বিজয় সিংহ লঙ্কা জয় করিয়াছিলেন, তাহার তারিখ লইয়া নানা গোলযোগ বাধিয়াছে। নানা মুনির নানা মত। কোনটা মানিব আর কোনটা মানিব না এই হইল বিষম সমস্যা। মিষ্টার রোলিনসন বলেন যে, বিজয় সিংহ খৃষ্টপূর্ব্ব ষষ্ঠ শতাব্দীতে। এনসাইক্লোপিডিয়া ব্রিটেনিকা বলে যে, খৃঃ পূঃ ৪৪৩ অব্দে বিজয় সিংহ লঙ্কা জয় করেন। কানিংহাম সাহেব বলেন যে খৃঃ পূঃ ৪৪৩ অব্দে যে দিন ভগবান বুদ্ধ নশ্বর দেহ ত্যাগ করিয়া অমর ধামে চলিয়া যান সেই দিন বিজয় সিংহ লঙ্কা যাত্রা করেন।

বিজয় সিংহ সম্বন্ধে নানা মত আছে। কানিংহাম বিজয় সিংহ কোন দেশের রাজা ছিলেন তাহা উল্লেখ করেন নাই। এনসাইক্লোপিডিয়া ব্রিটেনিকা বলেন, তিনি বঙ্গ দেশের রাজা ছিলেন। রোলিনসনও বলেন যে তিনি বাঙ্গালারই রাজা ছিলেন।

"In the story of the invasion of Ceylon probably in the Sixth centruy B. C. by the Bengal king Vijaya and his followers, we hear of a ship large enough to hold over seven haudred people."

বিজয় সিংহের লঙ্কা জয়ের ঘটনা যে সকল পুস্তকে উল্লেখ আছে, তাহার মধ্যে সিংহলী পুস্তকই প্রসিদ্ধ। ভারতবর্ষে এ সম্বন্ধে খুব কম বই-ই আছে। এত দিন সকল ঐতিহাসিকই সিংহলের প্রাচীন গ্রন্থ মহাবংশের সাহায্য গ্রহণ করিতেন। এখন অন্য একখানা পুস্তকের বিশেষ সাহায্য লওয়া হয়। ইহার নাম "রাজা বলিয়া" পুস্তকখানা কখন লেখা হইয়াছে তাহা লইয়া মত ভেদ আছে। কেহ বলেন যে, এই পুস্তক প্রাচীনকালে কোন এক খৃষ্টান দ্বারা লেখা হইয়াছিল; কিন্তু ইহার কোন মৌলিকতা নাই। তবে ইহা স্বীকার করিতেই হইবে যে, মহাবংশের তুলনায় পুস্তকখানি নূতন। নূতন হইলেও ইহাতে অনেক মূল্যবান তত্ত্ব সংগৃহীত আছে। বিজয় সিংহ সম্বন্ধে অন্যান্য অনেক পুস্তকে সংবাদ পাওয়া যায় সত্য; কিন্তু তাহা কোন কার্য্যেই আসে না—মহাবংশে সিংহলের প্রাচীন ইতিহাস যেখানে অস্পষ্ট হইয়া উঠিয়াছে, 'রাজাবলি'তে তাহার স্পষ্ট চিত্র ফুটিয়া উঠিয়াছে। বিজয় সিংহ কে ছিলেন, তাঁহার পিতার নাম কি, কেন তিনি লঙ্কায় গেলেন, তাহার লঙ্কায় পদার্পণ করিবার সময় ইত্যাদি দুই পুস্তকে লিপিবদ্ধ আছে। দুই পুস্তকের মধ্যে বিশেষ কোন বিভিন্নতা না থাকিলেও বিভিন্নতা দৃষ্ট হয়। বিজয় সিংহের পূর্ব্ব পুরুষগণ কেমন করিয়া বাঙ্গালা দেশে আসিলেন, কেমন করিয়া তিনি পিতার বিরাগভাজন হইলেন এবং তাঁহার পূর্ব্বপুরুষগণের পরিচয় পরিষ্কার ভাবে রাজাবলিতে দেওয়া আছে। কিন্তু যে সকল ঘটনা রাজাবলিতে বর্ণনা করা হইয়াছে, আজ কাল তাহা কেহ সত্য বলিয়া বিশ্বাস করিবে না। সত্য হওয়া যে একেবারে অসম্ভব তাহাও নহে; তবে যাহাই হোক—অর্থাৎ রাজাবলিতে বর্ণিত ঘটনা সত্য হোক বা মিথ্যা হোক সে বিচার করিব না। আমরা দেখিব যে, এই সকল ঘটনার মধ্যে কতটুকু ঐতিহাসিক সত্য আছে। মোট কথা এই সকল ঘটনার মধ্যে যে ঐতিহাসিক সত্য নিহিত আছে, তাহা আমরা দেখাইবার পূর্ব্বে ঘটনাগুলি বলিতে চাই। আমাদের মনে হয়, এই সকল ঘটনা হইতে এমন সব ঐতিহাসিক সত্য পাওয়া যাইবে যাহা হইতে প্রমাণ হইবে যে বিজয় সিংহ বাঙ্গালার রাজকুমার ছিলেন, তিনি লঙ্কা জয় করিয়াছিলেন ইত্যাদী। ইহা ভিন্নও বিজয়ের পূর্ব্বপুরুষগণের অবস্থাও সম্যক উপলব্ধি করিব।

কলিঙ্গ দেশে শকভিত্তি নামে এক রাজা ছিলেন। তাঁহার কন্যাকে বঙ্গের এক রাজপুত্রের সহিত বিবাহ দেন। এই রাজকুমারীর গর্ভে এক কন্যা জন্ম গ্রহণ করে। কন্যা জন্মগ্রহণ করিলে জ্যোতিষগণ বলিলেন যে, এ কন্যার সহিত এক সিংহের বিবাহ হইবে। লোহার পিঞ্জরে আবদ্ধ করিয়া রাখিলেও তাহাকে এই বিবাহ হইতে বাঁচান যাইবে না। কন্যার রাশি নক্ষত্র দেখিয়াই পণ্ডিতগণ এই কথা বলিলেন।

ধীরে ধীরে কন্যা বড় হইয়া যৌবনে পদার্পণ করিলে পিতা মাতা মহা চিন্তাকুল হইয়া পড়িলেন। তাহাকে সাত তালা দালানে রাখা হইত এবং চারিদিকে উপযুক্ত রক্ষকগণ পাহারায় নিযুক্ত থাকিত। একদিন রাত্রিতে রাজকন্যা কামাতুর হইয়া সাত তালা হইতে পালাইয়া আসিয়া একদল বণিকের সহিত মিলিত হইল। রাজ বাড়ীর কেহই একথা জানিতে পারিল না। অবশেষে রাজকন্যা বণিকদের সহিত যখন লাতা নামক বনে প্রবেশ করিল, তখন এক সিংহ বণিক দলকে আক্রমণ করে। বণিকের দল ভীত হইয়া রাজকুমারীকে পরিত্যাগ করিয়া চলিয়া যায়। সিংহ রাজকুমারীকে হত্যা না করিয়া তাহার আবাসে লইয়া আসে। তাহার পর হইতে রাজকন্যা সিংহের সহিত একত্রে বাস করিতে থাকে। এই ভাবে কিছুদিন বাস করিবার পর সিংহের ঔরসে রাজকন্যার দুইটী সন্তান হয়, একজন বালক ও একজন বালিকা। সিংহের ঔরসে জন্মগ্রহণ করিলেও রাজকুমারীর সন্তানদ্বয় দেখিতে মানুষের মত হইয়াছিল। সিংহের পুত্র বলিয়া এই রাজকুমারের নাম হইল সিংহব। আস্তে আস্তে রাজকুমার ও রাজকুমারী বড় হইয়া উঠিতে লাগিল। রাজকুমারের শরীরে সিংহের মত বল হইল। একদিন সিংহ শীকার অন্বেষণে প্রায় পঞ্চাশ যোজন দূরে চলিয়া যায়, তখন সিংহব তাহার মাতা ও ভগ্নিকে পিঠে তুলিয়া লইয়া বঙ্গ রাজ্যে চলিয়া আসে। তথায় আসিয়া দেখিল যে, তখন তাহার মামা সে দেশে রাজত্ব করিতেছেন। রাজা ভগ্নীর সন্তানগণকে উপযুক্ত উপহার দিয়া সহরে বাস করিতে অনুমতি দিলেন। সিংহব মাতা ও ভগ্নীকে লইয়া তথায় বাস করিতে লাগিল।

সিংহ শীকার হইতে ফিরিয়া আসিয়া দেখিল যে, তাহার স্ত্রী পুত্র কন্যা কেহই সেখানে নাই। সে দুঃখে অভিভূত হইয়া পড়িল; সঙ্গে সঙ্গে তাহার ভয়ানক রাগও হইল। সে বনের চারিদিক ঘুরিতে লাগিল এবং যাহাকে পাইতে লাগিল তাহাকে মারিতে লাগিল। এইভাবে বহু জনপ্রাণীর প্রাণ নাশ করিয়া বঙ্গে আসিয়া উপস্থিত হইল। বঙ্গে আসিয়াও সে ভয়ানক অত্যাচার আরম্ভ করিল এবং লোক জন মারিতে লাগিল। অনেকেই বহু চেষ্টা করিল কিন্তু সিংহকে কেহই মারিতে পারিল না বরং যাহারা মারিতে গেল তাহারা আর ফিরিয়া আসিল না। রাজা প্রজাদিগের বিপদ দেখিয়া চিন্তাকুল হইলেন। নানা চিন্তার পর সহরে প্রচার করিয়া দিলেন যে, যে সিংহ মারিতে পারিবে সে রাজ্যের এক অংশ পাইবে।

সিংহব রাজার ঘোষণা শুনিয়া তীর ধনুক লইয়া সিংহকে বধ করিতে বাহির হইল। বনে গিয়া সিংহকে দেখিতে পাইল এবং এস বলিয়া সিংহকে আহ্বান করিল। সিংহ তাহার পুত্রকে দেখিতে পাইয়া যেন সুধাভাণ্ড হাতে পাইল, সে আনন্দে গদ গদ হইয়া পুত্রের দিকে ছুটিয়া চলিল। কিন্তু পুত্র তিনটী বাণ সিংহের প্রতি নিক্ষেপ করিল, বাণের অগ্রভাগ বক্র থাকাতে লক্ষ্যভ্রষ্ট হইয়া মাটীতে গিয়া বিদ্ধ হইল চতুর্থ বাণ নিক্ষেপ করাতে তাহা সিংহের মস্তক বিদীর্ণ করিয়া দিল। সিংহ গর্জ্জন করিতে করিতে মাটীতে পড়িয়া গেল। অবশেষে সিংহব পিতার নিকট গমন করিলে সিংহ পুত্রের কোলে মাথা রাখিয়া স্ত্রী ও কন্যার কথা শুনিয়া প্রাণত্যাগ করিল। সিংহ প্রাণত্যাগ করিলে সিংহব তাহার মস্তক কাটিয়া আনিয়া রাজাকে উপহার দিল।

রাজা তাঁহার প্রতিজ্ঞামত লাতা নামক দেশ সিংহবকে ছাড়িয়া দিলেন! সিংহব সেখানে রাজধানী নির্ম্মাণ করিয়া রাজত্ব করিতে লাগিল! সে সিংহওয়ালী নাম্নী এক রাজকুমারীকে বিবাহ করে তাহার গর্ভে বত্রিশ জন রাজকুমার জন্মগ্রহণ করে। ইঁহাদের মধ্যে বিজয় সিংহ ছিলেন জ্যেষ্ঠ। কথিত আছে যে বিজয়ের জন্মদিনে আরও সাত শত বীর জন্মগ্রহণ করে। পরে এই সকল বীর বিজয়ের সৈন্য ও সহচর হইয়াছিল।

বিজয় সিংহ দিন দিন বৃদ্ধি পাইয়া যৌবনে পদার্পণ করিলেন। যে সাত শত লোক তাঁহার জন্মের দিনে সেই দেশে জন্মগ্রহণ করিয়াছিল, তাহারাও আসিয়া বিজয়ের

সহিত মিলিত হইল। তাহারা বিজয়ের নায়কতায় রাজ্যে নানা প্রকার উপদ্রব করিতে লাগিল। রাজ্যের লোক বিজয় সিংহের প্রতি অসন্তুষ্ট হইয়া রাজার কাছে গিয়া নালিশ করিল যে, যুবরাজ এরূপ করিলে তাহারা দেশে থাকিতে পারে না। রাজা সিংহব যুবরাজের প্রতি বিতৃষ্ণ হইয়া তাহাকে রাজ্য হইতে নির্ব্বাসিত করিলেন।

ভগবান বুদ্ধ যখন কুশীনগরে দেহ রক্ষা করিলেন তাহার সাতদিন পর বিজয় তাঁহার সাত শত সহচর লইয়া সমুদ্র যাত্রা করিলেন। জাহাজ চলিতে চলিতে এক দ্বীপে আসিয়া লাগিল, এই দ্বীপের নামই লঙ্কা দ্বীপ। তাহারা সিংহলের "তাম্বন্নট্টা" নামক স্থানে জাহাজ হইতে অবতরণ করিয়া এক অশ্বথ বৃক্ষের নীচে অবস্থান করিতে লাগিলেন। সে দেশ সবুজ বৃক্ষে পূর্ণ, শীতল ছায়ায় ঢাকা, নিবিড় বনে আচ্ছন্ন, লতায় পাতায় ঘেরা, জমি উর্ব্বর এবং ফল মূল যথেষ্ট পাওয়া যায় বলিয়া তথায় "কলোনী" করিবার বন্দোবস্ত করিলেন। যখন বিজয় সিংহ লঙ্কায় পৌছিয়াছিলেন তখন দ্বীপটী ভূত প্রেত রাক্ষস প্রভৃতিতে পূর্ণ ছিল। সেখানে কোন মানুষ বাস করিত না। রাম রাবণের যুদ্ধ এবং বুদ্ধের বুদ্ধত্ব লাভ করার পূর্ব্ব পর্য্যন্ত এক হাজার আট শ চুয়াল্লিশ (১৮৪৪) বৎসর পর্য্যন্ত লঙ্কা রাক্ষস রাজত্ব ছিল।

ভগবান বুদ্ধ বুদ্ধত্ব লাভ করিবার পর তিনবার লঙ্কা ভ্রমণ করিয়াছেন। প্রথম বুদ্ধত্ব লাভ করিবার দিন, দ্বিতীয় বুদ্ধত্ব লাভ করিবার ছয় বৎসর পর এবং তৃতীয় বার বুদ্ধত্ব লাভ করিবার নয় বৎসর পর। সেখানে গিয়া তিনি অলৌকিক শক্তি দেখাইয়া লঙ্কার রাক্ষসদিগকে মুগ্ধ করিয়াছিলেন এবং তাহাদের ঝগড়া মিটাইয়া দিয়াছিলেন।

যখন চতুর্থ তীথিতে ভগবান বুদ্ধ কুশী নগরে দেহ রক্ষা করেন, তখন তাঁহার বন্ধুগণকে বলিয়া গিয়াছিলেন যে, মহেন্দ্র নামে এক ব্যক্তি সিংহলে "বৌ-বৃক্ষ" স্থাপন করিবে। বুদ্ধদেব তখন শক্কালা নামক এক ব্যক্তিকে আশীর্ব্বাদ করিয়া তাঁহার উপর লঙ্কার ভার অর্পণ করেন। এবং কথিত আছে যে, বিজয় সিংহকে তাঁহার সহায়তা করিবার জন্যই নিযুক্ত করেন এবং বিজয়কে "রক্ষা-জল" ও "রক্ষা-সূত্র" দিয়া আশীর্ব্বাদ করেন। সিংহল সেই সময় 'উপলবন' নামক দেবতার তত্ত্বাবধানে ছিল।

রাজকুমার বিজয় সিংহ যখন অশ্বথ বৃক্ষের নীচে বসিয়া বিশ্রাম করিতে ছিলেন, তখন উপলবন নামক দেবতা ঋষির বেশে আসিয়া বিজয়কে "রক্ষাসূত্র" পরান এবং তাঁহাকে ও তাঁহার সহচরগণকে 'শান্তি জল' ছিটাইয়া দেন। বিজয়ের আগমনে নিকটস্থ দানব দৈত্য প্রভৃতি পালাইয়া অন্য বনে গমন করেন।

কুবেনী নাম্নী এক সুন্দরী দৈত্যকন্যা তখন সিংহলে বাস করিত। তাহার বুকে তিনটী স্তন ছিল। এই তিনটী স্তনের জন্য তাহার বুকের সৌন্দর্য্যের অনেকখানি হানি হইয়াছিল। কিন্তু সে দেশের বৃদ্ধরা বলিত যে, যদি কোন দিন তাহার কোন বর আসে এবং সে আসিয়া তাহার বুকের মধ্যম স্তনটী স্পর্শ করে তাহা হইলে তাহা অদৃশ্য হইয়া যাইবে। বিজয় সিংহলে পদার্পণ করিলে পর কুবেনী মনে করিল যে, সেই তাহার বর। সেই অনুমানের বশবর্ত্তী হইয়া যাদু মন্ত্র দ্বারা সে নিজে একটী কুত্তা সাজিয়া লেজ নাড়িতে নাড়িতে বিজয়ের পায়ে প্রণাম করিয়া চলিয়া গেল। কুকুর দেখিয়া বিজয় মনে করিলেন যে, লঙ্কায় মানুষ থাকা অসম্ভব নহে। তাঁহার সহচরদিগকে তিনি সংবাদ লইতে বনের মধ্যে পাঠাইয়া দিলেন। তাহারা একটী পুকুরের নিকট আসিলে কুবেনী মন্ত্রবলে পুকুরের পদ্ম পাতার নীচে তাহাদিগকে লুকাইয়া রাখিল। সারাদিনের মধ্যেও যখন তাহারা ফিরিয়া আসিল না, তখন বিজয়ের মনে সন্দেহ হইল। তিনি বনের মধ্যে সেই পুকুরের নিকট গিয়া দেখিলেন যে, মানুষ, জলের মধ্যে নামিয়া গিয়াছে তাহার পদ রেখা দেখা যায় কিন্তু উঠিয়া আসিবার কোন চিহ্ন দেখা যায় না। ইতিমধ্যে তিনি কুবেনীকে দেখিতে পান এবং তাহার চুল ধরিয়া টানিয়া অপমান করিবার ভয় দেখান। কুবেনী বলে যে যদি বিজয় তাহাকে বিবাহ করিয়া রাণী করে তবে তাঁহার সাত শত সহচরকে মুক্তি দিবে। কুবেনীর কথায় বিজয় সিংহ রাজী হইলেন। কুবেনীর অনুরোধে তাহার বুকের মধ্যস্থিত স্তন স্পর্শ করিলেন; ফলে স্তনটী অদৃশ্য হইয়া গেল। কুবেনী বিজয়ের সাত শত সহচরকে মুক্তি দিয়া বিজয়ের রাণী হইয়া বাস করিতে লাগিলেন।

এক দিন রাত্রিতে হঠাৎ কিসের একটা গণ্ডগোলে বিজয়ের ঘুম ভাঙ্গিয়া গেল। তিনি কুবেনীকে জিজ্ঞাসা

করিলে কুবেনী বলিল যে, এক দৈত্য কন্যার বিবাহ। আরও বলিল যে এই সকল দৈত্যদের মধ্যে বিজয়ের বাস করা ঠিক নহে। এই সকল দৈত্যদিগকে মারিতে পারিলে আর কোন ভয় নাই। অবশেষে কুবেনী ঘোড়া সাজিল, বিজয় তাহার পিঠে চড়িয়া দৈত্য ধ্বংস করিতে চলিলেন, এবং তাঁহার সাত শত সহচর তাঁহার সহিত চলিল। তাহারা অনেক দৈত্য বধ করিয়া নিরাপদে বাস করিতে লাগিল এবং কুবেনী তাহাদের জন্য চাউল প্রভৃতি খাদ্য আনিয়া দিল।

সমস্ত ঠিক হইলে বিজয়ের সহচরগণ বিজয়কে রাজমুকুট পরিতে অনুরোধ করিল। কিন্তু কুবেনীকে রাণী করিয়া রাজমুকুট পরা চলিবে না। অনেক পরামর্শ করিয়া পিণ্ডিদেশের রাজাকে এক বহুমূল্য মণি উপহার পাঠাইয়া দিলেন এবং রাজার নিকট এক রাজকুমারী, সাতশত পরিচারিকা এবং পাঁচ প্রকার বণিক পাঠাইতে প্রার্থনা করিলেন। শীঘ্রই পিণ্ডিদেশের রাজকুমারী সাত শত সহচরী ও পাঁচ প্রকার বণিক লইয়া লঙ্কায় আসিলেন। বিজয় রাজকুমারীকে বিবাহ করিয়া সিংহলের রাজা হইলেন এবং রাজকুমারীর সাতশত সহচরীকে তাঁহার সাতশত সহচরের নিকট বিবাহ দিলেন। এবং কুবেনীকে তাড়াইয়া দিলেন। ইহাতে কুবেনী ক্রোধিত হইয়া রাজাকে আক্রমণ করিতে আসিল কিন্তু দেবতাদের আশীর্ব্বাদে বিজয় তাহাকে পরাজিত করিলেন। দেবতাদের চক্রান্তে কুবেনী পাষাণ মূর্ত্তি হইয়া রহিল। বিজয় সিংহ সিংহলে আটত্রিশ বৎসর রাজত্ব করিয়া প্রাণত্যাগ করেন।

আমরা বিজয় সিংহের বৃত্তান্ত বর্ণনা করিলাম। যেখানে বিস্তৃত বিবরণ দেওয়া আবশ্যক মনে করি নাই সেখানে সংক্ষেপে ঘটনা বর্ণনা করিয়াছি। এখন আমরা এই বৃত্তান্তের ঐতিহাসিক তত্ত্ব নির্ণয় করিবার চেষ্টা করিব। তবে আমরা এখানে বিজয় সিংহের যে কাহিনী বর্ণনা করিলাম তাহা ভিন্ন পুস্তকে ভিন্ন ভিন্ন রূপে দেখা যায়। তবে সে বিভিন্নতা তেমন বেশী নয় এবং এই অল্প বিভিন্নতার জন্য কাহিনীর ঐতিহাসিক সত্য নষ্ট হইবে না।

প্রথমতঃ কাহিনী পড়িয়া অনেকেই মনে করিবেন যে, ইহার কোন মূল্য নাই। কিন্তু আমরা তাহা স্বীকার করিব না। একজন রাজকুমারীর সিংহের সহিত বিবাহ হওয়া যেন উপকথার পাতালপুরীর রাজকুমারীর ঘুমভাঙ্গান কাহিনীর মত মনে পড়ে। কিন্তু আমরা যদি আমাদের পুরাণ প্রভৃতি ধর্ম্ম গ্রন্থ আলোচনা করিয়া দেখি, তাহা হইলে দেখিতে পাইব যে, অনেকেই জীব-জন্তুর গর্ভে জন্ম গ্রহণ করিয়াছেন এবং অনেকেই অনেক পশু প্রসব করিয়াছেন; কাজেই এদিক দিয়া কথাটা অবিশ্বাস যোগ্য নহে। দ্বিতিয়তঃ রাশী নক্ষত্রের একত্র সমাবেশ যে মানুষের চরিত্রের উপর অনেক খানি প্রভাব বিস্তার করে তাহা বলাই বাহুল্য। কাজেই এদিক দিয়া আমরা কাহিনীর সত্যতা দেখিতে পাই কাহিনীর ভিতর ঐতিহাসিক সত্য ভিন্ন আরও অনেক সত্য নিহিত আছে; কিন্তু আমরা তাহার বিচার না করিয়া কেবল ঐতিহাসিক সত্যটুকুই বাহির করিয়া আনিবার চেষ্টা করিব।

এই গল্প হইতে আমরা একটা নূতন সত্য বাহির করিতে পারি। গল্পের একস্থানে লেখা আছে যে, বুদ্ধের বুদ্ধত্ব লাভের সময় হইতে এক হাজার আটশত চুয়াল্লিশ (১৮৪৪) বৎসর পূর্ব্বে রামচন্দ্র লঙ্কায় গিয়াছিলেন।

After the war of Ravana, and before the attainment of Budhahood by our Budha, the teacher of the three world, lanka had been the abode of demons for the space of 1844 years"—"Rajavaiiya"

কথাটা একটু ভাবিবার বটে। রামায়ণের কাল নির্ণয়ের জন্য এই তারিখ আমাদিগকে সাহায্য করিবে বলিয়া মনে হয়। পণ্ডিতগণ এ সম্বন্ধে একটু বিশেষ আলোচনা করিলে বোধ হয় অনেক তত্ত্ব সংগ্রহ করিতে পারিবেন। এই তারিখ লইয়া যদি আমরা বিচার করিয়া দেখি, তাহাহইলে বোধহয় রামায়ণের কাল নির্ণয় করিতে পারিব এবং হয়ত তাহাই রাম রাবণের যুদ্ধের ঠিক তারিখ। বুদ্ধদেব ৫৫৫ খৃঃ পূঃ অব্দে জন্ম গ্রহণ করিয়াছিলেন। চল্লিশ বৎসর বয়সে তিনি সিদ্ধি লাভ করেন অর্থাৎ তখন খৃঃ পূঃ ৫১৫ অব্দ। ইহার সহিত যদি আমরা ১৮৪৪ বৎসর যোগ করিয়া দেই, তাহা হইলে দেখিতে পাই যে, রামচন্দ্র খৃঃ পূঃ ২৩৫৯ অব্দে লঙ্কায় গিয়াছিলেন। কথাটা উড়াইয়া দিবার মত নহে। মহাভারতের অনেক পূর্ব্বে রামায়ণের কাল। পণ্ডিতগণ

অনুমান করেন এবং পুরাণ হইতে আমরা যে সকল রাজাদের নাম সংগ্রহ করিতে পারি তাহা হইতে দেখা যায় যে খৃঃ পূঃ ১৪৩৮ অব্দে কুরুক্ষেত্রের যুদ্ধ হইয়াছিল। তাহা হইলে বলা যাইতে পারে যে কুরুক্ষেত্রের যুদ্ধের ৯২১ বৎসর পূর্ব্বে রাম রাবণের যুদ্ধ হইয়াছিল। আমাদের মনে হয়, এই তারিখটা অযৌক্তিক নহে।

এখন কথা হয় যে, বিজয় সিংহ বাঙ্গালা রাজকুমার ছিলেন কি না? অনেকে বলেন যে, তিনি সিন্ধু দেশ হইতে গিয়া লঙ্কা জয় করিয়াছিলেন। কথাটার সত্যতার সম্বন্ধে প্রমাণ তেমন কিছু নাই। কেহ কেহ বলেন, বিজয় সিংহের পিতা সিংহব সিংহল দখল করেন। এবং তাঁহার ভগ্নী জাহাজে চড়িয়া পশ্চিম দিকে যান। তিনি পারস্য সাগরে পৌছিলে পারস্যের রাজা তাঁহাকে বন্দী করিয়া বিবাহ করেন। যাহারা বিজয় সিংহকে সিন্ধুদেশের রাজকুমার বলেন তাহারা কোন কোন গ্রীক লেখকদের দোহাই দিয়া থাকেন মাত্র। বাস্তবিক পক্ষে বিজয়সিংহ সিন্ধুদেশের রাজকুমার ছিলেন না – তিনি বাঙ্গালারই রাজা ছিলেন। যে সমস্ত পুরাতন পুস্তকে বিজয়ের সিংহল যাত্রার নিদর্শন পাওয়া যায়, তাহার সকল পুস্তকই স্বীকার করে যে, বিজয় বাঙ্গালার বীর। ৺রমেশচন্দ্র দত্ত মহাশয় বিজয়কে মগধের রাজা বলিয়া স্বীকার করেন; কিন্তু তিনি যখন পুস্তক লেখেন, তখন বিজয় সম্বন্ধে নানা বিবরণ জানা সুবিধার ছিল না। দ্বিতীয়তঃ মগধ আর বাঙ্গালা পাশাপাশি প্রদেশ ছিল; কখন কখন বাঙ্গালা মগধের মধ্যে, আবার কখন কখন মগধ বাঙ্গালার সীমার মধ্যে আসিয়া পড়িয়াছে। কাজেই দত্ত মহাশয়ের বিবরণে অযৌক্তিকতা নাই। এখন কথা হইল যে, আমরা বিজয় নামে একজন রাজা দ্বিতীয় শতাব্দীতে অঙ্গদেশে রাজত্ব করিতে দেখি কিন্তু তিনি লঙ্কা জয় করিয়াছিলেন বলিয়া কেহ স্বীকার করেন না।

বিজয় কোন সময় সিংহল জয় করেন তাহা লইয়া মতভেদ দেখা যায়। অনেকের মতে দেখা যায় যে, তিনি ৪৪৩ খ্রী পূঃ অব্দে সিংহল জয় করেন; আবার অনেকে নানা গোলযোগে পড়িয়া নির্দ্দিষ্ট তারিখ না দিয়া মোটা-মুটি একটা সময় নির্দ্দেশ করিয়াছেন। কিন্তু আমরা দেখিতে পাই যে, বুদ্ধের মৃত্যুর ছয় দিন পর বিজয় লঙ্কা যাত্রা করেন। বুদ্ধের জন্ম ৫৫৫ খৃঃ পূঃ অব্দে হয় আর ৮৯ বৎসর বয়সে তাঁহার মৃত্যু হয়। তাহা হইলে দেখা যায় খৃঃ পূঃ ৪১৪ অব্দে বিজয় সিংহল জয় করেন। যাহারা খৃঃ পূঃ ৪৪৩ অব্দ সিংহল জয়ের সময় নির্ণয় করেন, তাহাদের সহিত আমাদের মাত্র ৩১ বৎসরের ব্যবধান। কিন্তু একটা বিষয় লক্ষ্য করিবার আছে। অধ্যাপক রাধাকমল মুখার্জ্জি বুদ্ধের মৃত্যুর ছয় বৎসর পর বিজয় লঙ্কা যাত্রা করেন তাহা স্বীকার করিয়াছেন। আবার তিনিই বিজয়ের লঙ্কা যাত্রার দিন ৪৪৩ খৃঃ পূঃ অব্দ স্বীকার করিয়াছেন। কিন্তু এই স্বীকারোক্তির মধ্যে আমরা দেখিতে পাই ১১২ বৎসরের ব্যবধান। অর্থাৎ তাঁহার সিদ্ধান্ত অনুযায়ী বুদ্ধের জীবন কাল ১১২ বৎসর, কিন্তু বাস্তবিক পক্ষে তাহা নহে। এক্ষণে বিজয়ের লঙ্কা যাত্রার দিন ৪৪৩ খৃঃ পূঃ অব্দ কি ৪১৪ খৃঃ পূঃ অব্দ তাহার বিচারের ভার সুধিগণের উপর রহিল।

পথের শেষে

(চিত্র)

শ্রীমতী ইন্দুবালা রায়চৌধুরী

এঁকাবেঁকা পল্লীপথ—নদীর কোল ঘেঁষে ধনুকের মত বেঁকে এসেছে। তারপর খেয়াঘাট, হাটখোলা, গাজীর দরগার পাশ কাটিয়ে, আম বাগানের মধ্যে দিয়ে, মাঠের উপর এসে পড়ে কোথায় হারিয়ে গেছে। গাছপালায় ঘেরা খোড়োচালার মধ্যে আলোর লুকোচুরি অনেকক্ষণ সুরু হয়েছে। সেই পথে একলা আপন মনে বাড়ী ফিরে চলেছি। সাদা পথ চাঁদের আলোয় মাজা—এমন সাজানো, আচম্‌কা পা ফেল্‌তে ভয় হয়। পায়ের ধুলা তার সাজানো অঙ্গে তুলে দেব কি করে! ছিঃ! কিন্তু সে যে পথ—পায়ের ধুলাই তার মাথার শিরোপা। এই রকম ভুলই আমার বেশী করে হচ্ছিল।

হঠাৎ পিছনে কার পায়ের শব্দে ফিরে চাইতেই দেখি, বিমলদা আসছে। আমার দিকে চেয়ে' বড় স্নিগ্ধ স্বরে বিমলদা ব'ললে, "আঁচলটা যে ভুঁয়ে লুটোচ্ছে, খেয়াল নেই?

—বাস্তবিকই ত! অন্যমনস্কতায় আঁচলটা কখন যে কাঁধ থেকে খ'সে প'ড়েছিল, সেদিকে আমার একটুও হুঁস্ ছিল না। সলজ্জভাবে তাড়াতাড়ি আঁচল তুলে নিয়ে বাড়ীর দিকে ফিরলুম। বিমলদা আমার পাশ দিয়ে চ'লে গেল। পরণে তার মোটা খদ্দরের ধুতী-পাঞ্জাবী। মাথায় গান্ধী-টুপী! আমার কেবলই মনে প'ড়তে লাগলো আমার-ই প্রতিবেশী আমার-ই একান্ত শুভাকাঙ্ক্ষী অগাধ স্নেহশীল এই অদ্ভুত দাদাটীর কথা। কলকাতার কলেজের পড়া শেষ হ'তে না হ'তেই বাপ-মা আত্মীয়-স্বজনের মায়া ত্যাগ ক'রে স্বদেশী-আন্দোলনে সে কি অসাধারণ উৎসাহ নিয়েই নেমে প'ড়েছে। পরিজনের কোনো উপদেশ-অনুনয় সে একটুও মনে নেয় নি। কর্ত্তব্যকে বেছে নেওয়ার ফলে পূরো এক বৎসরের জন্য তাই তাকে কঠোর কারাবরণ ক'রতে হ'য়েছে। কারা-মুক্তির পর কি-জানি কি মনে ক'রে সে একবার তার বাপ-মাকে দেখতে এসেছে! সে ত আবার চ'লে যাবেই। কিন্তু কি পবিত্র সঙ্কল্পে ভরা তার মন! এটা যখনি আমি ভাবি, তখনি আমার অন্তর আনন্দে নেচে ওঠে! এর কারণটা কিন্তু আমি নিজেও ঠিক বুঝতে পারি না!...

হঠাৎ একদিন আমার জীবনের ধারা একেবারে ঘুরে গেল। বাবা আমার অত্যন্ত গরীব। এত গরীব যে, আমার উপযুক্ত বয়স হ'লেও, আমাকে পাত্রস্থ ক'রতে পারছিলেন না। বাবার বার্‌বার্ আশাহত অতি-করুণ মুখখানি দেখে, আমার বুকখানা যেন ফেটে যেতো। এক এক সময় ভাবতুম, হায়, কেন আমি আমার অভিশপ্ত জীবন নিয়ে জন্মেছি। আর জ'ন্মেছি-ই যদি, বিধাতা বাবাকে কেন অর্থ দেন নি! গরীবের ঘরে আমার মতন অভাগী যে বিষম বোঝার মতো!...

সেদিন বিকেলে বউদিদি আর মা গা'ধোবার জন্য পুকুর্-ঘাটে গিয়েছেন। আমি বাবার বিছানা পেতে ঠিক ক'রে রাখছিলাম। এমন সময় বিমল-দা হঠাৎ ঘরের দরজার সামনে এসে বললে, "জ্যেঠাইমা কোথায়, অরুণা?"

বিমল-দার কণ্ঠস্বর রীতিমত গম্ভীর। আমি আস্তে আস্তে ঘর থেকে বেরিয়ে আসছিলুম—মাকে ডেকে দেবার জন্য। বিমল-দা আগেকার মতন স্বরেই আবার বললে, "তুমি যেয়োনা, অরুণা। তোমার সঙ্গেই আমার একটু কথা আছে।"

আমি নতমুখে চুপ ক'রে দাঁড়িয়ে রইলুম। আমার দিকে চেয়ে' অভিমান-ভরা স্বরে বিমল দা ব'লিলেন, "অরুণা, তোর ছেলেবেলা থেকে তোকে আমি নিজের হাতে মানুষ ক'রেছি। আমার কাছে তোর লজ্জা করবার কোনো কারণ নেই। শুনলুম, তোর কিছুতেই বিয়ে হচ্ছে না ব'লে তুই নাকি কাল আত্মহত্যা করবার—"

আমার চোখের কোণে বেদনায় দু ফোঁটা অশ্রু ভ'রে উঠলো। বড় স্নেহের স্বরে বিমল-দা বললে, ছি! বোন্। আত্মহত্যায় কি বিয়ের পথ পরিষ্কার হয়? তোর মতন আরও কত মেয়ে আছে জানিস, যাদের বিয়ে হ'তে পারছে না? তাদের কথা ভেবেছিস? তারা কি ক'রবে? জানিস,

পৃথিবীতে পুরুষগুলো কেবল স্বার্থপর। মেয়েরা তাদের কাছে সুলভ ব'লেই, তারা মেয়েদের বাপের ওপর জুলুম করবার সুযোগ পায়। কেন, মেয়েদের কি কোনো আত্ম-মর্য্যাদা নেই? তাদের কি কোনো মূল্য নেই—হোকনা তাদের বাপ গরীব? অরুণা, নিজেকে সুলভ করিস্‌নি! তোর আত্ম-সম্মান রক্ষার গৌরব যেদিন অর্থ-লোলুপ পুরুষ-সমাজকে পদাঘাত ক'রতে পারবে, ঘৃণা ক'রতে পারবে, সেইদিন স্বার্থপরেরা তোর মূল্য বুঝবে। তোমার রুদ্ধ অভিমান সেইদিনের অপেক্ষায় যেন ঈশ্বরের কাছে শক্তি চায়!...অরুণা, আজ দেশের জাতীয় যুদ্ধে ঘরের বাইরে কত নর-নারী আত্মবলি দিচ্ছে, জান? এ-বিষয়ে ঘরের ভেতরে তোমাদের কাছে,—বিশেষ ভাবে তোমার কাছে আমাদের গরীব দেশ কি কিছুমাত্র আশা ক'রতে পারে না? আজ গ্রামে-গ্রামে পল্লীতে-পল্লীতে কত মেয়ের মতো তুমিও দেশকে সাহায্য করো। চর্‌কা কাটো! বাড়ী শুদ্ধ সবাইকে খদ্দরের পূজা ক'রতে বলো! মেয়ের বিয়ে দেওয়ার চেয়ে বর্ত্তমানে এইকায-ই বেশী দরকার হ'য়ে প'ড়েছে। আমাদের-ই এই গ্রামের দিকে চেয়ে গ্যাখো! তোমাকে সাহায্য করবার মতো ঘরে-ঘরে এমন অনেক মহিলা আছেন, যারা ইতিমধ্যেই দেশের ডাকে সাড়া দিয়েছেন। সাড়া দাওনি কেবল তোমরা এবং তুমি! তোমার বিয়ে হচ্ছে না ব'লে, তুমি আত্মহত্যা ক'রতে গিয়েছিলে। যদি জানতুম, দেশের কাজ ক'রতে না পারার জন্যে অভিমানে তুমি আত্মহত্যা ক'রতে গিয়েছিলে, তা হ'লে আমি সুখীই হতুম!..."

বিমল-দার চোখে-মুখে কী এক পুণ্যোজ্জ্বল তেজ-দীপ্তি ফুটে উঠলো। তার সামনে শ্রদ্ধায় আমার মাথা যেন আপ্‌নি-ই নুয়ে প'ড়লো।

* * * *

কখন পুকুর-ঘাটে এসেছি মনে নেই—সন্ধ্যার অন্ধকার গাছে-গাছে নেমে এসেছে হুঁস্ নেই। পিছন থেকে হঠাৎ কে গায়ে হাত দিলে। ফিরে দেখি বউদিদি দাঁড়িয়ে। তিনি আমার হাতটা ধরে বল্লেন "একি অরুণা! এই ভরা-সন্ধ্যায় তুমি এখানে দাঁড়িয়ে—এই পুকুর ঘাটে? আর তোমাকে সারা গাঁ খুঁজে বেড়ান হচ্ছে। এক মনে কি অত ভাবা হচ্ছিল, শুনি?" একটু নীরব থেকে গম্ভীরভাবে আমি বল্লুম "বউদিদি, দেশকে সাহায্য ক'রতে হবে। আজ, থেকে আমার কর্ত্তব্য—চরকার পুজো করা। এর দ্বারা বাবা-ও মুক্তি পাবেন। তোমরা আমার সঙ্গী হবে ত?" বউদিদি আমার কথাটা ঠিক বুঝতে পারলেন না। বল্লেন "তার মানে?" বৌদির একখানা হাত ধ'রে রুদ্ধ স্বরে কম্পিত গলায় আমি বললুম, "চরকাই যে গরীবের বন্ধু, বৌদি! আমার জন্যে তোমরা কেউ ভেবো না!"

কষ্টি-পাথর

শ্রীগোপেন্দ্র বসু (গল্প)

দার্জ্জিলিংয়ে সকাল সাতটারও অনেক পর—প্রায় আট ঘটিকা।

মাউন্ট প্লেসেন্ট্ রোডস্থিত নব-বিলাত প্রত্যাগত মিষ্টার এ, কে, সেন, বার-এট-ল, পুরানাম শ্রীঅশোক কুমার সেনের প্রাতঃকালীন চা পান প্রায় শেষ হইয়া আসিয়াছে, রঙ্গিন খদ্দরের একখানি পুরু চাদর আবক্ষ জড়াইয়া কুমারী উর্ম্মিলা চায়ের টেবিলের নিকট আসিয়া একখানি গদি আঁটা চেয়ারে বসিতেই অশোক হাস্য করিয়া কহিল, "Beware of tea। টেবিলের অত কাছে বস্‌লে দেখো ছোঁয়া না লাগে।" অশোকের কথায় চা-পানরতা উর্ম্মিলার জ্যেষ্ঠা ভগ্নী প্রতিমা দেবীও হাস্য করিল।

উর্ম্মিলা চা পান করে না। সেইজন্য অত্যধিক চা-প্রিয়

অশোক প্রায়ই এইরূপ বিদ্রূপ করিয়া থাকে। পরপর দু'কাপ চা পানান্তে অশোক উর্ম্মিলাকে লক্ষ্য করিয়া কহিল "By jove, কাল তোমার জন্যে যে সব জিনিষগুলো এনেছিলাম সব পছন্দ হয়েছে ত? সব একেবারে খাঁটি স্বদেশী।" মৃদু হাস্য করিয়া উদ্ভিন্ন যৌবনা উর্ম্মিলা বলিল, একটু ত্রুটি আছে।" আর এক কাপ চা'র জন্য আদেশ করিয়া অশোক কহিল 'may I have the fortune to hear যথা', উর্ম্মিলা হাস্য করিয়া কহিল, যথা একটি একটি হারমোনিয়াম ও একটি স্কুটার আনতে ভুল হয়েছিল।' অশোক কি বলিতে যাইতেছিল, তাহার ঠিক পার্শ্বের অপর একটি চেয়ার হইতে তাহার স্ত্রী প্রতিমা বলিয়া উঠিল 'কাল তুমি কতকগুলো ক্রেকার এনেছ তাই বোনটির আমার মান্যের হানি হয়েছে।' ভগ্নীর কথায় উর্ম্মিলা ঠোঁট ফুলাইয়া অভিমানের স্বরে কহিল 'মান্যের হানি হবে নাত কি? আমি বুঝি এখনও কচি খুকিটি আছি যে ঐ ক্রেকার নিয়ে সারাদিন পট্ পট্ করবো?' মুখগহ্বরস্থিত পাইপটাকে দাঁত দিয়া চাপিয়া মৃদু হাস্য করিতে করিতে অশোক কপট গাম্ভীর্য্যের সহিত বলিল 'Here you are, আমারি ভুল হয়েছিল তা Pretty miss, I should apologise first of all, কিছু মনে করো না ঝলে উর্ম্মিলা। আমার খেয়াল ছিল না যে তুমি বড্ড বড় য়েছ এবং ক্রেকার নিয়ে খেলতে তোমার মন বসবে না। t is very natural, যাক্ তুমিই যখন মনে করিয়ে য়েছ তখন তোমার যাতে মন বসে তার ব্যবস্থা শীঘ্রই ছি, অভয় দাও ত এই আশ্বিন মাসেই হিন্দু সমাজে ধা থাকলেও 'Oh what a fool I have been,' ম্নিপতির কথায় উর্ম্মিলা বিশেষ কুপিত হইয়া প্রতিমার তি লক্ষ্য করিয়া অনুযোগের স্বরে কহিল, 'দেখ্‌লে দিমণি আমি যেন সেই ভেবে বলেছিলুম", অশোক পাইপ রিস্কার করিতে করিতে কহিল 'স্পষ্ট করে বলনি বটে ut the cat is out আর white wash করলে হবে '। প্রতিমা উচ্চৈস্বরে হাসিয়া উঠিল, রাগান্বিতা উর্ম্মিলা বন পুষ্পিত দেহলতাটি লীলায়িত করিয়া দ্রুতপদে কক্ষাগ করিল। প্রতিমা ও অশোকের সম্বোধনে কোন ত্তর সে দিল না।

দুই

উর্ম্মিলা চলিয়া যাইলে অশোক প্রতিমাকে কহিল, "ঠিক কথা, তোমার বোনটির কি ব্যবস্থা করলে সত্যই ত বয়স হতে চল্ল। she is no more within her teens'। প্রতিমা কহিল "ব্যবস্থা ত তোমার হাতেই'। অশোক ধূম ত্যাগ করিয়া বলিল 'ব্যবস্থা ত আজই কর্ত্তে পারি কিন্তু তুমি যে বলছিলে উর্ম্মিলা betrothedকে একজন মুনসেফের নিকট বাগদত্তা'। প্রতিমা মৃদু প্রতিবাদ করিয়া কহিল, বাগদত্তা ঠিক নয় তবে বাবা বেঁচে থাক্‌তে তার সঙ্গে কথাটা অনেক দূর এগিয়েছিল, ছেলেটির নাম অসীম চৌধুরী—গেল বছরে ল পাশ করে মুনসেফ হয়েছে। বাপের সম্পত্তিও অনেক সে পেয়েছে, তার বড্ড ইচ্ছে উর্ম্মিলাকে বিয়ে করে—উর্ম্মিলারও তার প্রতি খুব টান। অসীম এই কিছুদিন আগেও আমাকে চিঠি লিখেছে। উর্ম্মিলাকে তার না হলে প্রাণে বাঁচবে না...শুধু চক্ষের নেশা নয় হৃদয় দিয়ে সে উর্ম্মিলাকে ভালবেসেছে ইত্যাদি। আর কতকি কাব্য-কাব্য আমি ভাল বুঝি না—তাই সব লিখেছে," রাবার পাউচ হইতে মিক্সচার বাহির করিতে করিতে অশোক বলিল 'তবে আর কি? পাত্র যখন ভাল আর উর্ম্মিলাও যখন তাকে ভালবাসে তাহলে শুভস্য শীঘ্রং। প্রতিমা কহিল "উর্ম্মিলা যে তাকে কিছু কিছু ভালবাসে সে কথা ঠিক, তবে ও দোটানায় পড়েছে'। অশোক মুখ হইতে পাইপ বাহির করিয়া আগ্রহান্বিত হইয়া কহিল 'দোটানায় কি রকম?" টেবিল ক্লথ গুছাইতে গুছাইতে প্রতিমা বলিল 'তোমাকে বুঝি এর আগে শৈলেশের কথা বলিনি? শৈলেশ উর্ম্মির বাল্য বন্ধু বললেও হয়—দুজনে এককালে খুব ভাব ছিল। তখন ওরা দুজনেই ছোট, তার কথা ও প্রায়ই ভাবে। তার প্রভাব ওর জীবনের উপর খুবই বিস্তার করেছে। তাই ও চা খায় না, বিলাতী জিনিষ ছোঁয় না। শৈলেশ লোকটা খুব বিদ্বান ও দেশপ্রেমিক হলেও কেমন একটু খাম্‌খেয়ালী। দুবিষয় এম এ তে ফার্ষ্ট, দ্বিতীয় বার এম এ পাশ করবার পর যখন কি একটা বিষয় নিয়ে থিসিস লিখছিল সেই সময় তার মামা কোথাকার এক সরকারী কলেজের প্রফেসারী' তার জন্যে ঠিক কর্ল্লে, কিন্তু তার দৃঢ় প্রতিজ্ঞা গভর্ণমেন্টের গোলামী সে কখনই করবে না, তাই নিয়ে মামার সঙ্গে মনোমালিন্য করে মামার অগাধ সম্পত্তি ও সকল সম্পর্ক ত্যাগ করে কোথায় গিয়ে খবরের কাগজ বার কর্ল্লে।"

অশোক দাঁত দিয়া পাইপটীকে চাপিয়া ধরিয়া কহিল "how strange!" প্রতিমা দেবী বলিতে লাগিল 'শৈলেশের মামা ছিলেন বাবার বন্ধু, শৈলেশের মামার অন্য কেহ ছিল না শৈলেশ ছিল তার সকল সম্পত্তির একমাত্র ভাবী উত্তরাধিকারী। সেই জন্যই বাবা মনে মনে শৈলেশকেই উর্ম্মিলার যোগ্য পাত্র বলে ঠিক করেছিলেন। শৈলেশের আমাদের বাড়ীতে অবাধগতি ছিল। সেই সময় উর্ম্মিলা ও শৈলেশে খুব ভাব হয়, কিন্তু মামার সঙ্গে মনোমালিন্য ও সকল সম্পর্ক রহিত হবার পর বাবা তাকে আমাদের বাড়ী আসা বন্ধ করে দেন। তারপর অনেকদিন আর তার দেখা নেই—কোন খবরও তার পাইনি, গেল বছরে বাবা মরে যাবার পর উর্ম্মিলার যখন টাইফয়েড হয় তখন একদিন হঠাৎ ঝড়ের মত এসে হাজির—বল্লে, উর্ম্মির টাইফয়েড শুনে লাহোর থেকে ছুটে এসেছে শুধু উর্ম্মিলাকে চক্ষে দেখতে চায়, তারপর দুদিন থেকে উর্ম্মিলাকে একটু ভাল দেখেই আবার চলে গেল, যাবার সময় অনেক জিজ্ঞাসা করে জানা গেল যে সে লাহোর ট্রিবিউন কাগজে সাব-এডিটারি করছে—মাইনে দুশ টাকার কিছু বেশী পায়, ব্যাস্ তারপর আর কোন খোঁজ নেই তার এই পুরো এক বছর। মনে হয় উর্ম্মিলাকে সে প্রাণ দিয়ে ভালবাসে, উর্ম্মিলাও যে তাকে কম ভাল বাসে না তা নয়, তবে ও খুব ভাব-সংযমী খুব চাপা শৈলেশের উপহার দেওয়া বইগুলোও কি যত্নেই না রাখে। ওর কাছে সেগুলো যেন এক একটা কহিনুর।" প্রতিমা চুপ করিল। অশোক কেশ হইতে একটা সিগার বাহির করিয়া টেবিলের উপর ঠুকিতে ঠুকিতে বলিল 'শৈলেশের কথা শুনলুম। তুমি বল্‌ছিলে অসীমের সঙ্গেও ওর খুব ভাব হয়—'প্রতিমা কহিল, "হাঁ উর্ম্মিলা তার গানের একজন বড় ভক্ত। লোকটীর সব গুণ আছে। এদিকে মুনসেফ্ আবার গানের গলাও খুব চমৎকার পিয়ানোও খুব ভাল বাজায়; বাবার সঙ্গে সেবার পুরী গিয়ে ওর সঙ্গে আমার আলাপ হয়, উর্ম্মির গানের ঝোঁক চিরকাল বেশী তাই ওদের দুজনে খুব অল্প সময়ের মধ্যে ভাব হয়, বাবা শেষে এই পাত্রই মনোনীত করেন কিন্তু তুমি তো জান কিরূপ হঠাৎ তিনি পরলোকে চলে যান, সেই থেকে সব কথা চাপা পড়ে আছে, উর্ম্মিলা বেচারী বড় দোটানায় পড়েছে"। অশোক কহিল 'তাইত কঠিন সমস্যা। এ দুজনের কাকে পেলে ওযে বেশী সুখী হবে আর কে যে ওকে বেশী ভালবাসে তা উর্ম্মিলাও জানে না। সত্যই ও দোটানায় পড়েছে। যাকে বলে parallelogram of forces'। প্রতিমা মৃদু হাস্য করিয়া বলিল—'মীমাংসা কর দেখি কি রকম ব্যারিষ্টার সাহেব বোঝা যাবে'। অশোক উচ্চ হাস্য করিয়া কহিল 'হাজার গিনি ফি দিতে হবে।" কটাক্ষ করিয়া প্রতিমা বলিল 'তোমাদের না ফি নিতে নেই'। অশোক একটী সিগার ধরাইয়া বলিল 'থাক্ এক্ষেত্রে ফি নোবো না শুধু তোমার শ্রীহস্তের এক কাপ ভাল রকম চা পেলেই' বাধা দিয়া প্রতিমা কহিল, 'ভাল রকম চা মানে খুব বেশী চিনি দিয়ে' অশোক হাস্য করিয়া কহিল "চিনি! তুমি যদি নিজের হাতে কর ত তাতে চিনি মোটেই দিতে হবে না, সেদিন সেই novelটাতে পড়েছিলুম না when lovely Susi sits by my side, I want no sugar in my tea"

হাঃ হাঃ! অশোক হাস্য করিতে লাগিল। প্রতিমা কহিল 'চা দেবো কিন্তু সে বিষয় কি করবে?" হাস্য থামাইয়া অশোক কহিল 'আচ্ছা অসীম বা শৈলেশ কতদিন তোমাদের খবর পায়নি?" প্রতিমা উত্তর দিল 'তুমি land করবার পর অর্থাৎ দুই তিন মাস মধ্যে তারা কেউ কোন খবর পায় নি অন্ততঃ আমাদের দিক থেকে' অশোক কিছুক্ষণ নীরব থাকিয়া কহিল 'আচ্ছা ব্যবস্থা হবে।'

* * * *

তিন

সত্যব্রত রায়, স্বীয় চেষ্টায় ও পরিশ্রমে অতি সামান্য অবস্থা হইতে বিশেষ ধনী হইয়া উঠিয়াছিলেন, অশ্বিনী কুমার মজুমদার ও তিনি একত্রে বিগত মহাযুদ্ধের কালে কাট চালানের ব্যবসায় অতি অল্পকালের মধ্যেই প্রভূত অর্থ সঞ্চয় করেন। এই ব্যবসায় বহুপূর্ব্ব হইতেই অশ্বিনী বাবুর সহিত সত্যব্রত বাবুর বিশেষ বন্ধুত্ব ছিল। শৈলেশ এই অশ্বিনী বাবুর ভাগিনেয়। সত্যব্রত বাবুর পুত্র ছিল না। প্রতিমা ও উর্ম্মিলা তাহার দুই কন্যা, তিনি কন্যাদ্বয়কে বিশেষরূপে শিক্ষা দিতেন। অশোক সত্যব্রতবাবুর এক দরিদ্র বন্ধুর পুত্র, তিনি বন্ধু-পুত্র অশোকের সহিত স্বীয় কন্যা প্রতিমার বিবাহ দিয়া তাহাকে বিলাতে ব্যারিষ্টার

হইবার জন্য পাঠান। সত্যব্রতবাবু প্রথমা কন্যার বিবাহের পর দ্বিতীয় কন্যা উর্ম্মিলার জন্য বহুদিন যাবৎ মনে মনে শৈলেশকেই পাত্র ঠিক করিয়া রাখিয়াছিলেন, কিন্তু মাতুলের সহিত শৈলেশের সম্পর্ক রহিত হইবার পর সে সঙ্কল্প ত্যাগ করিয়া পুরীতে পরিচিত মুনসেফ অসীম চৌধুরী নামক একটি যুবকের সহিত সে বিষয় কথাবার্ত্তা কহিতে কহিতে নব বিলাত প্রত্যাগত জামাতা অশোকের উপর সাংসারিক যাবতীয় ভার অর্পণ করিয়া অকস্মাৎ ওপারে তাহাকে চলিয়া যাইতে হইয়াছিল। অসুস্থতার জন্য অশোক এখনও প্রাক্‌টিস আরম্ভ করে নাই এবং সেই জন্যই স্ত্রী প্রতিমা ও প্রতিমার ভগ্নী উর্ম্মিলাকে লইয়া দার্জ্জিলিং আসিয়াছে। উর্ম্মিলা মার্টিনেয়ার হইতে এবার সিনিয়ার কেম্ব্রিজ পরীক্ষা দিয়াছে।

*　　*　　*　　*

পরদিন অশোক কুমার দুইখানি পত্র লিখিল, পত্র দুটির ভাব ও ভাষা একই।

মাননীয় মহাশয়—

আপনি বোধ হয় আমাকে চিনিতে পারিবেন না আমি স্বর্গীয় সত্যব্রত রায়ের প্রথম জামাতা, অদ্য আমার স্ত্রী প্রতিমা দেবীর বিশেষ ইচ্ছায় আপনাকে এই পত্র দিতেছি। আমার শ্বশুর মহাশয়ের জীবিতকালে উর্ম্মিলার সহিত আপনার বিশেষ ভাব হয় শুনিয়াছি—আপনাদের উভয়ের মধ্যে বিশেষ প্রীতির সঞ্চার হইয়াছিল। সেই হেতু আজ আপনাকে একটী অনুরোধ করিতে সাহসী হইলাম। গত মাসে উর্ম্মিলা ভীষণ বসন্তরোগে আক্রান্ত হয়, আমরা তাহার আশা এক প্রকার ছাড়িয়া দিয়াছিলাম, বহু ভাগ্যক্রমে বহু অর্থব্যয়ে, সুচিকিৎসায় ও শুশ্রূষায় তাহার প্রাণ অতিকষ্টে ফিরাইয়া পাওয়া গিয়াছে কিন্তু ঐ দুষ্ট রোগে তাহার সকল রূপ সৌন্দর্য্য চিরদিনের মত নষ্ট হইয়া গিয়াছে। এক্ষেত্রে উর্ম্মিলার অন্য কোন উপযুক্ত পাত্রে বিবাহ দেওয়া একেবারে অসম্ভব। অপর কোন সুপাত্র উহাকে স্ত্রী করিতে স্বীকৃত হইবে না। তবে আপনার কথা অন্য, যেহেতু আপনি উর্ম্মিলাকে ভালবাসিয়াছেন। শুনিয়াছি প্রেমিকের চক্ষে রূপ সৌন্দর্য্য কিছুই নহে যেহেতু তাহারা চখের নেশা দিয়া ভালবাসে না—তাহাদের প্রেম অন্তর লইয়াই কারবার করিয়া থাকে, যাহা হউক আমরা উর্ম্মিলার বিবাহের কথাবার্ত্তা এই মাসেই স্থির করিতে ইচ্ছা করি, আপনার মতামত সত্বর জানাইলে বাধিত হইব। আপনার পত্রের অপেক্ষায় আমরা সকলেই বিশেষ আগ্রহান্বিত চিত্তে রহিলাম, আপনি বিবেচক ও প্রেমিক। আপনার নিকট হইতে আনন্দজনক উত্তর পাইব ইহা আশা করি। ত্রুটি মার্জ্জনা করিবেন। ইতি—

শুক্রবার　　　　বশংবদ
দি টাওয়ার　　　　শ্রীঅশোক সেন
মাউণ্ট প্লেসেণ্ট রোড

পত্র দুটি লেখা হইলে অশোক প্রতিমাকে দেখাইল। প্রতিমা উহা পড়িয়া বলিল এতও মিথ্যে কথা বানাতে জান, কোথায় বসন্ত রোগ আর কোথায় রূপ সৌন্দর্য্য আরও কত কি! তুমি shine করবে শীগগিরই। বল্‌তে নেই উর্ম্মিলার সেই বড় অসুখটার পর হোটেলে থাক্‌লেও এই এক বছরে কোন দিনের জন্যও জ্বর হয় নি আর দেখতেও কেমন নিখুঁত সুন্দরী হয়েছে। যাক্ এতে আসল প্রেমিক কে ধরা যাবে।

সিগার টানিতে টানিতে অশোক বলিল 'The idea'!

চিঠি দুটিখানা খামে আঁটিয়া প্রথম খানিতে অশোক কুমার ঠিকানা লিখিল।

Mr Sailaish Sen Gupta M. A.
Sub-Editor The Tribune
Third Road
Lahore
The Punjab.

অন্য খানির বহির্ভাগে লিখিল—

Mr. Asim Chowhury, Munsiff
P 302/3 Lake Road
Ballygaunge
Calcutta.

পত্রদুটি পাঠাইবার এক সপ্তাহ মধ্যেই উভয় পত্রের উত্তর আসিল। অশোক কলিকাতা হইতে আগত পত্রটি প্রথমে খুলিয়া পড়িতে লাগিল:—

মহাশয়,

আপনার পত্র পাইয়া মর্ম্মাহত হইলাম। সামান্য কয়দিনের আলাপে কুমারী উর্ম্মিলা দেবীকে যে কিরূপে

ভালবাসিয়া ছিলাম তাহা বর্ণনা করিবার ভাষা আমার জানা নাই, সেই সময় হইতেই উর্ম্মিলাকে পাইবার জন্ত আমার প্রাণ মন বিশেষ আগ্রহান্বিত কিন্তু এ বিবাহে আমার কনিষ্ঠা ভগ্নীর আপত্তি আছে। জগতে এই ভগ্নীটি ব্যতীত, আর আমার কেহ নাই, অতএব তাহার একান্ত অনিচ্ছায় নিজের প্রবল ইচ্ছা থাকা সত্বেও এস্থলে মত দিতে পারিলাম না। আশা করি আপনারা সকলেই আমাকে ক্ষমা করিবেন। একটু বিশেষ চেষ্টা করিলে ও অধিক অর্থের লোভ দেখাইলে উর্ম্মিলার জন্য আপনারা সুপাত্র পাইবেন।

ইতি

আপনাদের চিরবন্ধু অসীম চৌধুরী

অশোক প্রথম পত্রটি পাঠ সমাপ্ত করিয়া মনে মনে হাস্য করিতে করিতে একটি সিগার মুখে দিয়া লাহোর হইতে আগত পত্রটি খুলিল,

পূজনীয় অশোক বাবু,

সবই জ্ঞাত হইলাম, তথাপি উর্ম্মিলাকে পাইলে আমার এ জীবন সার্থক বলিয়া জ্ঞান করিব। আপনারা আমার মত নিস্বব্যক্তির জন্তে তাঁহাকে দিবেন কিনা জানিনা, যাহা হউক আপনাদের নিকট হইতে দ্বিতীয় পত্রের আশায় বিশেষ আগ্রহান্বিত রহিলাম। অনুগ্রহ পূর্ব্বক শীঘ্র উত্তর দিবেন। ইতি— আপনাদের

শ্রীশৈলেশ চন্দ্র সেন গুপ্ত

সম্পূর্ণ

শ্রীজ্যোতির্ম্ময়ী দেবী

'তোমারে বাসিনু ভালো' এইটুকু এতটুকু শুধু
পূর্ণ করে ছিল প্রাণ মর্ম্ম মাঝে সঞ্চারিয়া মধু—
আলোকে আঁকিল হাসি ; অন্ধকারে অপূর্ব্ব বিরাম
দিনেরে স্বজিল লিপি নব নব পরিচ্ছেদ নাম।
ঋতুর নূপুর হ'তে ঝরে পড়া কুসুমে পল্লবে,
মধুর মৃদঙ্গ রবে, মর্ম্মর গুঞ্জিত কলরবে,
শুনায়ে সঙ্গীতে সুরে, সম্ভাষণ কথা কত বার,
ত্রিভুবন ভরি মোরে অপরূপ পরিচয় তার।
কখন বারতা এলো হয়ে গেছে সারা সে সঞ্চয়
এবারে ফিরিতে হবে, এবারে নূতন পরিচয় ;
কোটী গ্রহ নক্ষত্রের আঁকা বাঁকা আলো-ছায়া পথ,
নন্দাতিথি হারায়েছে ; রিক্ত যাত্রা এবারের কত,—
সে দিবস সাঙ্গ হ'ল, এবারে নূতন অহরহে,—
স্বপনে চিনিতে হবে, মূক স্তব্ধ একান্ত বিরহে ;
মৃত্যুতে চিনিতে হবে, বিচ্ছেদে বাসিতে হবে ভালো
অজানা সীমান্ত চাহি পথপ্রান্তে জ্বালি সন্ধ্যা আলো।

নামহীন এদিনের ঋতু পত্রে আজ লিখে রাখি,
সেদিনের ভালবাসা এদিনের বিরহেতে আঁকি ;—
—মধুর বিন্দুর চেনা, নাম নাই সীমা নাই যার—
'নন্দা' রিক্তা পূর্ণ যাত্রা অপরূপ সম্পূর্ণ আমার।

উপন্যাস

পূর্ব্ব প্রকাশিতের পর

(৫)

প্রভাতের চিঠিটা পড়তে খুব বেশী সময় লাগেনি। কিন্তু পড়ে প্রকৃতিস্থ হতে তার একটু সময় লাগ্‌ল। মাথার ওপরে পাখাটা খোলা থাকা সত্বেও তার চোখ মুখ দিয়ে অসম্ভব গরম বের হয়ে, সমস্ত মুখখানাকে সিন্দুঁর করে তুলেছিল।

খোলা চিঠিখানা সামনের টেবিলের ওপর রেখে দিয়ে সে কাছাকাছি একটা সোফায় বসে পড়ল। ভাবতে লাগ্‌ল, কোথা থেকে কিসের সংঘটন! সে তো বিয়ের কোন কথা এখনও মনেও আনতে পারেনি। তার ওপর পিতার কথায় তাঁর স্বাচ্ছন্দ্যের জন্যে যদি বিয়ে করতেই হয় তো সে কি এই মীনার মত মেয়ে! যে শুধু বোর্ডিংএ থেকে পড়াশুনো ও আদব কায়দাই শিখেছে! এ কি তার বাবাকে তাঁর আকাঙ্ক্ষিত তৃপ্তি বা শান্তি দিতে পারবে? একি তার মাতৃহীন ছোট ছোট ভাই কটাকে 'ভাই' বলে টেনে নিতে পারবে? উদ্যানলতা কি বনলতা হতে পারে? একে ফুলদানীতে সাজিয়ে রাখা চলে, শিউলী, অতসী কুন্দর মত একে যেখানে সেখানে রাখা চলে না—ভাবনা তো অনেক। মনে মনে হেসে বল্‌লে "ছিলাম কল্‌কাতায়, মার্চ্চেন্ট আপিসের বড়বাবু, দশটা, চারটা আফিস করি। চার দিনের ছুটি পেয়ে আর ৮ দিন আদায় করে বেড়াতে এলাম এখানে। দামোদরের উৎপত্তি দেখ্‌ব বলে। 'রাজরূপায়' গেলাম, ফিরতে পথে মোটর ভেঙে কি দুর্ভোগেই পড়েছি! অতিথি হয়ে এদের বাড়ী এসে, অতিথির সৎকার তো যতদূর হবার হলো, বিদায়কালে দক্ষিণারও দেখ্‌ছি ভাল রকম ব্যবস্থা হচ্ছে—একেবারে কন্যাদান! এ যে রীতিমত আরোব্যপন্যাস!

প্রভাত যখন এই রকম ভাবনায় ভোর, বন্ধ দরজা ঠেলে রমাপতিবাবু ঘরে ঢুকে পেছনে দরজটা বন্ধ করে এসে প্রভাতের সামনে একটা চেয়ার সরিয়ে বস্‌লেন। তাঁর এসে বসায় এবং পরের কথাগুলি কি হবে তাই ভেবে সে নিজেকে প্রস্তুত করছিল। চেয়ারে বসে বিনা ভূমিকাতে তিনি বল্‌লেন "তোমার বাবার চিঠিখানা কি পড়েছ প্রভাত?""

মাথা নীচু করে সে বললে 'হাঁ'।

"তোমার কি মতামত এ সম্বন্ধে? আমার মেয়েকে তো দেখ্‌লেই—পড়াশুনা সে আই,এ পর্য্যন্ত করেছে। আর আচার-ব্যবহার—তা সে কথা তো ঘরে না নিলে বুঝ্‌তে পারবে না বাবা। ওর মন যে কত কোমল ও কত দৃঢ় তা একমাত্র আমিই জানি—আর জানি বলেই আমার সঙ্গে ওর যত বনে, এত ওর মায়ের সঙ্গেও বনে না। আর তুমিও তো ক'দিন ধরে ওকে দেখ্‌ছ বাবা" প্রভাতের হাসি এল। ভাব্‌লে, বলে যে 'কতটুকু আর কিই বা আমি দেখেছি?' কিন্তু কিছু না বলে চুপ করেই রইলো। তার কাছে কোনো সম্মতির কথা না পেয়ে রমাপতিবাবু হঠাৎ যেন কি আবিষ্কার করলেন, এইভাবে বললেন "তবে হ্যাঁ, তুমি যদি আর কোথাও বিবাহ করতে ইচ্ছা করে থাক বা বাগদত্ত হয়ে থাক, তবে আমি তোমাকে প্রতিজ্ঞা ভঙ্গ করে মনস্তাপ পেতে দেবো না। আমাকে তুমি, তোমার বিশেষ হিতাকাঙ্ক্ষী বলেই জেনো।" তাঁর কথার সুরে বিচলিত হয়ে প্রভাত বললে "না, না, ওসব কোনো কথা নয়। আসলে আমি বিয়ে সম্বন্ধে এতদিন কিছুই ভাবিনি—হঠাৎ সেটা অপ্রত্যাশিত রকমে আসন্ন হয়ে পড়ায় একটু দ্বিধাগ্রস্ত হয়েছি মাত্র। আর কিছুই নয়।"

হো হো করে হেসে রমাপতিবাবু বল্লেন "এইতো বাবা বুদ্ধিমান হয়ে বোকার মত কথাটা বল্লে! পাগল ছেলে! বড় হয়েছ, পয়সাকড়ি ঘরে আন্‌ছ—আর বিয়ে করবার কথাটা মনে করনি তাই কখনো হয়? আমার মেয়ে কে বিয়ে

করবে তা না হয় ভাবোনি—কিন্তু কারো না কারো মেয়ে কে বিয়ে করে তোমাকে সংসারী হতে হবে, তা ভাবা তো উচিত ছিল।

প্রভাত নতমুখে বসে রইলো।

রমাপতিবাবু বলেই যেতে লাগলেন—"তারপর তোমার বাবার যখন এতে বিশেষ সম্মতি আছে, উপযুক্ত ছেলে তুমি, তোমার কি তাঁর ইচ্ছামত কাজ করা উচিত নয়? বিশ্বাস করো আমি কথা দিচ্ছি, আমার মেয়ে তোমাকে কখনো দুঃখু দেবে না। কি বল বাবা, তোমার মত আমাকে জানতে দাও"—বলে তিনি প্রভাতে হাতদুখানি চেপে ধরলেন।

প্রভাত একটু বিব্রত হয়েই বললে 'বাবার ইচ্ছায় ইচ্ছা—তিনি দুঃখু পাবেন বলে এ পর্য্যন্ত তাঁর অমতে কোনো কাজই করিনি। কিন্তু মতটা যে একলা আমার হলেই হ'বে না—আপনার মেয়েরও মতটা জানা দরকার। তিনি উচ্চ শিক্ষিতা, স্বাধীনভাবে মতামত প্রকাশ করবার ইচ্ছা বা অধিকার তাঁকে আপনার দেওয়া উচিত। এতো নিরক্ষরা পল্লীবালিকা নয় যে যাকে ধরে আপনারা বিয়ে দেবেন, তাকেই সে খুসীমনে মানিয়ে নেবে!"

রমাপতিবাবু প্রভাতের সম্মতি পেয়ে এবারে জোর গলায় হেসে উঠলেন। বল্লেন, 'মেয়েকে উচ্চ শিক্ষাই দিই আর যাই করি, হিন্দু নামটা তো আর মুছে ফেলতে পারছিনে!—তাই বাইরে যতই অহিন্দুয়ানী করি ভেতরটা আমার ঠিক আছে। ছেলেমেয়ের বিয়েথাওয়া সবই আমার মতে থাকে। একি সাহেব বাড়ী, যে বিয়ের আগে 'কোর্টশিপ' চাই, 'প্রোপোজ' চাই তারপরে 'এনগেজড্' হয়ে তখন মা বাবা জানতে পারবেন"—না, না তুমি ওসব কিছুই মনে কর না। তোমাকে স্বামী পেয়েও যদি মনে সুখী না হতে পারে তবে বুঝবে সেটা তার কপালের দোষ। তার অদৃষ্টে সুখ ভোগ নাই তাহলে। লোক চেনার ক্ষমতা আমার আছে। তাইতে প্রথম তোমাকে দেখেই আমার মাথায় যে প্ল্যানটা এসেছিল তা প্রায় শেষ করে এনেছি। কুলি মজুর খাটাই বলে বুদ্ধিটাও আমার তাদের মত মোটা নয়, বুঝলে?" বলে তিনি আবার তাঁর সেই সরল হাসি হাসলেন।—

প্রভাত ধীরে ধীরে বললে "আপনাদের সকলের মতে আমি যদি একান্ত সুপাত্র হয়ে থাকি তবে আমার নিজের আর কোন আপত্তি নাই।"

চেয়ার থেকে উঠে দাঁড়িয়ে রমাপতি বাবু বল্লেন "বড় নিশ্চিন্ত করলে আমায়। যাই এখনও কাউকে জানানো হয়নি। সবাইকে সুখবরটা জানাইগে। প্রভাত তুমিও এস।"

"যাচ্ছি একটু পরে।" রমাপতি বাবু তাড়াতাড়ি ঘর থেকে চলে গেলেন।

প্রভাত তাঁর পরিত্যক্ত চেয়ারখানায় বসে পড়ে ভাবতে লাগল, তার অদৃষ্ট তাকে কোন্ পথে নিয়ে যাচ্ছে। বিয়ের কথায় বিশেষ আপত্তি তো সে করল্‌না, কেন? পাত্রী মীনা বলে? না, তাই বা কেন? মীনাকে সে ক' মুহূর্ত্তই বা দেখেছে? তার কতটুকু কথাই বা সে জানে? তবে, বলা নেই, কওয়া নেই, হঠাৎ বিয়ে করতে রাজী হওয়ার কি কারণ? পিতৃভক্তি না নিজের দুর্ব্বলতা? সে যাই হোক; ভাগ্যে বিষ বা অমৃত যাই থাক নীলকণ্ঠের মত তা পান করতেই হবে।

প্রভাতের এই ভাবনায় বাধা দিয়ে, শুভ্রাংশু স্বয়ং এসে উপস্থিত হলেন। একলা তাকে বসে থাকতে দেখে বল্লেন "একি আপনি যে এখানে একলা! অথচ আপনাকে কেন্দ্র করেই আজকের নিমন্ত্রণটা হয়েছে! স্বরটা কিছু স্নেহের বলেই প্রভাতের মনে হল। সঙ্গে সঙ্গে মনে পড়্‌ল যে মাত্র কিছুক্ষণ আগেই সে এবাড়ীর বিশেষ আত্মীয় হবে বলে প্রতিশ্রুত হয়েছে, আর শুভ্রাংশু নিশ্চয়ই সেই আত্মীয়তার দাবী করতে এসেছেন। পুরুষ হলেও নতুন বিয়ের কথাটা মনে করতেই তার সারা দেহ মনে একটা শিহরণ চলে গেল। শুভ্রাংশু তার এই বিমূঢ় ভাব লক্ষ্য করে বল্‌লেন "চলুন, চলুন, বাবা ডাকছেন আপনাকে কার সঙ্গে যেন আলাপ করিয়ে দেবেন।"

এ আহ্বানের সুস্পষ্ট ইঙ্গিত বুঝ্‌তে প্রভাতের একটুও দেরী হল না। ভবিষ্যতের ভাবনা ঝেড়ে ফেলে সে এখন বর্ত্তমানকেই নিতে চল্‌ল।

শুভ্রাংশুর সঙ্গে প্রভাতের ঘরে ঢোকা মীনার চোখ এড়াল না। তার গান তখন চলছে—

একলা চলা পথটী আমার করব রমণীয়
মাঝে মাঝে প্রাণে তোমার পরশ খানি দিও

অনেক দূরে সকলের আড়ালে, নিজেকে লুকিয়ে প্রভাত বসে পড়ল। গানের লাইন ছটী তার মনে যেন গভীর দাগ দিয়ে যাচ্ছিল। এ গান তো সে আগে আরো কতবারই যে পড়েছে, কিন্তু তার ভিতরের রূপটা তো এমন করে তখন ধরা পড়েনি। নিজের মনের ভাবান্তর হয়েছে বলে কি গানের কথাগুলি ধরা দিচ্ছে? হবেও বা। মীনা গেয়েই চল্‌ল—

হৃদয় আমার চায় যে দিতে কেবল নিতে নয়
বয়ে বয়ে বেড়ায় সে, তার যা কিছু সঞ্চয়।
হাতখানি ওই বাড়িয়ে আনো, দাও গো আমার হাতে।
ধরবো তারে, ভর্‌বো তারে, রাখবো আমার সাথে।
একলা পথের চলা, আমার কর্‌ব রমণীয়। '
মাঝে মাঝে প্রাণে তোমার পরশ খানি দিও।

প্রভাত ছুই কাণ ভরে শুনেই যেতে লাগল। গান শেষ হলে মীনা বাজনাটা ছেড়ে উঠে দাঁড়াল। রমাপতি-বাবু প্রভাতের হাত ধরে সামনে এনে বল্লেন "এই প্রভাত আমার সতীর্থ ও বাল্যবন্ধুর ছেলে। এম, এ পাশ করে মার্চেন্ট আফিসে বেরোচ্চেন—শীগ্‌গীরই চাকরীটা পাকা হয়ে যাবে। এঁরই সঙ্গে আমি মীনার বিয়ের ঠিক করেছি। পাত্রের রূপ তো আপনারা দেখছেন, গুণও শুন্‌লেন। আশীর্ব্বাদ করুন যেন মীনা কোনও দিন অসুখী না হয় বা এঁদের অসুখের কারণ না হয়। হঠাৎ বিয়ের কথা শোনায় সবাই প্রথমে একটু আশ্চর্য্য হয়ে গেলেন; তার পর দেখ্‌লেন 'ভোলানাথ' রমাপতি বাবু বেশ সস্তায় ও অনায়াসে একটী সুপাত্র বের করেছেন। মনে যাঁর যাই থাক্‌—বাইরে কিন্তু আশীর্ব্বাদ ছাড়া, করবার তাঁদের আর কিছু রইল না।

এই কথা শোনার পরে মীনার সেখান থেকে চলে যাওয়া বা থাকা ছুইই সমান অসুবিধা বলে মনে হচ্ছিল; কিন্তু যায়ই বা কি করে? এখন যে ঘরের সব লোকগুলিরই চোখ তার উপরেই আছে, এই সামান্য কথাটা সে চোখ না তুলেই বুঝ্‌তে পারছিল। প্রভাতের অবস্থা আরও শোচনীয়। তার কেবলই মনে হচ্ছিল, সে যেন মীনার কাছে, ছোট হয়ে যাচ্ছে। কিন্তু উপায় কি? এই সঙ্কট থেকে তাদের মুক্তি দিলেন রমাপতি বাবু। এক হাতে প্রভাতের হাত অন্য হাতে মীনার হাত নিয়ে তিনি বল্‌লেন, "মীনা, আমি তোমার পিতা ও প্রভাতের পিতৃ-স্থানীয়। আশীর্ব্বাদ করি, ভগবান তোমাদের মিলিত করে সুখে ও শান্তিতে রাখুন। দুঃখ, দারিদ্র্য, অভাব, অনটন কিছুই যেন তোমাদের আত্মাকে মলিন না করে।" মীনা ধীরে ধীরে তার বাবার হাত ছাড়িয়ে মাথাটা নীচু করে ঘর থেকে বেরিয়ে গেল। প্রভাতের অজ্ঞাতে তার চোখ ছটী মীনার গমন পথে চেয়ে দেখলো। হঠাৎ অনেক দিনের পুরোণো কথা একটা তার মনে এল "সঞ্চারিণী পল্লবিনী লতেব" কথাটা কবিরা ঠিকই বলেছেন।

৬

বিয়ের কথা পাকাপাকি হবার পরে প্রভাত সেখানে আর কিছুতেই থাক্‌তে চাইল না। রাত্রেই যদি যাওয়ার সময় থাকতো, তবে সে চলেই যেত। কিন্তু ট্রেণের সময় না থাকায় বাধ্য হয়ে সে-রাত্‌ অপেক্ষা কর্‌তেই হল. একে তো নিজের লজ্জাকর অবস্থার জন্য সে বিশেষ অস্বস্তি ভোগ কর্‌ছিল, তার ওপর সকলের সসম্ভ্রম 'জামাই বাবু' সম্বোধন তাকে আরো লজ্জিত করে তুল্‌ছিল।

যে ঘরটায় সে থাক্‌ত সেটা বাইরের বাগানের গা ঘেঁষেই ছিল। ছদিন আগে কোজাগর পূর্ণিমা হয়ে গিয়েছে। শরতের ধব্‌ধবে্‌ জ্যোৎস্নায় সারা আকাশ ভেসে যাচ্ছে। তারই ছায়া পৃথিবীর, মাটী, গাছপালা, ফল-ফুল, বাড়ী-ঘরের ওপরে পড়ে তাকে যেন মায়াপুরী করে তুলছিল। প্রভাত আজ আর ঘরে থাক্‌তে পার্‌ছিল না। সন্ধ্যার সমস্ত ঘটনা-গুলি, একে একে বায়স্কোপের ছবির মত তার মনের ভিতর ঘুরে চল্‌ছিল। কোথায় ছিল সে, আর কোথায় ছিল এই মীনা! কি সূত্র অবলম্বন করে যে বিশ্বশিল্পী এই ফুল ছটী গাথ্‌ছেন তিনিই জানেন।

ঘরের সব জানালা ক'টী খুলে দিয়ে, সে বেড়াতে আরম্ভ কর্‌ল, তার আর শেষ নাই। জানালার ফাঁক পেয়ে জ্যোৎস্না যেন হাসিমুখে, তার বিছানায়, ঘরের মেঝেতে লুটিয়ে পড়্‌ল। মনের পূর্ণতায় সে যেন অধীর হয়ে উঠ্‌ল—এত আবেগ তার মনে আর ধর্‌ছিল না। ঘুরে ঘুরে ক্লান্ত হয়ে আলনা থেকে সবুজ রংয়ের আলোয়ানটা গায়ে জড়িয়ে বাহিরে বাগানের জ্যোৎস্না সমুদ্রে সে ঝাঁপিয়ে পড়ল।

রমাপতিবাবু কনট্রাক্‌টারী করেন; পয়সার কোনো

অভাব নাই। বাগানখানি এমন করে সাজিয়েছেন যে, যে-কোন লোকেরই সেখানি দেখে লোভ হয়। হাজারিবাগের মত জায়গায় পাহাড় কেটে যেন নন্দন কানন তুলে এনে বসিয়েছেন। বাগানের মধ্যে যে পাথরের মূর্ত্তিগুলি ছিল, তার ওপরে জ্যোৎস্না পড়ে সে গুলোকে যেন আরও শাদা করেছে। অন্যমনস্ক হয়ে তারই একটার নীচে সে বসে পড়ে ফের গোড়া থেকে সন্ধ্যার ঘটনাগুলি মনে কর্‌তে চেষ্টা কর্‌লে। মীনা কি এসব জান্‌ত? জান্‌লে কি আর আস্‌তে পার্‌তো? কিংবা এদের সাহেবী কায়দায় হয়তো বাধে না। কিন্তু মেয়েটী যে কেমন তাতো একটুও বোঝা গেল না। সুন্দরী, তা তো দেখাই গিয়েছে—তার ওপর সযত্নে পরা হেলিওট্রোপ শাড়ী, মুক্তার মালা ও নীল মীনাকরা চুড়ি চুটীতে তার সৌন্দর্য্য যেন আরো ফুটে বেরোচ্ছিল। আচ্ছা, হেলিওট্রোপ না পরে যদি অন্য রংএর শাড়ী পর্‌ত, তা হলেও কি এ রকম সুন্দর দেখাত? দেখাত বোধহয়, যে সুন্দর তাকে সব জিনিষেই সুন্দর দেখায়। চোখের কোণের টানটী, ঠোঁটের বাঁকান ভাবটী, ঘাড়ের ওপর এলিয়ে পড়া এলো খোঁপা, তার ফাঁক দিয়ে আধ ফুটন্ত গোলাপের কলিটী, চাঁপার কলির মত লতানে আঙুলে এঁটে বসা আংটীটী, বাঁ হাতের ঘড়িটী সবই তার মনে এখন রং ধরিয়ে দিচ্ছিল। মুহূর্ত্তের দেখায় প্রভাত এতটাই দেখে ফেলেছিল। কাপড় পরার ভঙ্গি, পায়ের লাল ভেলভেটের উপর রূপালী কাজের শ্লিপার, কাণের, অশ্রু বিন্দুর মত টলটলে মুক্তা চুটী তার মনে মায়াজাল বিছিয়ে দিচ্ছিল। চারদিক নিস্তব্ধ, মাথার ওপরে আকাশে জ্যোৎস্না ঢলঢল, চারি পাশের যতদূর চোখ যায় সব সাদা ফোয়ারার জলে লক্ষ লক্ষ হীরার কুচি, প্রভাত ভাব্‌লে অতি সন্তর্পণে একবার অক্ষর চুটি বলে দেখি নিজের কানে কেমন শুন্‌তে লাগে! বলেই ধীরে ধীরে 'মীনা' 'মীনা' বল্‌তে চারিদিকে একবার দেখে নিলে কেউ শুনেছে কিনা। তারপর হেসে বল্‌লে "আমার আজ হল কি! পাগল হলাম নাকি?—"

বাগানে একটা 'সামার হাউসও' ছিল। তার ভিতরে চুখানি হেলান বেঞ্চি ফেলা ছিল। অন্য মনে সেই "সামার হাউসের" দিকে যেতে যেতে প্রভাত দেখলে যে একটা পাথরের মূর্ত্তি যেন বড়ই শাদা দেখাচ্ছিল। ভাল করে চোখ মুছে দেখ্‌লে যে, সেখানে মানুষের মত একটা কি ছায়া আলোতে মিশে সেই মূর্ত্তিটাকে আরো শাদা করে তুলেছে একবার দেখেই সে মুহূর্ত্তে পিছন ফির্‌লে। ভাব্‌লে বো হয় অন্তঃপুরের সীমানায় এসে পড়েছে। বাড়ীর মেয়েদে কারো বোধহয় জ্যোৎস্নায় এই অপরূপ মায়ালোকে, তার মত বেড়াতে সাধ হয়েছে। ছি! ছি! তার আজ হলে কি? মনের আবেগে সে সীমানার বাইরে চলে এসেচে যদি ওই নারী, কারণ তা ছাড়া আর কিছু হওয়া সম্ভব নয় তাকে দেখে থাকেন তো না জানি কি মনে কর্‌ছেন। আত্ম গ্লানিতে মন তার পূরে উঠ্‌ল।—

চু এক পা যেতে না যেতেই সে পিছন থেকে মৃদু অথ তীক্ষ্ণ আহ্বান শুন্‌লে। শোনার ভুল মনে করে এগিয়েই যেতে লাগল। আবার সেই আহ্বান "একটু শুনুন।"—এবারে আর ভুল নয় বুঝে সে ফিরে প্রশ্নকারিণী দিকে গেল। চাঁদের উপর তখন একটুকরো কালো মেঘ এসে তার জ্যোতিকে ঢেকে ফেল্‌ছিল। কাছে গিয়ে দাঁড়াতে সে শুন্‌লে; কে বল্‌ছে, "আপনার সঙ্গে কথা বলছি বলে আমাকে প্রগল্‌ভা ভাববেন না; খুব দায়ে পড়েই আমি এরকম করতে বাধ্য হয়েছি জান্‌বেন। আর কাউকে দিয়ে একাজ হতে পার্‌লে আমি আর নিজে এ লজ্জা ভোগ কর্‌তাম না।"

কথার স্বরে প্রভাত বুঝ্‌লে যে মীনাই এখানে আছে। যে মীনার চিন্তায় তার এতক্ষণ কাট্‌ছিল যে মীনাকে চুদিন পরেই একান্ত আপনার বলে মনে কর্‌তে পারবে সেই মীনাকে হঠাৎ এই নির্জ্জনে নিজের এত কাছাকাছি দেখে সে একটু আশ্চর্য্য হয়ে গেল। ভয়ও যে না হল তা নয়। বিয়ে তো হয়নি এখনও, মীনার কাছে এখনও সে পর মাত্র—এই নিশীথ নির্জ্জনে যদি কেউ তাদের দেখে?' কোনো কথা শোনার আগেই দোষের ভাগী হতে হবে। একবার সে ভাবলে চলে যাই। আবার ভাব্‌লে ভয়ই বা কি? চুদিন পরে যাকে বিয়ে কর্‌ব বলে প্রতিশ্রুত হয়েছি, তার সঙ্গে যদি নির্জ্জনে চুটো কথা বলি, তাতে দোষ এমন কি হবে? হিন্দু সমাজ ছাড়া, আর সব সমাজেই তো এই-ই নিয়ম। কেউ যদি কিছু ভাবে বা দেখে, দেখুক—মীনা কি বল্‌তে চায় আমাকে, সেটা আমার শোনা কর্ত্তব্য। মেঘের ছায়াটা চাঁদের ওপর

থেকে সরে গিয়ে চারিদিক আবার শাদা জ্যোৎস্নায় ভরে উঠ্‌ল। প্রভাত মীনার দুহাত তফাতে দাঁড়িয়ে বললে, "বলুন"। উত্তর শুনে মীনার হাসি এল। ভাবলে ঠিক্ আর্য্য প্রথামত আলাপ চল্‌বে নাকি ! হাসিটা সাম্‌লে নিয়ে সে বল্‌লে "বাবার কাছে, আমার সম্বন্ধে বোধহয় অনেক আজগুবী কথা শুনেছেন, কিন্তু আসলে আমি তা নই। আমার কথা বাবা বড় বেশী করেই বলেন ! আমি যা, তা আমি নিজেই আপনাকে জানিয়ে দিচ্ছি। আর বছরে ম্যাট্রিক পাশ করেছি, ছোটবেলা থেকে বোর্ডিংএ থেকে থেকে সাংসারিক বুদ্ধি বা কর্ম্ম-প্রবৃত্তি আমার মোটেই নেই। সকলের কাছে যত্ন পেয়ে পেয়ে অন্যকে যত্ন করাটা আমার আদৌ আসে না। এরকম সব গুণ থাকাতে কি আপনাদের সংসারে আমাকে চল্‌বে ? তারপরে আমি মনে করেছি, অন্ততঃ বি-এ পর্য্যন্ত পড়ে নামের পাশে একটা ডিগ্রী বসাব। কিন্তু বর্ত্তমানে যে অবস্থায় পড়েছি এবং ভবিষ্যতে যে অবস্থায় পড়ব, তাতে করে আমার কিছুই হবে না।"

"কিছুই হবেনা বল্‌ছেন কেন ? ভবিষ্যতে আপনি যেভাবে থাক্‌লে খুসী হবেন, আমরা আপনাকে সেইভাবে রাখার চেষ্টা করবো। কিন্তু এতো সামান্য কথা—এইটাই এত বড় বলে মনে কর্‌ছেন কেন ?—"

"না, এর পরেও আমার আরো কথা আছে। বিয়ে করাটাই জীবনের মুখ্য উদ্দেশ্য নয়—এ ছাড়াও করবার আরো ঢের কাজ আছে। আপনি শিক্ষিত ও কৃতী ; কিন্তু ভেবে দেখুন তো বিয়েটা কি সকলের পক্ষে দরকারী ? আপনার হয়তো দরকার, কিন্তু আমার চেয়েও সর্ব্বাংশে ভাল মেয়ে আপনি খোঁজ করলে ঢের পাবেন।"

গম্ভীর স্বরে প্রভাত বল্‌লে "তা হয়তো যেতে পারে। কিন্তু দেখুন, যে জিনিসটা আপনার বাবা ও আমার বাবা দুজনে মিলে ঠিক বলে মেনে নিয়েছেন, সেটার ভিতরে যে কিছু না কিছু সু ও শুভ আছেই এটা আমি অস্বীকার করতে পারছি না। যে বন্ধন মানুষ থেকে আরম্ভ করে সামান্য পশু, পাখী পর্য্যন্ত স্বীকার করে নিচ্ছে স্বেচ্ছায়, তাতে আপনার এত আপত্তি কেন ?"

"কারণ তো আপনাকে বলেইছি। দূর থেকে যে জিনিস ভালো দেখায় কাছে গেলে তখন আর তত ভাল দেখায় না।—"

"আচ্ছা, ধরুন, আপনার যা' কিছু অসুবিধা তা যদি দূর করে দেওয়া যায়, তা হলেও কি আপনার মত বদলাতে পারে না ?"

"হাঁ, পারে। কিন্তু কেনই বা আপনি এত করবেন ? চেষ্টা কর্‌লেই তো ভাল মেয়ে পেতে পারেন।—"

আকাশে কোথাও আর মেঘের ছায়া ছিল না। হেনার গন্ধ চারিদিকের বাতাসকে ভারী করে তুল্‌ছিল। প্রভাত দেখলে মীনা তখনও তার সেই সন্ধ্যার সাজ খোলে নি। কাণের মুক্তা দুটী ও গলার মালাটী চাঁদের আলোয় ঝলমল করে উঠ্‌ল। একবার মীনার দিকে দেখেই আত্মহারা হয়ে হঠাৎ সে বলে ফেল্‌লে "বারে বারে—তুমি আমাকে সরিয়ে দিও না মীনা। মন যাকে একাগ্র হয়ে পেতে চাইছে, মিথ্যা ছলনায় তাকে আর ঘুরিও না। তোমার বাবার যখন সম্মতি পেয়েছি, তখন পৃথিবীর আর কোনো বাধাই আমি মান্‌বো না। পাহাড় ধ্বসে যখন ঢল নামে তখন তার গতি রোধ করতে পারে, এমন কিছু পৃথিবীতে নেই—আপন গতি বেগে, পথে-বিপথে সে পথ করে চলে। আমার মনের যে সুপ্ত বৃত্তিকে তোমার বাবার সাহায্যে জাগিয়েছি, সে আর নিবৃত্তি হবেনা—সুবিধা পাই তো দেখিয়ে দেব। তোমাকে ফুলই দেব মীনা, কাঁটা দেবনা।"—

"কিন্তু কেন ?—কেন আপনি আমার জন্যে এত অসুবিধা ভোগ করবেন ?—"

"কেন করব ? কেনই বা করবনা ? বিজয়-যাত্রা করে বেরিয়ে ছিলাম, জয়শ্রী সঙ্গে নিয়ে ফিরব। এখানে আসা আমার সার্থক হলো। আমি সুখী হব—কিন্তু তুমি তো —"

একটু এগিয়ে এসে মীনা বল্‌লে "মাপ করবেন। আমি আপনাকে পরখ কর্‌ছিলাম। জানেন না কি যে, হিন্দু মেয়ের বিয়ের কোনো কথায় থাক্‌তে নেই—মা, বাবা ও অভিভাবকে যা করেন তাই শিরোধার্য্য !—দেখ্‌ছিলাম যে দায়ে পড়ে বিয়ে না অন্য কিছু !—কলেজেই পড়ি আর বোর্ডিং এই থাকি, বাবার আদেশেই আমার সব চেয়ে বড়।

আপনার ঘরেই আমার শেষ আশ্রয় তা ভাল করে জেনেই কথা বলতে এগিয়েছি—না হলে বল্‌তাম না।—"

"মীনা, এতক্ষণ তুমি ছলনা করছিলে?—কিন্তু দরকার ছিল কি?—"

"না, কিছুই না। শুধু একটা খেয়াল।" বলে উঠে দাঁড়িয়ে সে বাগানের পথ ধরল। সরে দাঁড়িয়ে তাকে পথ ছেড়ে দিয়ে প্রভাত বল্‌লে "একটা কথা; কালই আমি চলে যাচ্ছি। আবার ঠিক সেই সময়ে হাজির হব। গত কাল যা মনেও করতে সাহস করিনি, আজ তা ঘটে গেল, আগামী কাল এমন সময়ে আমি ট্রেনে যাচ্ছি। একটু কিছু চিহ্ন তোমার দেবে না মীনা, যাতে করে এই প্রতীক্ষার দিনগুলো আমার কেটে যায়!"

চল্‌তে চল্‌তে মীনা ফিরে দাঁড়াল। একটু কি ভাব্‌লে তারপর হাতের আঙুল থেকে মীনার অক্ষরে 'মীনা' লেখা আংটীটা খুলে হাতে ধরে বল্‌লে "এটা ছাড়া দেবার মত আমার আর কিছু নেই।—আর কিছু দিলে জানা-জানি হবে।"—

লোভীর মত প্রভাত তার সবুজ আলোয়ানের ভিতর থেকে হাত বের করে বল্‌লে "তুমি পরিয়ে দেও।—"

মীনা লজ্জায় ও সঙ্কোচে মাথা নীচু করে দাঁড়িয়ে রইলো। প্রভাত আবার বল্‌লে "আজকের রাতের স্মৃতি সুবর্ণাক্ষরে আমার মনে লেখা থাক্‌বে—দাও মীনা পরিয়ে তোমার দান, আমি মাথায় করে রাখবো।" প্রভাতের উঁচু করে তুলে ধরা আঙুলের মধ্যে—আংটীটা গলিয়ে দিয়েই মীনা পিছন ফিরল। প্রভাতের গায়ের রংএ আংটীর সোনার রং বুঝি মিশে গেল।

প্রভাত বল্‌লে "যে ক'দিন ঘুরে না আস্‌ছি—চিঠি লেখায় কি তোমার আপত্তি হবে?

"না, না, সে কি?—সে বড় বিশ্রী হবে।" বলেই মীনা একরকম ছুটে পালিয়ে গেল।—

প্রভাত ধীরে ধীরে তার এই ভাগ্য পরিবর্ত্তনের কথা ভাব্‌তে ভাব্‌তে ঘরে চলে গেল।—

বাগান পার হয়ে বারান্দায় উঠতেই সিঁড়ির মুখের দরজা খুলে মলিনা বের হয়ে এসে মীনাকে বল্‌লে "এস, এস, অভিসারিণী! বিয়ের-নামে-জলে-উঠুনী। ধরি-বিড়ে-ধরা-পড়ুনী!—তোমার জন্যে দরজা খুলে আমি হাঁ করে দাঁড়িয়ে আছি। দুঘণ্টা ধরে কথাই ফুরোয় না! কিসের এত কথা রে!—আমরা তো ফুল-শয্যার দিনেও এত কথা বলিনি তুই আজ যত বল্‌লি!—"—

"বড়দা বুঝি আজ শুতে আসেনি এখনও?—"—

"আস্‌বেন না কেন?—তাঁকে ঘুম পাড়িয়ে রেখে এসেছি। রাত কি কম হল?—তোমার কি সে হুঁস আছে? মীনু, বল্‌বিনে ভাই কি কথা বল্‌ছিলি?"—

সিঁড়ি দিয়ে উঠ্‌তে উঠ্‌তে মীনা হেসে বল্‌লে "কিছুই নয় ভাই বৌদি' তুই শুতে যা।—মানুষটাকে একটু যাচাই কর্‌ছিলাম।"—

মলিনা তার ঘরে চলে গেল। মীনা গুন্ গুন্ করে গাইতে গাইতে গেল

"হৃদয় আজি মোর কেমনে গেল খুলি
জগত আসি সেথা করিছে কোলাকুলি।"

৭

যতীশ্বর ছিল রমাপতি বাবুর স্বজাতি। গরীবের ঘরে জন্মালেও অনেক লোকের যেমন উঁচু দিকে নজর থেকে যায় যতীর ছিল ঠিক তাই। দেশ থেকে যখন যতীকে সঙ্গে করে তিনি হাজারিবাগে ফির্‌লেন, তখন সন্তুষ্ট হওয়ার চেয়ে অসন্তুষ্টই হয়েছিল সকলে বেশী। রমাপতি কিন্তু বাড়ীর সকল লোকের সঙ্গে বিদ্রোহ করেই—যেন এই অনাথ ছেলেটীর ওপর খুব মনোযোগ দিলেন। এই মন দেওয়াই হল সকল অনিষ্টের মূল। ফলে, তিনি যখন বাড়ী থাক্‌তেন যতীর আদরটা তখন সকলের কাছের বেশী হ'ত আর না থাকার সময়ে ঝি চাকরেও তাকে গ্রাহ্য কর্‌ত না।

যতীর নিজের, কিন্তু এসবে কোনও ক্ষতি হত না, ঝি-চাকরের তুচ্ছ-তাচ্ছিল্য সে গ্রাহ্যই করত না। কর্‌লেও এসব নিয়ে কোনো হাঙ্গামা করা তার আদৌ আস্‌ত না।—

রমাপতি বাবু নিজের সঙ্গে রেখে রেখে, যতীকে তাঁর কাজের অংশীদার করে তুললেন। বুদ্ধিমান্ যতীও নিজের ভাগ্য ফেরাবার একটা পথ এতদিনে যেন খুঁজে পেল। শতদলের কাছে প্রথম যেদিন তিনি বল্‌লেন যে মীনার সঙ্গে বিয়ে দেবার জন্যেই তিনি যতীকে এমন করে হাতে গড়ে মানুষ করেছেন; সেদিন শতদল অবাক্ হয়ে বল্‌লেন, "সেকি? কোথাকার কোন্ হাঘরের ছেলে নিজের বুদ্ধি ও ভাগ্যের জোরে একটু পায়ের ভর করে দাঁড়িয়েছে বলেই

সে কি মীনুর যোগ্য স্বামী হল? দিনরাত্ মিস্ত্রী খাটিয়ে খাটিয়ে বুদ্ধিও তোমার সেই রকম হয়েছে!"—

বাধা দিয়ে রমাপতি বল্‌লেন "আহা! বুদ্ধির দোষ আর আমাকে দিওনা। তা হলে এই হাজারিবাগের মত জায়গায় আর ঘরে ঘরে বিদ্যুতের আলো জ্বল্‌ত না। কেন, যতী, পাত্র হিসেবে মন্দ কি?—পুরুষের শ্রী হল বুদ্ধি, কর্ম্মপ্রবৃত্তি, সুস্থ সবল দেহ। তাদের দুএক পোঁচ গায়ের রং ফরসা কালোতে কিছু ক্ষতি বৃদ্ধি হয়না বুঝলে? সে ধরতে গেলে যতীর মত সুপাত্র কোথায় পাব?—"

হ্যাঁ তোমার এক কথা; জন্মে কখনও মেয়ে শ্বশুরঘরে যাবে না। ঘরজামাই হয়ে জামাই চিরকাল এখানে থাক্‌বে—মেয়ের মন তাতে থাক্‌বে না। যে মেয়ে বিয়ের পরে বাপের বাড়ীতেই বেশী থাকে, বাপের বাড়ীর লোকের কাছে তার আর কোন সম্মান থাকে না বুঝ্‌লে? যতীর সঙ্গে বিয়েতে মীনুর আমার সেই অবস্থা হবে। যে অভিমানী! ও যে অমনি করে ঘর-জামাইএর বৌ হয়ে মুখ কালি করে বেড়াবে তা আমি এই চোখে দেখ্‌তে পার্‌বো না। তার চেয়ে ওর বিয়েই দিও না।"

"শোন, শোন, তুমি যে চটেই খুন হলে!—'স্ত্রীণাম চরিত্র পুরুষস্য ভাগ্যম্, দেবাঃ ন জানন্তি কুতো মনুষ্যা:"—বলে একটা প্রবচন আছে জানো? কে বলতে পারে যে, এই কুড়িয়ে আনা যতীশ্বরই একদিন অতুল ঐশ্বর্য্যের অধিপতি হবে না?"—

একটু নরম সুরে শতদল বল্‌লেন "তা, হয়তো, হতে পারে। কিন্তু মীনু আর যতীতে মোটে বনে না। বিয়ে হয়েই কি আর বনবে।"—

"ও সব মিটে যাবে বুঝ্‌লে গিন্নী! বিয়ের আগে আমাদের তো কই আধুনিক প্রথামত 'কোর্টশিপ' 'লভ্' কিছুই হয়নি! দিন কি মন্দ কাট্‌ছে? সময়ে ওসব ঠিক হয়ে যাবে।—একটা কথা আছে না—

'নূতন প্রেমে, নূতন বঁধু, আগা গোড়া কেবল মধু,
পুরাতনে অম্ল মধুর, একটু ঝাঁঝালো।—"—

ঠিক তাই। মীনা এখন জানে, যতী একজন চাল-চুলাহীন কুড়োনো ছেলে। কাজেই খুব কর্ত্তৃত্ব করে; আর যদি জানে যে ওর ভাবী স্বামী; তবে দেখ্‌বে যতীর কোনো খুঁতই আর ওর চোখে ঠেকবে না। সংসারের নিয়মই এই।

"কাহারো এমন পড়িল না চোখে আমার যেমন আছে"—এই হল সংসারের বীজ মন্ত্র।—"—

"জানিনে বাপু, তোমার যা ইচ্ছে হয় কর। মেয়েটা কষ্ট না পেলেই হল।—"—

"বেশ, বেশ, পথে এস। মীনু কষ্ট পেলে কি সেটা আমারও বাজ্‌বে না? আমি কথা দিচ্ছি, যতী, তোমার মেয়ের সকল অভাব দূর করবে। এর চেয়ে বেশী প্রমাণ আর কিছু আমি জানিনা।"—

সেদিন এই পর্য্যন্ত হয়েই রইলো।

যতীর নিজের কিন্তু এসব নিয়ে কোনো ভাবনাই ছিল না। মীনা সব সময়ে বাড়ীতে থাকে না—যখন বোর্ডিং থেকে আসে, তখন অবিশ্যি যতীর কাজ-কর্ম্মের মধ্যেও তার অসঙ্গত আবদার পূরোতে হ'ত। কারণ দীর্ঘকাল ধরে মীনাদের বাড়ী থেকে সে এটুকু বুঝেছিল যে রমাপতি বাবুকে সন্তুষ্ট রাখ্‌তে গেলে মীনাকে চটানো হবে না। তাই সে বোর্ডিং থেকে বাড়ী এলেই নিজের বিশ্রামের সময়টুকুও যতীর জুট্‌তো না।—

ধনবান পিতার একমাত্র কন্যা হয়েও বরাবর সকলের কাছে প্রশ্রয় পেয়ে পেয়ে খেয়ালেরও তার শেষ ছিল না। হঠাৎ আচমকা কোনদিন বলে বস্‌ল "চল রাজ রপ্পায় বেড়াতে।"—প্রায় সমস্ত দিনের ধাক্কা। কিন্তু 'না' বলারও যো ছিলনা; কারণ রমাপতি বাবুর ঢালা হুকুম ছিল যে মীনা যেন তার যা' ইচ্ছা, তাই করতে পায়। বাড়ীর কেউ তো নয়ই, এমন কি স্বয়ং শতদলেরও এ নিয়ে কোন কথা বলার উপায় ছিল না।

মীনার বাবা ভাব্‌তেন যে শেষ পর্য্যন্ত যখন দুটীকে একসঙ্গে গাঁথতেই হবে, তখন পরস্পরে যত কাছাকাছি এসে পড়ে, পড়ুক, আরও জানাজানি হোক। মীনাকে নিয়ে যতী এ পর্য্যন্ত কোনই কথা ভাবেনি, বাগানে ভাল ফুল ফুট্‌লে যেমন সকলেই সেটা দেখ্‌তে বা গন্ধ পেতে ইচ্ছে করে, মীনার সম্বন্ধে এর বেশী কোন কথা তার মনে হয়নি। তা ছাড়া, ছোটবেলা থেকেই একসঙ্গে এক বাড়ীতে থাকায় তার ওপর যতীর একটা সরল ও সহজ সস্নেহ ভাব এসে পড়েছিল। কিন্তু যখন থেকে রমাপতিবাবু তাকে ভাবী সম্বন্ধের আভাস দিলেন, তখন থেকে সে আর একটু ভাব্‌তে আরম্ভ করল যে শেষ পর্য্যন্ত যদি মীনা আমাকে বিয়ে করে,

তা হলে বুঝ্‌তে হবে যে আমার ভাগ্য আমাকে তার চরম পুরস্কার দিয়েছে। সাহস করে সে মনে আন্‌তে পারলে না যে মীনাকে বিয়ে করতে তার দিক থেকে কোন আপত্তি থাকতে পারে।

শতদলের স্নেহ দ্বিগুণ বেড়ে গেল। শুভ্রাংশুও সময়ে অসময়ে তার ঘরটীতে গিয়ে গল্প জুড়ে দেন। মীনার আর দুটী ভাই সুধাংশু ও হিমাংশু যারা ঐখানেই স্কুলে পড়ছিল তারা সময়ে অসময়ে তাকে জামাইবাবু বলে ক্ষেপায়, লজ্জায় তার কাণ লাল হয়ে উঠে। কাছে এসে বলে "ছিঃ! ও বল্‌তে হবে না। আমি তোমাদের যতীদা।"

দিন যখন এমনি কাটছে তখন প্রভাত এলো। সমস্ত উল্টে গেল।

স্থির হয়ে সে সমস্ত দেখে গেল। বিরুদ্ধে একটী কথাও বল্‌লে না। মনে মনে কিন্তু ঠিক করে ফেল্লে যে এখানের পাততাড়ি এবার গুটাতে হবে এরপরে আর থাকা চলে না।

নিজের ঘরে বসে প্রায় ষোল বৎসর পরে সে আপনার ভাগ্যের কথা ভাবছিল। এতদিন যেন তার এ অবসরও মেলে নি। ভাবলে সে যদি গরীব না হয়ে কিছু পয়সা-ওয়ালা হতো তা হলেও কি মীনার বাবা তাকে প্রত্যাখ্যান করতে পারতেন? এক পয়সা ছাড়া কিসে প্রভাত তার চেয়ে শ্রেষ্ঠ! নিজের ব্যায়াম পুষ্ট কর্ম্মীষ্ঠ দেহখানার দিকে একবার দেখে সে বল্‌লে "না, এ অপমানের পরে আর থাকা চলে না। এখন আমি যেমন করে হোক নিজের ভাত করতে পারব। অসময়ে এঁর আশ্রয়ে এসেছিলাম, খুব দয়া পেয়েছি, প্রভু যিনি, তিনি চিরদিন প্রভুই থাকুন। অন্য সম্বন্ধ তাঁর সঙ্গে করতে যাওয়াই ভুল।" বলেই হেসে বল্‌লে "কিন্তু কেনইবা গাছে তুলে মই কাড়লেন? আমার আশার যা অতীত ছিল, তা কেন আমার চোখের সামনে ধরলেন?—"

প্রভাত যে রাত্রে গেল, সে রাত্রে যতী তার নিজের ঘরে বসে এই রকম নানা চিন্তায় ডুবে ছিল। সে আগের রাত্রে প্রভাত ও মীনার বাগানে কথা বলা শুনেছে, এখন সেইগুলো তার মনে আরো জ্বালা ধরিয়ে দিলে।

ভেবে ভেবে সে ঠিক করলে যে, যেতেই হবে, এটা ঠিক! চুপি চুপি যেতে হবে, কাউকে জানিয়ে যাওয়া হবে না। নিঃসম্বল হয়েই সে তো এদেশে এসেছিল, এখন তো তাও অর্থকরী একটা বিদ্যা তার সম্বল রইলো। নিজের সামান্য যা দু' চারখানি কাপড় ছিল, সেগুলি গুছিয়ে রেখে রমাপতিকে একটা চিঠি লিখলে এই মর্ম্মে যে একটু দূরে একটা কাজ পাওয়ায় সে যাচ্ছে—অসময়ে খবর পাওয়াতে তাঁকে কিছু বলতে পারেনি। কবে ফিরবে তার ঠিক নেই। মীনার বিয়ের জন্যে সে শীগ্‌গীর ফিরবার চেষ্টা করবে। চিঠি লেখা হলে, ব্লটিং ছেপে সেখানার ওপর ঠিকানা লিখে একটা পেপারওয়েট চাপা দিল।

অনেকক্ষণ ধরে এই সব চিন্তা করায় তার মাথাটা গরম হয়ে উঠলো। ঠিক আগের দিনে প্রভাত নিজের আনন্দ চেপে রাখতে না পেরে, বাগানে পায়চারী করতে বেরিয়েছিল, যতীও নিজের বিরূপ ভাগ্যের চাপে পিষে গিয়ে, অবসন্ন মন ও দেহ নিয়ে বাগানে বেরিয়ে পড়ল।

বেরিয়ে দেখলে মীনাও তত রাত্রে বাগানে এসে আছে। সে নিজের ভাবে এত তন্ময় যে তার আসা-যাওয়া কিছুই লক্ষ্য করলে না। একটা গানের দু চার লাইন ঘুরে ফিরে তার কাণে আসতে লাগ্‌ল।

রঙিয়ে দিয়ে যাও, এবার যাবার আগে,
আপন রাগে, গোপন রাগে,
তরুণ হাসির অরুণ রাগে, অশ্রুজলের করুণ রাগে;
রং যেন মোর মর্ম্মে লাগে,
আমার সকল কর্ম্মে লাগে,
সন্ধ্যা-দীপের আগায় লাগে
গভীর রাতের জাগায় লাগে॥

যতী চোরের মত নিঃশব্দে নিজের ঘরে গেল। বাগানে বেড়ান তার আর হোল না। ঘরে বসেও সে মীনার গানের কথাগুলি শুন্‌তে পাচ্ছিল। সমস্ত ইন্দ্রিয়ের শক্তি কাণে লাগিয়ে দিয়ে সে শুন্‌তে লাগ্‌ল, মীনা বল্‌ছে—

"যাবার আগে যাওগো আমায় জাগিয়ে দিয়ে,
রক্তে তোমার, চরণ-দোলা লাগিয়ে দিয়ে।
আঁধার নিশার বক্ষে যেমন তারা জাগে,
পাষাণ গুহার কক্ষে যেমন নিঝর-ধারা জাগে,
মেঘের বুকে যেমন মেঘের মন্দ্র জাগে
বিশ্ব নাচের কেন্দ্রে যেমন ছন্দ জাগে,

তেমনি আমার, দোল দিয়ে যাও, যাবার পথে,
আগিয়ে দিয়ে।
কাঁদন বাঁধন ভাসিয়ে দিয়ে॥"

দুবার তিনবার ফিরে ফিরে মীনা একই সুরে এই গান গাইলো। যতী দুহাতে নিজের কাণদুটো চেপে তার বিছানারশুয়ে পড়ল। সারাদিনের অবসাদ ও মনের ক্লান্তি তাকে গভীর ঘুমে আচ্ছন্ন করে দিলে।

পরদিন ঘুম ভেঙে যখন উঠল, দেখলে ঘরে রোদের ঢেউ খেলে যাচ্ছে, আর হাস্যমুখী মীনা তার দরজার বাইরে দাঁড়িয়ে বলছে। "যতীদা, তুমি কি আজ কুম্ভকর্ণের চেলা হয়েছ নাকি? লোক পাঠিয়ে পাঠিয়ে হয়রাণ, শেষে নিজেই এলাম। বাবা বললেন, তোমার শরীর ভাল নেই, সত্যি নাকি যতীদা?"

যতী কিছু বলতে পারলে না—বিছানায় থেকে উঠেই সে বরাবর টেবিলের কাছে গেল—দেখলে পেপারওয়েট কাৎ হয়ে গড়াচ্ছে, চিঠিটা সেখানে নাই।

রেশমী

গল্প

শ্রীযোগেন্দ্রনাথ সেনগুপ্ত

রেশমীর স্বামী ফয়জাবাদে চাকরী করে। দুষ্ট লোকে বলে, সে দরওয়ানী করে। রেশমী বিশ্বাস করে না; প্রতিবাদ করিয়া কহে, "কক্ষণ না, কক্ষণ না। সে——" বলিয়া হঠাৎ চুপ করিয়া যায়। আর বলিতে পারে না। সে নিজেও জানে না, স্বামী কি কাজ করে।

শ্বশুরবাড়ীতে কেউ নাই। আছে শুধু একখানি মেটে অতি জীর্ণ ঘর। তাও নাকি আবার সবিনয়ে ভূমিশয্যা গ্রহণ করিয়াছে। তাই, রেশমী বাপের কাছে থাকে। বাপের বাড়ী গোগা।

গ্রামের উত্তরে ছোট নদীটিতে রোজ রেশমী বিকালে কলসী হাতে গা ধুইতে যায়। ফিরিতে বড় দেরী হয়। মা রাগ করিয়া জিজ্ঞাসা করে, "তুই কি নদী খুঁড়ে জল আনছিলি নাকি যে এত দেরী?"

রেশমী কাঁকের কলসী নামাইয়া রাখিয়া মুখ টিপিয়া হাসে। কি যেন একটা উত্তর ঠোঁটের কোণে আসে; কিন্তু কিছু বলে না।

মা আরও রাগ করিয়া কহে, "তোর ঢং দেখে আর বাঁচিনে। কথার গ্রাহ্যিই নেই। ধাড়ী মেয়ে গাঁয়ের পাঁচটা লোক——" বলিয়া বিড় বিড় করিতে করিতে কাজে চলিয়া যায়। মায়ের রকম দেখিয়া বড় হাসি পায়; কিন্তু সুমুখে হাসে না। ছেলেবেলাকার মারধরের কথা এখনও সে ভোলে নাই। আর সেদিন নাকি তাহার গালের উপর কি একটা ঘটিয়া গিয়াছিল।

রেশমী অবশ্য তা স্বীকার করে না। পাশের বাড়ীর বিন্টুর কিন্তু রেশমীর উপর বড় লোভ। সেদিন কি একটা রসিকতা করিতে আসিয়া রেশমীর কাছে ধমক খাইয়া সে এখন আড়ালে আবডালে উঁকি মারে; কিন্তু সামনে আসিয়া কিছু বলিতে সাহস করে না।

বিকালবেলা নদীর ঘাট যখন প্রায় শূন্য হইয়া আসে, রেশমী তখন একলাটি চুপ করিয়া বসিয়া পশ্চিমের রাঙ্গা মেঘের দিকে চাহিয়া থাকে। চাহিয়া চাহিয়া ভিতরটা হয়ত তাহার তেমনি রাঙ্গা হইয়া ওঠে। হঠাৎ চোখে জল আসিয়া পড়ে। আশ-পাশের লোকের কথা ভুলিয়া যায়। চোখের জল তেমনি ধারা বহিয়া নদীর বুকে পড়িতে থাকে। বিন্টু লুকাইয়া রেশমীর মুখের পানে একমনে চাহিয়া থাকে। তারপর রেশমীর চোখের জল দেখিয়া তাহারও চোখে জল আসিয়া পড়ে; কিন্তু ভরসা করিয়া কাছে আসিয়া কিছু বলে না। রেশমীর বড় রাগ। তাই, সে দূরে দূরে থাকে।

সন্ধ্যা যখন নামিয়া আসিয়া নদীর বুক কালো করিয়া দেয়, তখন রেশমীর চমক ভাঙ্গে। চাহিয়া দেখে চারিদিক তেমনি ঝাপসা হইয়া আসিয়াছে।

তাড়াতাড়ি গা ধুইয়া, কলসী কাঁকে লইয়া বাড়ীর দিকে ফিরে। বিন্টু অলক্ষ্যে পিছু পিছু আসে। আর সন্ধ্যার আঁধারে ভিজা কাপড়ের ভিতর দিয়া রেশমীর যে রূপের আলোটুকু বাহির হইয়া আসে, তাই যেন সে দু'চোখ দিয়া পান করিতে থাকে।

বাড়ী ফিরিয়া রেশমী আবার মায়ের গালি-মন্দ খায়। গভীর রাত্রে ছোট জানালার বাহিরে অন্ধকারের ভিতর দিয়া খোলা মাঠের দিকে চোখ মেলিয়া থাকে। কি যেন দেখিতে চায়, কিন্তু পায় না। বুকের ভিতরটা হা হা করিতে থাকে! তারপর চোখ মুছিয়া, বুকে হাত রাখিয়া সে এক সময় ঘুমাইয়া পড়ে।

(২)

চিঠি আসিয়াছে, রেশমীর স্বামী ৭ দিন পরে আসিবে। লুকাইয়া চিঠিখানা সে একশবার পড়িয়াছে। তবু যেন পড়া শেষ হয় না; যেন অফুরন্ত কত মধু, কত রস তাতে রহিয়াছে।

সে দিন গুণিতে আরম্ভ করিয়াছে। পাছে ভুলিয়া যায়, তাই খড়ি দিয়া দিনের শেষে একটি করিয়া দাগ অতি গোপনে কাটিয়া রাখে।

আজ ৭ দিন পূর্ণ হইয়াছে। রাত ৭টার গাড়ীতে স্বামী আসিবে। সকাল হইতেই রেশমীর বড় কাজ পড়িয়া গেল। নিজের হাতে কখনও ঘর ঝাঁট দেয় না, নিকায় না, গরুকে খড় দেয় না—কিছু করে না। আনে শুধু বিকালবেলা এক কলসী ছোট নদীর মিষ্টি জল। তাও আবার আনিতে রাত হইয়া যায়।

আজ সকালে উঠিয়া সে নিজের হাতে ঘর ঝাঁট দিল, উঠান মুছিল, গরুর খোঁজ-খবর নিল. পিতাকে তামাক কাটিয়া 'খৈনি' প্রস্তুত করিয়া দিল। এবং শেষে রান্নাঘরে গিয়া উনান জ্বালিয়া বসিল।

মা গোবর হাতে ঘুঁটে দিতেছিল। বেড়ার ফাঁকে হঠাৎ আলো আর ধোঁয়া দেখিয়া রান্নাঘরে উঁকি মারিয়া অবাক হইয়া গেল। তারা জানে না, আজ কে আসিবে। রেশমী নিজে গ্রামের ছোট পোষ্টআফিসে গিয়া চিঠি লইয়া আসিয়াছে। রেশমী একটু আধটু লিখিতে জানে। চিঠির কথা তো কাহাকে কিছু বলে নাই—মাকেও নয়। বিন্টুর চোখে কিন্তু সে ধুলা দিতে পারে নাই। সে রেশমীর কাণ্ড দেখিয়াছে। রেশমীর হাতে চিঠি দেখিয়া তাহার বুক শুকাইয়া গিয়াছিল। কিন্তু এতদিনেও যখন কেউ আসিল না, কিছু ঘটিল না, তখন সে একথাটা প্রায় ভুলিয়াই গিয়াছিল। নিজের জানালার ফাঁক দিয়া সে রোজ সকালে চোখ মেলিয়া থাকে। রেশমীর চলা-বলার ভঙ্গী দেখিয়া তাহার বুকের ভেতরটা যেন কেমন করিতে থাকে। ইচ্ছা হয় এখনি কাছে যায়। কিন্তু সাহস হয় নাই। মনকে বলে, "যাক্ না ক'দিন! যাবে কোথায়। আস্‌তে বয়ে গেছে ঝিমনের। সে বিদেশে চাকরী কচ্ছে না ছাই কচ্ছে।

বিন্টু কার কাছে যেন শুনিয়াছিল, ঝিমন দেশ ছাড়িয়া যাওয়ার সময় রামটহলের মেয়ে বিনিকে ফুস্‌লাইয়া লইয়া গিয়াছে। তাই তার মনে মনে বেশ একটা জোর ছিল।

কিন্তু, আজ সকালে রেশমীর ব্যাপার দেখিয়া বিন্টুর মুখ শুকাইল, বুক শুকাইল, চোখের কোণে জল আসিয়া পড়িল। তবু সে চুপ করিয়াই রহিল।

এখন রেশমীর মার বিস্মিত মুখের দিকে চাহিয়া একটু সাহস করিয়া আসিয়া কহিল, "জান না মাসী, আজকে আসবে? আজ যে——" বলিয়া সহসা সে 'হা হা' করিয়া হাসিয়া উঠিল। কিন্তু, সে হাসি যেমন রুক্ষ তেমনি ব্যথায় ভরা।

মাসী আরও অবাক হইয়া, গোবর হাতে বিন্টুকে প্রায় ধরিয়া ফেলিয়া জিজ্ঞাসা করিল, "বল্‌না বাছা, কে আস্‌বে?

"তোমার জামাই গো—রেশমীর বর।" বলিয়া বিন্টু আবার তেমনি শুক্‌নো হাসি হাসিতে লাগিল।

রান্নাঘরের ভিতর বসিয়া রেশমী সব শুনিল; কিন্তু কিছু বলিল না। শুধু একটা কাঠ রাগ করিয়া উনানের মধ্যে জোর করিয়া ঠেলিয়া দিয়া ধপ্ করিয়া ভাতের হাঁড়িটা উনানে চড়াইয়া দিল। ভাগ্যি ভাল হাঁড়িটা ভাঙ্গিল না।

খবর শুনিয়া রেশমীর মা শুধু "হুঁ" বলিয়া আবার ঘুঁটে দিতে সুরু করিল। খুসি হইল, কি রাগ করিল, বোঝা গেল না। বিন্টু মাসীর এই উদাসীনতায় একটু আশ্চর্য্য হইল। মাসী আর কথা কয় না দেখিয়া তাহার মনে বড়

রাগ হইল। কতকটা যেন সে নিজের মনেই বলিতে লাগিল, "বর আসবে না ছাই আস্‌বে।"

মাসী মুখ তুলিয়া জিজ্ঞাসা করিল, "কেন ?"

তখন সে একগাল হাসিয়া কহিল, "শোন নি বুঝি মাসী ?"

তাহার এই হাসি দেখিয়া মাসী শুধু হাঁ করিয়া তাহার মুখের দিকে চাহিয়া রহিল। কি বৃত্তান্ত জিজ্ঞাসা করিতে সাহস করিল না। মাসীর মুখ দেখিয়া বিন্টু মনে মনে খুসী হইল! এবং ফলাও করিয়া বলিতে লাগিল, 'মাসী তুমি এত খবর রাখ; শুধু এ-টাই জান না। ঐ রামটহলের মেয়ে বিবি কোথায়? কে না জানে করিয়া তাকে—" হঠাৎ তাহার চোখ রান্না ঘরের দ্বারের উপর পড়িতেই—বিন্টুর মুখ যেন চড় খাইয়া বন্ধ হইয়া গেল।

রেশমীর অগ্নিদৃষ্টির সুমুখে সে আর মাথা তুলিতে পারিল না। একদৌড়ে পাশের বাঁশ ঝাড়টা ঘুরিয়া নিজের ঘরের মধ্যে গিয়া লুকাইল।

রেশমীর মা সে কথা জানিত। লজ্জায়, অপমানে সে মুখ নীচু করিয়া মনের ভুলে, এই এতটুকুর বদলে, এই এত বড় বড় ঘুঁটে দিতে লাগিল।

রেশমী রাগে, ক্ষোভে কাঁদিয়া ফেলিল, "কখ্‌খন না, কখ্‌খন না। সব মিছে কথা। তুমি ওকথা শুনোনা।" বলিয়া পুনঃ উনানের সামনে গিয়া বসিল; কিন্তু চোখ দিয়া তাহার তেমনি জল ঝরিয়া পড়িতে লাগিল।

আজ বিকালে নদীতে আসিয়া রেশমী গায়ে সাবান দিল, হাত-পা ভাল করিয়া ঘসিয়া পরিষ্কার করিল। তারপর বেশ করিয়া গা ধুইয়া কলসী কাঁকে সকাল সকাল বাড়ী ফিরিয়া আসিল। পশ্চিমের সোনার আকাশ আজ আর তাহাকে স্পর্শ করিল না। নিজের ভিতরে আজ তাহার অনেক সোনা গলিয়া, বহিয়া যাইতেছে। বাহিরের সোনা, বাহিরেই পড়িয়া রহিল।

বাড়ী ফিরিয়া, সে যুঁই ফুলের তেল মাখিল এবং ছোট আরসি সামনে রাখিয়া চুল বাঁধিল। শেষে আয়নায় নিজের মুখের দিকে চাহিয়া একটু মুখ টিপিয়া হাসিল।

সন্ধ্যার পর নিজে রাঁধিতে বসিল; কিন্তু বড় ভয় পাছে হাত খারাপ হইয়া যায়, মুখ কালি হইয়া ওঠে এবং চুল শুকাইয়া আসে।

রাত ৭টা বাজিয়া গিয়াছে। এইবার স্বামী আসিবে। রেশমী বাহিরের দিকে কান পাতিয়া রান্নাঘরে বসিয়া নিজেকে কোন মতে স্থির রাখিয়াছে। অদূরে কুকুর 'ঘেউ ঘেউ' করিয়া উঠিল। বাঁশ কাঁঠাল পাতার মড় মড় শব্দ— এই বার নিশ্চয় সে আসিয়াছে। রেশমী তাড়াতাড়ি দুয়ারে আসিশা অন্ধকারে এদিক ওদিক চাহিয়া দেখিল— কৈ কেউ না। ফস্ করিয়া কে একজন যেন চলিয়া গেল। রেশমীর মনে হইল বিন্টু। ঠিক বলিতে পারিল না; বাইরে বড় অন্ধকার।

রেশমী নিশ্বাস ফেলিয়া স্বস্থানে ফিরিয়া আসিয়া চুপ করিয়া রাঁধিতে লাগিল। আঁচলে ঘন ঘন চোখ মুছে। আবার জল আসে আবার মোছে।

রাত ৮টা, ৯টা বাজিয়া গিয়াছে। রেশমীর আর রাঁধিতে ভাল লাগিল না।

সকাল হইতেই রেশমীর মার মন ভাল ছিল না। বিন্টুর কথা শুনিয়া আরও তাহা বিগড়াইয়া গেল। অবশ্য বিন্টু প্রায়ই সত্য কথা বলে না। অথচ অনেক সময় তা মিথ্যাও হয় না। তারপর রেশমীর মা ত মনে মনে সব বোঝে। নিজেও ত রেশমীর বাপের সঙ্গে স্বামী ছাড়িয়া নাথ নগর হইতে পলাইয়া আসিয়া এখানে বাস করিতেছে। লোকে জানে, স্বামী-স্ত্রী। কিন্তু, নিজের কাছে ত নিজের লজ্জার সীমা থাকে না। শেষে জামাইএর এই কাণ্ডে প্রথম যৌবনের সেই তাহার লজ্জার কথা মনে পড়িয়া একেবারে মরমে মরিয়া গিয়া চক্ষে জল আসিয়া পড়িল। আজ তাহার বয়স হইয়াছে। তাই, তাহার অশান্ত যৌবনের সেই রস, আনন্দ এখন শুধু লজ্জায় পরিণত হইয়াছে।

রেশমীর মা আর থাকিতে পারিল না। সমস্ত রাগটা পড়িল গিয়া রেশমীর উপর। দুম্ দুম্ করিয়া রান্না ঘরে ঢুকিয়া রেশমীর পিঠের উপর সজোরে এক কিল বসাইয়া দিল। বাঁধা চুল টান মারিয়া খুলিয়া দিয়া, তাহাকে রান্না ঘর হইতে ধাক্কা মারিয়া বাহির করিয়া দিল।

রেশমী তাহার ছোট্ট ঘরের মেঝের উপর লুটাইয়া পড়িয়া কাঁদিয়া-কাটিয়া শেষে ঘুমাইয়া পড়িল। রাতে

কাহারও খাওয়া হইল না। বাপ শুধু 'খৈনি' আর তাড়ি খাইয়াই বেহুঁস হইয়া রহিল।

(৩)

কিছুদিন কাটিয়া গিয়াছে। রেশমী আর নদীতে যায় না। কাহারও সঙ্গে মিশে না, কথা কয় না। বিণ্টু তেম্‌নি তাহার জানালা দিয়া চোখ মেলিয়া থাকে। আগের মত আর সব সময় রেশমীর দেখা মিলে না। তাহার বড় দুঃখ হয়। সে-ই ত সব প্রকাশ করিয়া দিয়া, রেশমীকে দুঃখী করিয়াছে। একথা মনে করিয়া তাহার চক্ষে জলে আসিয়া পড়ে।

এক একবার বিণ্টুর ইচ্ছা হয়, রেশমীর কাছে মাপ চাহিয়া আসে; কিন্তু সাহসে কুলায় না। তাই, ঘরের ভিতর বসিয়াই শুধু নিশ্বাস ফেলে আর চোখ মোছে।

সেদিন দুপুর বেলা বাপ মাঠে গিয়াছে। মা মুড়ি বিক্রী করিতে গাঁয়ে বাহির হইয়াছে। রেশমী একা। মাঝে মাঝে বিণ্টুর কথা মনে পড়ে। বড় 'দুষ্টু' ছোঁড়া সে। তবুও দেখিতে বেশ। কথাও মন্দ কয় না। কিন্তু তাহার যে স্বামী রহিয়াছে। তাই, বিণ্টুর কথা মনে হইলেই লজ্জায় মরিয়া যায়। মনে মনে 'ছি ছি' করিতে থাকে। তবুও বিণ্টুর মুখখানি মনের কোণে উঁকি-ঝুঁকি মারে। আজ দুপুর বেলা তাহার আর কিছুই ভাল লাগিল না। আস্তে আস্তে বাহির হইয়া একটু দূরে একটা কাঁঠালের ছায়াতলে বসিয়া চুপ করিয়া কি ভাবিতে লাগিল।

বিণ্টু সব দেখিয়াছে। কিন্তু যেন কিছুই জানে না, এম্‌নি ভাবে ও দিকের মাঠ ঘুরিয়া সহসা কাঁঠালতলায় আসিয়া যেন আশ্চর্য্য হইয়া গেল। ইতিমধ্যে বিণ্টুর কিছু সাহস বাড়িয়াছিল।

তেমনি বিস্ময়ের ভান করিয়া কহিল, "আরে, রেশমী যে? দুপুর বেলা কাঁঠাল তলায় বসে কি কচ্ছিস? যা যা, বাড়ী যা, রোদে মাথা ধরবে।"

রেশমী আজ আর বিণ্টুকে দেখিয়া রাগ করিল না। একটু চুপ করিয়া থাকিয়া কহিল, "রোদ কোথায়? ছায়ায় ত বসে আছি। তুমিই ত রোদে ঘুরে এলে। একটু জিরিয়ে বাড়ী যাও।"

বিণ্টু যেন হাতে স্বর্গ পাইয়া গেল। আনন্দের আবেগে কিছুক্ষণ কথাই বলিতে পারিল না। ছেলে বেলায় রেশমী এমনি কথা বলিত বটে; কিন্তু আজ সে অনেক দিনের কথা। সে তা প্রায় ভুলিয়াই গিয়াছিল। এই কাঁঠাল তলায়ই তাহার খেলিত, মারা-মারি করিত। পরদিন আসিয়া আবার ভাব করিত। তারপর এক দিন রেশমীর বিবাহ হইয়া গেল। বিণ্টুও পাট-কলে চাকরি করিতে গেল। পাঁচ বছর পরে ফিরিয়া দেখিল, রেশমী আর সেই ছোট রেশমী নাই। সর্ব্বাঙ্গ দিয়া রূপ ঝরিয়া পড়িতেছে। আর রেশমী দেখিল, বিণ্টু টেরি কাটে, শিস্ দেয়, আর রাত্রে তাড়ি খাইয়া ফিরিয়া আসিয়া গান সুরু করে।

বিণ্টুর টেরি কাটা, শিস্ দেওয়া রেশমীর ভাল লাগিত, কিন্তু তাড়ি-টাড়ি সে পছন্দ করিত না। তা ছাড়া, তাহার যে স্বামী রহিয়াছে। কাজেই সে ভাল করিয়া বিণ্টুর সঙ্গে কথা বলিত না। বরঞ্চ বিণ্টুর যা-তা পরিহাসে তাহার রাগই হইত।

আজ বিণ্টুর ছেলে বেলাকার কথা মনে পড়িয়া গেল। রেশমীও বোধ হয় তেমনই কিছু ভাবিতেছিল।

বিণ্টুর গলা ধরিয়া আসিল। কহিল, "তোর কাছে একটু বস্‌ব রেশমী? রাগ করবিনে ত?"

রেশমী শুধু একটু সরিয়া বসিল; উত্তর দিল না।

বিণ্টু আসিয়া পাশে বসিল।—তারপর আস্তে আস্তে রেশমীর একখানি হাত নিজের হাতের মধ্যে লইয়া রেশমীর মুখের দিকে একদৃষ্টে চাহিয়া চুপ করিয়া রহিল।

রেশমী কিছু আপত্তি করিল না, কথা বলিল না।

কিছুক্ষণ পরে বিণ্টু ভয়ে ভয়ে জিজ্ঞাসা করিল, "রেশমী তুই কি আমায় ভুলে গেছিস্?"

রেশমী নিরুত্তরে মুখ নত করিয়া রহিল।—ক্ষণকাল পরে বিণ্টু আবার ডাকিল, "রেশমী?"

রেশমী ক্ষীণকণ্ঠে উত্তর দিল, "কেন?"

"তুই কি আমায় ভুলে গেছিস্?"

"না।"

"তা হলে তুই আমার সঙ্গে কথা বলিস্ নে কেন, দেখা করিস্ নে কেন?"

"আমার যে স্বামী আছে।"

"ওঃ।" বলিয়া বিণ্টু চুপ করিল।

রেশমী এক মুহূর্ত্ত বিণ্টুর শুষ্ক মুখের পানে চাহিয়াই

মুখ নীচু করিল। কিছুক্ষণ পরে আস্তে আস্তে কহিল, "তুমি তাড়ি খাও কেন?"

"না খেয়ে কি করব? আমার ত কেউ নেই।"

"কেউ না থাকলে বুঝি তাড়ি খেতে হয়?"

বিণ্টু শুধু নিশ্বাস ফেলিল। সে কেমন করিয়া বুঝাইবে, কেন সে তাড়ি খায়। যাহার আছে, সে বুঝিতেও পারে না, বুঝিবার দরকারও হয় না। তাই, বিণ্টু চুপ করিয়া রহিল।

কিছুক্ষণ মাঠের তপ্ত হাওয়ার সোঁ সোঁ শব্দ ছাড়া উপরের পাখীগুলা পর্য্যন্ত নিস্তব্ধ।

রেশমীর একটা কথা মুখে আসিয়া আসিয়া ফিরিয়া যায় বলিতে পারে না। অতি কষ্টে রেশমী জিজ্ঞাসা করিল, "তুমি তাড়ি ছাড়তে পার?"

বিণ্টু সাগ্রহে প্রশ্ন করিল, "কেন বলত?"

"আমার ইচ্ছে। কেন, মনে নেই, ছেলে বেলায় আমার ইচ্ছেয় তুমি অনেক কাজ করতে?"

বিণ্টুর মনে পড়িল। কহিল, "পারি। নিশ্চয় পারি।"

"ঠিক?"

"ঠিক।"

"আমাকে আর যা-তা পরিহাস করবে না?"

"না।"

তারপর দুজনেই চুপ চাপ। রেশমী যেন কি ভাবিতে ছিল। সহসা তাহার চোখের কোণ বহিয়া এক ফোঁটা জল নীচে পড়িয়া গেল।

বিণ্টু তাড়াতাড়ি নিজের হাতে রেশমীর চোখ মুছিয়া দিয়া বুকের কাছে টানিয়া আনিল। রেশমী কিছু বলিল না। বিণ্টু আস্তে আস্তে তাহাকে বুকে চাপিয়া ধরিল। রেশমী তেমনি নীরবে তাহার বুকে মুখ লুকাইল। তারপর চারিদিকে চাহিয়া সহসা মুখ নীচু করিয়া একটা চুমা খাইল। রেশমী বাধা দিল না, কথা কহিল না; শুধু চোখ দিয়া তাহার অনেক অশ্রু ঝরিয়া পড়িতে লাগিল।

কিছুকাল পরে বিণ্টু বলিল, "চল্ রেশমী, আমরা গাঁ ছেড়ে যাই।"

রেশমী মুখ তুলিয়া চক্ষু মুছিল। তারপর কহিল, "না বলে-কয়ে কি করে যাবে?"

"কেন পালিয়ে?"

"ছিঃ।"

"পারবে না তুমি?" বলিয়া সমস্ত ইন্দ্রিয় এক করিয়া বিণ্টু রেশমীর মুখের উপর ব্যাকুলদৃষ্টি নিবদ্ধ করিল।

রেশমী ভাবিতে লাগিল।

বিণ্টু আবার জিজ্ঞাসা করিল, "যাবে না রেশমী?"

রেশমী তেম্‌নিই চুপ করিয়া রহিল। তারপর অতি অস্ফুটে জিজ্ঞাসা করিল, "কখন যাবে?"

বিণ্টু আবার তাহাকে বুকে চাপিয়া ধরিয়া চুমা খাইয়া কহিল, "কাল রাত্রে।"

রেশমী চক্ষু বুজিয়া কহিল, "আচ্ছা।"

"সত্য?"

প্রত্যুত্তরে রেশমী শুধু একটা চুমা ফিরাইয়া দিল।

(৪)

পরদিন ভোরবেলা উঠিয়া বিণ্টু ভিন্ন গাঁয়ে গিয়া নিজের ঘরের সমস্ত বিক্রী করিয়া ২০৲ টাকা সংগ্রহ করিল। একটা ছোট টিনের বাক্সে খান দুই কাপড়, একটা জামা, আর খান দুই ছবি বাক্সে বন্ধ করিয়া সন্ধ্যার জন্য উদ্‌গ্রীব হইয়া রহিল। আজ আর জানালায় বসিয়া সে চোখ পাতিয়া রহিল না। রেশমী সন্ধ্যার পর আসিবে, তাহা নিশ্চয়।

বেলা যতই পড়িয়া আসিতে লাগিল, ততই বিণ্টু ঘরের ভিতর ছটফট করিতে লাগিল। সন্ধ্যার আর বড় বাকী নাই। বিণ্টু একবার বসে, একবার ওঠে, একবার বাইরের সন্ধ্যাকাশের দিকে চাহিয়া দেখে। তারপর নিজের ছোট বাক্সটি কোলে করিয়া চুপ করিয়া বসিয়া থাকে।

বিণ্টু বাক্স কোলে করিয়া মাঠের দিকের জানালায় বাহিরে আকাশের দিকে চাহিয়া বসিয়াছিল। সহসা একটু ক্ষীণ পদশব্দে মুখ ফিরাইয়া দেখিল, রেশমী বড় সন্তর্পণে, এদিক-ওদিক চাহিয়া ঘরে ঢুকিতেছে।

বিণ্টু তাড়াতাড়ি বাক্স ফেলিয়া উঠিয়া আসিয়া আবেগে রেশমীকে ধরিতে গেল। রেশমী একটু সরিয়া দাঁড়াইল। বিণ্টুর ম্লান মুখের দিকে চাহিয়া অবাক হইল, ভয় পাইল, স্তব্ধ হইয়া দাঁড়াইয়া রহিল।

রেশমী ধীরে ধীরে কাছে আসিয়া গড় হইয়া বিণ্টুর

পায়ের কাছে নমস্কার করিল। তারপর উঠিয়া দাঁড়াইয়া আস্তে আস্তে কহিল, "আজ যাচ্ছি।"

"সে কথা তো জানি গো।" বলিয়া আনন্দের আবেগে বিণ্টু রেশমীকে বুকের মধ্যে লইতে যাইতেছিল।

রেশমী আবার সরিয়া দাঁড়াইল। বিণ্টু আবার আশ্চর্য্য হইয়া জিজ্ঞাসা করিল, "আজ যাবে না?"

"হাঁ, যাব বৈকি।"

"কখন? সন্ধ্যার পর ত?"

রেশমী বহুক্ষণ চুপ করিয়া থাকিয়া অস্ফুটে কহিল, "হ্যাঁ, সন্ধ্যার পরেই; কিন্তু—" বলিয়া থামিয়া গেল।

"কিন্তু কি?" বলিয়া বিণ্টু বিস্ময়ের ব্যথায় অস্থির হইয়া উঠিল।

রেশমী আরও কিছুক্ষণ মৌন থাকিয়া অতি ক্ষীণকণ্ঠে কহিল, "কিন্তু তোমার সঙ্গে নয়। আমার স্বামীর সঙ্গে। সে এসেছে।" বলিয়া তাড়াতাড়ি আর একবার বিণ্টুর পায়ের সুমুখে ভূমিতলে মাথা ঠেকাইয়া ছুটিয়া বাহির হইয়া গেল।

অগ্নিধারা

শ্রীহাসিরাশি দেবী

একাঙ্ক নাটিকা

রাঘব	গুরু
রঞ্জিৎ	প্রিয় শিষ্য
অগ্নি	রাঘবের পালিতা কন্যা

আশ্রমবাসিনিগণ, শিষ্যগণ, রাজা—প্রতিহারী ইত্যাদি

পুষ্পোদ্যান

প্রভাতের আলোক স্পষ্ট হইয়াছে;—বহুদূরে—আশ্রমে সকলে জাগিয়াছে। পুষ্প আহরণোদ্যতা অগ্নি।

রঞ্জিতের প্রবেশ।

রঞ্জিৎ—অগ্নি!

অগ্নি (চমকিয়া)—কে? রঞ্জিৎ?

রঞ্জিৎ—হাঁ—

অগ্নি—এমন সময়ে তুমি এখানে কেন? জান আশ্রম বালিকারা যখন বাগানে আসবে তখন এখানে পুরুষের প্রবেশ নিষেধ? গুরুর আদেশ!

রঞ্জিৎ—জানি।

অগ্নি—তবে?

(রঞ্জিৎ নীরব)

চুপ করে দাঁড়িয়ে রইলে কেন? উত্তর দাও।

রঞ্জিৎ—কি উত্তর দেব?

অগ্নি—যা তোমার ইচ্ছা।

রঞ্জিৎ—ইচ্ছার উপরে কি সমস্তই নির্ভর করে অগ্নি?

অগ্নি—আজকে তোমার কথাগুলো শুনতে যেন কি রকম বোধ হচ্ছে। স্পষ্ট করে বল রঞ্জিৎ।

রঞ্জিৎ—স্পষ্ট ক'রেই তো ব'লছি অগ্নি, ইচ্ছার পরেই কি সমস্ত নির্ভর করে? তাহ'লে—

অগ্নি—তাহ'লে কি? চুপ করলে কেন? বল—বল—

রঞ্জিৎ—ব'লছি তুমি ফুল তুলতে এসেছ?

অগ্নি—হ্যাঁ।

রঞ্জিৎ—আর সব আশ্রম বালিকারা কোথায়?

অগ্নি—তার প্রত্যেকেই যে এক একটা কাজে ব্যস্ত আছে সে কথা কি ভুলে গেছ? এক একদিন এক এক জনের ওপর ফুল তুলবার ভার পড়ে এ নিয়মও কি তোমার মনে নেই?

রঞ্জিৎ—আছে।

অগ্নি—তবে?

রঞ্জিৎ—কিছু নয়। (কিছুক্ষণ নীরব থাকিয়া) না, আমার কিছু জিজ্ঞাসা ক'রো না অগ্নি, কোর' না কোর'

রাজা কহে শুন রে কোটাল
নিমকহারাম বেটা আজি বাচাইবে কেটা
দেখিবি করিব সেই হাল।

না—; আর করলেও সে উত্তর আমি দেব না। ইচ্ছা করেই উত্তর দেব না।

অগ্নি—তবে এখন এ ফুল বাগানে এসেছিলে কেন?

রঞ্জিৎ—ব'লেছি তো, উত্তর দিতে পারব' না, দেব না।

অগ্নি—তবে গুরুকে এসংবাদ জানাব কিন্তু তা'হলে কি কঠিন শাস্তি পাবে তা কি একটিবার ভেবে দেখেছ রঞ্জিৎ?

রঞ্জিৎ—ভেবেছি,—নির্ব্বাসন। ভাল সেও আমার পক্ষে ভাল। যদি তোমার সঙ্গে দুটো কথা বলতে পাই, এই নির্জ্জনে এই লতাকুঞ্জে—

অগ্নি—একি? তোমার কথাগুলো আজ এমন শুনতে লাগছে কেন? তোমার মুখই বা আজ অমন কেন?—কেন—কেন? রঞ্জিৎ।

রঞ্জিৎ—ডাক, আজ আবার আমায় ডাক অগ্নি, ডাক। মরুভূমিতে একটু ছায়া, একটু জল যে কতখানি ক্লান্তি দূর করে পথ চলবার উৎসাহ শক্তি বাড়িয়ে তোলে তা তুমিও জান না অগ্নি। কিন্তু আমি জানি। ডাক, তুমি আমায় ডাক অগ্নি, আমি চুপ করে শুধু তোমার ডাক শুনি।

অগ্নি—পথ ছাড় রঞ্জিৎ, আমি আশ্রমে যাব; গুরু ফুলের খোঁজে লোক পাঠাবেন, সরো পথ ছাড়।

রঞ্জিৎ—কোথা যাবে অগ্নি?

অগ্নি—আশ্রমে।

রঞ্জিৎ—না।

অগ্নি—তুমি আমার বাধা দেবার কে?

রঞ্জিৎ—কেউ নই।

অগ্নি—তবে?

রঞ্জিৎ—(অগ্নির সম্মুখে হাঁটু গাড়িয়া বসিয়া) প্রার্থনা, অনুরোধ, দাবী।

অগ্নি—রঞ্জিৎ! রঞ্জিৎ!! তুমি কি পাগল হয়েছো? ওঠ, পথ ছাড়, আমি যাই।

রঞ্জিৎ—না, না যেও না, যেও না; ভগবান যদি এমন সময় মিলিয়ে দিয়েছেন তবে একটা কথা, শুধু একটা কথা শুনে যাও।

অগ্নি—উঃ! রঞ্জিৎ তোমার চোখে ওকি দৃষ্টি? মুখেও কোন কথা লেখা দেখতে পাচ্ছি? আমার মুখের দিকে অমন করে চেয়ে আছ কেন? উঃ, চোখ যে ঝলসে গেল।

রঞ্জিৎ—অগ্নি! অগ্নি!! আমি তোমায় ভালবাসি।

অগ্নি (চমকিয়া) রঞ্জিৎ—

রঞ্জিত—কোনও কথা নয়; আমি তোমায় ভালবাসি, তোমার রূপকে ভালবাসি। অগ্নি! তোমার ঐ ভুবন ভুলান রূপকে ভালবাসি।

অগ্নি—রঞ্জিৎ! মনে কর গুরুর দণ্ডাদেশ।

রঞ্জিৎ—করেছি। নির্ব্বাসন তারপরে মৃত্যুদণ্ড।

অগ্নি—নিজের সর্ব্বনাশ নিজে করবে?

রঞ্জিৎ—তা হোক; মরণকে বরণ করেও তাঁকে জয় করা যায়।

(নেপথ্যে ঘণ্টাধ্বনি)

অগ্নি—(সভয়ে) ঐ বুঝি সকলে আসছে। রঞ্জিৎ পালাও, পালাও।

রঞ্জিৎ—কিন্তু, পালাবার ফল?

অগ্নি—পালাতে চাও না? তবে সর, আমায় পালাতে দাও।

রঞ্জিৎ—ভয় করছে?

অগ্নি—হ্যাঁ।

রঞ্জিৎ—তবে যাও।

অগ্নি—কিন্তু—তুমি?

রঞ্জিৎ—আমার যাওয়ার দরকার নেই। তুমি যাও।

অগ্নি—তুমি যাবে না? তবে আমি একাই যাই। গুরুর দণ্ডাদেশ মনে পড়ে। উঃ! কি ভয়ঙ্কর। পালাই পালাই।

(দ্রুতপদে প্রস্থান ও অন্য দুয়ার দিয়া অন্যান্য আশ্রম বালিকাগণের প্রবেশ।)

১ম বালিকা—গুরুর পূজার সময় হয়ে এল, কই? যে পূজার ফুল তুলতে এসেছিল? (চারিদিকে অন্বেষণ) না—বোধ হয় চ'লে গেছে (সহসা রঞ্জিতের উপর দৃষ্টি পড়িতে) একি এখানে কে ব'সে? রঞ্জিৎ?

রঞ্জিৎ—হ্যাঁ, আমি রঞ্জিৎ।

২য়া বালিকা—এখানে এমন সময়ে কেন? জান এসময়ে আশ্রম বালিকারা ফুল তুলতে আসে?

রঞ্জিৎ—জানি।

৩য়া বালিকা—গুরুর দণ্ডাদেশ?

রঞ্জিৎ—জানি।

১মা বালিকা—তবে।

রঞ্জিৎ—প্রশ্ন কোর না ভগিনীরা, যাও আশ্রমে ফিরে যাও।

৩য়া বালিকা—কিন্তু।

রঞ্জিৎ (হাসিয়া)—শাস্তির কথা আমার বেশ মনে আছে, দণ্ড নেবার জন্যে আমি প্রস্তুত হ'য়ে আছি, একথা গুরুকে জানাও গে।

১মা বালিকা—তবে তাই চল সকলে। ভাই! আজ প্রভাতের নমস্কার গ্রহণ কর।

(প্রস্থান)

রঞ্জিৎ—আমি উঠি, যাই। শাস্তি নেবার আগে সকলের সঙ্গে একবার দেখা করিগে। না, আমার মন এতটুকু খারাপ হয়নি, হয়নি, নীরব পূজা আজ আমার ব্যক্ত, আজ সার্থক।

(প্রস্থান)

দ্বিতীয় দৃশ্য

রাঘবের কক্ষ

সন্ধ্যা হইয়া আসিয়াছে। রঞ্জিতের প্রবেশ।

রঞ্জিৎ (প্রণাম করিয়া)—দাসকে স্মরণ করেছেন প্রভু?

গুরু—হ্যাঁ বৎস। উপবেশন কর।

(রঞ্জিৎ বসিল; কিছুক্ষণ উভয়েই নীরব)

গুরু—বৎস রঞ্জিৎ!

রঞ্জিৎ—প্রভু।

গুরু—আমি তোমায় শিশুকাল হ'তে পালন করেছি; পুত্রের অধিক স্নেহ করেছি, ভালবেসেছি; কিন্তু আজ তোমার নামে একি কথা শুনছি বৎস? একি সত্য? সত্যই কি তুমি—

রঞ্জিৎ—প্রভু—

গুরু—কি বলছিলে রঞ্জিৎ? নীরব হ'লে কেন? বল, বল, একি সত্য?

রঞ্জিৎ—সত্য।

গুরু (কতক্ষণ নীরব থাকিয়া) আমি কিন্তু একথা সত্য ব'লে বিশ্বাস করতে পারিনি।

রঞ্জিৎ (জানু পাতিয়া) দেবতা! শাস্তি চাই।

গুরু (স্বগত) শাস্তি দেবার কে আমি? আমিই কি কোনও দিন কোনও পাপ করিনি? (প্রকাশ্যে) শাস্তি? শাস্তি?

রঞ্জিৎ—হাঁ, প্রভু শাস্তি। আপনার আদেশ অবমাননাকারীর শাস্তি।

গুরু (কিছুক্ষণ পরে উঠিয়া আসিয়া হাত ধরিলেন) বৎস রঞ্জিৎ!

রঞ্জিৎ—আদেশ করুন গুরু।

গুরু—তোমায় ক্ষমা করেছি বৎস, ওঠ।

রঞ্জিৎ (চমকিয়া) ক্ষমা?

গুরু—হ্যাঁ, ক্ষমা।

রঞ্জিৎ—কিন্তু ক্ষমা তো আমি আপনার কাছে প্রার্থনা করিনি, গুরু।

গুরু—ক্ষমা তো কারও মতামতের অপেক্ষা রাখে না। ওঠ, মন্দিরে চল, আজ মন্দিরে আমার একজন সম্মানীয় অতিথি আসবেন। তোমরা তাঁর অভিভাষণ পাঠ করবে, আর আশ্রম বালিকারা তাঁর বরণের মঙ্গলগীতি গান করবে। চল দেবারতির সময় হয়ে এসেছে, এখনি তিনি আসবেন।

রঞ্জিৎ—আশ্রমে বালিকারা বরণের মঙ্গলগীতি গান করবে। অগ্নিও সেখানে উপস্থিত থাকবে।

গুরু—হ্যাঁ চল, চল, আর বিলম্ব নয়।

রঞ্জিৎ—তবে চলুন।

(প্রস্থান)

তৃতীয় দৃশ্য

দেব মন্দির। রাজা আসীন, পার্শ্বে গুরু রাঘব। চতুর্দ্দিকের উজ্জ্বল আলোকে রাজার বহুমূল্য মুকুট ঝক ঝক করিতেছে। চতুর্দ্দিকের চামর দুলিতেছে ও মন্দিরের চতুষ্পার্শ্বের মৃদু মৃদু ধ্বনী শুনা যাইতেছে।

(শিষ্যমণ্ডলীর দ্বারা অভিভাষণ পাঠ শেষ হইবার পরে বরণডালা হস্তে প্রথমে রক্ত বস্ত্র পরিহিত অগ্নি ও তৎপশ্চাৎ আশ্রমবালাগণের প্রবেশ)

গান

এস হে এস, এস হে এস এসহে সুন্দর—
এস হে নব কল্যাণ! ওগো এসহে মনোহর।
মোরা এনেছি বরণ ডালা,
এনেছি কুসুম মালা,

এনেছি দেব আশীষ বহিয়া যতনে হে ধর ধর।
আজিকে এ শুভ লগনে
কার আঁখি জাগে গগনে,
আশীষের মালা ঝরিয়া পড়িছে যতনে হে পর পর।
এসহে এস! এসহে এস! এস হে সুন্দর।

(বালিকাগণের রাজার চতুস্পার্শে ঘুরিয়া বরণ ডালা নামাইয়া প্রণাম)

রাজা—(স্বগতঃ) রক্তবস্ত্র পরিহিতা ওকে? উঃ কি রূপ, চোখ যেন ঝল্‌সে যেতে চায়!—অথচ তাকিয়েও আশা যেন মিটতে চায় না। কে, এ বালিকা কে?

রঞ্জিৎ—(স্বগত) রাজার চোখে ও কি ভীষণ দৃষ্টি! অগ্নির দিকে ও কী ভীষণ দৃষ্টিতে চেয়ে আছে।

গুরু—বৎস রঞ্জিৎ, এবার তুমি তোমার আশ্রম ভ্রাতাদের বিশ্রামের জন্য নিয়ে যেতে পার।

রঞ্জিৎ—(স্বগতঃ) ভেবেছিলাম দেবীকে পূজা নিবেদন করেই বুঝি ভক্তের সব আশার সব আকাঙ্ক্ষার সমাধা হয়ে যায়। কিন্তু এখন বুঝতে পারছি, তা হয় না। মনের মধ্যে কে যেন ধীরে ধীরে হিংসার আগুন জ্বালিয়ে দিচ্ছে! রাজার চোখে ও কী দৃষ্টি? ও কিসের শিখা আমি স্পষ্ট দেখতে পাচ্ছি? অগ্নি! অগ্নি!!—

গুরু—রঞ্জিৎ, রঞ্জিৎ।

রঞ্জিৎ—গুরু!

গুরু—তোমার আশ্রম ভ্রাতাদের সঙ্গে বিশ্রাম করতে যাও।

রঞ্জিৎ—যাই।

(গুরুর পদবন্দনা করিয়া শিষ্যগণের প্রস্থান)

রাজা—(অগ্নির হাত ধরিয়া) বালিকা।

গুরু—(ব্যস্তভাবে) রাজা! ও আশ্রমবাসিনী।

রাজা—তাহোক। একে আমার চাই, গুরু। এর রূপ আমায় পাগল করেছে, আমায় উন্মত্ত করেছে।

গুরু—(চীৎকার করিয়া) অগ্নি! অগ্নি!!

রাজা—বল গুরু কিসের বিনিময়ে একে আমি পাব? বল, বল—এর রূপ আমায় পাগল করেছে।

গুরু—তোমার ঐ অমূল্য মুকুট চাই।

রাজা—যা চাও তাই পাবে। (মুকুট খুলিয়া দিতে উদ্যত ও অগ্নির বাধাপ্রদান)

অগ্নি—রাজা কি করছো?

রাজা—তোমায় আমার চাই—। তার বিনিময়ে সব দিতে পারি।

অগ্নি—প্রাণ?

রাজা—প্রাণও।

অগ্নি—গুরু! গুরু! আদেশ দাও—আদেশ দাও।

গুরু—রাজা! আজ তুমি শ্রান্ত, চল, পৌঁছে দিয়ে আসি।

রাজা—পৌঁছে দিয়ে আসবে গুরু? কিন্তু অগ্নি... অগ্নিকে যে আমার চাই-ই।

গুরু—চাই-ই?

অগ্নি—চাই।

রাজা—চাই-ই—আমার চাই-ই।

গুরু—চল তোমাকে পৌঁছে দিয়ে আসি।

রাজা—অগ্নি?

গুরু—ফাল্গুন পূর্ণিমার দিনে তাকে পাবে।

অগ্নি—(আর্ত্তস্বরে) পিতা! গুরু! পিতা।

গুরু—(স্বগত) একী? মন কেঁপে উঠে কেন? (প্রকাশ্যে দৃঢ়স্বরে) না কোনও কথা শুনতে চাইনে, ফাল্গুন পূর্ণিমা আগত প্রায়, ঐ দিনে তুমি রাণী হবে। যাও, বিশ্রাম করতে যাও। রাজা! চল—।

(রাজাকে লইয়া গুরুর প্রস্থান ও অন্য দুয়ার দিয়া আশ্রমবালিকাগণ সহ ধীরে ধীরে অগ্নির প্রস্থান)

চতুর্থ দৃশ্য

গভীর রাত্রি। গুরু রাঘবের বিশ্রাম কক্ষ।
ধীরে ধীরে অগ্নির প্রবেশ।

অগ্নি—পিতা! কন্যাকে স্মরণ করেছেন?

গুরু—(স্বগত) মন এত চঞ্চল হও কেন? পিতা! পিতা! এ ডাক তো আর কখনও শুনিনি। না, ও ডাক শুনতে চাইনে—আর ও ডাক শুনতে চাইনে।

(প্রকাশ্যে)

বৎসে!—উপবেশন কর।

অগ্নি (উপবেশন করিয়া)

পিতা!—কন্যাকে স্মরণ করেছেন?

গুরু (স্বগত) মন! স্থির হও। (প্রকাশ্যে) হাঁ বৎসে। (স্বগত) পিতা! এ ডাকে মন দোলে কেন?

আমি গুরু, এই আশ্রমের মালিক, এই আশ্রমবাসিদের হর্তা কর্তা—জীবনে কোনও পাপ করিনি। পাপ করিনি? কে বল্‌লে? যে দিন সেই বিধবা পা জড়িয়ে ধরে কেঁদে ব'লেছিল ও আমার—আমার কন্যা...উঃ, না, না। ও দেবতার কন্যা, রূপের কন্যা! আর আমি, আমি জিতেন্দ্রিয়, আমি সাধু।—

(প্রকাশ্যে) বৎসে!

অগ্নি—আদেশ করুন পিতা।

গুরু—রাজার রাণী হতে তোমার আপত্তি আছে?

অগ্নি—আপত্তি না, কিছুমাত্রও না।

গুরু—তুমি ফাল্গুনি পূর্ণিমার দিন রাণীর আসনে ব'সবে।

অগ্নি—এ আদেশ শিরোধার্য্য।

গুরু (উঠিয়া)—আশীর্ব্বাদ গ্রহণ কর কন্যা। (আশীর্ব্বাদ শেষে) এইবার তুমি যাও আর আমার সম্মুখে দাঁড়িও না—দাঁড়িও না।—

অগ্নি—পিতা!

গুরু—ডেক না! তুমি যাও, তুমি যাও।

(অগ্নির ধীরে ধীরে প্রস্থান)

পঞ্চম দৃশ্য

পদ্মানদীর তীর। জ্যোৎস্না রাত্রি। চতুর্দ্দিক নিস্তব্ধ অগ্নি উপবিষ্টা।

রঞ্জিতের প্রবেশ

রঞ্জিৎ—ডেকেছ অগ্নি?

অগ্নি (চমকিয়া)

কে রঞ্জিৎ?—ব'স

রঞ্জিৎ (তৃণদলের উপরে বসিয়া)

ডেকেছ অগ্নি?

অগ্নি—খবর শুনেছ বোধ হয়, কেমন রঞ্জিৎ?

রঞ্জিৎ—খবর কই না?

অগ্নি (হাসিয়া) সেকি? এতবড় খবরটা তোমায় কেউ দিলে না? আশ্চর্য্য তো!

রঞ্জিৎ—না, আমি কিছু শুনিনি।

অগ্নি-শোননি? তবে শোন আমি শীঘ্রই রাজার রাণী হ'তে চ'লেছি।

রঞ্জিৎ (কিছুক্ষণ নীরবে থাকিয়া) এই কথা শোনবার জন্যে ডেকেছিলে?

অগ্নি—হঁ্যা।

রঞ্জিৎ—কিন্তু আশ্রম বালিকাদের নিয়ম তো তা নয় অগ্নি!

অগ্নি (হাসিয়া) নিয়ম আর সকলের বেলাতেও উল্টে যেতে পারে—যদি কেউ রাজার মত—

রঞ্জিৎ—রাজার মত কি অগ্নি?

অগ্নি—অমূল্য কিরীট উপহার দেয়।

রঞ্জিৎ—রাজা দিয়েছেন?

অগ্নি—হঁ্যা, রাজা আমার বিনিময়ে মুকুট দিয়েছেন।

রঞ্জিৎ—তবে তুমি রাণী হ'তে চলেছ।

অগ্নি—হঁ্যা।

রঞ্জিৎ—আনন্দের সঙ্গে।

অগ্নি—আনন্দের সঙ্গে।

রঞ্জিৎ—(কিছুক্ষণ নীরব থাকিয়া উঠিয়া দাঁড়াইল) না, তোমার সে আনন্দ আমি চূর্ণ ক'রবো অগ্নি, আমি তোমায় রাণী হ'তে দেব না।

অগ্নি (হাস্য) হা হা হা হা। পাগল!

রঞ্জিৎ (শিহরিয়া) কী ভীষণ হাসি! কী সুন্দর হাসি!

অগ্নি—শিউরে উঠছো? হাসি শুনে শিউরে উঠছো?

রঞ্জিৎ—হঁ্যা, তুমি বড় ভয়ানক।

অগ্নি—আর?

রঞ্জিৎ—সন্ধ্যা।

অগ্নি—পতঙ্গ আগুনকে সুন্দর দেখেই পুড়ে মরে। তুমিও পুড়ে মরতে চাও কেমন?

রঞ্জিৎ—সে পোড়াতে সতর্কতা আছে।

অগ্নি—আচ্ছা, পুড়বে, তুমিও পুড়বে। কিন্তু রঞ্জিৎ, ও কি? সরে আসছ কেন?

রঞ্জিৎ—স্পর্শ করবো, একবার তোমায় স্পর্শ ক'রব।

অগ্নি—পাগল! পাগল!!

রঞ্জিৎ—সরে যাচ্ছ? দূরে স'রে যাচ্ছ? অগ্নি সরে এস, ধরা দাও, আজ নিবিড়ভাবে ধরা দাও।

অগ্নি—পাগল! পাগল!

(নদীকূল দিয়া অগ্রে অগ্নি ও তৎপশ্চাৎ পশ্চাৎ রঞ্জিৎ

ছুটিতে লাগিল। অগ্নি দৌড়াইতে দৌড়াইতে রাজতোরণের সম্মুখে আসিয়া দাঁড়াইল) (হাঁপাইতে হাঁপাইতে) কে আছ ? কে আছ ?

(দ্রুতপদে এক বর্ম্মাবৃত পুরুষ মূর্ত্তির প্রবেশ)

মূর্ত্তি—আমি আছি।

অগ্নি—আশ্রয় চাই।

মূর্ত্তি—আমার কাছে ?

অগ্নি—হ্যাঁ,, তোমার কাছে।

মূর্ত্তি—তবে এস।

(পুরীর মধ্যে প্রবেশ করিয়া চলিতে চলিতে একটি সুসজ্জিত কক্ষে আসিয়া দাঁড়াইয়া মূর্ত্তি বর্ম্ম খুলিয়া ফেলিতেই অগ্নি চমকিয়া উঠিল)

অগ্নি—এ কি ? রাজা ?

রাজা—হ্যাঁ, আমি রাজা।

অগ্নি—তোমার প্রহরীবৃন্দ কোথায় গেল ?

রাজা—তাদের আজ ছুটি দিয়েছি, তুমি আসবে বলে।

অগ্নি—আমি আসব, তা জানতে ?

রাজা—গুরু খবর দিয়েছিলেন।

অগ্নি—উঃ—

রাজা—কাল প্রভাতেই তুমি রাণীর আসনে বসবে।

অগ্নি—স্মরণীয় দিন। কিন্তু তুমি আমায় কি উপহার দেবে রাজা ?

রাজা—কি চাও তুমি ?

অগ্নি—যা চাই, তা পাব ?

রাজা—তাই পাবে।

অগ্নি—তাই পাব ? তবে শোন রাজা, আমি আমার স্মরণীয় দিনে উপহার চাই—

রাজা—কি ?

অগ্নি—চাই গুরু রাঘবের ছিন্ন শির।

(রাজা চমকিয়া উঠিলেন)

অগ্নি—চমকিও না রাজা, চমকিও না। চাইই, রাঘবের ছিন্ন শির আমার চাই, ওই আমার একমাত্র শ্রেষ্ঠ উপহার। কাল প্রভাতে রাণীর অভিষেকের পরেই আমি দেখতে চাই গুরুর ছিন্ন শির। বল রাজা, পাব ? পাব ?

রাজা (অভিভূতভাবে অগ্নির চোখের দিকে চাহিয়া)

অগ্নি—পাব ?

রাজা—পাবে।

অগ্নি—(হাস্যে) হাঃ হাঃ হাঃ হাঃ কাল আমার জীবনের স্মরণীয় দিন—স্মরণীয় দিন।

রাজা—অগ্নি! অগ্নি !!

অগ্নি—চুপ করো রাজা ; চুপ কর। আমি আমার অভিষেকের বাজনা শুনতে পাচ্ছি, আর শুনতে পাচ্ছি কি জান ?

রাজা—না।

অগ্নি—শুনতে পাচ্ছি গুরুর কাতর ক্রন্দন। রাজা! রাজা !! চল বাগানে যাই, জ্যোৎস্নার আলোয় যাই, এ বন্ধ ঘর আর ভাল লাগছে না। চল, চল।

(হাত ধরাধরি করিয়া উভয়ের প্রস্থান)

ষষ্ঠ দৃশ্য

পরদিন প্রভাত। রাণীর বেশে অগ্নি সিংহাসনে উপবিষ্টা। ক্রোড়ে স্বর্ণপাত্রে রঘুনন্দনের ছিন্ন শির।

প্রতিহারীর প্রবেশ

প্রতিহারী—(অভিবাদন করিয়া) মহারাণী ! এক রমণী আপনার সাক্ষাৎ প্রত্যাশী।

অগ্নি—নিয়ে এস।

(প্রতিহারীর সহিত নারীসাজে রঞ্জিতের প্রবেশ ও প্রতিহারীর প্রস্থান। রঞ্জিৎ অগ্নির ক্রোড়স্থিত গুরুর ছিন্ন শিরের দিকে চাহিয়া শিহরিয়া উঠিল)

অগ্নি—(হাসিয়া) চিনতে পারব না ভেবেছিলে, নয় রঞ্জিৎ ?

রঞ্জিৎ—হ্যাঁ।

অগ্নি—তাই নারীবেশে এসেছেন ? কিন্তু দেখছো আমার কোলে এটা কি ? আজ আমি কে ! আর আমার একটা কথায় আজ কি হতে পারে ?

রঞ্জিৎ—(ঘৃণা ভরে) জানি, আজ তুমি রাণী আর—

অগ্নি—(হাসিয়া) ঘৃণা হচ্ছে ? আর কি ?

রঞ্জিৎ—পালক হন্ত্রী, বিশ্বাসঘাতিনী।

অগ্নি—(সক্রোধে) জান, তোমারও এই মুহূর্ত্তে গুরুর দশা হ'তে পারে ?

রঞ্জিৎ—জানি। কিন্তু তার আগে তোমাকেও ক্ষমা করতে পারিনে। (বস্ত্রাভ্যন্তর হইতে অস্ত্র বাহির করিয়া দ্রুতপদে অগ্রসর হইয়া গেল, অগ্নি নড়িল না, মৃদু হাসিল মাত্র)

শোধ নেব অগ্নি, প্রস্তুত হও।

অগ্নি—(রক্ষাবস্ত্র উন্মোচিত করিয়া) এই যে।

(রঞ্জিতের হাত কাঁপিয়া অস্ত্র গালিচার উপর পড়িয়া গেল)

রঞ্জিৎ—(চীৎকার করিয়া) অগ্নি! অগ্নি!!

অগ্নি—ছিঃ এত দুর্ব্বল চিত্ত তোমার? রঞ্জিৎ! তুমি না পুরুষ? তুমি না গুরু-হত্যার প্রতিশোধ নিতে এসেছিলে? তবে পিছিয়ে পড় কেন? অস্ত্র নাও, আমায় খুন কর, আমি বাঁচি; পিতৃহত্যার পাতক থেকে আমায় বাঁচাও, আমায় এ যন্ত্রণা হতে মুক্তি দাও।

(কাতরভাবে রঞ্জিতের হাত জড়াইয়া ধরিতেই রঞ্জিৎ শিহরিয়া সরিয়া দাঁড়াইল)

রঞ্জিৎ (সগর্জ্জনে) রাক্ষসী! পিশাচি!

অগ্নি—হ্যাঁ, আমি তাই। একদিন না একদিন পুড়ে মরতে চেয়েছিলে? ভুলে গেছ?

রঞ্জিৎ—হাঁ, ভুলেছি। অগ্নিকেও আর মনে পড়ে না।

অগ্নি—তবে তোমার সম্মুখে ব'সে কে?

রঞ্জিৎ—রাণী! আজ আমার সম্মুখে ব'সে আছে এক রাক্ষসী, সর্ব্বনাশী নারী।

অগ্নি—তাকেই আজ তুমি খুন করতে এসেছিলে।

রঞ্জিৎ—ভুল করেছিলাম। পালাই, পালাই; এখনি কেউ দেখতে পাবে।

দ্রুতপদে প্রস্থান

অগ্নি—(রুদ্ধস্বরে) রঞ্জিৎ! রঞ্জিৎ!!

সপ্তম দৃশ্য

রাজার শয়ন কক্ষ। রাজা বহুমূল্য পালঙ্কে নিদ্রিত; সম্মুখে শূন্য গরলাধার হস্তে দাঁড়াইয়া অগ্নি।

রাত্রি শেষ হইয়া আসিয়াছে। নহবৎ বাজিতে সুরু করিয়াছে; পুরবাসী তখনও কেহ জাগে নাই।

অগ্নি—(হাসিয়া) ঘুমাও রাজা, সুখে ঘুমাও; এ ঘুম আর তোমার কেউ ভাঙ্গাতে পারবে না। নহবৎখানায় নহবতে সুরের নানা হেরফের চলছে, তুমি ঘুম ভেঙ্গে শুনবে ব'লে, কিন্তু আজ আর তুমি শুনতে পাবে না। আগুনের ধারার মত ব'য়ে চলেছি। রাজা! রাজা!! ঘুমাও, ঘুমাও!! তোমার রূপের রাণী আজ যে তোমায় ঘুম পাড়িয়েছে। সে ঘুম আর কেউ ভাঙ্গাতে পারবে না। গুরুকে ঘুম পাড়িয়েছে, তোমায় ঘুম পাড়িয়েছি, আর এক জনের ঘুমের অভিসারে চলেছি।

অনেক কাজ, আজ আমার অনেক কাজ' যাই তবে, ঘুমাও রাজা, ঘুমাও।

(কক্ষ হইতে বাহির হইয়া রাজপুরীর বাহিরে পড়িল ও চলিতে চলিতে পূর্ব্বের আশ্রমের নিকটবর্ত্তী একটী কুটীর দ্বারে আসিয়া উপস্থিত হইল। রুদ্ধদ্বারে করাঘাত করিয়া) রঞ্জিৎ। দুয়ার খোল। (ভিতর হইতে দুয়ার খুলিয়া রঞ্জিৎ বাহিরে আসিল।)

রঞ্জিৎ—(চমকিয়া) রাণী তুমি?

অগ্নি—হ্যাঁ, আমি রাণী। তোমার সঙ্গে কথা আছে রঞ্জিৎ।

রঞ্জিৎ—আমার সঙ্গে কথা আছে—তোমার?

অগ্নি—হ্যাঁ, আমার।

রঞ্জিৎ—বিশ্বাস হয় না।

অগ্নি—অবিশ্বাস হবার তো কোনও লক্ষণ দেখি না' যাক্ আর কাউকে জানিয়ে কাজ নেই; পদ্মানদীর কূলে চল, দেখবে নদীতে কেমন ভাঙ্গন ধরেছে, আর ঢেউয়ের কি তাণ্ডব নৃত্য।

রঞ্জিৎ—সে আমি দেখেছি।

অগ্নি—ভাল কোরে দেখেছ?

রঞ্জিৎ—ভাল করে দেখেছি।

অগ্নি—তা হোক্ চল রঞ্জিৎ, শুধু আজকের এই রাতের অন্ধকারটি যতক্ষণ থাকবে, ততক্ষণ; তারপরে তুমি ফিরে এস, আমি বারণও করব না, চল।

রঞ্জিৎ—তোমার সঙ্গে আমার যাওয়া সাজে না, তুমি রাণী।

অগ্নি—তোমায় রাজা সাজাব ব'লেই তো নিয়ে যাচ্ছি রঞ্জিৎ।

রঞ্জিৎ (চমকিয়া) কি? কি ব'ললে?

অগ্নি—না, কিছু নয়। তুমি যে রঞ্জিৎ, আর দেরী নয়, এখনই সূর্য্য উঠবে। ঐ শোন, পাখীদের অস্ফুট কাকলী শোনা যাচ্ছে। রাজবাড়ীর নহবতের রাগরাগিণীও থেমে এসেছে।

রঞ্জিৎ—(অগ্রসর হইতে হইতে) তবে চল কিন্তু তুমি যে

রাজবাড়ী থেকে চলে এলে রাণী। নহবতের রাগরাগিণী শুনছে কে?

অগ্নি—(হাসিয়া) রাজা।

রঞ্জিৎ—উঃ, রাণী আজ তোমার হাসিটাও অত ভীষণ দেখাচ্ছে কেন? এমন তো আমি কোনও দিনই দেখিনি!

অগ্নি—যেদিন গুরুর ছিন্ন শির লয়ে বসেছিলাম, সেদিনও নয়?

রঞ্জিৎ—ঠিক মনে পড়ে না, সে প্রায় এক বৎসর আগের কথা।

অগ্নি—হ্যাঁ, আজ আবার এক বৎসর পরে সেইদিন ফিরে এসেছে। আর ফিরে এসেছে সেইদিনটি, যেদিন বলেছিলে আমি তোমার ভালবাসি অগ্নি, তোমার ভুবন-ভোলান রূপকে ভালবাসি! (কথা কহিতে কহিতে উভয়ে পদ্মানদীর তটে আসিয়া দাঁড়াইল)

নীরব কেন রঞ্জিৎ, উত্তর দাও, একদিন ব'লেছিলে মরণকে বরণ করে অমর হ'তে চাও, আজ তা পারবে।

রঞ্জিৎ—একথা আজ কেন?

অগ্নি—উঃ, অনেকদিন হ'য়ে গেছে নয়? দিনের পর দিন গত হ'লে প্রবৃত্তি যে একরকম থাকে না, তুমিই তার জলন্ত প্রমাণ, কি করব? নীরব কেন রঞ্জিৎ?

রঞ্জিৎ—বল।

অগ্নি—(শাণিত কৃপাণ হস্তে অগ্রসর হইয়া আসিয়া) প্রস্তুত হও রঞ্জিৎ; সেদিন তুমি আমায় যা দান করতে পারনি, আজ আমি তাই তোমায় দান ক'রবো। যদি ভগবানকে কোনওদিন মেনে থাক, তবে তাঁকে স্মরণ কর, না হ'লে—

রঞ্জিৎ—না হ'লে কি?

অগ্নি—যদি কাউকে কোনওদিন ভালবেসে থাক তাকে ভাব।

রঞ্জিৎ—(হাসিয়া ঘৃণাপূর্ণ স্বরে) ভয় পাব' ভেবেছ? কিছু না। ভগবান আছেন কি না জানি না; কিন্তু ভালও আমি কাউকে বাসিনি।

অগ্নি—কোনওদিন না?

রঞ্জিৎ—না, কোনওদিন নয়।

অগ্নি—তবে আমায় মিথ্যাকথা বলেছিলে?

রঞ্জিৎ—হ্যাঁ।

অগ্নি—(রুদ্ধস্বরে) উঃ এতদিনে—এতদিন পরে আমায় কাঁদালে? রঞ্জিৎ,—রঞ্জিৎ—

(রঞ্জিৎ উত্তর দিল না, অগ্নির হস্ত হইতে অস্ত্র লইয়া আপনার বিশাল বক্ষে আমূল বিদ্ধ করিয়া ছিন্নমূল তরুর ন্যায় লুটাইয়া পড়িল)

অগ্নি—(চীৎকার করিয়া) রাজা, রাজা আমার!!

(উভয়কে লইয়া খানিকটা স্থান মহাশব্দে পদ্মাবক্ষে ভাঙ্গিয়া পড়িল)

নানা কথা

লক্ষ্ণৌ মুস্লিম জাতীয় সম্মেলনে সভাপতি স্যার আলী ইমামের বক্তৃতা

অদ্যকার এই বিপুল জনসমাবেশ দেখিয়া পার্লামেন্টের শাসন-সংস্কার যুগের কথা আমার মনে হইতেছে। তৎকালে মিশ্র নির্ব্বাচন প্রথার সমর্থকের সংখ্যা বোধ হয় অঙ্গুলীতে গণিয়া শেষ করা যাইত। যাঁহারা স্বতন্ত্র নির্ব্বাচন-প্রথার প্রবল সমর্থক ছিলেন, আমি নিজেও সেই দলের অন্তর্ভুক্ত ছিলাম, এবং প্রকৃত পক্ষে গত ১৯০৫ খৃষ্টাব্দে লর্ড মিন্টোর সঙ্গে ঐ সম্পর্কে যে ডেপুটেশন সাক্ষাৎ করিতে গমন করেন, আমি সেই ডেপুটেশনের একজন সদস্যও ছিলাম। কিন্তু ১৯০৫ এবং ১৯০৯ সালের মধ্যবর্ত্তী সময়ে আমি ঐ প্রশ্ন সম্বন্ধে বিশেষভাবে পর্য্যালোচনার অবসর লাভ করি এবং সুনিশ্চিতভাবে এই সিদ্ধান্তে উপনীত হই যে, স্বতন্ত্র নির্ব্বাচন-প্রথা শুধু ভারতের জাতীয়তারই বিরোধী নহে, উহা নিঃসংশয়িতরূপে মুস্লিম সমাজের পক্ষেও ক্ষতিকর। ১৯০৯ সালেই এই স্বতন্ত্র নির্ব্বাচন-নীতির বিরুদ্ধে প্রতিবাদ ধ্বনি উত্থিত করি, কিন্তু তৎকালে মুসলমানেরা প্রায় সকলেই সংবাদপত্রে এবং জনসভায় আমার মতের নিন্দাবাদ করেন।

২২ বৎসর পরের অবস্থা

তৎপরে ২২ বৎসর কাল কাটিয়া গিয়াছে, এই ২২ বৎসর পরে, আমি আমার সম্মুখে শুধু ভারতের সকল প্রদেশের মুসলমান সমাজের প্রতিনিধিদিগকে মাত্র নহে পরন্ত কয়েকটী শক্তিশালী প্রতিষ্ঠানের প্রতিনিধিদিগকে এবং প্রকৃতপক্ষে সমগ্র শিক্ষিত মুসলমানসমাজের প্রতিনিধিদিগকে সমবেত দেখিতে পাইতেছি। অদ্যকার এই সভায় মুস্লিম ন্যাশনালিষ্টগণ, অন্য কথায় যাহারা স্বতন্ত্র নির্ব্বাচননীতির অনুরাগী নহেন, তাঁহাদের প্রতিনিধিগণ সমবেত হইয়াছেন। গত ২০ বৎসরে অভীষ্টপথে আমরা অভাবনীয়রূপে অগ্রসর হইয়াছি। এই সম্মেলনের নির্ব্বাচিত সভাপতিরূপে আমি ভারতের সকল অংশ হইতে এবং বিভিন্ন নেতৃগণের নিকট হইতে অসংখ্য বার্ত্তা প্রাপ্ত হইয়াছি, তাঁহারা সকলেই মিশ্র নির্ব্বাচন প্রথার দৃঢ়ভাবে সমর্থন করিয়াছেন। ঘটনাচক্রের এই যে গতি, ইহা খুবই আনন্দের বিষয়, এবং এতদ্দারা ইহাই প্রতিপন্ন হইতেছে যে, সঙ্ঘবদ্ধ এবং সম্মিলিত ভারতীয় জাতীয়তার পতাকা ঊর্দ্ধে ধারণ করিতে ভারতের মুসলমানগণ অপর কোন সম্প্রদায় অপেক্ষা পশ্চাদ্‌বর্ত্তী নহেন।

অদম্য শক্তি

আমি আপনাদের নিকট সাহস করিয়া এই ভবিষ্যদ্বাণী করিতে পারি যে, ভারতের মুসলমানদের এই আন্দোলন, উত্তরোত্তর শক্তিশালী হইয়া উঠিবে এবং জগতের কোন শক্তিই তাহাকে রুদ্ধ করিতে সক্ষম হইবে না। নিরাশার কোনই কারণ নাই। কালের গতি আমাদেরই অনুকূলে।

স্বাধীনতা সংগ্রামে মুসলমান

ভারতের বর্ত্তমান স্বাধীনতা সংগ্রামে গত দুই বৎসর কাল মুস্লীম ন্যাশনালিষ্টগণ যে সব দুঃখ কষ্ট বরণ করিয়া লইয়াছেন, শুধু তাহা লক্ষ্য করিলেই কালের গতি কোন্ দিকে বুঝিতে পারা যাইবে। অদ্যকার এই মহতী সভায় এমন অনেকে আছেন, যাঁহারা অদম্য দৃঢ়তার সহিত এবং প্রফুল্লচিত্তে অন্যান্য স্বদেশ প্রেমিকগণকে যে সব দুঃখ কষ্ট সহ্য করিতে হইয়াছে, তাঁহারাও তৎসমুদয় সহ্য করিয়াছেন। তাঁহাদের এই আত্মত্যাগ কখনই বৃথা যাইতে পারে না।

যদি আমাকে কেহ জিজ্ঞাসা করেন যে, ভারতের জাতীয়তার প্রতি আমার এইরূপ অবিকল শ্রদ্ধা কেন, তদুত্তরে আমি বলিব উহা ব্যতীত ভারতের স্বাধীনতা সম্পূর্ণ অসম্ভব। স্বতন্ত্র নির্ব্বাচননীতি জাতীয়তার অভাবেরই দ্যোতক। রাজনীতিক সমস্যাসমূহ সামাজিক নীতিসমূহের প্রতিঘাত ব্যতীত অন্য কিছু নহে। আপনারা যদি বিভিন্ন সম্প্রদায়ের মধ্যে একটি লোহার প্রাচীর তুলেন, তাহা দ্বারা আপনারা সমাজের সংস্থানসূত্রকেই ধ্বংস করিবেন। আপনারা যদি রাজনৈতিক ব্যবধান সৃষ্টির উপর জোর দিতে থাকেন, দিন দিন আপনাদের জীবন দুর্ব্বহ হইয়া উঠিবে। রাষ্ট্র শাসনতন্ত্রে স্বতন্ত্র স্বতন্ত্র শ্রেণীর গণ্ডী নির্দ্দেশের তাৎপর্য্য কি বিবেচনা করিয়া দেখুন।

তৃতীয় পক্ষের শক্তি বৃদ্ধি

স্বতন্ত্র নির্ব্বাচননীতির পথে এই যুক্তি দেখান হইয়া থাকে যে মুসলমানেরা সংখ্যায় কম, শিক্ষায় পশ্চাৎবর্ত্তী এবং আর্থিক হিসাবে অনুন্নত। এই যুক্তি দৃঢ় করিবার জন্য বলা হয় হিন্দুদের প্রবল বিরুদ্ধতার সঙ্গে যুদ্ধ করিয়া তাহারা কখনই নির্ব্বাচনদ্বন্দ্বে জয়লাভে সক্ষম হইবে না। ইহাতে ইহাই স্বীকার করিয়া লওয়া হয় যে, প্রত্যেক হিন্দু মুসলমানদের চির-শত্রু। আমি এই সংজ্ঞা নির্দ্দেশে বিশ্বাস করি না, কিন্তু যদি ঐগুলি সত্য বলিয়াও ধরিয়া লওয়া যায়, তাহা হইতে কি সিদ্ধান্ত আসে? প্রথমে এই কথা স্বীকার করিয়া লওয়া হয় যে, মুসলমানেরা অত্যন্ত দুর্ব্বল, নিজেদিগকে রক্ষা করিবার শক্তি তাহাদের নাই। দ্বিতীয়তঃ মুসলমানদের শত্রুস্বরূপ হিন্দুরা অতি নিষ্ঠুর এবং দুর্দ্দমনীয় এবং পরিশেষে এই সিদ্ধান্ত করিতে হয় যে, মুসলমানদের স্বার্থরক্ষার জন্য শাসনতন্ত্রে সংরক্ষণ ব্যবস্থা থাকা আবশ্যক।

ঐ সব সংরক্ষণ ব্যবস্থার পশ্চাতে যদি কোনরূপ শক্তি না থাকে, তাহা হইলে ঐ গুলির দ্বারা যে বাস্তবিক পক্ষে স্বার্থ সংরক্ষিত হইতে পারে, আমি ইহা বিশ্বাস করি না। মুসলমানেরা যদি নিজদিগকে রক্ষা করিতে না পারে এবং হিন্দুরা তাহাকে রক্ষা না করে, তাহা হইলে সে শক্তি নিশ্চয়ই তৃতীয় পক্ষের হাতে গিয়া বর্ত্তিবে। ইহা কি জাতীয়তার বিরোধী নহে? ইহাতে কি ইহাই প্রতিপন্ন হয় না যে, এ দেশে যে সমর্থন পাওয়া যাইতে পারে না, সেই সমর্থনের উপরই স্বতন্ত্র নির্ব্বাচনবাদীদের ভরসা? ইহার অর্থ চিরন্তন শিক্ষানবিশীতে অবস্থান করা। ন্যাশানালিষ্ট মুসলমানগণ, স্বাধীনতার আশা অন্তরে পোষণ করেন, এমন অবস্থায় তাঁহারা যে শাসনতন্ত্রে স্বতন্ত্র নির্ব্বাচননীতির প্রবর্ত্তন করিতে ঘৃণা বোধ করিবেন, ইহা কি আশ্চর্য্যের বিষয়? একদল লোক আছেন যাঁহারা যুক্ত-নির্ব্বাচন প্রথার সহিত কতকগুলি সর্ত্ত বরাদ্দ করিয়া দিতে ইচ্ছুক। আইন সভায় আসন 'রিজার্ভ' বা স্বতন্ত্র রাখিবার দাবী প্রভৃতিতে তাঁহাদের মত অভিব্যক্ত হইয়াছে।

ফাঁদে পড়িবেন না

এ সম্বন্ধেও আমার ব্যক্তিগত মত এই যে, ঐগুলি ফাঁদস্বরূপ এবং বিশেষভাবে ঐগুলি পরীক্ষা করিয়া দেখিলে, বাহিরের কোন শক্তির উপস্থিতির আবশ্যকতাই উহার ফলে অনিবার্য্য প্রতিপন্ন হইবে। কোনরূপ সর্ত্ত বা বাধা-নিষেধ বিনির্ম্মুক্ত অবিকৃত যুক্তনির্ব্বাচননীতিকে সোজা-সুজিভাবে সমর্থন করাই আজ একান্ত আবশ্যক; ইহাই আপনাদের নিকট আমার নিবেদন। স্বার্থ সুবিধা লুঠের ব্যাপারে ভারতীয় মুসলমানদের ভাগবাঁটোয়ারা সম্বন্ধে অনেক কথা বলা হইয়াছে, কোন বিধি-বিধানের দ্বারা যে, এই ভাগ বাঁটোয়ারা স্থিরীকৃত হইতে পারে, এ বিশ্বাস আমি করি না। ভারতের স্বাধীনতা লাভ করিতে এবং সে স্বাধীনতা রক্ষাকল্পে মুসলমান সমাজের অবদানের অনুপাতেই মুসলমান-সমাজ ঐ সব সুখ সুবিধার ভাগী হইবে। মুসলমানদের ভয় করিবার কিছুই নাই। উত্তর-পশ্চিম সীমান্তের বীর মুসলমানগণ, বাঙ্গলা এবং পূর্ব্ব-সীমান্তের

মুসলমানদের সংখ্যাবাহুল্য স্বাধীন ভারতের মুসলমান সম্প্রদায়ের নির্বিঘ্নতার পক্ষে অধৃষ্যশক্তিস্বরূপ থাকিবে। ভবিষ্যৎ ভারতে হিন্দুরাজ অথবা মুসলমানরাজ বলিয়া কোন কিছুর স্থান হইবে না। স্বদেশ প্রেমের উদার ভিত্তির উপর ভারতের জনগণের রাষ্ট্রীয় স্বাধীনতা প্রতিষ্ঠিত থাকিবে। সাম্প্রদায়িকতার কলঙ্ক-কালিমার স্পর্শ তাহাতে থাকিবে না। ভারতের তেমন রাষ্ট্রীয় স্বাধীনতাই আপনাদের লক্ষ্য হউক এবং সেই লক্ষ্য সাধনে আপনারা আত্মত্যাগে অগ্রসর হউন।

উত্তর পশ্চিম সীমান্তে জাগরণ

উত্তর-পশ্চিম সীমান্তের অধিবাসীদের মধ্যে রাজনীতিক নব-জাগরণ সুস্পষ্টরূপে অভিব্যক্ত হইয়াছে। ভারতের জাতীয় সংহতি উত্তরোত্তর বর্দ্ধিত হইতেছে, উহা তাহার সু-নিশ্চিত লক্ষণ। আশার আর একটি কারণ আছে। বিশ্ববিদ্যালয়, বণিকসভা প্রভৃতি যে সব স্থলে গণ্ডীবদ্ধভাবে যুক্তনির্ব্বাচনপ্রথা প্রচলিত আছে, সে সব স্থানেও সাম্প্রদায়িক বিরোধ ক্রমশঃই বিলোপ হইয়া যাইতেছে। আমার নিজের প্রদেশে—বিহারে মৌলবী আবদুল হাফীজ এবং মিঃ আলী মনজার সম্প্রতি নির্ব্বাচন দ্বন্দে জয়লাভ করিয়াছেন। তাহা হইতে সুস্পষ্ট ভাবে প্রমাণিত হইয়াছে যে, সদস্যপদপ্রার্থীদের চরিত্র এবং যোগ্যতার বিবেচনা সাম্প্রদায়িক সংস্কারকে পরাভূত করিয়াছে। ইঁহাদের মধ্যে একজন প্রাদেশিক ব্যবস্থাপক সভায় এবং অপর ব্যক্তি বিশ্ববিদ্যালয়ের সিনেটে হিন্দুদের বিপুল সংখ্যাধিক্যের ভোটের জোরে প্রভাবশালী হিন্দু প্রতিদ্বন্দ্বীগণকে পরাস্ত করিয়া নির্ব্বাচিত হইয়াছেন। যুক্তনির্ব্বাচনপ্রথা একবার প্রবর্ত্তিত হইলে সদস্যপদপ্রার্থীদের চরিত্রবল, যোগ্যতা এবং ব্যক্তিগত প্রভাব নিশ্চয়ই সাম্প্রদায়িক সংস্কারের ঊর্দ্ধে উত্থিত হইবে। জগৎ অনেকটা আগাইয়া গিয়াছে, এখন রাজনীতিতে অন্য কোন বিচার আর চলিতে পারে না।

ইহা সত্য যে, এই সেদিন বেনারস, মীর্জাপুর, আগ্রা এবং কাণপুরে ভীষণ শোচনীয় কাণ্ড ঘটিয়াছে। অনেকে আছেন, যাঁহাদের এইরূপ বিশ্বাস যে, এজেন্ট প্রভোকেটর বা প্ররোচক গুপ্তচর দ্বারা ঐ সব হইতেছে।

অন্যেরা বিশ্বাস করেন যে, উভয় সম্প্রদায়ের গুণ্ডাশ্রেণীর লোকেরাই এই সমস্ত দাঙ্গা বাধায়। এই সমস্ত সর্ব্বনাশকর আত্মকলহের মূল কি, তাহা এখানে স্থির করা সম্ভবপর নহে। আমি সাগ্রহে আশা করি যে, এই সমস্ত দুর্ঘটনা অতীতের বিষয়ই হইবে। বড়ই দুঃখের বিষয় যে, কেহ কেহ এই সমস্ত দাঙ্গাগুলিকে রাজনৈতিক কুমতলব সিদ্ধির জন্যই প্রয়োগ করার জন্য চেষ্টা করিতেছে। এইরূপ ঘটনার পুনরাবৃত্তি যাহাতে না হয় এবং উভয় সম্প্রদায়ের মনোমালিন্য যাহাতে দূরীভূত হয় তজ্জন্য সর্ব্বতোভাবে যত্ন করিতে হইবে। এক্ষণে ভারতের পরমসঙ্কিক্ষণ—কাজেই সমস্ত ভারতবাসীর একমাত্র কর্ত্তব্য সাম্প্রদায়িক মিলন দৃঢ় করা এবং চার্চ্চিলের দলকে ভবিষ্যৎ শাসন-সংস্কারে বাধা দেওয়ার সুযোগ না দেওয়া।

ডাঃ আনসারী

আমরা যে সমস্যার সমাধান করিতে এস্থলে সমবেত হইয়াছি, তাহার উপর ভারতের ভাগ্য এবং মুসলমানদের সভ্যতাগত অধিকার জড়িত রহিয়াছে। স্বাধীনতার জন্য ভারত যে অহিংস সংগ্রাম করিয়াছে, তাহা জগতে অতুল, এই সংগ্রামে প্রথম স্তরে সে জয়লাভ করিয়াছে, কিন্তু ইহা প্রাথমিক স্তর মাত্র। স্বার্থসংশ্লিষ্ট ব্যক্তিগণ আমাদের নিজেদের মধ্যে বিরোধের সৃষ্টি করিয়া ঐ সংগ্রামের ফল হইতে ভারতভূমিকে বঞ্চিত করিতে চেষ্টায় প্রবৃত্ত আছে। একথা এখন আর চাপা নাই যে, স্বার্থ সংশ্লিষ্ট ব্যক্তিরা এই কার্য্যে উঠিয়া পড়িয়া লাগিয়াছে। কিছুর মধ্যে কিছু না এমন অবস্থাতেও সাম্প্রদায়িক দাঙ্গা ঘটিতেছে। বিপজ্জনকভাবে আজ অনেক লোকের ভাবোচ্ছ্বাসের ছড়া-ছড়ি আরম্ভ হইয়াছে। এমন একটা আবহাওয়ার সৃষ্টি করিবার চেষ্টা হইতেছে, যাহাতে হিন্দু-মুসলমান এই উভয় সম্প্রদায়ের মধ্যে মৈত্রী এবং সহযোগিতা সম্ভব না হয়, ভারতের সমস্যা দিন দিনই জটিল আকার ধারণ করিতেছে। যাহাতে ভারতের এবং মুসলমান সম্প্রদায়ের স্বার্থ সংরক্ষিত থাকিতে পারে, সেজন্য জাতীয়তাবাদী মুসলমান সমাজের বিভিন্ন মতাবলম্বী রাজনীতিকদের সঙ্গে একটা মীমাংসায় পৌঁছিতে চেষ্টা করিতেছেন।

দেশ ও সমাজ :—

দেশ এবং সমাজ এই দুইটি বিষয়ের উপর আমি বিশেষ জোর দিতে চাই। কারণ এক দল লোক নিতান্ত ধৃষ্টতাসহকারে এই অভিযোগ করিতেছে যে জাতীয়তাবাদী মুসলমানগণ ইস্লামের স্বার্থ দেখেন না। তাঁহাদের ঐ অভিযোগ যে কতদূর মিথ্যা, আমি তাহা দেখাইতে চাই। যাঁহারা এই অভিযোগ করেন, ইস্লামের আধ্যাত্মিক উদারতার কথা তাঁহাদের স্মরণ রাখা উচিত; ইস্লাম জগতের মানব-সৌভ্রাত্রের আদর্শকে ঊর্দ্ধে ধারণ করিয়াছে এবং তাহাকে এই শিক্ষা দিয়াছে যে, সেই সৌভ্রাত্রের স্থান সর্ব্বদা সঙ্কীর্ণ গোঁড়ামীর উপরে। দেশের জন্যই হউক, আর সমাজের জন্যই হউক, জাতীয়তাবাদী মুসলমানগণের দাবী ন্যায়ের উপর প্রতিষ্ঠিত। সেক্ষেত্রে জাতির এবং সাম্প্রদায়িক স্বার্থে যে সঙ্ঘাত কোথায়, আমি বুঝিতে পারি না। জাতীয়তাবাদী মুসলমানগণ অন্যান্য রাজনীতিক মতাবলম্বী মুসলমানদের সঙ্গে আপোষ-নিষ্পত্তি করিতে বারংবার চেষ্টা করিয়াছেন। তাঁহারা অপর দলের মত কতকটা মানিয়া লওয়া সম্ভব বলিয়াছিলেন, কিন্তু তাহা সত্ত্বেও নির্ব্বাচননীতি সম্পর্কিত প্রস্তাব লইয়া ঐ আলোচনা ফাঁসিয়া গিয়াছে। ঐক্যবদ্ধ জাতীয়তা গঠনের পক্ষে যুক্তনির্ব্বাচন প্রথার প্রয়োজনীয়তা প্রদর্শন করিবার যে কোন আবশ্যকতা আছে, তাহা আমি মনে করি না। বিশিষ্ট মুসলমানদের মধ্যে অনেকেই উহার অনুকূল মতাবলম্বী। রাজনীতির দিক হইতে স্বতন্ত্র নির্ব্বাচন প্রথা যে সাম্প্রদায়িক ভেদবিদ্বেষ এবং বিরোধকে চিরস্থায়ী করিবার একটি সর্ব্বোৎকৃষ্ট কৌশল, একথা কাহাকেও বুঝাইয়া দিতে হইবে না। যে প্রদেশের মুসলমানেরা সংখ্যায় লঘিষ্ঠ, সেই সব স্থান এবং ভোটের ওপর সমগ্র ভারতে তাহারা

যে অযোগ্য এবং অক্ষম, ঐ প্রথাতে তাহাই স্বীকার করিয়া লওয়া হয় এবং উহার ফলে বিদ্বেষভাব এবং নৈতিক অধোগতি অনিবার্য্য।

সভ্যতার দিক হইতেও ঐ প্রথা দারুণ অনিষ্টকর। মুসলমানগণ ঐ স্বতন্ত্র নির্ব্বাচন প্রথার প্রাচারের দ্বারা নিজদিগকে আবদ্ধ করিয়া রাখিলে ভ্রান্ত নির্বিঘ্নতার একটা বিশ্বাসে তাহাদের সভ্যতার অন্তর্হিত তেজোবীর্য্য নষ্ট হইয়া পড়িবে। স্বতন্ত্র নির্ব্বাচনবাদী পুরাতত্ব রাখিবার যাদুঘরে মুসলমান সভ্যতাকে রাখিতে চাহিতেছেন। আমি নিজে এই বিশ্বাস করি যে, ভারতের মোস্লেম সভ্যতা এক প্রাণবান জিনিষ, জাতীয়তাবাদী মুসলমানগণ এই স্বতন্ত্র নির্ব্বাচনকে ভারত এবং মুসলমানসমাজ উভয়ের পক্ষেই দারুণ ক্ষতিকর মনে করিয়া থাকেন, তাঁহারা কিছুতেই ইহার সমর্থন করিতে পারিবেন না।

বোম্বাই করপোরেশন ও মহাত্মা

কর্পোরেশনের অভিনন্দন

এক বৎসর পূর্ব্বে আপনি জাতীয় জীবনে যে উৎসাহের সঞ্চার করিয়াছেন উহা অপূর্ব্ব এবং অদম্য শক্তিশালী। গত এক বৎসরের রাষ্ট্রীয় অভ্যুত্থানে জগতের সমক্ষে ইহা প্রমাণিত হইয়া গিয়াছে যে, ভারতকে আর জগতের জাতিসঙ্ঘে স্বাধীনতা ও আত্ম-সম্মানের আসন হইতে বঞ্চিত রাখিতে পারা যাইবে না। আপনি জগতকে যে অহিংসার মন্ত্র দিয়াছেন, উহা আজ দিকে দিকে মানবতার বহুধা কল্যাণ সাধন করিতেছে। এতদ্দেশের সকল সম্প্রদায়ের মধ্যে মৈত্রী ও সম্প্রীতি প্রতিষ্ঠার জন্য আপনার মহনীয় উদ্যমের মর্ম্ম উপলব্ধি করিয়া আমরা কৃতজ্ঞতায় শির নত করিতেছি। আমাদের প্রিয় জন্মভূমির সমৃদ্ধি ও উন্নতির পক্ষে নিপীড়িত অস্পৃশ্য সমাজের উন্নয়ন প্রচেষ্টা হিন্দু-মুসলমান সমস্যা সমাধান প্রচেষ্টা অপেক্ষা কম গুরুত্বপূর্ণ নহে। যাহাতে ভারতের প্রতি সন্তান, জাতিবর্ণ-নির্ব্বিশেষে সামাজিক, রাজনৈতিক ও আর্থিক অধিকার ভোগ করিতে পারে এজন্য আপনার মহান প্রচেষ্টার আমরা সর্ব্বান্তঃকরণে সাফল্য কামনা করিতেছি।... ...

মহাত্মার উত্তর

'আমি চিরদিনই দরিদ্র নারায়ণের প্রতিনিধিত্বের দাবী করিয়া থাকি, আমার কাছে স্বরাজের অর্থ হিন্দুস্থানের ৭ শত পল্লীর অধিবাসী জনসাধারণের উন্নতি বিধান, নগরগুলিকে যদি তাহাদের নিজেদের অস্তিত্বের যুক্তিযুক্ততা সপ্রমাণ করিতে হয় তাহা হইলে নগরসমূহকে দারিদ্র্য-পীড়িত পল্লীবাসীদের অবস্থার উন্নতি করিয়া দিতে হইবে লক্ষ লক্ষ ক্ষুধার্ত্তের অন্ন সংগ্রহের ব্যবস্থা করিয়া দিতে হইবে—উহাই হইতেছে পূর্ণ স্বরাজ। অস্পৃশ্যতা সম্বন্ধে আমি এই মাত্র বলিতে পারি যে, উহা হিন্দুধর্ম্মের কলঙ্ক। উহা অপসারিত না করা পর্য্যন্ত আমরা স্বরাজের যোগ্য হইতে পারিব না। হিন্দু-মুসলমান সমস্যা সমাধান সম্বন্ধে আমার বক্তব্য এই যে, এই সমস্যা সমাধান সম্পর্কে যে কর্ত্তব্যভার আমি বরণ করিয়া লইয়াছি, উহা এক আমার দ্বারা সম্পন্ন হওয়া অসম্ভব, আমি এজন্য সকলের সাহায্য প্রার্থনা করি। হিন্দু, মুসলমান, জৈন, শিখ, খ্রীষ্টান সকলের সাহায্য চাই এবং উঁহাদের সকলকেই নিজকে সর্ব্বাগ্রে ভারতীয় বলিয়া ভাবিতে শিখিতে হইবে।"

নারী সম্মেলনে

সরলা দেবী চৌধুরাণীর অভিভাষণ

বাংলার নারীদের জন্য একটি পৃথক কংগ্রেসের কি প্রয়োজন ছিল—এই প্রশ্ন আজ চারিদিক হইতে জিজ্ঞাসিত হইতেছে। আমি যতদূর বুঝিতে পারি, তাহাতে মনে হয়, এই কংগ্রেস বঙ্গনারীর আত্মচেতনার মূর্ত্ত বিকাশ, বাঙ্গালার পুরুষের আত্মচেতনার সহিত তাহার সম্পর্ক নাই। বাংলার নারী তাহার জীবনের বিভিন্ন বিভাগে যে বৈষম্যমূলক ব্যবহার পাইয়া আসিয়াছে, তাহার ফলেই এই আত্মচেতনার উদ্ভব। সামাজিক আচার-নিয়ম তাহার আত্মবিকাশের পরিপন্থী, গার্হস্থ্য নীতির আদর্শ পুরুষের পক্ষে একরূপ, নারীর পক্ষে অন্যরূপ এবং উত্তরাধিকারের আইনগুলি চিরকালের জন্য তাহাকে পুরুষের মুখাপেক্ষী করিয়া রাখিয়াছে।

পরস্পর প্রয়োজন :—

জীবনের প্রত্যেক ক্ষেত্রে পুরুষ এবং নারীর পরস্পর প্রয়োজন আছে। কিন্তু পুরুষ তাহার নিজ স্বার্থোদ্দেশ্যেই নারীকে ব্যবহার করিয়াছে—নারীর নিজ প্রয়োজন পূরণ করিতে বিশেষ কোন সাহায্যই সে করে নাই। সমাজের বুকে নিজেদের স্থান প্রতিষ্ঠা করিবার জন্য বাঙ্গলার নারীগণ আজ ভারতের এবং পৃথিবীর অন্যান্য দেশের নারীদের সহিত সমভূমে দণ্ডায়মান হইয়াছে।

পুরুষের উৎপীড়ন :—

এক শতাব্দী পূর্ব্বে মার্কিণ রমণীরা তাহাদের 'মনোভাবের' বিবৃতিতে বলিয়াছিলেন যে, মানবজাতির ইতিহাস পর্য্যালোচনা করিলে দেখা যায়, পুরুষ চিরদিনই নারীকে তাহার অধিকার হইতে পুনঃ পুনঃ বঞ্চিত করিয়া আসিয়াছে ; পুরুষের মূল লক্ষ্য ছিল নারীর উপর সম্পূর্ণ কর্ত্তৃত্ব স্থাপন করা ; সে যত প্রকারে পারিয়াছে নারীর আত্মশক্তিতে বিশ্বাস নষ্ট করিতে, তাহার আত্মসম্মান খর্ব্ব করিতে এবং তাহাকে পরাধীন ও ঘৃণিত জীবন যাপনে রাজি করিতে চেষ্টা করিয়াছে।

ক্রমশঃ অধিকার প্রতিষ্ঠা :—

তথাপি পাশ্চাত্যের নারীগণ দীর্ঘদিনের মোহ নিদ্রা ভঙ্গ করিয়া শতাব্দীব্যাপী সংগ্রামের পর তাঁহাদের অবস্থার বিশেষ পরিবর্ত্তন সাধন করিয়াছেন। সহস্র অত্যাচার, অনাচার ও বুজরুকির সহিত সংগ্রাম করিয়া আজ তাঁহারা জয়লাভ করিয়াছেন। তাহার ফলে আমাদের, অর্থাৎ ভারতীয় নারীদিগের পক্ষে প্রত্যেকবার নূতন শাসন সংস্কারে কোন-না-কোন প্রদেশের মিউনিসিপ্যালিটি, সিনেট, আইনসভা এবং অন্যান্য প্রতিষ্ঠানে প্রবেশ করা অপেক্ষাকৃত সহজ হইয়াছে। ভারতে সামাজিক জীবনে পুরুষের সহযোগীরূপে নারীর যে মূল্য তাহা পুরুষদের

প্রতিষ্ঠানগুলি সাধারণ ভাবে মানিয়া লইয়াছে। রাষ্ট্রীয় ক্ষেত্রে নারী পিকেটিং-এর কার্য্যে নিজের যোগ্যতা প্রমাণ করিয়াছেন, কিন্তু নারীকে এখনও বহু দুর্গ সম্মুখসমরে জয় করিতে হইবে, পুরুষ এই সকল দুর্গের চাবি আজিও দৃঢ় মুষ্টিতে আপন করায়ত্ত রাখিয়াছেন। নারীরা বুঝিয়াছেন যে, ভারতের উন্নতির প্রতিপদক্ষেপে নারীর সাহায্য একান্ত প্রয়োজনীয়। নারী-শক্তি যাহাতে জাতীয় উন্নতির কার্য্যে প্রযুক্ত হইতে পারে, তাহার জন্য বিধিমতে চেষ্টা করিতে হইবে। জাতীয় মহাসভা অদ্যাবধি নিজেদের কর্ম্মসমিতি প্রভৃতি শুধু পুরুষের দ্বারাই গঠিত করিয়া চলিয়াছেন, যদিও বহু ক্ষেত্রে এই সকল পুরুষ অনেক নারী অপেক্ষা কার্য্যক্ষমতায় ও বুদ্ধিতে হীন।

নারীর আর্থিক দুর্দ্দশা :—

জাতির মঙ্গলের জন্য যদি বিশেষ কাহারও অর্থনৈতিক স্বাধীনতার প্রয়োজন হয়, তবে সে নারীর। স্ত্রীলোকের নীতিবিগর্হিত বৃত্তি গ্রহণ অথবা দুর্নীতিপরায়ণ জীবনযাপনের মূল কারণ আর্থিক দুর্দ্দশা। পুরুষের বেকার-সমস্যা অপেক্ষা নারীর বেকার-সমস্যা আরও গুরুতর। আর্থিক স্বাধীনতা হইতে বঞ্চিত স্ত্রীলোক অনেক সময়ই পুরুষের লালসা-বহ্নিতে পতিত হয়—ইহার ফল ব্যভিচার, ইহার ফল বেশ্যালয়। সুতরাং কোন আদর্শ রাষ্ট্রে একজন বেকার কিম্বা জীবিকাহীন স্ত্রীলোক থাকিবে না ; আদর্শ সমাজে পুরুষ যদি কোন নারীকে প্রলুব্ধ করিয়া লইয়া যায়, তবে আইনানুসারে তাহার কঠোর শাস্তির ব্যবস্থা থাকিবে।

ব্যভিচার দোষ দূর :—

শৌণ্ডিকালয়গুলি পুরুষের পক্ষে অনিষ্টকর, কিন্তু বেশ্যালয়গুলি নারী-জাতির পক্ষে সর্ব্বাপেক্ষা অপমানজনক। বিগত শীতকালে লাহোরে নিখিল ভারত এবং নিখিল এসিয়া নারী-সম্মিলনী নামক দুইটি মহিলা সভার প্রত্যেকটিতেই মদ্য নিবারণের দাবী উপেক্ষা না করিয়াও বেশ্যালয় ধ্বংসের প্রচেষ্টাকেই কার্য্যসূচীর একটী প্রধান বিষয় বলিয়া গণ্য করা হয়। কিন্তু কংগ্রেস মদ্য নিবারণের প্রয়োজনীয়তা পূর্ণভাবে হৃদয়ঙ্গম করিলেও বেশ্যালয়গুলি রাখার কুফল সম্বন্ধে এতটুকুও দৃষ্টি দেয় নাই। পুরুষচালিত গবর্ণমেন্ট যখন বেশ্যালয়ের লাইসেন্স দিয়া নিজ তহবিল পূর্ণ করে, আর পুরুষদের পরিচালিত ভারতের জাতীয় মহাসভা যখন তাহাদের বিরুদ্ধে একটি প্রতিবাদ বাণীও উচ্চারণ করে না, তখন ভারতের নারীদের উচিত অবিলম্বে উদ্বুদ্ধ হইয়া মিলিত চেষ্টায় চৈনিক কবি ডাঃ লিউয়ের প্রস্তাবিত একটি নিখিল-বিশ্ব গণতন্ত্র সভা গঠন করা। পৃথিবীর পবিত্রতা এবং শান্তি রক্ষার জন্য এই গণতন্ত্রের পরিষদ সমূহে নারীরই থাকিবে সর্ব্বাপেক্ষা অধিক ক্ষমতা।

স্বরাজের মর্ম্ম ও নারী :—

বাঙ্গালার নারীগণ এই মহিলা-কংগ্রেসে সমবেত হইয়া ঘোষণা করিতেছে যে, ভারতীয় জাতীয় মহাসভা যে রাষ্ট্রতন্ত্রেই সম্মত হউক না কেন তাহাতে নিম্নলিখিত বিষয়গুলি থাকিবে অথবা সেগুলির ব্যবস্থার জন্য স্বরাজ গবর্ণমেন্টকে ক্ষমতা দেওয়া হইবে

নারীর মূল অধিকার :—

১। স্ত্রীলোকদের মূল অধিকার, যথা—

(ক) সধবা অবস্থায় স্বামীর আয়ে সমান অংশ এবং বৈধব্যের পর স্বামীর সম্পত্তিতে সন্তানসন্ততিদের সহিত সমান উত্তরাধিকার।

(খ) পিতামাতা, ভ্রাতা অথবা ভগ্নীদের সম্পত্তিতে পুত্র এবং ভ্রাতাদের সহিত কন্যা এবং ভগ্নীদের সমান উত্তরাধিকার।

(গ) সন্তানসন্ততির উপর মাতার সমান অভিভাবকত্বের অধিকার।

(ঘ) বিচার, শাসন, চিকিৎসা, আইন, শিক্ষা, বিমান, নৌ এবং অন্যান্য বিভাগে চাকুরী পাইতে অথবা ব্যবস্থাপরিষদ সভা, মিউনিসিপ্যালিটি এবং জেলা বোর্ডে সদস্যপদ পাইতে কিম্বা মন্ত্রীপদ, শাসন-পরিষদের সদস্যপদ অথবা গবর্ণর পদ প্রাপ্তিতে স্ত্রীলোকের স্ত্রীলোক বলিয়াই কোন অনধিকার থাকিবে না।

(ঙ) সমস্ত প্রকার নাগরিক বিষয়ে সমান অধিকার এবং সমান বাধ্যবাধকতা। স্ত্রীলোক বলিয়া কোন বাধা থাকিবে না।

২। লাম্পট্য, বেশ্যাবৃত্তি, স্ত্রীলোক সংগ্রহ এবং তাহাকে প্রলুব্ধ করা—আইনে তুল্যরূপে দণ্ডার্হ হইবে।

৩। বেশ্যালয়গুলি সমস্ত বন্ধ করিয়া দিতে হইবে।

৪। উত্তরাধিকার-পত্র না লিখিয়া মৃত এমন বেশ্যার সম্পত্তির মালিকানা দাবী করিয়া গবর্ণমেন্ট তাহার আয় বাড়াইতে পারিবে না।

৫। (ক) স্ত্রীলোক-মজুরের ভালরূপ জীবিকা-উপযোগী বেতন।

(খ) কাজের জন্য নির্দ্দিষ্ট সময়ের ব্যবস্থা।

(গ) কাজের জন্য স্বাস্থ্যকর এবং নৈতিক আবহাওয়ার সৃষ্টি।

(ঘ) বৃদ্ধ বয়স এবং পীড়িতাবস্থায় আর্থিক কষ্ট হইতে রক্ষার ব্যবস্থা।

(ঙ) প্রসূতি অবস্থায় বেতনসহ ছুটীর বিশেষরূপ ব্যবস্থা।

৬। স্ত্রীলোকদের বেকার অবস্থা এবং আর্থিক দুর্দ্দশা হইতে তাহাদের রক্ষার জন্য রাষ্ট্র হইতে বিশেষ ব্যবস্থা।

৭। বালিকাদের বাধ্যতামূলক প্রাথমিক শিক্ষা।

৮। বয়স্কা স্ত্রীলোকদের শিক্ষার সুবিধা।

৯। যে সমস্ত স্কুলে ছেলে ও মেয়ে উভয়েই পড়ে, তথায় শিক্ষক এবং কমিটির সদস্যদের মধ্যে কয়েকজন নির্দ্দিষ্ট সংখ্যক স্ত্রীলোকের স্থান রাখা।

১০। পূর্ণ বয়স্ক স্ত্রীলোকদের ভোটাধিকার।

নারীর কর্ত্তব্য :—

এতক্ষণ আমরা ভারতের নারীদের অধিকার সম্বন্ধে আলোচনা করিয়াছি। এখন আমরা আমাদের কর্ত্তব্য সম্বন্ধে আলোচনা করিব। আমরা ভারতের নারীগণ এক মহান সভ্যতার উত্তরাধিকারিণী। আমরা তাহার আধ্যাত্মিক এবং নৈতিক কৃষ্টি উত্তরাধিকারসূত্রে পাইয়াছি। আর্থিক এবং রাজনৈতিক আশা আকাঙ্ক্ষার তুমুল ঝড়ের মধ্যে বসিয়া ভারতের নারীকে আজ সমাহিত চিত্তে চিন্তা

করিতে হইবে এবং বলিতে হইবে—"যেনাহং অমৃতো ন স্যাম্ তেনাহং কিম্ কুর্য্যাম" যাহা আমাকে অনন্ত জীবন দান করে না, তাহা লইয়া আমি কি করিব ?

বন্দেমাতরম

হিন্দুদের আত্মসমর্পণ জাতির কল্যাণকর হইবে কি ?

মহাত্মা গান্ধী 'ইয়ং ইণ্ডিয়া'তে হিন্দুমুসলমান সমস্যার সমাধান সম্পর্কে যে প্রবন্ধ লিখিয়াছেন, সে সম্বন্ধে শ্রীযুত রামানন্দ চট্টোপাধ্যায় নিম্নলিখিত বিবৃতি প্রকাশ করিয়াছেন :—

"মহাত্মা গান্ধী 'ইয়ং ইণ্ডিয়া' পত্রে লিখিয়াছেন—'সত্যাগ্রহী স্বরূপে পূর্ণ আত্ম-সমর্পণের ফলোপধায়কতায় আমি বিশ্বাস করি। সংখ্যার দিক হইতে হিন্দুদের প্রাধান্য রহিয়াছে। মিশরের সংখ্যাগরিষ্ঠ সম্প্রদায় কি করিয়াছে, সে কথা না তুলিয়া তাঁহারা সংখ্যালঘিষ্ঠ সম্প্রদায় যাহা চাহে, তাহাদিগকে তাহা দিতে পারেন ;কিন্তু হিন্দুরা যদি সংখ্যালঘিষ্ঠও হইতেন, তাহা হইলেও আমি একজন সত্যাগ্রহী স্বরূপে, একজন হিন্দু হিসাবে বলিতাম পূর্ণ আত্মসমর্পণের জন্য পরিণামে হিন্দুদের কোন ক্ষতিই ঘটিবে না।

"আমি যে আত্মসমর্পণের কথা বলিতেছি, তাহা মানমর্য্যাদার ক্ষেত্রে নহে, পার্থিব বিষয়ে। আইন সভার আসন, প্রতিপত্তি, অথবা চাকরী প্রভৃতির বেলায় আত্মসমর্পণ করাতে মর্য্যাদার হানি ঘটে না।"

মহাত্মাজী হিন্দুদিগকে পূর্ণরূপে আত্মসমর্পণ করিতে পরামর্শ প্রদান করিয়াছেন এবং তাহাদিগকে এই আশ্বাস দান করিয়াছেন যে, ঐ ভাবে আত্মসমর্পণ করিলে, পরিণামে তাহাদিগকে কিছুমাত্র ক্ষতিগ্রস্ত হইতে হইবে না। এইভাবে আত্মসমর্পণে হিন্দুদের কোন ক্ষতি হইবে কিনা সে সম্বন্ধে বিবেচনা করা আমি আবশ্যক মনে করি না। ঐরূপ আত্মসমর্পণের ফলে সমগ্র দেশের ও জাতির কি লাভ বা ক্ষতি হইবে, সেই বিষয়ের বিবেচনাতেই আমার আগ্রহ অধিক।

আব্রাহাম লিঙ্কন বলিয়াছেন—

"অপর দেশ শাসন করিবার মত যোগ্যতা কোন জাতিরই নাই ; সেইরূপ একথাও বলা যাইতে পারে, কোন একটি ধর্ম্ম সম্প্রদায়ের উপর কর্তৃত্ব করিবার যোগ্যতা অপর একটি ধর্ম্মসম্প্রদায়ের নাই।" কাজেই সমগ্র জাতির কল্যাণ দেখিতে হইলে, সকল সম্প্রদায় এবং সকল শ্রেণীর ভিতর যাহারা সর্ব্বাপেক্ষা যোগ্য এবং জনহিতপরায়ণ, তাহাদের হস্তেই দেশের শাসন ক্ষমতা ন্যস্ত রাখা উচিত। এক সম্প্রদায় অপর এক সম্প্রদায়ের কাছে আত্মসমর্পণ করিলে, এই ফললাভ করা যাইতে পারে না।

মহাত্মাজী সত্যই বলিয়াছেন—আইন সভার আসন, চাকুরী প্রভৃতি ছাড়িয়া দেওয়াতে মর্য্যাদার হানি ঘটে না ; কিন্তু তাহাতে কার্য্যকারিতার হানি ঘটে, কর্ত্তব্য পালন এবং দেশসেবার অধিকার ত্যাগের জন্য ক্ষতি ঘটে। বর্ত্তমানের অবস্থা যেমনই থাকুক না কেন, স্বরাজের অধীনে আইন সভা এবং অপরাপর প্রতিষ্ঠামূলক প্রতিষ্ঠানসমূহের সদস্যগিরি, ছোট বড় চাকুরী বিভিন্নরূপে দেশসেবারই সুযোগ রূপে গণ্য হইবে। দেশসেবার কর্ত্তব্য, অধিকার এবং সুযোগ হইতে কোন সম্প্রদায়কেই বঞ্চিত করা কর্ত্তব্য নহে।

অন্যান্য প্রদেশের কথা আমি বলিতে পারি না। কিন্তু বাঙ্গালার সম্বন্ধে এই কথা বলিব যে, এই প্রদেশে ধর্ম্ম, সমাজ, নীতি, বিজ্ঞান, সাহিত্য, শিল্পকলা, ব্যবসা-বাণিজ্য অর্থনীতি, স্বাস্থ্য বিধান এই সব দিক দিয়া যে উন্নতি ঘটিয়াছে, তৎসমুদয় বলিতে গেলে সবই করিয়াছে হিন্দুরা। এই প্রদেশে দুর্ভিক্ষ, বন্যা, ভূমিকম্প, মহামারী প্রভৃতিতে যাহারা বিপন্ন হইয়াছে, হিন্দুরাই জাতিধর্ম্ম-বর্ণনির্ব্বিশেষে তাহাদের দুঃখকষ্ট লাঘব করিবার নিমিত্ত স্বার্থত্যাগ করিয়াছে, অর্থ, সময় এবং উৎসাহ এবং মস্তিষ্কের শক্তি প্রয়োগ করিয়াছে। বাঙ্গলাদেশের মুসলমানেরা শিক্ষার দিক হইতে হিন্দুদের ন্যায় উন্নত নহে এবং হিন্দুদের ন্যায় তাহারা সকল সম্প্রদায়ের কল্যাণকল্পে বিনা পয়সায় জনহিতকর কার্য্য করিতে অভ্যস্তও নহে।

নিজেদের বড়াই করা কিংবা বাঙ্গলার মুসলমানদিগের মনে কষ্ট দান করা আমার উদ্দেশ্য নহে। এতদ্দ্বারা আমি শুধু এইটুকু দেখাইতে চাই যে. বাঙ্গলাদেশের কল্যাণের জন্য বিনা পয়সায় এবং পয়সা লইয়া যে সব কাজ দরকার, একা মুসলমান সম্প্রদায়ের দ্বারা সেগুলি সুদক্ষভাবে অনুষ্ঠিত হইতে পারে না। কাজেই অবিসংবাদিত চিত্তে গান্ধীজীর পরামর্শ মানিয়া চলিলে বাঙ্গলার কল্যাণ হইতে পারে না, অন্যান্য প্রদেশে এবং সমগ্র ভারতের বেলায়ও তাঁহার ঐ উপদেশ সর্ব্বোত্তম হিত বিধায়ক হইতে পারে কিনা এ বিষয়েও সন্দেহ আছে।

ডগ্‌লাস্ ফেয়ার ব্যাঙ্কস্

—অভিনেতাকাহিনী—

শ্রীধীরেন্দ্রলাল ধর

আমেরিকার "কোলোরাডো" রাজ্যের রাজধানী "ডেন্‌ভার" সহরে ডগ্‌লাস্ প্রথম পৃথিবীর আলো-বাতাসের সঙ্গে পরিচিত হন তেইশে মে, আঠারো-শো-

(ডগলাস ফেয়ার ব্যাঙ্ক ও বিলি ডভ্—'ব্ল্যাক্ পাইরেটের' দৃশ্য)

তিরাশী সালে। ছেলেবেলায় পড়াশুনার দিকে এঁর মন ছিল। "ডেন্‌ভার সিটি স্কুলে" পড়াশুনা শেষ করে ইনি "কোলোরাডো স্কুল অব্ মাইন্স"এ ভর্ত্তি হন খনিজ বিদ্যায় পারদর্শিতা লাভ করবার জন্য। কিন্তু পড়াশুনা বেশী দূর অগ্রসর হোল না।

এক বন্ধু এঁকে নিমন্ত্রণ করলেন—তাদের আমেচার ক্লাবে থিয়েটার দেখবার জন্য। সেই প্রথম এঁর থিয়েটার দেখা।

থিয়েটার দেখে এঁর মনের মধ্যে এমনি একটা বিপর্য্যয় ঘটে গেল যে কয় রাত্রি তাঁর কেটে গেল বিনিদ্র অবস্থায়। তারপর অভিভাবকদের লুকিয়ে ইনি অভিনয় করতে সুরু করে দিলেন। এর আগে ইনি কোনদিন কল্পনাও করেন নি যে অভিনেতা হবেন।

কিছুদিন অভিনয় করবার পর এঁর খ্যাতি ছড়িয়ে পড়ল জনসাধারণের মুখে মুখে—তখন এঁর বয়স কুড়ি বছরও পেরোয়নি। কিন্তু রাত জেগে অভিনয় করবার কালে পড়াশুনায় অসুবিধা হতে লাগলো অত্যন্ত, কাজেই পড়াশুনা ছেড়ে দিতে ইনি বাধ্য হলেন। কিন্তু অভিনয়ের বৈচিত্র্যহীনতা এঁকে আকৃষ্ট করতে পারলে না বেশীদিন, ইনি রঙ্গালয় ছেড়ে দিয়ে আবার 'স্কুল অব্ মাইন্সে' ভর্ত্তি হলেন।

কিন্তু পড়াশুনাও বেশীদিন চললো না, আবার ঢুকলেন রঙ্গালয়ে—এই হোল এঁর প্রথমবার রঙ্গালয় ছাড়বার ইতিহাস।

এমনিভাবে ইনি তিনবার রঙ্গালয় ছেড়ে বিদ্যালয়ে প্রবেশ করেন। বিদ্যাশিক্ষা করবার জন্য কিন্তু শেষবারও—যদিও খুব দৃঢ়তার সঙ্গে ইনি রঙ্গালয় ত্যাগ করলেন—তবু আবার এঁকে ফিরে আসতে হোল রঙ্গালয়ে—কেন না ছ'মাস একাগ্রচিত্তে পড়াশুনা করবার মত মনের অবস্থা

তখন এঁর ছিল না—অতনু স্বপ্নকে রূপ দেবার নেশা, অপূর্ব্ব কল্পনাকে অভিব্যক্তি দেবার কামনা, এঁর রক্ত তখন চঞ্চল করে তুলেছিল।

ইনি এই সময়ে সেক্সপীয়রের কয়েকখানি নাটক অভিনয় করে খ্যাতি লাভ করেন যথেষ্ট, তারমধ্যে "ট্ লিটল্ অরফ্যান বয়েজ্" "মেসার্স জ্যাক্" ও "দি পিট"— এই তিনখানির নামই উল্লেখযোগ্য। তার পর সুপ্রসিদ্ধ অভিনেতা 'হারি ক্যারে'র লেখা "ম্যাণ্টন্" নামক নাটকে অভিনয় করতে করতে ইনি অভিনয় ছেড়ে দিলেন দালালি করবার ঝোঁকে।

দালালিতে ইনি বিশেষ কিছু সুবিধা করে উঠতে পারলেন না। কেননা এ ব্যবসায় তাড়াতাড়ি সুনাম হয় না—যথেষ্ট সময় সাপেক্ষ। ক দিন পরে নিজের চেষ্টায় একটি লৌহ ফ্যাক্টরীর প্রধান সাহায্যকারীর পদ পান, কিন্তু তাতেও ইনি বিশেষ কিছু সুবিধ করে উঠতে পারলেন না। কাজেই এঁকে আবার ফিরে আসতে হোল অভিনয়-জীবনে,—এর দ্বিতীয়বার অভিনয় জীবন ছাড়বার ইতিহাস এইটুকুই।

ইনি তৃতীয়বার পাদপীঠ ছেড়ে চলে আসেন ওকালতী করবার জন্য কিন্তু ওকালতী ব্যবসায় এঁর প্রকৃতির সঙ্গে খাপ খেলেনা, ইনি আবার ফিরে এলেন রঙ্গমঞ্চে—দৃঢ় সঙ্কল্প করে যে এবার হতে অভিনয়ই এঁর জীবিকা নির্ব্বাহের একমাত্র উপায় হবে।

এই তৃতীয়বার পাদপ্রদীপের তলে দাঁড়িয়ে দর্শকদের নমস্কার জানাবার কিছুদিন পরে ইনি বিয়ে করেন "বেথ্ সালী"কে—এঁরই গর্ভে কনিষ্ঠ (জুনিয়র) ডগ্লাস্ ফেয়ার ব্যাঙ্কসের জন্ম হয়। কনিষ্ঠ ডগ্লাস্ও আজ অভিনয় জগতে যথেষ্ট প্রতিপত্তি অর্জ্জন করেছেন—পিতারই পুত্র তো! কনিষ্ঠ ডগ্লাসের জন্মদিন হচ্ছে উনিশ-শো-দশ সালের নয়ই নভেম্বর।

স্বনামধন্য প্রযোজক "ডি, ডব্লু গ্রিফিথ"এর নাম আজ চিত্রজগতে কারুরই অজ্ঞাত নয়। এঁর বিচক্ষণ দৃষ্টি যে ক'জন নট-নটীর উপর পড়েছে, এঁর সুশিক্ষার কল্যাণে তাঁরা প্রত্যেকেই আজ চিত্রজগতে প্রথিতযশা। এই গ্রিফিথ সাহেব সেই সময় অনেক অর্থব্যয় করে "ইন্টলারেন্স্" নামক একখানি ফিল্ম তুলছিলেন। অনেক ছোটখাটো অভিনেতা অভিনেত্রী এসে জড় হন এই ছবিখানির বিভিন্ন ভূমিকায় অভিনয় করবার আশায়—তাদের মধ্যে গ্রিফিথ সাহেবের শ্যেনচক্ষু ডগ্লাস্কেই পছন্দ করেন। এই বইখানিতে এক বেবিলোনবাসী সৈনিকের ভূমিকায় ইনি

(ডগলাস ফেয়ার ব্যাঙ্কস্ ও মেরী এষ্টর)

নামেন গ্রিফিথ্ সাহেবের প্রযোজনায়। এই ছবিখানিতে ইনি তিন সপ্তাহ উপরি-আর্টিষ্ট হিসাবে অভিনয় করেন দৈনিক এক পাউণ্ড বেতনে।

চিত্রাভিনেতা রূপে এঁর জীবন সুরু হয় উনিশ-শো-চোদ্দ সালের গ্রীষ্মকাল হতে। এই সময়ে ইনি প্রথম নামেন "দি ল্যাম্ব্" ছবিতে গ্রিফিথ সাহেবের প্রযোজনায়। পরপর আরো কয়েকখানি ছবিতে ইনি গ্রিফিথ সাহেবের

প্রযোজনায় অভিনয় করেন—সেগুলির মধ্যে "হিজ পিক্‌চর্স ন দি পেপার্স," "ডবল্ ট্রাবেল্" "দি আমেরিকানো" রেক্সী মিক্‌সেস," "হেবিট্‌স্ অব্ হাপিনেস্"—প্রভৃতির ম করা যেতে পারে।

কিছুদিন পরে ইনি "ট্রাঙ্গস্ ফিল্ম কোম্পানীতে" যোগ ন এবং তাদের হ'য়ে তিনখানি ছবিতে অভিনয় রেন"—"এগেন্ আউট্ এগেন," "ডাউন্ টু দি আর্থ", ওয়াইল্ড্ উলী।"

"ওয়াইল্ড্ উলীতে" অভিনয় করবার পর ইনি ফেমাস্ পিক্‌চার্স" এর চুক্তি সই করেন। তারপরে "থ্রি ম কেটিয়ার্স," "মিষ্টার কিক্‌স্ ইট্," "নিকার বুকার বাকারু" এই তিনখানি ফিল্মে ইনি অসাধারণ সাফল্য ভ করেন—চিত্রনট বলে এঁর যশ তখন ছড়িয়ে পড়ে ঃ ছায়াজগতের বুকে।

'মেরী পিকফোর্ড' ও সেই সময়ে 'ফেমাস্‌পিকচার্সের' দলভুক্ত ছিলেন। সু-অভিনেত্রী বলে খ্যাতিও অর্জ্জন করেছিলেন। তখনও ইনি ছিলেন বিবাহিতা, এঁর প্রথম স্বামীর নাম "ওয়েন মূর।"

কেউ তখন ভাবেওনি যে এঁদের দুজনের মধ্যে প্রেমের অঙ্কুর ধীরে ধীরে পরিণতি লাভ করছে। তবে অনেকেই জানতো এঁরা দুজন খুব অন্তরঙ্গ বন্ধু, কেন না অবসর সময়ে প্রায়ই এঁদের দুজনকে একত্রে দেখতে পাওয়া যেত 'লস এঞ্জেলেসের' সমুদ্র-তীরে।

হঠাৎ সেদিন ডগ্‌লাস তাঁর স্ত্রী "বেথ সালী"কে 'ডাইভোর্স' করলেন সেদিন হতে হোলিউড বাসীদিগের সজাগ দৃষ্টি পড়ল এই দুটি 'নক্ষত্রের' উপরে। কিন্তু এই ডাইভোর্সের সময় থেকে কিছুদিন আর এই দুটী চিত্রনট নটীকে একত্রে দেখতে পাওয়া গেল না—কাগজে দীর্ঘ দীর্ঘ আলোচনা বেরুতে লাগলো এঁদের দুজনের ভবিষ্যত আশা নিরাশার কথা নিয়ে।

পূর্ব্বের ঘটনাই পরবর্ত্তী ভবিষ্যতের সূচনা করে' যা' জনা কল্পনা-চলছিল, তাই ঘটলো—পিকফোর্ড তাঁর স্বামীকে ডাইভোর্স করলেন।

দুজনের বিয়ে হোল উনিশশ-কুড়ি সালের আটাশে মার্চ্চ।

বিবাহের পরে এঁরা "ইউনাইটেড আর্টিস্ কর্পোরেসন্" নামে একটী ফিল্ম কোম্পানী খোলেন—চার্লি চ্যাপলিনের সহযোগীতায়। চার্লি এই কোম্পানীর একজন প্রধান অংশীদার। যতগুলি ভাল আমেরিকান ছবি অবিমিশ্র খ্যাতি অর্জ্জন করেছে, তার অনেকগুলো এই কোম্পানীর তোলা—সেই কারণে 'ইউনাইটেড্ আর্টিষ্টস্'' আজ সাফল্য অর্জন করেছে যথেষ্ট।

ডগলাস যে কয়খানি ফিল্ম অভিনয় করে অবিমিশ্র সুখ্যাতি লাভ করেন, সেগুলির মধ্যে "দি নট" "মোলী কড্‌ল্" "হোয়েন ক্লাউডস্ রোলড্ বাই," "এ্যামেরিকান্‌স্," এ্যামেরিকান্ এ্যারিষ্টোক্রেসী," "সিন্দবাদ দি সেলার," "থিফ্ অব্ বাগ্‌দাদ্," "মার্ক অব জোরো'," "সান্ অব জোরো," "ব্লাক পাইরেট," "দি থ্রি মাস্কেটীয়ারস্," "গোচো," "দি আয়রণ মাস্ক"—সব ক'খানিই এঁর নিজের কোম্পানীর তোলা। এঁর এই সব ছবির পরিচয় আজ নতুন দেবার কিছু নেই, যাঁরা এঁর ছবি একবার দেখেছেন এঁর অসামান্য অভিনয় নৈপুণ্যের প্রশংসা করেছেন একবাক্যে। এঁর ব্যক্তিত্বের মধ্যে এমন একটা আকর্ষণী আছে, যা দর্শকদের আকৃষ্ট করে প্রয়োজনেরও অতিরিক্ত ভাবে।

এঁর প্রথম সবাক ছবি হচ্ছে "টেমিং অব দি স্রু।" এর নায়িকার ভূমিকায় নামেন 'মেরী পিকফোর্ড'। মুখর ছবিতেও এঁর অভিনয় যে অসামান্য সাফল্য অর্জ্জন করবে তার প্রমাণ পাওয়া যায় এই ছবিখানিতে।'

মেরীকে বিয়ে করবার পর মধুযামিনী যাপন করবার সময় ইনি ভারতে এসেছিলেন বেড়াতে কিন্তু নানা কারণে সেবার তাড়াতাড়ি এদেশে থেকে তাঁদের ফিরে যেতে হয়। এই ক' সপ্তাহ হোল তিনি আবার ভারতে এসে গেছেন। এখানে বিশেষভাবে কোলকাতায় তিনি যে সম্বর্দ্ধনা পেয়েছেন তা তাঁর পক্ষে গৌরবের—গর্ব্বের বিষয়—একথা তিনি নিজেই বলেছেন সংবাদপত্রের মারফৎ। কোলকাতায় কদিন থেকে দর্শন লিপ্সু সহরবাসীদের আকাঙ্ক্ষা মিটাবার আগেই ইনি কুচবিহারে চলে গেলেন শীকার করবার আনন্দ উপভোগ করবেন বলে। কুচবিহারের জঙ্গলে ইনি কটা বাঘ শীকার করেছেন।

ইনি বলেন—যতগুলি দেশ আমি বেড়িয়েছি ভারতবর্ষ তাদের সকলের চেয়ে সুন্দর। প্রাকৃতিক শোভায়

সভ্যতার আদর্শে ভারতের সঙ্গে অন্যান্য দেশের তুলনা হয় না !

ইনি দৈর্ঘ্যে পাঁচ ফিট দশ ইঞ্চি। চোখ দুটো এঁর কটাশে হলেও চুলগুলো মিশ্ কালো, স্বাস্থ্যবান বললেই সব বলা হোল না—শক্তিও এঁর দেহে আছে সুপ্রচুর পরিমাণে। এঁর দেহের ওজন এক-শো-পঁয়ষট্টি পাউণ্ড।

ভারতবর্ষ থেকে ফিরে গিয়ে ইনি "রিচিং টু দি মুন্" নামে একখানি মুখর চিত্র অভিনয় করবেন' 'বিবি দানিয়েল্‌সে'র সঙ্গে—এই ছবিখানির জন্য ইনি সপ্তাহে পাঁচ হাজার ডলার করে পাবেন ইউনাইটেড্ আর্টিষ্টস্ কর্পোরেশনের কাছ থেকে। এই ছবিখানিতে ইনি প্রাতীচ্যের অনেক নতুন বিষয় দর্শকদের দৃষ্টির সামনে মেলে ধরবেন বলে জানিয়েছেন। এঁর এই অভিযান সফল হোক—

মোগলের প্রাসাদে ও শ্মশানে

শ্রীজ্ঞানেন্দ্রনাথ চক্রবর্ত্তী — ভ্রমণ স্মৃতি

১

উত্তর পশ্চিম ভারত ভ্রমণ করিতে গিয়া মুসলমান রাজাদের অনেক কীর্ত্তিকলাপ দেখিয়াছি। বহু স্থানেই মসজিদ ও সমাধি মন্দিরের বৈচিত্র্য ও বিরাটত্ব দেখিয়া বিস্মিত হইয়াছি। মোগলদের এসব জিনিষের প্রশংসা করিলে কোন কোন বন্ধু মত প্রকাশ করিয়াছেন—মুসলমানদের মসজিদ আর সমাধি মন্দির ছাড়া আর কি-ই বা আছে। আর কিছু থাক বা না থাক, দীর্ঘ-কাল-জয়ী হইয়া যাহা এতকাল সগৌরবে বিশ্বের বিস্ময়রূপে বিরাজ করিতেছে, তাহার গৌরবও তো সামান্য নহে।

তাজ-তোরণ

লাহোরের জাহাঙ্গীর বাদশাহের সমাধিও যেমন অপূর্ব্ব, সালিমার বাগানও তেমনি বিস্ময়ের। আবার মসজিদটিও সামান্য নহে। লাহোরের দুর্গটিও মুসলমান আমোলেরই—এ দুর্গটি আধুনিক উন্নত ধরণের দুর্গের পর্য্যায়ে পড়িতে পারে কিনা জানি না, কিন্তু এখনো এখানে বৃটিশ সৈন্যেরা আরামে নিশ্চিন্ত মনে বাস করে এবং দুর্গ নামেই ইহাকে অভিহিত করা হয়। আর এই দুর্গটিকে রাবী নদের ধ্বংসলীলা হইতে যে ভাবে মোগল যুগে রক্ষা করা হইয়াছিল, তাহা আজিকার উন্নত যুগের ইঞ্জিনিয়ারদেরও বিস্ময় উৎপাদন করিবে।

সাম্রাজ্ঞী নুরজাহান বাদসাহ জাহাঙ্গীরের কবর নিজে পছন্দ করিয়া সাজাইয়াছিলেন। বাদসাহ সাজাহান সালিমার বাগ নির্ম্মাণ করাইয়াছিলেন। সালিমারের মত একটি বাগান নাকি মোগল সম্রাটদের গ্রীষ্মাবাস ভূ-স্বর্গ কাশ্মীরে আছে; আর কোথাও আছে কিনা জানিনা। অতীতের একেবারে ধ্বংসাবশেষে পরিণত না হইলেও সম্পদ-হারা এই বাগান এখনো বিস্ময়ে বিমুগ্ধ করিয়া দর্শকদের আনন্দ দেয়। যে বাদশাহ সাজাহান তাজমহল নির্ম্মাণ করিয়াছেন, মতি মসজিদ নির্ম্মাণ করিয়াছেন—তিনিই এই বাগানও তৈরী করাইয়াছিলেন। সাজাহানের সৌন্দর্য্য-বোধ আজ বিশ্বের অষ্টম আশ্চর্য্য তাজমহলরূপে যেমন পরিচিত, তাঁর মতি মসজিদ, সালিমার বাগানও তেমনি আশ্চর্য্যই বটে। আরো একটী জিনিষ সাজাহান যাহা তৈরী করিবার মনস্থ করিয়াছিলেন, তাহা সম্পূর্

হইলে কত সুন্দর যে হইত কে বলিবে! শ্বেত মার্ব্বেলের সমাধিতে তিনি প্রিয়তমা তাজকে শয়ন করাইয়া নিজে

'দেওয়ানী খাস' অদূরে তাজ

কৃষ্ণ মার্ব্বেলের অমনি সমাধিতে তাজের ছায়া হইয়া থাকিতে চাহিয়াছিলেন—এতখানি সৌন্দর্য্য রসজ্ঞ মানুষ বিশ্বের ইতিহাসে আর ক'জনা আছে?

লাহোর অঞ্চলে মোগল বাদসাহের কবর, মসজিদ ও বাগান দেখা গেল বটে, কিন্তু যে বাগান একদিন সম্রাটের প্রমোদ উদ্যান ছিল—আজ সেথায় যে সব প্রাসাদে সম্রাট সম্রাজ্ঞীরা জীবন উপভোগ করিতেন, তাহার সন্ধান মেলে না।
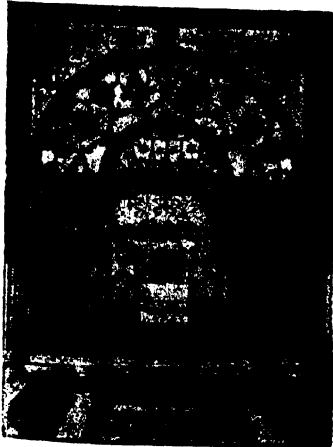
'বিচার বেদী' দিল্লী

মোগল সম্রাটদের প্রাসাদ কক্ষগুলি কেমন ছিল, তাঁহাদের শয়ন ঘর, বসিবার ঘর, পাঠ কক্ষ কেমন ছিল, তাহা দেখিবার আমার অত্যন্ত আগ্রহ ছিল। লাহোর তো মোটেই নয়—দিল্লীও আমার সে ইচ্ছা যেন পুরাইতে পারিল না।

দিল্লীর জুম্মা মসজিদ পার হইয়া আগে প্রাসাদ বা ফোর্ট দেখিতেই গেলাম, কিন্তু বেলা দশটা বাজিয়া গেছে—ফোর্টের দ্বার বন্ধ, দ্বারে বৃটিশ সৈন্য পাহারা দিতেছে, অসময়ে প্রবেশ নিষেধ। তিনটার পর দর্শনের অনুমতি। প্রাসাদের পরিবর্ত্তে মসজিদই আগে দেখিতে হইল;—প্রকাণ্ড চত্বর, উপাসনা স্থান যেমন দীর্ঘ তেমনি প্রশস্ত;—কি বিচিত্র গঠন কৌশল, এ যেন কালজয়ী বিরাট বিচিত্র সৌধ। জুম্মা মসজিদ হইতে মোগলের প্রাসাদ দেখা যাইতেছে—এ মসজিদের সম্মুখের একটা ভাগ সিপাহী বিদ্রোহের সময় শান্তি স্থাপনের জন্য কামানে দাগা হইয়াছিল।

মসজিদ হইতে ক্রমাগত সমাধিস্থানের দিকেই যাইতে হইল। প্রথমেই দেখিলাম 'খুনীকা গেট', এখানে নাকি এখনো সন্ধান করিলে ঔরংজেবের ভ্রাতৃবদের রক্তধারার সন্ধান মেলে।

—পাণ্ডবের শ্মশান হস্তিনাপুরী সেও এই দিল্লীতেই।
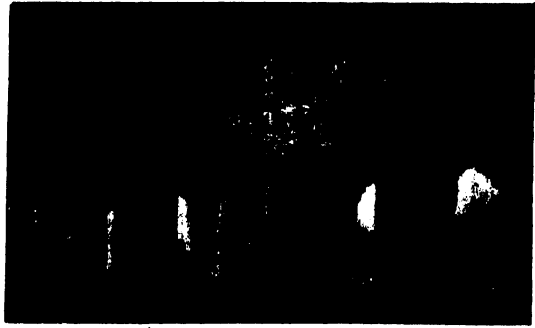
'দেওয়ানী খাস' ভিতরের দৃশ্য

এ শ্মশানেও পাঠান-মোগলের মসজিদ উঠিয়াছে, তবে দ্রৌপদীর পাতাল-স্নানের নিদর্শন ও কুন্তীদেবীর মন্দির এখনো আছে। ময়দানবের নির্ম্মিত অপূর্ব্ব পুরীর চিহ্ন স্বরূপ আজ ভগ্নাবশেষ প্রশস্ত প্রাচীর ও গেটগুলিই দেখা যায়। ইট-পাথরের কীর্ত্তি, মানুষের শিক্ষা-সভ্যতা-জ্ঞানের

পরিচয় দেয়—দীর্ঘকালজয়ীও হয়—কিন্তু কালের গ্রাসে তাহারও ধ্বংস হয়।

তারপর হুমায়ুনের কবর। কবর যেন রাজপ্রাসাদ—এখানে বেগমেরা সব লুকোচুরী খেলিতেন উপরে অলিন্দগুলি এমনি ভাবে সাজান যে একদিক দিয়া উঠিলে আর সেদিক দিয়া সহজে বাহির হইবার উপায় নাই—

'দেওয়ানী-আম' আগ্রা

গোলকধাঁধাই বটে। কবর যে এত সুন্দর ও বৈচিত্র্যময় হইতে পারে তাহা বাংলার লোকে উত্তর-পশ্চিম ভারতে এ-সব সমাধি না দেখিলে বুঝিতেই পারিবে না। এইখান হইতেই অন্ধ বাদশাহ শাহ আলমকে ইংরাজেরা ধরিয়া নেন। তারপর আরো কত কত সমাধি মন্দির যে দেখিলাম তাহার সংখ্যা নাই। সবগুলি যেন অতীত-স্মৃতির দীর্ঘশ্বাস ফেলিতেছে। যাহারা দেখিতে যান তাহাদেরও দূর অতীতের মোহ অভিভূত করিয়া ফেলে।

মোগলের রাজপ্রাসাদ—আধুনিক ফোর্ট আগের মতই তেমনি পরিখা ও গেট পার হইয়াই যাইতে হয় তারপর ক্রমশঃ দেওয়ানী আম, খাস—প্রাসাদের অন্যান্য স্থল। দিল্লীর প্রাসাদে বাদশাহদের সিংহাসন তেমনি পাতা রহিয়াছে।

প্রাসাদও ঠিকই আছে। পিছন দিকটা যেন ভাঙ্গা-ভাঙ্গা। বহিরাঙ্গণ পার হইয়া বিরাট চত্বর—তারপর অন্দরের প্রাসাদ। এখানকার স্নানাগার প্রভৃতি অপূর্ব্ব। যমুনা হইতে এখানে কলে, জল আসিত ও সে-জল ঠাণ্ডা, গরম, নাতিশীতোষ্ণ ভাবে কলে, ফোয়ারায় পড়িত,—অথচ কি করিয়া যে যমুনার জল এ-ভাবে তখন এখানে আনিতে পারা যাইত তাহা আজিও বিস্ময়ের বিষয়ই হইয়া আছে। এ প্রাসাদও দেখিবার মত। সব চেয়ে দেখিবার বেগমদের প্রসাধন কক্ষ। এখনো কোন ঘরে গরম, কোন ঘরে ঠাণ্ডা, কোথাও বা বসন্তের প্রাকৃতিক ভাব; এই সব কক্ষেই বেগমেরা কোথাও স্নান করিতেন, কোথায় চুল বাঁধিতেন। সব জয়গা তেমনি রহিয়াছে। যত দেখি ততই যেন দেখিবার ইচ্ছা হয়। এখানেও ঔরঙ্গজেবের ছোট একটি মসজিদ আছে। বাদশা ঔরঙ্গজেব গোঁড়া মুসলমান হইয়াও মসজিদের সময় পর্য্যন্ত উদার ভাবে বৃহৎ মসজিদ কোথাও করিতে পারেন নাই, এ মসজিদ সুন্দর হইলেও তাই মনে হয়।

প্রাসাদের নীচেই এককালে যমুনা ছিল—যমুনার ঢেউ আসিয়া প্রাসাদের প্রাচীরে লাগিত। কি সু-উচ্চপ্রচীর, কি বিরাট—বিচিত্র তাহার গঠন কৌশল। কোথাও বাদশাহ বেগমদের বসিবার স্থান। এই প্রাসাদ ভবনে অন্ধকারে, কত আলোতে মানে অভিমানে সে যুগের ভাগ্যবান নর-নারীরা চলিয়াছে। আজ স্মৃতি ছাড়া তাহাদের চিহ্নও নাই। মানুষের চিহ্ন নাই কিন্তু তাহাদের হাতে গড়া ইটপাথর আজও অতীতের স্মৃতি হইয়া আছে।
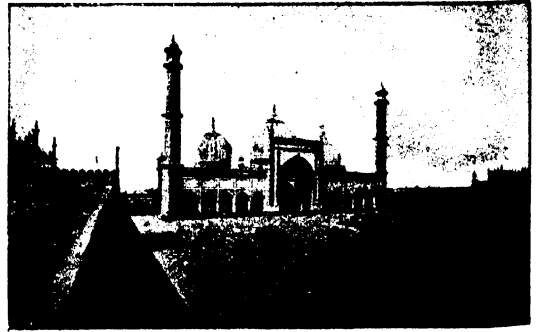
'জুম্মা মসজিদ' ভিতরের দৃশ্য

এসব দেখিয়াও তেমন যেন তৃপ্ত হইতে পারিতেছিলাম না। মনে হইতেছিল, কই বাদসাহদের বাসভবন তো দেখিলাম না। কেমন তাহারা শুইতেন, বসিতেন—কেমন অন্দরমহল, বাহির-মহল ছিল তাহা তো দেখিলাম না। দিল্লীতে যাহা দেখিতে পাইলাম না আগ্রায় তাহা দেখিলাম।

লক্ষ্মীর ছেলে

শ্রীকেশব সেন

—গল্প—

কেরাণীবাগানের অপরিসর একটা গলি—পর পর গুটা দুই-তিন ডাষ্ট্‌বিন্ আর প্রায় তাহারি সাথে সাথে এক-একটী পান ও সোডা-ওয়াটারের দোকান। সন্ধ্যার পর বুভুক্ষিত চক্ষু বিস্ফারিত করিয়া নারী-মূর্ত্তিগুলি যখন দরজাগুলিতে দাঁড়াইয়া থাকে, গলিতে পথিকদলের যাওয়া-আসার সাথে সাথে তাহাদের হৃদয় আশা-নিরাশার তরঙ্গ-দোলায় দুলিতে থাকে—সে একরকম। দিনের বেলায় পানের দোকানগুলিও বন্ধ—ডাষ্ট্‌বিন্‌গুলির চারিদিকে মক্ষিকাকুলের যে বাজার মিলিয়া যায় এবং পরস্পর বিবাদমান কুকুরের পাল ইতস্ততঃ সঞ্চরণ করিতে থাকে—সে এক অভিনব দৃশ্যই বটে।

ইহারি একটী বাড়ীর বাহিরের দিক্‌কার ঘরে একরকম সদর দরজা আগ্‌লাইয়া থাকে যে মেয়েটী তার নাম ধরুন লক্ষ্মী। সন্ধ্যার অন্ধকারে মেয়েটীর বয়স হয়তো পনেরো ষোল অনুমিত হইতেও পারে, কিন্তু দিনের আলোয় পরিষ্কার বুঝা যায় যে অন্ততঃ কুড়ির কোঠায় সে পা দিয়াছেই। দেহের বর্ণ তার ঘনশ্যাম, মুখশ্রী নেহাৎ মন্দ নয়, বিশেষতঃ চঞ্চল চোখদুটী—মহাকবি কালিদাস যাহাকে মনসিজের পঞ্চশরের শ্রেষ্ঠতম দুইটী শর বলিয়া আখ্যাত করিয়াছিলেন, সমজদার ব্যক্তি উপস্থিত থাকিলে হয়তো বলিত—এ তাই।

—দুই—

লক্ষ্মীর ঘরের দরজার কাছে শিক্‌লীতে বাঁধা একটী কুকুর—সারা গায়ে বড় বড় রোঁয়া, চোখ দু'টী প্রায় ঢাকিয়াই রাখে, লম্বা ও ভাঁজ-করা কান দু'টীও তাই। লক্‌লকে জিভটী চলন্ত মোটরের ড্রাগন-মুখো হর্ণের জিভটীর মতো কাঁপিতেছেই। লক্ষ্মীর ঘরের নতুন আগন্তুক হরবিলাসকে দেখিয়া তীক্ষ্ণ দৃষ্টিতে তার পানে চাহিয়া থাকে—হরবিলাসের ভীরু চোখ সে দৃষ্টির সম্মুখে স্থির থাকিতে পারে না। লক্ষ্মীকে সে বলে—ওকে সরাও।

লক্ষ্মী হাসে। বলে, কিছু করবে না।

কিন্তু সে তীক্ষ্ণ দু'টী চোখ—

হরবিলাস থাকিয়া থাকিয়া কাঁপিয়া ওঠে। বলে—ওকে বাইরে রেখে এস না।

লক্ষ্মী আবার হাসে। হাসিয়া ডলিকে আদর করে। কুকুরটাই ডলি। তার গায়ে গলায় হাত বুলাইয়া দেয়।

হরবিলাস ফ্যাল ফ্যাল করিয়া চাহিয়া থাকে। আদরে আদরে ডলি এলাইয়া পড়ে—লক্ষ্মীও।

তারপর—হরবিলাসের চোখের ওপরে চোখ পড়ায় লক্ষ্মী সরিয়া আসে, ওর কাছে আগাইয়া বসে। ডলিও উঠিয়া আসে—লক্ষ্মীর বসনাঞ্চল ধরিয়া টানাটানি করে, তার ওপরে একাধিপত্য, সে একাধিপত্যে বাধা জন্মাইতে দিতে চাহে না।

লক্ষ্মী হাসে—দেখেছো? হাসিয়া আবার ডলির কাছে যায়। হরবিলাসের চোখ দু'টা টাটাইয়া ওঠে। সে চলিয়া যাইবার সময়ে লক্ষ্মী তার হাত দুটী ধরিয়া মিনতির ভঙ্গীতে শুধায়—আবার আসবে তো?

হরবিলাস উত্তর করে—কি জানি।

লক্ষ্মীর মুখখানি ম্লান হইয়া ওঠে। দরজাটী ভেজাইয়া দিয়া আবার ডলিকে লইয়াই বসিয়া পড়ে।

ডলি! ডলি! ডলি!

কুকুরটা ওর কোলে, তার মাথা ওর বুকের মধ্যে। দেখিয়া কেনা বলিবে—ডলি ওর পেটের ছেলে নয়, ওরা দু'টী মায়ে-বেটায় নয়?

—তিন—

কি জানি কি মনে করিয়া হরবিলাস পরদিন আসে, আসিয়া দেখে—ঘরে লক্ষ্মী একা, ডলি নাই।

শুধায়—ছেলে কোথায়? একেবারে নিশ্চিন্ত হইতে পারে না।

ও বলে—বেড়াতে গেছে কাছের পার্কে।

হরবিলাস তৃপ্তির নিঃশ্বাস ফেলে। লক্ষ্মী তার কাছটীতে ঘেসিয়া বসে।

কয়েক মিনিট পরে।

লক্ষ্মী বলে—একটু বস্‌বে?

পাল্টা প্রশ্ন আসে—কেন? কোথাও যাবে নাকি?

জবাব আসে—ডলিটাকে নিয়ে আস্‌বো।

প্রতিবাদের অবসরমাত্র না দিয়া ঘরের বাহির হইয়া যায়।

বেচারী হরবিলাস!

একা বসিয়া ঘরের কড়িকাঠ গণিতে তার ভালো লাগে না। সাম্‌নের কাচের আলমারীতে যে সব চীনা-মাটীর বাসন ও পুতুল, তাও ছ'মিনিটেই পুরাণো হইয়া যায়।

দেয়ালের ছবিগুলো সবই ঠাকুর-দেবতার। বৈচিত্র্য-হীন। লক্ষ্মীর নিজ হাতে তৈরী কালো কাপড়ের ওপরে ঝিনুকের অক্ষরে লেখা "শিব-দুর্গা"—তাও দু দণ্ড ধরিয়া দেখিবার মতো নয়।

দেয়ালের ঘড়ীতে টং করিয়া একবার বাজিয়া ওঠে—সাড়ে আটটা। হরবিলাস মনে মনে বলে—একটা কুকুর নিয়ে এত! তাহ'লে দোকান সাজিয়ে বসা কেন বাপু?

সে উঠিয়া দাঁড়ায়। গলি ছাড়াইয়া বড় রাস্তায় গিয়া পড়ে।

ডলিকে লইয়া ওদিকে লক্ষ্মী ঘরে ফিরিয়া আসে। আসিয়া দেখে—খালি ঘর। কেহ নাই। অপেক্ষা করিয়া হরবিলাস চলিয়া গিয়াছে। দুয়ার আগ্‌লাইয়া বসিয়া তার মকর হরিমতি। হরিমতি বলে—ঘর খালি রেখে কোথায় চলে গিয়েছিলি? কি বলিস্? ঘর খালি ছিল না? মানুষ ছিল? বাবুটীকে একা ঘরে বসিয়ে রেখে বেরিয়ে গিয়েছিলি বুঝি? বসে বসে বাবুটী চলে গেলেন? যাবেন না? ডলিকে নিয়ে যা ঢলাঢলি সুরু করেছিস্—কাউকে রাখ্‌তে পার্‌বি নে। নৈলে আর দুঃখ ছিল কি? রাজরাণীর হালে থাক্‌তিস্—এত অভাবে পড়্‌বি কেন?

হরিমতির কথাগুলির কোনটা ওর কানে যায় আর কোনটা যায় না বলা শক্ত। মনে পড়িয়া যায়—এখনি বাড়ীওয়ালী আসিবে ভাড়ার টাকা চাহিতে। চৌদ্দ টাকার জোগাড়, দু'টা টাকা হরবিলাসের কাছে পাইত—ভাড়াটা চুকাইয়া দিতে পারিত। রাগের মাথায় ডলিকে মারিতে যায়; হাত কি আর ওঠে? উল্টা ডলিকে বুকে চাপিয়া ধরে।

ডলি জানাইয়া দেয় তার ক্ষুধা পাইয়াছে। ডলির জন্য বিশেষ করিয়া রাঁধা টুক্‌রা টুক্‌রা মাংসের ঝোল আর ভাত লইয়া হেঁসেলের দিকে যায়।

সদর হইতে মেয়েরা এক সঙ্গে ডাকিয়া ওঠে—লক্ষ্মী!

হেঁসেল হইতেই উত্তর আসে—যাচ্ছি।

ওরা আবার ডাকে—লক্ষ্মী!

লক্ষ্মীর 'মকর' নিজে চলিয়া আসে; বলে—ডলি নিজেই পাবে'খন। শীগ্‌গীর আয়, সেই চক্‌দিঘীর বাবু।

লক্ষ্মী বলে—বাবুকে ঘরে বস্‌তে বল ভাই, আমি যাচ্ছি এখ্‌খুনি।

যাচ্ছি যাচ্ছি করিয়াও গোটা পাঁচেক মিনিট কাটিয়া যায়। সদরে যাইতেই মেয়েরা একসঙ্গে বলিয়া ওঠে—এমন অনাসৃষ্টি কাণ্ড দেখিনি বাপু। ঐ এক কুকুরের জন্যে সব খোয়ালে। চক্‌দীঘির বাবু মোটর নিয়ে এসেছিল, দশ-বিশ টাকা কোন না পেতে? বস্‌লে তো হারিয়ে? ঐ দেখ মোটর আঠারো নম্বরে গিয়ে দাঁড়িয়েছে। এখন দেয়ালে কপাল ঠুকে মর আর কি?

মনে যাই থাক্‌, মুখে লক্ষ্মী বলে—কপাল ঠুকে মর্‌তে যাব, গরজ? পাঁচটা মিনিট যার সবুর সয় না, তাকে বেঁধে রাখ্‌বার প্রবৃত্তিও আমার নেই, রাখ্‌তে চাইনেও তা।

শুধু এই নয়—আঠারো নম্বরের উদ্দেশে আরো দু'চারিটা কটু উক্তি করিয়া ঘরে ঢুকিয়া গুম্ হইয়া বসিয়া থাকে। ইলেক্‌ট্রিকের বাল্‌ব তার চোখের সুমুখে আগুনের গোলাগুলি বর্ষণ করে যেন। সুইচ্ টিপিয়া বাতিটা নিভাইয়া দেয়।

বাড়ীওয়ালী আসে ভাড়ার টাকার তাগাদায়—দু' চারিটী বক্র উক্তি করিয়া দু' টাকা বাকী রাখিয়াই ফিরিয়া যায়।

পরদিন হাঁড়িতে হাত দিয়া দেখে—চাল বাড়ন্ত। মুদি আর ধারে দিতে চায় না। পাওনা-গণ্ডা তো আর কম নয়?

—চার—

সেদিনও কিন্তু জোটে না—সাড়ে দশটা অবধি এক ঠাঁই বসিয়া বসিয়া কোমরটা কন্ কন্ করিয়া ওঠে। তারপর দেখা হয় হরবিলাসেরই সঙ্গে। মিনতির চোখে ডাকে তাকে, সে সদরে আসিয়া দাঁড়ায়। বলে—এসে আর কি করবো? তোমার তো আর মানুষকে দিয়ে প্রয়োজন নয়! মরে আবার কুকুর হ'য়ে জন্মাতে পারতুম, তা'হলে তোমার কাছে কিছু যত্ন-আত্তি পেতুম। কিন্তু কপালের দোষে যখন মানুষ হয়েই জন্মেছি, তখন—

হরবিলাসের কথায় আর আর মেয়েরা হাসিয়া ওঠে। ওর চোখের কোণে আগুনের শিখা দেখা দেয়। বলে—মরণ আর কি?

হরবিলাস চলিয়া যায়! আর আর মেয়েরাও যে যার ঘরে যায়। একা সদরে বসিয়া থাকে লক্ষ্মী কিছু রোজ-গার তার করা চাই।

দুইটী টাকা এবং গণ্ডা তিনেক পয়সা আঁচলে বাঁধিয়া ওপরে খাটের বিছানায় নয়—নীচের চিকণ মাদুরে ঢাকা তোষকে নয়—ঘরের মেজেতে লুটাইয়া ঘুমাইয়া পড়ে রাত প্রায় দু'টায়।

এমন করিয়া দিন আর চলে না।

শনিবারের বাবুকে সব কথা খুলিয়া বলে। ছ'দিন নির্বান্ধব লইয়া ঘাঁটাঘাঁটির পরে বান্ধবের সাক্ষাৎ পায় এই একটী দিন। মনের কথা খুলিয়া বলা চলে তাঁর কাছে—পরামর্শ দিতেও তিনিই। তিনি বলেন—সব্ চেয়ে ভালো হ'ত যদি ওকে বিদেয় করে দিতে পারতে।

লক্ষ্মীর বুকের ভেতরটায় ছাঁৎ করিয়া ওঠে। ভাব দেখিয়া বাবু বলেন— কিন্তু সত্যি তো আর তা পারছ না! দিন-রাত যে অকারণ ওকে নিয়ে মাতামাতি করছো, সেটুকু একটু কমিয়ে নাও।

বাবুটীর পানে তীক্ষ্ণ দৃষ্টি হানিয়া শুধায়—তার মানে?

বাবু বলেন—মানে আর কিছুই নয় লক্ষ্মী, সারা দিন তোমার ছেলেকে নিয়ে যা খুসী কর; রাতটা শুধু অন্যদিকে মন দাও। দেখ্ছোই তো আমার আজকাল বড্ড টানা-টানি, তবু তো পাঁচটাকা বাড়িয়ে দিয়েছি। কিন্তু তা নিয়ে তো আর চল্‌বে না তোমার? অন্তত গোটা ত্রিশেক টাকা এদিক-সেদিক করে জোগাড় করতে হবেই।

লক্ষ্মী শুধায়—তা ওকে রাখি কোথায়?

বাবু বলেন—সন্ধ্যে থেকে ভেতরের দাওয়ায় বেঁধে রাখলেই পার?

ও বলে—ছেলে আমার তেমনি বটে! দাওয়ায় নোংরার মধ্যে এক দণ্ড টিকে থাকতে পারলে তো! ধব্‌ধবে বিছানাটী নইলে ওর ঘুম হবে, না একটু বস্‌বেই? মাঝে মাঝে নীচের বিছানাটা তুলে রাখি দিনের বেলায়, ও ওপরে উঠে শোয়।

বাবু বলেন—কিন্তু সত্যি যদি তোমার পেটের ছেলে-মেয়েই কিছু থাকতো, তাকেও তো দূরে রাখতে হ'ত?

লক্ষ্মী দীর্ঘ-নিঃশ্বাস ছাড়ে। তার মনে পড়িয়া যায় অনেক কথাই। সে কথা সে শনিবারের বাবুর কাছেও খুলিয়া বলে না।

পাঁচ

কিন্তু আমরা কথাটা জানি এবং তা এই—

বছর পাঁচেক আগে লক্ষ্মী যখন বজ্‌বজের কাছাকাছি কি-একটা গ্রামে মণ্ডলদের ঘরের বৌ ছিল, এ তখনকারই কথা। স্বামী তার কলিকাতা কোন বড় লোকের বাড়ীর মোটর ড্রাইভার—আয় খুব বেশী না হইলেও দেশে যখন যাইতেন, খুব চালের উপরই যাইতেন। যে ফুট্‌ফুটে কন্যাটী তাঁর ঘরে জন্ম গ্রহণ করিল, তার নাম রাখিলেন—ডলি।

বাপের তাঁর তেজারতির কারবার, শ্বশুরের মুদি-দোকান। নামটা শুনিয়া পাড়া-প্রতিবেশী তো বটেই মণ্ডল পরিবারেরও সকলে হাসিয়াছে—ডলি! এ আবার কি নাম গো।

কিন্তু ঠাট্টা টিটকারীতে বিচলিত হ'বার লোক তো নয়—যে বাঙালী সাহেবের বাড়ীর মোটর চালাইতেন, তাঁরই ছোট নাত্নীটির নাম নাকি ডলি এবং কন্যা-সন্তান জন্মিলে নাম রাখিবেন ডলি এ তাঁর বহুদিনের সাধ।

মানুষের কোন্ সাধ ভগবান পূর্ণ করেন এবং কোন্ সাধ করেন না, মানুষ তা বুঝিয়া উঠিতে পারে না। অভিপ্রেত কন্যাসন্তান জন্মিল, অভিপ্রেত নামও রাখা হইল—কিন্তু কন্যার যিনি জনক তিনি এক অশুভ অবসরে সংসার হইতে বিদায় গ্রহণ করিলেন।

লক্ষ্মীর হাতের নোয়া খসিল, সিঁথির সিঁদুর মুছিল, কিন্তু মাছ আর বিকেলের পাওয়া ঘুচিল না। এ অঞ্চলে

পাড়া-গাঁয়ে অধিকাংশ ক্ষেত্রে যা হয়, লক্ষ্মীর বরাতে তার চেয়ে বেশী কিছু হইল না—বাপের বাড়ীতে ভাই, ভাইএর বৌর অনাদর ও তাচ্ছিল্যের মধ্যে আশ্রয় পাইল।

ওর শক্ত হাড়—ঝঞ্ঝাবাতেও টিকিয়া গেল। টিকিল না মেয়েটী—ঠাণ্ডা লাগিয়া ব্রঙ্কাইটিশ এবং একরকম বিনা চিকিৎসাতেই মৃত্যু।

স্বামী হারাইয়া লক্ষ্মী কাঁদে নাই স্বামীকে চিনিবার অবসর তার হয় নাই। স্বামীরও উপসর্গ জুটিয়াছিল বহুৎ—দেশে কম যাইতেন, গেলেও লক্ষ্মীর সঙ্গে যে রকম ব্যবহারটা করিতেন লক্ষ্মীর স্মৃতির কোঠায় তা খুব উজ্জ্বল নয়।

কিন্তু মেয়েকে দিয়া হয়তো স্বামীকে সে ফিরিয়া পাইত, কারণ মেয়ের ওপর তাঁর টান পড়িতেছিল। কিন্তু এমনি সময়ে পরকালের ডাকে জবাব দিতে তিনি চলিয়া গেলেন।

মেয়ে হারাইয়া লক্ষ্মী কাঁদিল—খুবই কাঁদিল। শেষে চোখের জল চোখে মিলাইল—মনের দাগ মিলাইল কি কে জানে?

স্বামী থাকিতেই পতন ঘটিয়াছিল, বাপের বাড়ী আসিয়া আরো বাড়িল। দ্বিতীয় সন্তান যখন তার উদরে তখন দাদার এক বন্ধু তাকে কলিকাতায় রাখিয়া যান—কেরাণী বাগানের এই বাড়ীতে এই ঘরেই।

এখানে আসিয়া অল্পদিনেই নিজেকে নতুন করিয়া গড়িয়া লইয়াছে। নতুন? তা নতুন আর কতটুকু? সতীত্বের সংস্কার তো কবেই লুপ্ত হইয়াছে—মদের নেশাটা নতুন বটে। পতিতা জীবনের প্রথম ছ'বছরে তার যা আয়, সঞ্চয় করিলে হয়তো একটা জীবন কাটাইয়া দিবার পক্ষে যথেষ্ট। কিন্তু মদের নেশায় সব যে উপিয়া গিয়াছে।—

সুদিনের অংশ গ্রহণ করিতে তার ভাইএরা ছাড়ে না; সবচেয়ে ছোট ভাই মাঝে মাঝে দিদির কাছে আসে, টাকা কড়ি জিনিষ-পত্তর কিছু কিছু লইয়া যায়।

এখনো ওর মনে জাগে ছোট্ট মেয়েটীর স্মৃতি। ডলির ওপরে ওর যা আকর্ষণ তার পূর্ব্বেতিহাস এই।

—ছয়—

লক্ষ্মীরই এক বাবু—আসল নামটা প্রকাশ করা চলেনা, নকল না-হয় ধরিয়া লইলাম—প্রকাশ, শনিবারের বাবু যখন আসিয়া জুটেন নাই, তখন তিনিই ছিলেন "ইনার সার্কেল্"এর।

প্রকাশ বাবু ইণ্ডিয়া-গবর্ণমেণ্টের "আর্ম্মি" ডিপার্টমেণ্টে কেরাণী—কলিকাতা হইতে বদলী হইয়া যখন দিল্লী যান, কাচের আলমারীটা, আবলুস কাঠের সো-কেশটা আর অর্গান-টিউন হারমোনিয়মটার সঙ্গে ডলিকে রাখিয়া যান লক্ষ্মীর ঘরে।

আরো ছ'তিন মাস আগেকার কথা। বাবুর সহিত ডলি আসে লক্ষ্মীর বাড়ীতে। ওকে দেখিয়া লক্ষ্মীর যতটা না ভাবান্তর ঘটে, তার বেশী ঘটে ওর নাম শুনিয়া। প্রথম দিন বাবু যখন বলেন, ওর নাম ডলি, লক্ষ্মীর বুকের ভেতরটা কাঁপিয়া ওঠে। ডলি! আহা! সেই একটু খানি মেয়ে গো!

ডলি! ডলি! আঃ—

কুকুরটাকে বুকে চাপিয়া ধরে, আদরে ডলি এলাইয়া পড়ে। বাবুকে বলে—ওকে আমায় দেবে?

বাবু বলেন—পাগল! ও আমাদের ছেড়ে থাক্‌তে পারে কখনো?

কুকুরটার দিকে ফিরিয়া ফিরিয়া চায়। বাবুর হাত ধরিয়া বলে—একটা কথা রাখবে?

বাবু বলেন—কি কথা? হ্যামিণ্টনের—

ও বলে—না গো না হ্যামিণ্টনের দোকানে নতুন গয়নার বায়না দিতে হবে না। আমি বুঝি সেই আবদারই শুধু করি?

বাবু শুধান—তবে?

বলে—ওকে কাল নিয়ে আস্‌বে তো?

বাবু বলেন—আস্‌বো।

আবার বলে—পরশু?

বাবু বলেন—আস্‌বো

বলে—রোজ নিয়ে আস্‌বে?

বাবু হেসে বলেন—আচ্ছা ফন্দীবাজ তো তুমি লক্ষ্মী! ওকে নিয়ে আসার ছলে আমাকেও রোজ টেনে আন্‌তে চাও?

আহত হইয়া লক্ষ্মী বলে—তা বলিনে। তুমি যেদিন যেদিন আস্‌বে, ওকে নিয়ে তো আস্‌বেই, যেদিন না আস্‌বে—সেদিনও পাঠিয়ে দেবে। কি বল?—

বলেন—অর্থাৎ আমার চেয়েও ওকে দিয়ে তোমার বেশী প্রয়োজন ?

হরবিলাস তো এই কথাটারই পুনরুক্তি করিয়াছিল মাত্র। আরো কতজনে যে এই কথাটাই বলিয়াছে, তার কি হিসাব আছে ? তবে কথাটা প্রথমে লক্ষ্মী কানে তোলে এই। মনে একটু খচ্ করিয়া ওঠে—কিসের যেন কাঁটা বিঁধে।

ওর কালো মুখ বাবু সহিতে পারেন না। আবার বলেন—আচ্ছা, দেব পাঠিয়ে—নিশ্চয় দেব।

এর বেশী লক্ষ্মী আশা করে না। নিজেরটাই সে ধরিয়া রাখিতে পারে নাই—ওতো পরের।

রোজ যখন বাবুর সঙ্গে আসে, ডলিকে সে খাবার দেয়। আদর করে কত। থাকিয়া থাকিয়া বুকে চাপিয়া ধরে।

অবশেষে একদিন ডলিকে সে আপনার করিয়া পায়।

প্রকাশবাবুর ওপরে অনেকটা নির্ভর করে সে, তাঁর বদলীতে আসন্ন আর্থিক ক্ষতির সান্তবনায় দুঃখিত হইবার অবকাশ পর্য্যন্ত পায় না—ডলিকে লইয়া এতই মত্ত।

প্রথম প্রথম ডলি বলিয়া ডাকিতে বুকে তার বেদনার চোরকাঁটা বিদ্ধ হয় ; শেষে আর হয় না।

মানুষ-ডলির স্মৃতিটুকুও কি কুকুর-ডলির মধ্যে তলাইয়া যায় ? অন্তরে বাহিরে ফাঁকী দিয়াই নিজেকে ভরিয়া তোলা যাহাকে বলা হয়, একি তাই ?

তারপর ?

তারপর সে আর একটা মানুষ।

ডলিই তাকে মদ ছাড়ায়। কবে মাতাল হইয়া ডলিকে লাথী মারে, ডলির আর্ত্তনাদেই নেশা টুটিয়া যায়—আর মদ খায় না।

যে-সব পুরাণো বন্ধু মদ খাইতে ভালবাসে, ঠাঁই না পাইয়া তারা ফিরিয়া যায়। শনিবারের বাবু মদ খান না, তাই। নৈলে তাঁকেও হয়তো হারাইত !

আগন্তুকের সংখ্যা কমিয়া আসে।

—সাত—

মকর আসিয়া বলে—বীণাকে তো আর ঠেকিয়ে রাখ্‌তে পারিনে ভাই।

লক্ষ্মী চুপ করিয়া থাকে।

মকর বলে—বছর ঘুরে এল, এক পয়সা সুদের পেল না। বলে, সাম্‌নে চৈত্ সংক্রান্তি, এর মধ্যে সুদের টাকাটা অন্তত দিয়ে দিক্ সব, নইলে জবাব দিক্।

লক্ষ্মীর বুকটা কাঁপিয়া ওঠে—নতুন হার ছড়া ! ছ'মাস সে পরিতে পারে নাই।

মকরকে শুধায়, সংক্রান্তির আর ক'দিন ?

মকর বলে—আজ সতেরোই, আর তের দিন।

লক্ষ্মীর মুখে আঁধারের কালিমা ঘনাইয়া আসে—সতেরো ? আর তো তের দিন বাকী, এরই মধ্যে কি করিয়া সে জোগাড় করিবে ? সুদের টাকা তো কম নয়, কম হইলেও সাতাশ টাকা। মকরকে বলে—তুই-ই বল্ না ভাই, কি করি ?

মকর ভাবিয়া পায় না।

ও বলে—শনিবারের বাবুর টাকাটা ওবেলায় পাব। কিন্তু তা যে মুদিকেই দিতে হবে।

মকর বলে—চক্‌দিঘির বাবুর কাছে একটা চিঠি লিখে দেনা।

বলে—তা কি আর দিইনি। দু'তিন খানা চিঠি দিয়েছি।

মকর শুধায়—জবাব পেলি কিছু ?

উত্তর আসে—দু'খানার তো জবাবই নেই। শেষের-খানির ছোট্ট একটা জবাব পেয়েছি। তাও দু'ছত্র—

মকর আবার প্রশ্ন করে—কি ?

উত্তর দেয়—সময় আর সুযোগ হ'লেই আস্‌বে, এই মাত্র।

মকর বলে—তার মানে—আস্‌বে না। স্পষ্ট জবাব। তা এখন কি কর্‌বি ?

বলে—সো-কেশটাই বেঁচে ফেল্‌বো অর্দ্ধেক দামে দিলেও গোটা ত্রিশেক টাকা হবেই। তা থেকে সুদের টাকাটা তো দিয়ে দেই—

বলিয়া আর একটা দীর্ঘ নিশ্বাস ছাড়ে। সো-কেশটার পানে ফিরিয়া চায়—কত দিনের কত প্রসাধনের, বিকশিত যৌবনের বিজয়াভিসারের সাক্ষী ঐ সো-কেশটা। আঃ—

আর একদিনের কথা—

লক্ষ্মীদের বাড়ীতে সাড়া পড়িয়া যায়, বড় বাজারের এক ভাটিয়া বাবু পাইক পাড়ায় গার্ডেন পার্টি দিবেন ! লক্ষ্মীদের বাড়ীর চারিটী মেয়ের নিমন্ত্রণ—লক্ষ্মীরও।

প্রত্যেকের জন্য নতুন বেনারসী শাড়ী, এক একছড়া সরু হার আর নগদে পঁচিশ টাকা বরাদ্দ। মকর বলে—ওলো, তোর সো-কেশটা এবারে রক্ষা পেল।

লক্ষ্মী খুসী হইয়া বলে—আমার ডলির ভাগ্যি।

আর আর মেয়ে আগে থাকিতে মোটরে উঠিয়া বসে। ডলিকে মাজিয়া ঘষিয়া রূপার ঘুঙুর আর দামী বগ্‌লাস্‌টা গলায় দিয়া লক্ষ্মী ডলিকে লইয়া যায় মোটরে।

বাবুর ড্রাইভার অবোধ্য হিন্দিতে যা বলে, তার অর্থ দাঁড়ায় এই যে— বিবিজান্‌ একা গিয়া মোটরে উঠুন, কুকুরকে নেওয়া চলিবে না।

লক্ষ্মী শুধায়—কেন?

ড্রাইভার বলিয়া যায়—বাবুকে একবার কুকুরে কাম্‌ড়াইয়া প্রায় ছ'মাস ভোগাইয়াছিল, সেই জন্য বাবুর কড়া নিষেধ—মেয়েমানুষের সঙ্গে কুকুর কিছুতেই তার বাগান বাড়ীতে ঢুকিতে পারিবে না।

লক্ষ্মীর মুখে উদ্বেগের চিহ্ন দেখা দেয়। মেয়েরা বলে—কুকুরটাকে বাড়ীতেই রেখে আয় না লক্ষ্মী?

হরিমতি মোটর হইতে নামিয়া আসে—ডলির গলা ধরিয়া আদর করিয়া বলে—লক্ষ্মী ডলি, তুমি আজ ঘরে থাক। তোমার মা বেড়িয়ে আসুক একটু।

লক্ষ্মীর হাত হইতে শিকলটা ছিনাইয়া লয়। লক্ষ্মী দুয়ার খুলিয়া দেয়, হরিমতি জানালার শিকের সঙ্গে শিকলটা বাঁধিয়া দেয়। বলে—চল্‌ মকর।

লক্ষ্মীকে ঠেলিয়া আনিয়াই মোটরে উঠায়। ড্রাইভার তখন হাঁটু গড়িয়া মাটীতে বসিয়া পাম্প্‌ দিতেছে, বলে—এই তো ভালো বিবিজান, কুকুরটাকে সঙ্গে নিয়ে কি হবে?

লক্ষ্মী একপাশে চুপ্‌ করিয়া বসে—

ঘরের মধ্যে হইতে ডলির কান্না শুনা যায়। দারুণ আর্ত্তনাদ—

একটী মেয়ে বলে—আঃ ডলি কী কান্নাটাই না কাঁদছে!

আর একটী মেয়ে বলে—কেঁদে কেঁদে যে ম'লো।

ড্রাইভার তখন ষ্টার্ট দেয় কেবল। লক্ষ্মী বলে—থামাও।

মেয়েরা চমকিয়া ওঠে। হরিমতি বলে—কেন?

ও বলে—আমি নেমে যাব।

সকলকে বিস্ময়ের চরমে তুলিয়া দিয়া ও নামিয়া আসে। ঘরের দরজা খুলিয়া ডলিকে গিয়া জড়াইয়া ধরে।

ডলি কাঁদিয়া কাঁদিয়া শান্ত হয়।

সে রাত্রে আর খাওয়া-দাওয়া হয় না, মায়েরও না—ছেলেরও না।

—আট—

পরদিন সকাল আটটা আন্দাজ।

লক্ষ্মীর মহাজন বীণাই আসে ফার্ণিচারওয়ালাকে লইয়া। দুইটা কুলী সো-কেশটা ধরিয়া ঘরের বাহির করে। সো-কেশ সহ কুলীরা যখন সদরের ফটক পার হইয়া নীচে নামিবার উদ্যোগ করে, বাধা পায় তারা—সাম্‌নেই ভাটিয়া বাবুর মোটর আসিয়া দাঁড়ায়।

মোটর হইতে নামে হরিমতি এবং আর আর মেয়েরা। প্রত্যেকের পরণে নতুন বেনারসী, গলায় সরু সোনার হার—কেহ ভাঁজ করিয়া গলায় দিয়াছে, কেহ বা সখ করিয়া হাঁটু পর্য্যন্ত ঝুলাইয়া রাখিয়াছে।

হরিমতি সরাসর লক্ষ্মীর ঘরে ঢোকে। ডাকে—মকর!

লক্ষ্মী চুপ করিয়া বসিয়া—চোখ দু'টী তার জবা ফুলের মতো লাল। যেখানে সো-কেশটা ছিল, সেই খালি জায়গাটারই পানে চাহিয়া সে।

মকরের পানে ফিরিয়া চায়—চোখের আগে ঝল্‌সাইয়া ওঠে নতুন বেনারসী আর সরু হার ছড়াটা।

মকর আবার ডাকে—লক্ষ্মী!

ও উঠিয়া দাঁড়ায়। মকরের কাঁধে হাত রাখিয়া বলে—নতুন শাড়ী আর নতুন হার দেখাতে এসেছিস্‌ বুঝি ভাই?

হরিমতি হা করিয়া চাহিয়া থাকে। ও আবার বলে—বেশ ভাই, বেশ। ভারী সুন্দর মানিয়েছে তোকে। কিন্তু তা বলে দেমাকে মাটীতে পা ফেল্‌তে পারিস্‌ যেন।

হরিমতি আহত হইয়া চলিয়া যায়।

সারাদিন আনমনা বসিয়া ভাবে।

রাত্রে দু'তিনজন লোককে ফিরাইয়া দেয়।

—নয়—

গ্রীষ্ম যায়, বর্ষা আসে।

বারনারীদের সব চেয়ে দুঃসময় নাকি এইটেই।

বাইরে জলের ঝাপ্‌টা পড়ে, ডলিকে এক দণ্ড বাইরে

রাখিতে পারে না—দিন-রাত থাকে সে ঘরেই। মেঘের ডাকে ডলি চম্‌কাইয়া ওঠে—বিদ্যুতের ঝলকে লাফালাফি করে। এ কীরকম মেজাজ তার!

একে বাদ্‌লায় লোকে পথে বাহির হয় না, গলিতে সাঁঝের যাতায়াত নাই বলিলেই চলে। তার ওপর ডলির উৎপাৎ। সাথে সাথে লক্ষীও যেন ক্ষেপিয়া যায়।

দু'দিন অপেক্ষার পরে একটী অতিথ্‌ জুটিয়া যায়। ভদ্রলোক ডলির চীৎকারে অতিষ্ঠ। লক্ষীকে বলেন—ওকে বাইরে রেখে এস।

লক্ষী বলে—বিষ্টিতে যাবে কোথায়?

লোকটী বলেন—কিন্তু অমন বিদিকিচ্ছি চীৎকারও সইতে পরি নে বাবু।

শেষে বাবুটীই উঠিয়া যান—

দুয়ারের কাছে গিয়া লক্ষী তাঁর হাতখানি ধরে—টাকা?

ঝনাৎ করিয়া একটা টাকা ফেলিয়া দিয়া বাবুটী চলিয়া যান। লোকটাকে এক রকম সেই তাড়াইয়া দিল, এক টাকার বেশী দাবী করে কি করিয়া?

বাড়ীওয়ালী আসে ভাড়ার টাকার তাগাদায়। দু'মাসের ভাড়া জমিয়াছে—একত্রে বত্রিশ টাকা কি করিয়া দেয়! তাহা ছাড়া ইলেক্‌ট্রিক চার্জও দু'মাসে পাঁচ টাকা—সাঁইত্রিশ। বাড়ীওয়ালী গালাগালি করে; শেষে বলে—ভাড়ার টাকা দেওয়া সামর্থ্য যার নেই, সে আবার হাতে তাগা পরে কেন?

হাড় হাড়াটা জন্মের শোধ গিয়াছে, তাগা জোড়ার ওপরে বাড়ীওয়ালীর বড় সাধ। হয়তো হাত হইতে খুলিয়া উহাকেই দিতে হইবে। ভাবিয়া আঁত্‌কাইয়া ওঠে। বলে—আর দু'চারদিন দেখ, শেষ আদায়ের উপায় তো আছেই।

ডলির জন্ম আর মাংস কেনা হয় না, গয়লাকেও জবাব দেওয়া হয়—ডলি খালি ভাত বা ডাল-ভাত খাইতে পারে না—প্রায় উপোসী থাকে—

সঙ্গে সঙ্গে লক্ষীও। ছেলেকে না খাওয়াইয়া মা কি খাইতে পারে? একি রাক্ষসী—পেটে পুরিলেই হইল?

শরীরটী শুকাইয়া কাঠ। পাণ্ডুর মুখে পাউডার ঘসিতে বসে—আয়নায় নিজের মুখ দেখিয়া শিহরিয়া ওঠে—নিজেকে নিজে চিনিতে পারে না যেন।

শনিবার রাত্রে আসিয়া বাড়ীওয়ালী টাকা চায়—লক্ষী জানে না, তার মকরের শিক্ষা এ।

নিজের দৈন্যের কথা এমন করিয়া পাড়ার বাবুর কাছে প্রকাশ করিতেও তার বাধে, দরজার কাছে আসিয়া বাড়ীওয়ালীর হাতে তাগা জোড়া খুলিয়া দেয়। আগুনের হল্‌কার মতো দৃষ্টি হানিয়া চাপা গলায় বলে—আর বোকোনা, চুপ কর।

কথাটা বাবুর কানে যায়। হাতের দিকে চাহিয়া বাবু বলেন—তাগা!

সব কথা খুলিয়া বলিতে হয়। বাবুর মুখ গম্ভীর হইয়া ওঠে। ওর অসাক্ষাতে বাবু আসিয়া হরিমতির সহিত পরামর্শ করেন। হরিমতি বলে—কুকুরটাকে না তাড়ালে ও শোধ্‌রাবে না।

বাবু বলেন—কিন্তু তাড়াইবা কি করে মকর?

হরিমতি বলে—আমি একদিন না হয় ছেড়ে দেব, আপনি যদি ধরে নিয়ে যান্‌।

বাবু সায় দেন। আরো পরামর্শ চলে।

—দশ—

অবশেষে একদিন সত্যই লক্ষী ডলিকে খুঁজিয়া পায় না। দু'দিন দু'রাত যায়, কত খোঁজাখুঁজি—কিছুতেই ডলির সাক্ষাৎ মেলে না।

লক্ষী এ দু'দিন উপোসী, নির্জ্জলা উপোসী—ডলিকে না পাইয়া সে জল-গ্রহণ-করিবেনা, এ তার ধনুর্ভঙ্গ পণ

বাবুর কাছে খবর যায়, বাবু আসেন—খোঁজেন এবং জবাব দেন—পাওয়া গেল না,

সন্ধ্যার সময় একগাল হাসি হাসিয়া বাড়ীওয়ালী তাগা-জোড়া আর দু'মাসের ভাড়ার রসিদ্‌ দিয়া যায়। ও অবাক্‌ হইয়া প্রশ্ন করে—টাকা দিলে কে?

জবাব পায়—বাবু।

আঙুল নির্দ্দেশে বাড়ীওয়ালী শনিবারের বাবুকেই দেখায়।

ও বলে—তুমিই টাকা দিয়েছো?

বাবু বলেন—দিয়েছি আমিই।

বলে—অতোগুলো টাকা দিলে, ধার করে বুঝি?

আম্‌তা আম্‌তা করিয়া বাবু বলেন—না লক্ষী, ধার করে দিইনি।

শুধায়—তবে ?

বাবু মুচ্‌কি হাসি হাসেন। বলেন—ধার করে দিয়েছি কি ঘর থেকে এনে দিয়েছি, সে খবরে তোমার কাজ কি লক্ষ্মী ?

লক্ষ্মী ভাবে কি মনে মনে।

খানিকপরে পান-বিড়ী আর সোডাওয়াটারওয়ালা পরমেশ্বর আসিয়া বলে—মাঈজী, সব টাকা পেয়েছি।

তারপর বাবুর দিকে ফিরিয়া বলে—বাবু যখন আছেন, তখনকি আর টাকার জন্তে ভাবনা করি ?

পরমেশ্বর চলিয়া গেলে লক্ষ্মী বাবুকে শুধায়—ওর পাওনা ছিল সাড়ে সাত টাকা, তাও তুমি দিয়েছো ?

বাবু হাসি গোপন করিয়া বলেন—দিয়েছি।

হরিমতি হাসিয়া হারছড়াটা ছুঁড়িয়া ফেলে ওর গায়। বলে বীণা এসে দিয়ে গেল।

ও বলে—তার মানে ?

হরিমতি বলে—মানে আর কি ? স্থদে আসলে সব টাকা বুঝে পেয়েছে সে, হার দেবে না ?

হরিমতি চলিয়া যায়। ও বাবুকে বলে—এটাকাও তাহলে তুমি দিয়েছো ?

বাবু বলেন—দিয়েই যদি থাকি লক্ষ্মী, তাহলে কি অন্যায় করেছি ?

বলে—কিন্তু এত টাকা পেলে কোথায় ?

বাবু কোন জবাব দেন না—পাশ ফিরিয়া শুইয়া থাকেন।

ও ঝড়ের মতো বাহির হইয়া যায়। হরিমতি তখন নিজের ঘরে মেয়েদের শুধায়—তোরা কিছু জানিস্ ?

একটা মেয়ে হরিমতির নামে জলিয়া উঠে, বলে—কি জানি ভাই ! তবে দেখছি তো ক'দিন ধরে হরিমতির সঙ্গে ফিসির ফিসির করে কি বল্‌ছেন।

হরিমতির ঘরের দরজা ঠেলিয়া তীক্ষ্নস্বরে ডাকে—মকর !

এমনি শক্ত করিয়া ধরে যে হরিমতি কথাটা অস্বীকার করিতে পারেনা।

ঘরে ফিরিয়া বাবুকে বলে—বাবু !

বাবু বলেন—কেন ?

বলে—আমার ভলিকে বেচে আমার সাহায্য করছো ? এমন সাহায্য তোমার কাছে কখ্‌খনো চাইনি তো।

বাবু বলিতে যান—লক্ষ্মী, চুপ কর, কথাটা শোন—

কিন্তু কোন কথাই আর শুনিতে চায় না। বলে—কোন কথা শুনতে চাইনে আমি আমার ছেলেকে পর করে দিয়ে আমাকে হাতে রাখবার চেষ্টা ! তা নইলে হবে কেন ?—বলিয়া ছ'একটা অশ্রাব্য কথাই বলিয়া ফেলে। বাবু কানে আঙুল দেন।

আবার বলে—কারু সাহায্য চাই নে আমি, তোমরা কেউ এসো না আর।

বাবু হাসিতে হাসিতে বলেন— আর না-হয় আস্‌বো না কিন্তু আজকে ?

বলে—আজ কি ? একটা দিনও থাক্‌তে পার্‌বেনা আমার ঘরে, এক দণ্ডও না—যাও বেরোও—

বাবু বলেন—মদ না খেয়ে—

বলে—মদ না খেয়ে এমন মাতাল কেউ হয়, এ তোমার অজানা ? বেশ তাই হয়েছি আমি। নেশা যদি মনে কর তবে তাই। কিন্তু আমার এ নেশা আজ বাদে কাল ভাঙ্‌বে বলে যদি আশা কর তবে ভুল। আমার ছেলেকে যে বিক্রী করে, তাকে আমি কোনো কালেই আমার ঘরে ঠাঁই দো'বো না। যাও বেরিয়ে যাও।—

একটু থামিয়া আবার বলে—যাও। নইলে পুলিশ ডাক্‌বো।

লক্ষ্মী যদি মদের ঝুকিতে এ ধরণের কথা কহিত বাবু অবশ্যই তা গায়ে মাখেন না। কিন্তু সজ্ঞানে দৃঢ়স্বরে যখন এ আদেশ করে—বিশেষতঃ রাগের মাথায় পুলিশ ডাকিলে কেলেঙ্কারী কোথায় গিয়া দাঁড়ায় তার তো ঠিক নেই, তাই বাবু উঠিয়াই পড়েন।

সদর হইতে নামিলে লক্ষ্মী শুধায়—কার কাছে বেচেছো? সেই পার্শী সাহেবের কাছে ?

একটীমাত্র কথা শোনা যায়—হাঁ।

খালি ঘরে বসিয়া সেই অর্দ্ধশিক্ষিত মেয়েটী যা ভাবে, শুদ্ধ ভাষায় গুছাইয়া বলিলে তা দাঁড়ায় এই—

আর নয় ! আর নয় ! পতিতা গৃহের বিষাক্ত বাতাস যেভাবে আমার প্রতি মুহূর্ত্তের নিঃশ্বাস-প্রশ্বাস রুদ্ধ করিয়া তুলিতেছে, তাহাতে আর এখানে তিলার্দ্ধও অপেক্ষা

করিতে পারি না। যেখানে ছেলের ওপর মায়ের আর মায়ের ওপর ছেলের আকর্ষণ অপরাধ বলিয়া গণ্য, নির্ম্মম নৃশংস রাক্ষস-রাক্ষসীদের বিদ্রূপ ও টিটকারীর বিষয়, সেখানে মন টিঁকাইয়া থাকিতে আর যেই পারুক, আমি পারিব না। আমার কোল হইতে আমার ছেলেকে কাড়িয়া লইয়া তুচ্ছ অর্থের বিনিময়ে বিক্রয় করিবার স্পর্দ্ধা পর্য্যন্ত যাহারা রাখে, তাহাদের মন জোগাইয়া চলিতে, তাহাদের তৃপ্তির জন্য নিজেকে সু-সজ্জিত করিয়া, নিজের রূপ-যৌবন উন্মুখ ও অনাবৃত করিয়া রাখিতে আমি পারিব না—পারিব না—পারিব না।

—দশ—

পরদিন সকালে উঠিয়াই লক্ষ্মী পরমেশ্বরকে দিয়া ফার্ণিচারওয়ালাকে ডাকে। ডাকিয়া বলে—এই ঘরের খাট, আলমারী, বিছানা-পত্র, আলনা, ছবি—মায় পেতল ও রূপার বাসনগুলোর জন্যে কত দেবেন আপনি?

ফার্ণিচারওয়ালা কোন কথা না বলিতেই ঘরের মধ্যে ঢুকিল হরিমতি। সে বলে—আপনি সত্যই এসবের দর করবেন না দাশুবাবু, ও পাগল হয়েছে।

জিনিষগুলি দেখিয়া দেখিয়া দাশুবাবু লুব্ধ হইয়া উঠেন। হরিমতির কথায় বিদ্রূপের ভঙ্গীতে তিনি বলেন—তাই তো ভাবি, এত বৈরাগ্য এল কবে!

শুনিয়া ও আরো জ্বলিয়া ওঠে। বলে—না দাশুবাবু, আমি পাগল হইনি। সত্যই আমি সব বিক্রী করবো। আপনি কত দিতে পারবেন বলুন?

দাশুবাবু ছুঁতা-নাতা না করিয়া সময় কাটাইয়া দেন। হরিমতি ঘরের বাহিরে গেলে চুপি চুপি বলেন—জিনিষগুলো পুরাণো, আলাদা আলাদা করে দর করলে হয় তো কমই পড়বে। তা তোমার টাকার দরকার, আড়াইশো টাকাই না-হয় নিও।

ও উৎফুল্ল হয়—ডলির দর কি আর আড়াইশো টাকার বেশী হইয়াছে? সকল জিনিষের তালিকা লিখিয়া তার নীচে লক্ষ্মীর নাম সই করিয়া লইয়া দাশুবাবু আড়াইশো টাকার নোট তার হাতে গুঁজিয়া দেন।

লক্ষ্মী বাড়ীর বাহির হইয়া পড়ে—এক বস্ত্রে। বড় রাস্তায় পড়িতেই গয়নার দোকান। হার, তাগা, রুলী, আংটী এবং অল্প-স্বল্প আর যা গয়না ছিল, একত্র করিয়া দোকানদারের হাতে তুলিয়া দেয়। বলে—এই গয়না নিয়ে কত টাকা দিতে পারবে?

দোকানী গয়নাগুলি নাড়িয়া চাড়িয়া দেখিয়া বলে—শ' চারেক।

আচ্ছা, তাই দাও—বলিয়া টাকা লইয়া লক্ষ্মী আগাইয়া যায়। নেবুতলার মোড়ের ওপাশে সেই পার্শীর বাড়ী—যে একদিন ছ'শো টাকা দিয়া ডলিকে কিনিতে চাহিয়াছিল। সাহেব বাড়ীতেই ছিলেন, লক্ষ্মী গিয়া বলে—আমার কুকুরটা ফিরিয়ে দিন।

সাহেব বলেন—ফিরিয়ে দেব, সেকি? ওটাকে কত টাকা দিয়ে কিনেছি তা জান?

সাড়ে ছ'শো টাকার নোট সাহেবের সুমুখে ছড়াইয়া ধরিয়া লক্ষ্মী বলে—এর বেশী দিয়ে নিশ্চয় নয়। এগুলো সব নাও, আমার ছেলেকে দাও।

সাহেবের মেয়ে ডলিকে আনিয়া দেয়, ডলি লক্ষ্মীকে পাইয়া হাতে হাতে স্বর্গ পায় যেন—লক্ষ্মীই কি তার কম? নোটগুলি ড্রয়ারে ভরিয়া সাহেব চাহিয়া দেখেন—মায়ে ছেলেতে মনের আনন্দে রাস্তায় গিয়া দাঁড়াইয়াছে। কি ভাবিয়া মেয়েকে দিয়া সাহেব একখানা পঞ্চাশ টাকার নোট পাঠাইয়া দেন।

লক্ষ্মী ছল ছল চোখে বলে—ও নোট আমি নিতে পারবো না। যেখান থেকে এসেছি, সেখানকার কোনো স্মৃতিই আর রাখবো না। মায়ে-বেটায় নতুন করে সংসার পাতবো।

ডলিকে আদর করিয়া বলে—কি বলিস্ ডলি, পারবিনে আমার সঙ্গে কষ্ট করে থাকতে?

নারীর পুরস্কার

ডাক্তার শ্রীঅমূল্যধন ঘোষ

আমার নাম সুধাহাসিনী। শুনিয়াছি নামের সঙ্গে মানুষটার অনেক সময়ে অনেক মিল থাকে। আমার ভাগ্যে কিন্তু তাহার কিছুই হয় নাই। চিরজীবনটা যাহাকে কাঁদিয়া কাটাইতে হইবে, তাহার নামকরণের সময় ভগবান আমার পিতার মনে এমন বিপরীত নামটা কেন যে জোগাইয়া দিয়াছিলেন তাহা আজও বুঝিয়া উঠিতে পারিলাম না। আমার দুরদৃষ্টের উপর করুণাময় বিধাতারও কি নিষ্ঠুর পরিহাস ছিল ?

চিরকাল ধরিয়া এই প্রবাদবাক্য শুনিয়া আসিতেছি, "দুঃখের কপালে সুখ নেই।" আমারও দুঃখের কপালে সুখ হইল না। অথচ এই দুঃখের কপালটাকে পরিবর্তন করিয়া ফেলিবার জন্য আমি নিজে যথেষ্ট চেষ্টাই করিয়াছি। অদৃষ্টের সঙ্গে পুরুষকারের নিত্য যে লড়াই হইয়া থাকে তাহা কেবল পুরুষেরই জীবনে ঘটে। নারী নিজের অদৃষ্ট নিজে গড়িয়া তুলিতে পারে না, সারাজীবন পরের অদৃষ্টের উপরই তাহাদের নির্ভর করিয়া চলিতে হয়। আমি তবুও নিজের অদৃষ্ট গড়িয়া তুলিবার চেষ্টা করিতে ছাড়ি নাই।

সে সকল কথা পরে বলিব,—এখন আগের কথা আগে বলি। যখন একঘর ছেলেমেয়ে হারাইবার পর, বৃদ্ধ বয়সে, সন্তান লাভের বয়স প্রায় অতিক্রম করিয়া, আমার পিতামাতা আমায় লাভ করিলেন, তখন বড় আদরে আমার নাম রাখিলেন,—সুধাহাসিনী। তারপর আমার ছয়মাসমাত্র বয়সে আমার বাপ মা দুজনেই এক দিনে কলেরা রোগে মারা গেলে, জগতে আমার আপনার লোক রহিলেন, শুধু হারা মরার অবশিষ্ট, বড় দাদা।

বড়দাদার বয়স তখন একুশ বৎসর মাত্র। হারা-ারার ধন বলিয়া বাবা তাঁহাকে লেখা পড়া সেখান নাই। জভিহীন কায়স্থ ঘরের মূর্খছেলে দাদা আমার, পিতৃহীন ইয়া দারুণ কষ্টে পড়িলেন বটে, কিন্তু তাহার কষ্ট াড়াইবার মূল কারণ হইলাম, আমি। তখনও দাদার বিবাহ হয় নাই। পিতামাতা তাহাকে আদর করিয়া মূর্খ করিয়া রাখিয়াছিলেন বটে, কিন্তু সকাল সকাল বিবাহ দিয়া আরও বেশী আদর দেখাইয়া যান নাই। কিন্তু বাপ-মা মরিতে না মরিতেই আমারই জন্য দাদাকে বিবাহ করিতে হইল। গরীব বাবা দাদার জন্য যদিও কিছুই রাখিয়া যাইতে পারেন নাই, তবুও একা দাদা যে কোনও উপায়ে সহজেই নিজেকে চালাইয়া লইতে পারিতেন। কিন্তু, আমাকে মানুষ করিবার জন্য পাঁচজনের পরামর্শে দায়ে পড়িয়া দাদাকে বিবাহ করিতে হইল। গ্রামেরই একজন সম্ভ্রান্ত ধনী ব্যক্তি দাদাকে তাহার অধীনে সামান্য বেতনে একটা চাকুরি দিয়া তাহার বাড়ীর পাচিকার একমাত্র অরক্ষণীয়া কন্যার সঙ্গে দাদার বিবাহ দিয়া, একদিকে আমার বাঁচিবার ও অপরদিকে অসহায়া বিধবার কন্যাদায় উদ্ধারের উপায় করিয়া দিলেন।

জগতের চিরপ্রচলিত প্রথানুসারে দাদার লক্ষ্মীভাগ্যের অভাবে ষষ্ঠভাগ্যটা খুব প্রবল হইয়া উঠিল। এদিকে আমিও বড় হইয়া উঠিলাম। আমার বিবাহের চেষ্টা চলিতে লাগিল। একটু ভালঘরে বিবাহ না দিলে চিরকালই আমায় টানিয়া বেড়াইতে হইবে, এই আশঙ্কা করিয়াই দাদা অনেক সন্ধানের পর অতিকষ্টে বেশ ভাল ঘরে আমায় পার করিলেন।

কপালগুণে দুই বৎসরের মধ্যেই আমি বিধবা হইলাম। শ্বশুরের তখনও পাঁচ ছেলে বর্তমান। শাশুড়ী অল্পকালের মধ্যেই শোক ঝাড়িয়া ফেলিয়া ছেলে কয়টীর উপায় করিবার জন্য বিষয়ের ব্যবস্থা করিয়া লইলেন। আমি শ্বশুরের বিষয় লাভে বঞ্চিত হইলাম।

কিন্তু, স্বামী হারাইয়াও যেমন, বিষয় হারাইয়াও তেমনই, কোনওটাতেই আমার বিশেষ দুঃখবোধ হইল না। আমি বেশ স্বচ্ছন্দমনে দাদার কাছে ফিরিয়া আসিলাম।

আমার বুদ্ধিহীনতার এবং হৃদয়হীনতার কথা শুনিয়া

কহ যেন আশ্চর্য্য হইও না। স্বামীগৃহের কতটুকু আমার ছিল? স্বামীপ্রেমের কতটুকু আমি পাইয়াছিলাম, একটা স্ত গৃহস্থালী আমার হাড়ভাঙ্গা খাটুনির অপেক্ষায় ব-বন্দোবস্ত হইয়া ছড়াইয়া পড়িয়া আছে। সে বাড়ীতে একমাত্র স্ত্রীলোক ছিলেন, আমার শাশুড়ী। আমাকে বিয়ের ক'নে লইয়া গিয়াই তিনি আমার ঘাড়ে সমস্ত ার চাপাইয়া দিয়া নিষ্কৃতি পাইলেন! তাঁহারই বা দাষ দিব কি! তিনিও নয় বৎসর বয়সে সেই যে আসিয়া সখানে ঢুকিয়াছিলেন, সেই অবধি একটা মুহূর্ত্তের জন্য রাগে শোকেও তাঁহার খাটুনির বিরাম ছিল না। ত্রিশ বৎসর বয়সে তাঁহার গালের হাড়গুলি এমন উঁচু হইয়াছিল য সহসা তাঁহাকে তেষট্টি বৎসরের বলিয়া মনে হইত। আমি তবু সেখানে গিয়া পেটভরা অন্নের সংস্থান দেখিতে াইয়াছিলাম;—শুনিয়াছি তিনি যখন আসিয়াছিলেন, খন অর্দ্ধেক দিন তাঁহাকে উপবাসে কাটাইতে হইত। আমার দেহে তবু শীত বর্ষা ছেঁড়া নেকড়ার উপর দিয়া কাটে নাই! কাজেই আমাকে পাইয়া তাঁহার একেবারে হাত পা ছাড়িয়া দেওয়ার অপরাধ কি?

যাহা হউক স্বামীগৃহে আমার এই অধিকার ছিল! স্বামীপ্রেমে আমার অধিকারের দাবি যে কতটুকু, তাহা আমি সে বয়সে ঠিক জানিতাম না। তবে যেটুকু পাইয়াছিলাম, তাহা কেবল মাঝে মাঝে আমার কাজের খুঁত ধরিয়া নেপথ্যে তিরস্কার ও মায়ের কাছে অভিযোগ!

এরূপ স্থলে শ্বশুরবাড়ীর সৌভাগ্য হারাইয়া দুঃখিত না হওয়া কি এতই অস্বাভাবিক?

দাদার নিজের অবস্থা ভাল ছিল না। তিনি ভাল ঘরে আমার বিবাহ দিয়াছিলেন। কিন্তু, সে ভাল ঘরে আমার ছিল কি? দিন রাত হাড়ভাঙ্গা পরিশ্রম করিয়া, ধান ভানিয়া, দাল কাঁড়িয়া, জনমজুরের জন্য পর্য্যন্ত কাঁড়ি কাঁড়ি ভাত তরকারি রাঁধিয়া,—সামান্য মোটা ভাত মোটা কাপড়ের সংস্থান! আরাম উপভোগের জিনিস সেখানে কিছুই ছিল না। আমার শ্বশুরবাড়ীর সকলে যখন গর্ব্ব করিতেন যে, পরের চাকুরি না করিয়া, পরের দোরে না গিয়া, তাঁহাদের রাজার হালে চলিয়া যায়,—তখন আমার গা জ্বালা করিত। পুরুষরা চাষের কাজে হাড় মাটি করিবে, আর স্ত্রীলোকেরা ঘরের কাজে গতর জল করিবে,—অতটা পরিশ্রমের দাম কি শুধু পেটের জন্য কয়টি অন্ন ও বৎসরে এক জোড়া কাপড়? অতটুকু পাইবার জন্য কতটুকু পরিশ্রমের দরকার হয়?

পরিশ্রমে আমি কখনও কাতর ছিলাম না। দাদার ঘরেও অনেক পরিশ্রম করিতাম, পরের ঘরে অতটা পরিশ্রম করিলে যে আমি অতি সহজেই অনেক বেশী উপার্জ্জন করিতে পারি, এ বিশ্বাস আমার খুবই ছিল। তবে দাদার ঘরে আমার খুব একটা স্নেহের বন্ধন ছিল, তাই সেখানে আমার খাটুনির পরিমাণ হিসাবে দাম পাইবার কথা আমার মনে হইত না। কিন্তু, স্বামীগৃহে আমার কোনও আকর্ষণ না থাকায় আমার উৎকট পরিশ্রমের পরিমাণানুযায়ী কিছুই পাইতাম না বলিয়া হতাশায় বড়ই ম্রিয়মানা হইয়া থাকিতাম।

বিধবা হইবার কিছুকাল পরে একদিন নিজেই চেষ্টা করিয়া আসিয়া দাদার কাছে হাজির হইলাম। শাশুড়ী বিশেষ কোনও আপত্তি করিলেন না। আমার স্বামীই ছিল তাঁহার বড় ছেলে। সে মারা যাওয়াতে মেজর বিবাহের জন্য একটু তাড়াতাড়ি আয়োজন হইতেছিল। শীঘ্রই সংসারে আর একটি খাটিবার লোক পাইবার আশায় বোধ করি, শাশুড়ী আমায় রাখিবার জন্য বেশী টানাটানি করিলেন না।

দাদা আমায় দেখিয়া একেবারে বসিয়া পড়িলেন। খানিকক্ষণ গালে হাত দিয়া চুপ করিয়া থাকিবার পর যেন দারুণ দুঃখে তিনি দীর্ঘনিঃশ্বাসের সহিত বলিলেন, 'জানিস্ ত' সুবা, আমার অবস্থা—ভাব্‌ছি—"

আমি তাড়াতাড়ি উৎসাহের সহিত উত্তর দিলাম "কোনও ভাবনা নেই, দাদা তোমার। আমি নিজের পেটের ভাত নিজে যোগাড় ক'রে নিতে পারবো। আমি চরকায় সুতো কেটে আমার খরচ খুব চালিয়ে নিতে পার্ব্বো।"

কথাটা, বোধ হয়, দাদার তেমন যুক্তিযুক্ত মনে হইল না, তিনি চুপ করিয়া রহিলেন। আমি যে সময়ের কথা বলিতেছি, তখন চরকার ততটা প্রচলন ছিল না। তখন গান্ধী মহাত্মার দিন আসে নাই, সবে সুরেন্দ্রবাবুর দিন সুরু হইয়াছিল। তখনও কেহই লজ্জা নিবারণের উপায় ভাবিয়া চরকা ধরে নাই—তখন শুধু আমাদের জিনিস

বলিয়াই যেন কেহ কেহ অতি অকিঞ্চিৎকর বুঝিয়াও চরকার আদর করিতেছিল। কিন্তু, আমাদের মত অবস্থার লোক সেরূপ আদর করিতে পারিত না। যাহারা দেশের অতীত গৌরবের কথা লইয়া কবিত্ব হিসাবে বড় বড় কথা কহিতে পারে, তাহারাই শুধু ওরূপ জিনিসের আদর করিতে পারে। দাদা বুঝিতেন যে উহাতে পেট ভরিবে না। তাই তিনি আমার উপর উৎসাহপূর্ণ আশ্বাসবাক্যে খুসী হইতে পারেন নাই। আমি, কিন্তু প্রাণপণে চরকা চালাইয়া পেট ভরিবার উপায় করিয়া ফেলিলাম।

আমার নিজের ক্ষুদ্র পেটের জন্য যতটুকুর দরকার সময়মত কাটনা কাটিয়া তাহা অতি সহজেই সংগ্রহ হইতে লাগিল। তাহার উপর আরও বেশী করিয়া কাটিয়া আমি কিছু বেশীও উপায় করিতে লাগিলাম। পুকুরের কল্‌মি শাক তুলিয়া, উঠানে তরি তরকারির গাছ পালা দিয়া ঘরে একটা গরু পুষিয়া সংসারের কিছু খরচও বাঁচাইতে লাগিলাম।

দাদা সংসারের খবর কিছুই রাখিতেন না। যাহা কিছু রোজগার করিতেন, সমস্তই বৌদিদির হাতে দিয়া নিশ্চিন্ত হইতেন। তাঁহার যাহা আয় তাহাতে অতিকষ্টে তাঁহার সংসার চলিয়া যাইতেছিল, ইহাই তিনি জানিতেন। আমি আসিয়া ভার বাড়াইলে নিশ্চয়ই তাহার দেনা হইয়া পড়িবে এই ভয়েই তিনি অস্থির হইয়াছিলেন। কিন্তু যখন দেখিলেন যে কোনও দেনার সংবাদ তাঁহার কানে উঠিল না,— তখন আবার নিশ্চিন্ত হইয়া নিজের কাজ করিয়া যাইতে লাগিলেন। কিসে যে কি হইতেছে, তাহার কিছুই খোঁজ রাখিলেন না।

বৌদিদি আমার মায়ের মত ছিলেন। তিনি যখন তখনই বলিতেন, সুধা অত খাটিস্‌নে—ভগবান আমাদের অবিশ্যি চালিয়ে দেবেন। অত খাটলে মারা যাবি—'

মারা যাইবার ভয়েতে আমার ঘুম হইতেছিল না! আমি মনে মনে ভাবিতাম, আমি মরিলেই বা কাহার কি ক্ষতি? কিন্তু, যতই খাটি, যতহ কষ্ট পাই, আর যতই যাহা মনে করি, ইহাও আমার মনে হইত যে, আর কাহারও জন্য না হউক, দাদার ছেলে মেয়েদের জন্য আমার বাঁচিবার ও আরও পরিশ্রম করিবার আবশ্যক আছে। সারাদিন পরিশ্রমের পর একএকদিন রাত্রি জাগিয়া পাট কাটিয়া হয়ত তাহাদের জন্য সামান্য গোটাকতক মুড়কি কিনিয়া দিতে পারিতাম,—তাহাই পাইয়া তাহারা যেরূপ আমোদ করিত, তাহাতে আমার বুকের মধ্যে তাহাদের জন্য দারুণ অভাব বোধ হইত। মনে হইত, যদি কোনও উপায়ে তাহাদের নিত্য ভাল ভাল খাবার জিনিস কিনিয়া দিতে পারিতাম! জগতে তাহারাই ত' আমার যা' কিছু! পরিশ্রমে আমার কষ্ট বোধ হওয়া দূরে থাকুক তাহাদের মুখের পানে চাহিলেই আমার মনে হইত আরও আমি পরিশ্রম করিতে পারিতাম!

গরীবের ঘরের বিধবা মেয়ে আমি, দাদার ঘাড়ে বোঝা হইয়া যে পরিশ্রম করিতাম তাহাতে লোকের কাছে আমার কিছু বাহাদুরী ছিল না। আমারও পরিশ্রম যখন আমার অভাব সম্পূর্ণ মোচন করিতে পারিত না, তখন আমিও সেরূপ বাহাদুরী পাইবার প্রত্যাশা করিতাম না। কিন্তু একদিন গিরীন্‌দা আসিয়া আমার সুখ্যাতি গাহিয়া আর বাঁচে না!

গিরীন দা' আমাদেরই গ্রামের ছেলে। কয়েক বৎসর হইল তাহারা কলিকাতায় গিয়া বাস করিয়া আছেন। এখন দেশ-ঘর বড় মাড়ায় না। গিরীন্‌-দা এবার বি-এ পরীক্ষা দিয়া বাড়ীতে বেড়াইতে আসিয়াছেন। আমি ছোট বেলায় তাহার সহিত কত খেলা করিয়াছি। কিন্তু, সেদিন আমার ষোল বৎসর বয়সের কোথাকার প্রচ্ছন্ন লজ্জা হঠাৎ বয়ঃপ্রাপ্ত গিরীন-দা'র সম্মুখে কিছুতেই আমায় অগ্রসর হইতে দিল না। আমি নিজের ঘরের ভিতর লুকাইয়া বসিয়া রহিলাম। অথচ গিরীন্‌-দা' কেমন সহজে নিঃসঙ্কোচে আমার সঙ্গে কথা কহিয়া আমার সে লজ্জা ঘুচাইয়া দিলেন! বৌদিদির কাছে আমাদের সংসারের সুখ দুঃখের পরিচয় লইতে লইতে আমার সম্বন্ধে সমস্ত পরিচয় পাইয়া তিনি মড় মড় করিয়া আমার ঘরের দরজায় আসিয়া দাঁড়াইয়া বলিলেন, "কইরে, সুধা, তোর চরকা কাটা দেখি।"

অগত্যা দেখাইতেই হইল। তিনি দেখিয়া বৌদিকে বলিলেন, 'বাঃ সুধা ত অল্পবয়সে শিল্পকলা বেশ শিখয়াছে!'

ওমা কে জানিত যে ইহারই নাম আবার শিল্পকলা!

[আ]মি পেটের দায়ে গরু চরাই, ঘুঁটে দিই, 'কাটনা কাটি,' [ঘ]টে কাটি',—শিল্পকলার কি ধার ধারি? এখন [জা]নিলাম যে ইহার মধ্যেও শিল্পকলা থাকিতে পারে। [শু]ধু তাই নহে,—তাহাতে আমার আমার নৈপুণ্যও নাকি [জ]ন্মিয়াছে!

কিন্তু, এই জানাই আমার কাল হইল। এতদিন [গো]বর মাখিয়া, কাদা ঘাঁটিয়া, রাত্রি জাগিয়া চরকা [ঘু]রাইয়া, দাদার সংসারে দিনরাত্রি খাটিয়া, অবসাদ আসিলে প্রায়ই যে মনে করিতাম, পৃথিবীতে আমার বাঁচিয়া কোনও [ফ]ল নাই,—আজ গিরীনদা'র মুখের প্রশংসাটুকুতে সে চিন্তা ফিরিয়া দাঁড়াইল। ভাবিতে লাগিলাম, আরও [বাঁ]চিয়া আরও ভাল করিয়া আরও সব শিল্পকলা অভ্যাস [ক]রি না কেন?

সে অবধি গিরিন্‌দা প্রায়ই আমাদের বাড়ী আসিয়া [শু]নাইতে লাগিলেন যে আরও অনেক প্রকার শিল্পবিদ্যা [আ]ছে যাহা শিখিয়া কলিকাতায় অনেক স্ত্রীলোকে খুব [স]হজে স্বাধীনভাবে যথেষ্ট অর্থ উপার্জ্জন করিয়া বেশ সুখ [ভো]গ করিতেছে! কথাটা শুনিয়া শুনিয়া সেই সব বিদ্যা শিখিবার জন্য আমার লোভ জন্মিতে লাগিল। ভাবিতে [লা]গিলাম, আমার দুঃখের কপালে আমি নিজের কোনও [সু]খের প্রত্যাশা না করিলেও চেষ্টা করিলে ছেলেমেয়ে [ক]য়টাকেও সুখে রাখিতে পারি।

কিছুদিন পরে কলিকাতায় যাইবার সময়, গিরীন্‌দা' [আ]মার তৈরী সূতা খানিকটা চাহিয়া লইয়া গেলেন! [তা]রপর আবার দেশে ফিরিয়া আসিয়া আমায় বলিলেন যে, [তা]হার বড়ই ইচ্ছা হয় যে আমি নিজে হাতে তাঁহাকে [বে]শ সরু সূতা কাটিয়া দিই, তিনি তাহার কাপড় তৈরী [ক]রাইয়া পরিয়া পাঁচজনকে দেখান।

আমি পেটের দায়ে সূতা কাটিয়া বেচিতাম, তাহাতে [কে]মন কাপড় হয়, কে তাহা পরে, এসব কথা একদিনও [ভা]বিয়া দেখি নাই। আজ গিরীন্‌দার এই প্রস্তাব [শু]নিয়া আমার মনে হইল, তবে আমার এই সূতাকাটারও [সা]র্থকতা আছে! আমার তৈরী সূতায় নির্ম্মিত কাপড় [তা]হাকে পরিতে দেখিয়া আমি আমার চরকা ঘুরানো [সা]র্থক বোধ করিতে পাইব!

গিরীন্‌দার জন্য আমি প্রাণপনে ভাল সরু সূতা কাটিতে লাগিলাম। হায়! আমি মোটা সূতা বেচিয়া মোটা ভাত রোজগার করিতেছিলাম,—সূক্ষ্ম কারুকার্য্যের মোহে ডুব দিলাম কেন? চরকা বিদ্যা আমার অভাব মোচনের অবলম্বন ছিল, আমি তাহাকে সখের শিল্প-কলা বলিয়া জানিলাম কেন?

শীঘ্রই আমি গিরীন্‌-দাকে একজোড়া কাপড়ের মত সূতা কাটিয়া দিলাম। সূতা দেখিয়া তাঁহার আমোদ দেখে কে? আমায় দাম দিতে আসিতে তাঁহার লজ্জা বোধ হওয়ায় অনেকবার ইতস্ততঃ করিয়া শেষে বৌ'দির কাছে গেলেন। বৌ'দি কিছুতেই দাম লইতে রাজী হইলেন না। গিরীন্‌-দার একান্ত পীড়াপীড়িতে শেষে বলিয়াদিলেন দাম যদি দিতেই হয় তবে সুধার কাছে দিবেন।

খুব চেষ্টায় গিরীন্‌দা আমার কাছে একবার দামের কথা তুলিতেই, আমি বলিয়া ফেলিলাম "গিরীন্‌-দা' আপনি কি আমাদের এতই পর মনে করেন?"

গিরীন্‌-দা' লজ্জায় রাঙা হইয়া উঠিলেন। কোনও উত্তর দিতে পারিলেন না। তাঁহার বি-এ পাশ করা বুদ্ধিতে এ উত্তর জোগাইল না, সত্যই ত তুমি আমার পর। তুমি মজুরি করিয়া দিনপাত কর, তোমার একি অন্যায় বদান্যতা!

এসব কিছুই না বলিয়া তিনি শুধু আমার মুখের পানে একবার চুপ করিয়া রহিলেন মাত্র।

ফিরে বারে কলিকাতা হইতে আসিবার সময় তিনি আমার জন্য ভাল একজোড়া সরুপেড়ে মিহি কাপড় কিনিয়া আনিলেন। বিধবা হইলেও তখনও আমি পান পরিতে আরম্ভ করি নাই। পাড়ওয়ালা ধুতি পরিতাম, মাঝে মাঝে সরুপেড়ে শাড়ীও পরিতাম। আবশ্যক হইলে কখনও কখনও বৌদির চওড়াপেড়ে কাপড়ও পরিয়াছি। কিন্তু এই গিরীন্‌-দার দেওয়া এই সরুপেড়ে ধুতি কোনওমতে লজ্জায় পরিলাম না অথচ এই কাপড় পাইয়া আমার এত আমোদ বোধ হইল যে, তাহা আমার প্রদত্ত সূতার মূল্য-স্বরূপ জানিয়াও, আমি তাহা প্রত্যাখ্যান করিতে পারিলাম না।

তারপর হইতে গিরীন্‌-দার পরামর্শমত আমি মিহি সূতাই কাটিতে লাগিলাম। বরাবর আমি মোটা সূতা

কাটিয়াই বেচিয়া আসিতেছিলাম, সরু স্থতায় কিরূপ লাভ দাঁড়াইবে জানিতাম না। তবু গিরীন্-দা' যখন বলিলেন যে, তাহা কলিকাতায় তিনি খুব বেশী দরে বিক্রয় করিয়া দিতে পারিবেন তখন তাহাই বিশ্বাস করিলাম। তাঁহার কথায় আমার খুবই বিশ্বাস ছিল। ফলে প্রকৃতই তিনি আমার অসম্ভব লাভ দাঁড় করাইয়া দিলেন। কিন্তু, অত দিয়া কে যে তাহা কেনে, এবং কেন যে কেনে, একদিনও তাহা তাঁহাকে জিজ্ঞাসা করিতাম না।

অনেকদিন ধরিয়া এইরূপ চলিল। আমার অভাবও ঘুচিল। তারপর একদিন গিরীন্-দা' কলিকাতা হইতে আসিয়া বলিলেন, 'সুধা তোর সূতাগুলো পেয়ে আমার বন্ধুরা বড়ই খুসি হ'য়েছে, সমস্তটা তা'রাই কিনে নিচ্ছে।'

কাহারা যে গিরীন্-দা'র বন্ধু,—তাঁহারা যে কেমন,—কিছুই আমি জানিতাম না। তবুও তাঁহাদের অপরিচিত মুখে আমার সুখ্যাতির কথা শুনিয়া আমার বড়ই আমোদ হইল। আমি ত' আমার জীবনে কোনও কাজের জন্য কখনও কাহারও কাছে কোনওরূপ সুখ্যাতি পাই নাই! ইদানিং কোনও কাজে গিরীন্দা'র কাছে সুখ্যাতি পাইলেই আমার সকল শ্রম সফল মনে হইত। কর্ম্মময় এই বিশ্ব-জগতের কোনও কাজ যেদিন আমার অস্তিত্বটুকুরও আমি সন্ধান পাই নাই, সেদিন গিরীন্-দার চোখের দ্বারাই আমি আমাকে খুঁজিয়া পাইয়াছিলাম। আজ সেই গিরীন্-দার বন্ধুদের মুখে আমার সূতার সুখ্যাতির কথা শুনিয়া কি জানি কিসের উৎসাহে আমি সহসা বলিয়া উঠিলাম, 'গিরীন্-দা, আপনি যে আরও সব শিল্পবিদ্যার কথা বলে ছিলেন, সেগুলো কি আমি অভ্যাস করতে পারি না?

গিরীন্-দা'র কৃপায় সূতা বেচিয়াই তখন আমার অভাব বেশ দূর হইয়াছিল, তবুও কেন যে আবার নূতন বিদ্যা শিখিবার সখ হইল, বলিতে পারি না। গিরীন্-দা'র মুখেও ত' ও-কথা সেই গোড়ায় গোড়ায় শুনিয়াছিলাম, ইতিমধ্যে ত' আর একদিনও শুনি নাই। তবে আজ হঠাৎ নূতন করিয়া সে কথা মনে পড়িল কেন? আমার প্রাণের ভিতর কি তবে ও-চিন্তা সেই অবধি নিত্যই লুকাইয়া খেলা করিতেছিল? কই আমিত' সে সন্ধান জানিতাম না।

যাহাহউক, নূতন নূতন বিদ্যাভ্যাসে আমার উৎসাহ দেখিয়া গিরীন্-দা' বড়ই খুসি হইলেন। মহা উল্লাসে স্ফীত হইয়া তিনি বলিয়া উঠিলেন, 'এই ত' চাই! এই উৎসাহের অভাবেই ত' আমাদের শিল্পের আজ এতদূর অধঃপতন হইয়াছে!' একটা ইংরাজী পদ মুখে মুখে আবৃত্তি করিতে করিতে বলিলেন, "কত ভাল ভাল ফুল বনে আপনি ফুটে আপনিই শুকিয়ে যাচ্ছে, কেউ তার খোঁজ রাখছে না! আমাদের দেশেও যেসব মেয়ে জন্মায় তা'দের দিয়ে শুধু ভাত রাঁধিয়ে না নিয়ে, যদি তা'দের কিছু কিছু শিল্প-বিদ্যা শিক্ষা দেওয়া হ'ত, তা'হলে আজ আমাদের জাতীয় শিল্পের এতদূর অধঃপতন হ'ত না।'

জন্মদুঃখিনী আমি যে আজ চেষ্টা করিলে দেশের বিনষ্ট শিল্পের অন্ততঃ খানিকটা উদ্ধার করিতে পারি, গিরীন্-দা'র হিসাবে যে আমি এত বড়, একথা মনে করিতে আমারও মনে একটু গর্ব্ব আসিল। আমি উৎসাহের আবেগে মুখরা হইয়া গিরীন্-দা'র কাছে ও-সম্বন্ধে অনেক খোঁজ লইলাম। যে সকল মেয়েরা শিল্পবিদ্যাবলে স্বাধীন জীবিকা অর্জ্জন করিয়া সুখ ভোগ করিতেছে, তাহারা কেমন, তাহাদের আহার-বিহার কিরূপ, তাহারা একএকজন কত টাকা করিয়া উপার্জ্জন করে - এই সকল বিষয়ে খোঁজ করিয়া আমি যাহা জানিলাম, তাহার আমি হাতে হাতেই গিরীন্-দা'র কাছে আমার মত প্রকাশ করিলাম, তাহারা ত' বেশ! আমাদের মত হাত-পা থাকিতে খোঁড়া হইয়া পরের ঘাড়ের বোঝা হইয়া না থাকিয়া বেশ স্বাধীনভাবে নিজের জোরে, নিজেও সুখে থাকিতে পারে, অপর পাঁচজনকেও সুখে রাখিতে পারে।'

আমার উৎসাহ দেখিয়া গিরীন্-দা আমার দাদাকে সকল কথা জানাইলেন। সে সকল শিল্পবিদ্যা শিক্ষা করিতে হইলে যে আমার কলিকাতায় থাকিবার আবশ্যক হইবে। একথা গিরীন্-দা আমাকেও বলিলেন, দাদাকে জানাইলেন। আগে এমন কথা কেহ আমায় বলিলে, আমি মনে করিতাম যে হয়ত সে আমায় গালি দিতেছে; কিন্তু আজ আমি ইহাতে খুব রাজী হইলাম।

দাদারও কোন আপত্তি হইল না। গিরীন্-দা'র মতেই দাদার মত! তাঁহার উচ্চ-শিক্ষার উপর দাদার একটা
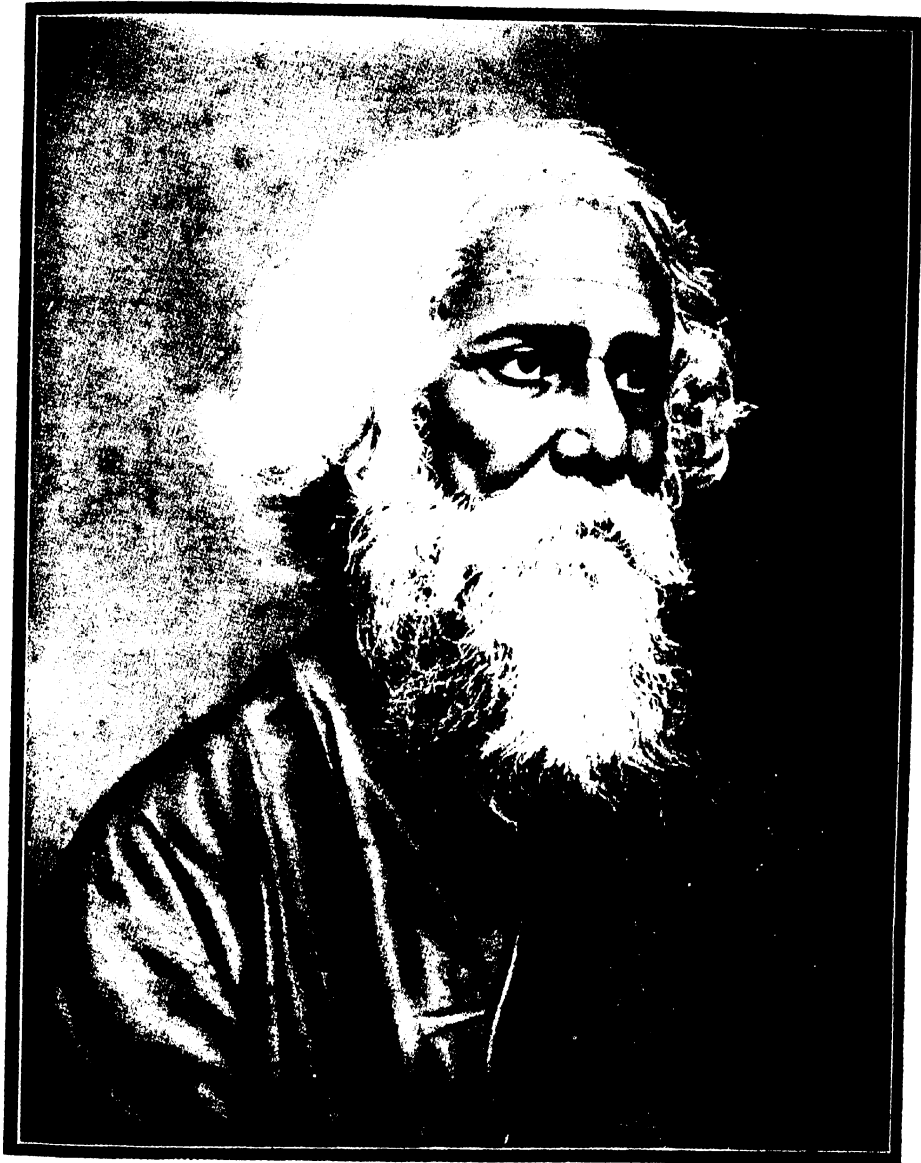
"বিশ্বকবি রবীন্দ্রনাথ"

শ্রদ্ধা ছিল। আমরা গিরীন্-দা'র পিতাকে আমরা জ্যেঠা মহাশয় বলিয়া ডাকিতাম এবং ছেলেবেলায় তাঁহাদের সঙ্গে আমাদের খুবই ঘনিষ্ঠতা ছিল ও অনেকদূর টানিলে একটু জ্ঞাতিত্বও ছিল। তাঁহারা বড়লোক। কলিকাতায় একটু উন্নত ধরণে বাস করেন,—এই কারণে দেশে সকলে হিংসা করিয়া তাঁহাদের ব্রাহ্ম বলিয়া তাঁহাদের সঙ্গে মেশা-মেশা বন্ধ করিয়াছিল। কেহ কেহ বলিত, সত্যই তাঁহারা ব্রাহ্মধর্ম্ম অবলম্বন করিয়াছেন, কিন্তু প্রকৃত ঘটনা যাহাই হউক না কেন যখন গিরীন্-দা'র মা পর্য্যন্ত দাদাকে পত্র লিখিয়া আমাকে তাঁহার বাড়ীতে রাখিবার জন্য অনুরোধ করিলেন, তখন দাদা বলিলেন, 'সুধার ত' ছেলেমেয়ে নেই, যে আমাকে এনে তাদের বিয়ে দিতে হ'বে, ওর যদি আখেরের উপায় হয়ত' ও স্বচ্ছন্দে সেখানে থাক্।'

বৌদিদি অনেক আপত্তি করিলেন। কিন্তু দাদার এ বিষয়ে এত উদার হওয়ার একটা কারণ ছিল। তিনি যখন তখন দুঃখ করিয়া বলিতেন যে আমাদের ঘরের মেয়েরা যদি এমন কিছু শিক্ষা পাইত যে দরকার হইলে পরের বাড়ীতে রাঁধুনী বৃত্তি না করিয়াও কিছু রোজগার করিতে পারিত, তাহা হইলে অনেক গরীবের উপায় হইত। গিরীন্-দা'ও এ বিষয়ে দাদার সহিত একমত ছিলেন। তিনি দাদাকে সঙ্গে করিয়া আমায় কলিকাতায় লইয়া গেলেন।

যাইবার সময় বাড়ীর সকলের জন্যই আমার মনটা খারাপ হইয়া গেল। কিন্তু মনকে বুঝাইলাম আমি ত তাহাদেরই সুখের জন্য যাইতেছি; সেখানে গিরীন্-দা'র কাছে থাকিয়া কত ভাল উপদেশ পাইব, দেশের কাজে লাগিতে পাইব, এ আশায় আমার একটু অবসাদও হইতে লাগিল।

গিরীন্-দা'র বাড়ীতে পৌঁছিয়া আমি চোখের উপর অনেক নূতন জিনিস দেখিতে পাইলাম। মাঝে মাঝে আমার অনেক পুরাতন মত বদলাইয়া যাইতে লাগিল। আমরা গরীবের ঘরের মেয়ে,—অভাবের পীড়নে আমাদের এত করিতে হয় যে, সেই খাটুনীর জন্য অনেক সময়ে আমরা মনে করি, এ জীবনে আর দরকার নাই,—অনেক সময়ে মনে করি যে যদি আমাদের ভাল অবস্থা হইত ত' দিনরাত [illegible] থাকিয়া [illegible] করিয়া জীবনটা উপভোগ করিয়া লইতে পারিতাম কিন্তু, গিরীন্-দা'র ছোট বোন সুকুমারীকে দেখিয়া আশ্চর্য্যবোধ করিলাম। এত বড় লোকের মেয়ে সে রাত্রিদিন এতটা পরিশ্রম করে যে তাহা দেখিয়া তাহার উপর আমার একটা শ্রদ্ধা জন্মিল।

সুকু' আমারই সমবয়স্কা ছিল। তখনও তাহার বিবাহ হয় নাই। আমরা চিরকালই জানি যে বড়লোকের মেয়েরা বাপের বাড়ীতে, বিশেষ বিয়ের আগে, একেবারে নড়িয়া বসে না। কিন্তু, সুকু' রাত্রি জাগিয়া পড়ে, দেশের উন্নতির জন্য মাথা ঘামাইয়া কত প্রবন্ধ লেখে, আবার মহিলা-সভায় বক্তৃতা দিবার জন্য আহার নিদ্রা ত্যাগ করিয়া সেগুলি মুখস্থ করে। সারাদিন আলমারি সাজাইয়া কাপড়-চোপড় গোছাইয়া, নিজের বেশবিন্যাস করিয়া, সাবান ও পাউডার মাখিয়া, জুতা পালিস করিয়া, সে সর্ব্বদা একটা-না একটা কাজে এমনই ব্যস্ত থাকে যেন কাহারও কাছে তাহার সারাদিনকার কাজের কৈফিয়ৎ দিতে হইবে। একটা ছুঁচের, কিম্বা একটা উলের কাজে সে অনেক সময় এমন নিবিষ্ট থাকে যে হয়ত ঘাড়-পিঠ টন্‌টন্ করিতেছে, বাড়া ভাত শুকাইয়া যাইতেছে, ঝি আসিয়া খাইবার জন্য ডাকাডাকি করিতেছে, তবুও কোনও দিকে তাহার ভ্রূক্ষেপই থাকে না।

সখের ব্যসন কাহাকে বলে, তখন তাহা জানিতাম না। সুকুর আদর্শে নিজেকে গড়িয়া তুলিবার জন্য প্রাণে উৎকট আকাঙ্ক্ষা জন্মিল। সুকুর সঙ্গে ভাব করিয়া, আমি তাহার লেখাবিদ্যা নিজে আয়ত্ত করিয়া লইতে চেষ্টা করিতে লাগিলাম। সেও আমাকে বেশ যত্ন করিয়া শিখাইতে লাগিল। বোধহয় তাহার প্রতি গিরীন্-দা'র এইরূপ উপদেশ দেওয়া ছিল। কিন্তু যতই আমি তাহার সঙ্গে ঘনিষ্ঠভাবে মিশিয়া যাইতে চেষ্টা করি না কেন, আমার মনে হইত, আমাদের উভয়ের মাঝখানে কি-একটু যেন ব্যবধান থাকিয়া যাইতেছে। সে ব্যবধানটুকু সে যে ইচ্ছা করিয়া সৃষ্টি করিতেছে, এরূপ সন্দেহ না করিয়া আমি তাহার সঙ্গে সমানভাবে চলিতে চেষ্টা করিতাম, কিন্তু তবুও আমার মনে হইত যে কিছুতেই আমি তাহার সঙ্গে সমান তালে পা ফেলিয়া উঠিতে পারিতেছি না।

শীঘ্রই ইহার একটা কারণও আমি বুঝিয়া ফেলিলাম। জ্যেঠাইমা (গিরীন্-দা'র মা) আমাকে যথেষ্ট যত্ন করিতেন।

সেই পরিমাণে ভালবাসিতেন কি না জানি না। তবে পাড়াগেঁয়ে মেয়ে আমি যত্ন ও ভালবাসা, এদুটী জিনিসকে কখনও পৃথকভাবে ভাবিতে পারিতাম না। যাহা হউক, খাওয়া-পরার বিষয়ে তিনি নিজের মেয়ের মতই আমাকে যত্ন করিতেন। অতটা যত্ন আমি স্বচ্ছন্দে ভোগ করিয়া যাইতে পারিতাম না। একটা ভাল জিনিস মুখে তুলিতে গেলেই আমার মনে হইত যে দাদা, বৌদি' ও ছেলেপিলেরা এমন জিনিস কখনও চোখেও দেখিতে পায় না। ভাল কাপড়-চোপড় পড়িতেও আমার লজ্জা ও কষ্টবোধ হইত, বাড়ীতে আমাদের অনেক সময় ভিজা গামছা পরিয়াই কাটে। কাজেই আমি যতটা সম্ভব নিজের দৈন্য লইয়া কাটাইতে চাহিতাম কিন্তু, এক্ষণে সহজেই লক্ষ্য করিলাম যে আমার ওরূপ ভিখারিণীর চাল-চলন লইয়া আমি যে খুকুর সঙ্গে সমানে চলিতে চেষ্টা করিতেছি, ইহাতে বাড়ীর দাসদাসীগণ পর্য্যন্ত সর্ব্বদা আমার প্রতি বিদ্রূপ কটাক্ষ করে। ক্রমশঃ জ্যেঠাইমাও বলিতে লাগিলেন যে কলিকাতায় অমন পাড়াগেঁয়ে অসভ্য চালে থাকিলে লোকে বড়ই ঠাট্টা করে। একটু সভ্যভাবে চলিবার জন্য তিনি আমায় বিস্তর জেদও সুরু করিলেন। কাজেই আমি বুঝিলাম যে সুকুমারীর সঙ্গে সমানে চলিতে হইলে, আমার তদনুযায়ী বাহ্যিক পরিবর্ত্তনও করিয়া লইতে হইবে।—নচেৎ লোকেও উপহাস করিবে এবং সুকুমারীও ঠিকভাবে ঘেঁসিতে দিবে না।

দেশে যেভাবে বাস করিতাম, লোকে তাহাতে আমায় নিন্দা বা বিদ্রূপ করিবে না,—বরং এখানকার মত চাল চলন দেখিলে অবশ্য যথেষ্ট নিন্দা ও বিদ্রূপ করিতে পারিবে, সেখানে এমন চালে চলিবার মত অবস্থাও আমাদের ছিল না। কিন্তু, এখানে জ্যেঠাইমার কাছে যখন সহজেই সমস্ত পাইতেছিলাম, তখন অনর্থক লোকাচার বহির্ভূত কাজ করিয়া নিজের ক্ষতি করি কেন? নিজের হীনাবস্থা ছাড়া কোনও নিষ্ঠার বশে আমি দীনতা অবলম্বন করি নাই লোকের উপহাসকে তুচ্ছ জ্ঞান করিয়া নিজের স্বাতন্ত্র্য ও বৈশিষ্ট্য বজায় রাখিয়া চলিতে পারি, এমন শিক্ষাও আমার জীবনে কখনও হয় নাই। কাজেই আস্তে আস্তে পরিবর্ত্তনের দিকে নিজেকে ফিরাইতে বাধ্য হইলাম।

কিন্তু, মন একবার ফিরিল, অমনি দ্রুতগতিতে আবার পরিবর্ত্তন চলিয়া শীঘ্রই এতদূর পূর্ণতা লাভ করিল যে যাহারা চিরকাল ধরিয়া সহরে চাল-চলনে মানুষ হইয়াছে তাহারাও সর্ব্বদা আমার মত খুঁটিনাটি ঠিকমত বজায় করিয়া চলিতে পারিবে না।

বৎসরখানেক পরে দাদা আমায় দেখিতে আসিয়া সহসা ত' চিনিতেই পারেন না। এতদিন আমায় না দেখিতে আসার কারণ জিজ্ঞাসা করায়, দাদা দুঃখিতভাবে আমায় জানাইলেন যে আমি গিরীন্-দার বাড়ীতে আসিয়া থাকায় দেশের সমাজে আমার স্থান ঘুচিয়াছে, এবং আমার সঙ্গে তাঁহার সাক্ষাতের কথা জানিতে পারিলে তাঁহারও দুর্গতির সীমা থাকিবে না, এই ভয়ে গোপনে তিনি আমায় দেখিতে আসিয়াছেন। আমার সম্বন্ধে আরও এমন সব নিন্দা সেখানে রটিয়াছে যাহা দাদা স্পষ্ট করিয়া বলিতে পারিলেন না,—আমি আভাষে বুঝিয়া লইলাম।

আগে হইলে এ সংবাদে আমি লজ্জায়-ঘৃণায় মরিয়া যাইতাম। কিন্তু, আজ আমার সম্মুখে যে জীবনটার আস্বাদ আমি বুঝিতে পারিতেছিলাম, সামান্য লোকনিন্দা তাহার কাছে কিছুই নহে।

দাদা আমার উন্নতি দেখিয়া খুব খুসি হইলেন। জ্যেঠাইমার কাছে থাকায় একে ত' নিজে দাদার ঘাড়ের উপর বোঝা হইতেছিলাম না, তাহার উপর আবার ছেলেদের জলখাবারের খরচ বলিয়া জ্যেঠাইমা মাসে মাসে গোটাচারেক করিয়া টাকা দাদাকে পাঠাইতেছিলেন। দেশে যথেষ্ট খাটিয়াও দাদাকে মাসে চার টাকা করিয়া নগদ হাতে দিতে পারিতাম না। অথচ এখানে ত' আমার কোনও খাটুনিই ছিল না। যা' দুই একটা কাজ আমায় করিতে হইত, তাহাকে আমরা কাজই বলি না। এই সামান্য কাজের জন্য জ্যেঠাইমা আমায় রাখিয়াছিলেন এবং মাসে মাসে আমার জন্য অত টাকা খরচ করিতেছিলেন।

দেশে অত পরিশ্রম করিয়াও আমার কি উন্নতি ছিল? এখানে গোড়াতেই এই,—আবার পরে আরও অনেক উন্নতির আশা ছিল। তবে অবশ্য এখানে আমার খাটুনি না থাকিলেও বুঝিতাম যে এটা আমার চাকুরি। চাকুরি? হাঁ, চাকুরি বই কি! তবুও চাকুরি সম্বন্ধে আমার বরাবর যে ধারণা ছিল যে, নিজের স্বাধীন ইচ্ছার বিরুদ্ধে, মনিবের মতলব মত, নাকে দড়ি দেওয়া খাটুনির নাম চাকুরি এবং

তাই দেশে খাটিয়া খাটিয়া কখনও কখনও বিরক্ত হইয়া যে বলিতাম, 'ভাল চাকরি হয়েছে, আমার?'—এখানে চাকুরির উপর আমার সে ধারণা উল্টাইয়া গিয়া একটা শ্রদ্ধাই জন্মিয়াছিল।

যাহা হউক, দাদা বাড়ী ফিরিয়া গেলেন। অনেকদিন কাটিয়া গেল। আমি মন দিয়া অনেক প্রকার শিল্পবিদ্যা অভ্যাস করিলাম। কিন্তু, তখনও আমার লেখাপড়া শেখা হইল না। তবুও শিক্ষিতা মেয়েদের চালচলনে আমি নিজেকে এমনই অভ্যস্ত করিয়া লইয়াছিলাম যে আমায় দেখিয়া সহজে কেহই বুঝিতে পারিত না যে আমিই সেই পাড়াগেঁয়ে অশিক্ষিতা মেয়ে সুধাহাসিনী নিজেকে পাড়াগেঁয়ে বলিয়া পরিচয় দিতেও আমি লজ্জাবোধ করিতাম। মাঝে মাঝে আমার ম্যালেরিয়া জ্বর হইত। সকলেই সহানুভূতি করিয়া বলিত, 'পাড়াগাঁয়ে অমন হয়,—এখানে থাক্‌তে থাক্‌তে সেরে যাবে।'—আমি আপ্যায়িত হইয়া যাইতাম। কিন্তু, আজকাল আমার জ্বর হইলে যদি কেহ তাহাকে ম্যালেরিয়া বলিত, তাহা হইলে রাগে ও লজ্জায় আমি খুন হইয়া যাইতাম,—কিছুতেই ম্যালেরিয়া বলিয়া স্বীকার করিতে চাহিতাম না।

গিরীন্‌দা' বরাবরই আমার পক্ষপাতি ছিলেন এবং আমার সকল আচরণই প্রশংসার চক্ষে দেখিতেন, 'সুধা ঠিক কল্‌কেতার শিক্ষিতা মেয়েদের মতন হয়েছে।' তাঁহার এরূপ প্রশংসাবাদে আমি আহ্লাদ ও গর্ব্বে ফাটিয়া যাইতাম। কিন্তু, ইদানিং একদিন তিনি ঐরূপ সুখ্যাতি করিলে সহসা আমার প্রাণে কষ্ট হইল। 'ঠিক কল্‌কেতার শিক্ষিতা মেয়েদের মতন।'—কথাটায় যে স্পষ্ট করিয়া বলা হয় যে, 'ঠিক তাহাই নহে'! এতকালের প্রশংসাবাদটা আজ হঠাৎ অপবাদ মনে করিয়া গৌরবের পরিবর্ত্তে দারুণ লজ্জাবোধ করিলাম।

সেইদিনই এক সময়ে গিরীন্‌দা'কে বলিলাম, 'গিরীন্‌-দা, আমায় যে লেখাপড়া শেখাবেন ব'লেছিলেন, তা'র কি ক'র্‌লেন?'

গিরীন্‌-দা' একটু বিস্মিত ভাবে আমার মুখ পানে চাহিয়া বলিলেন, 'কই, তুমি ত' এতদিনের মধ্যে একবারও আমায় ওকথা মনে ক'রে দাওনি!—আজ হঠাৎ যে তোমার ও ইচ্ছা হ'ল!'

আমি বলিলাম, 'লেখাপড়া না শিখলে আমার উন্নতি হবে কিসে?—আপনি যে বলেছিলেন, লেখাপড়া শিখলে বেশ ভাল চাকরি হ'তে পারে!"

গিরীন্‌-দা' একটু হাসিলেন। বলিলেন, "আচ্ছা তোমায় এইবার লেখাপড়া শেখাবো।"

তাঁহার হাসির অর্থটা ঠিক বুঝিলাম না। হয়ত তিনি ভাবিয়াছিলেন, 'এত উন্নতিতেও তোমার হচ্চে না! কিম্বা হয়ত মমে মনে বলিয়াছিলেন, 'তোমার আবার লেখাপড়া!'

যাহাই কেন ভাবুন না তিনি, আমি ছাড়িব কেন? দেশে আমার নিন্দা রটিয়াছে, রটুক,—আমি তাহা সার্থক করিয়া না লইব কেন? আমি আমার উন্নতির পথ ছাড়িব কেন? যে উন্নতির প্রথম সোপানে উঠিতেই গিরীন্‌-দা' আমায় 'তুই' ছাড়িয়া 'তুমি' বলিতে আরম্ভ করিয়াছিলেন, সে উন্নতির চরমটা দেখিতে ছাড়িব কেন? ঘনিষ্ঠতায় 'তুমি', 'তুই' হইয়া দাঁড়ায়—কিন্তু যাহাতে 'তুই' 'তুমি' হইয়া দাঁড়ায়, তাহা ত' ঘনিষ্ঠতা নয়,—তাহা নিশ্চয়ই আমার উন্নতির সম্ভ্রম!

খুব উৎসাহের সহিত গিরীন্‌-দা'র কাছে লেখাপড়া শিখিতে লাগিলাম। অল্পকাল মধ্যে শিখিলামও অনেক। গিরীন্‌-দা' আশা দিলেন যে, কিছুকাল এইরূপে শিক্ষা করিলেই, শীঘ্রই একটা মেয়ে স্কুলে মাষ্টারি করিবার উপযুক্ত শিক্ষা লাভ করিতে পারিব।

কিন্তু, অল্পদিনেই যখন লক্ষ্য করিলাম যে গিরীন্‌-দা' আমাকে সম্ভ্রমের চক্ষে দেখিতে আরম্ভ করিয়াছেন, তখন তাঁহার কাছে পড়ার আর তেমন সুবিধা হইতে লাগিল না।

গোড়ায় গোড়ায় গিরীন্‌-দা'কে যেরূপ ভয় ও ভক্তি করিতাম, ইদানিং তাহা খুব কমিয়া গেল। ভুলিয়া দুই একবার তাঁহাকে 'তুমি' বলিয়া ফেলিতেও লাগিলাম। আগে তাঁহার মুখের পানে চাহিয়া পড়া জানিয়া লইতে পারিতাম না। এখন পরস্পরের মুখপানে চাহিয়া পড়া বুঝিতে বুঝিতে প্রায়ই কখন বাজে কথা আসিয়া পড়ে, পড়া থামিয়া যায়, হয়ত সব কথাই থামিয়া যায়, শুধু মুখপানে চাহিয়া চাহিয়া কতক্ষণ যেন একটা ঘোরে কাটিয়া যায়;—তারপর হঠাৎ এক সময় কিসের লজ্জায় সজাগ

হইয়া দু'জনেরই মাথা নিচু হইয়া পড়ে,—তখনকার মত পড়া বন্ধ করিয়া দু'জনেই পলাইয়া বাঁচি।

অল্পদিনের মধ্যেই জ্যেঠাইমা' বিশেষ চেষ্টা করিয়া আমার জন্য একটা মেয়ে স্কুল শিক্ষয়িত্রীর কাজ যোগাড় করিলেন। পূর্ব্বে অনেকবার তাঁহারই কাছে শুনিয়াছিলাম যে বোর্ডিংয়ে থাকিয়া 'গুরু-মা'-গিরি করা তিনি পছন্দ করেন না। অথচ ঠিক এইরূপ একটা চাকুরিতেই তিনি জোর করিয়া আমায় ঢুকাইলেন।

বেতন যদিও আমার আশাতীত বেশী ছিল, এবং এইরূপ চাকুরির আশাই আমি করিতাম,—তবুও জ্যেঠাইমা'র বাড়ী ছাড়িয়া সেখানে গিয়া থাকিতে আমার এখন আর আদৌ উৎসাহ ছিল না।

গিরীন্-দা'র সঙ্গেই গিয়া কাজে ভর্ত্তি হইলাম। সেখানে কেহ কেহ গিরীন্-দা'র কাছে আমার পরিচয় জিজ্ঞাসা করাতে তিনি উত্তর দিলেন, 'আমাদের দেশের একটী বিধবা মেয়ে—আমাদের আশ্রিতা!'

পরিচয়ের বহর শুনিয়া গিরীন্-দা'র উপর আমার ভারি রাগ হইল। ছিঃ ছিঃ, এই কি আমার পরিচয়? গিরীন্-দা'র সঙ্গে এই কি আমার সম্বন্ধ? সেখানে কে আমায় চিনিয়া রাখিয়াছে?—গিরীন্-দা কি আর কিছু বলিতে পারিতেন না?

কিন্তু, কি পরিচয় দিলে ঠিক হইত, তাহা আমি বলিতে পারি না। তবুও আজও আমার মনে হয় যে তিনি আমায় খাটো করিয়া দিয়াছিলেন।

যাহা হউক চাকুরিতে ঢুকিয়া আমার এত টাকা রোজগার হইতে লাগিল যে দেশে তাহা হইলে অমন পাঁচটা দাদার সংসার একলা চালাইতে পারিতাম। খবর পাইয়া দাদার খুব আনন্দ হইল। তিন চারি মাস আমি দশ বারো টাকা করিয়া দাদাকে পাঠাইলাম। পত্র লিখিলাম যে নূতন স্থানে সমস্ত নূতন করিয়া কিনিয়া গোছ বিলি করিতে হইতেছে বলিয়া উপস্থিত বেশী পাঠাহতে পারিলাম না, শীঘ্রই আরও বেশী পাঠাইতে পারিব।

কিন্তু, ক্রমশঃ আমার নিজেরই খরচ এত বাড়িয়া উঠিতে লাগিল যে আমি প্রায় আর কিছুই পাঠাইয়া উঠিতে পারিলাম না।

নিজের জন্য নূতন নূতন পোষাক পরিচ্ছদ কিনিতে সভ্য ফ্যাসানের বিছানাপত্র করাইতে, ও দাদার ছেলেপিলেদের জন্য গোটাকয়েক জামা কিনিতে, আমার যাহা দেনা হইয়া গেল, তাহাই শোধ করিতে আর ছয় মাসের মধ্যে দাদাকে কিছুই পাঠাইতে পারিলাম না।

তার পর হইতে যখন কোনও মাসে হয়ত দুই টাকা কোনও মাসে হয়ত পাঁচ টাকা হাতে থাকিত, তখন ভাবিতাম, 'এই সামান্য টাকা কেমন করিয়া দাদাকে পাঠাই? ফিরে মাসে হাতে আর কিছু হইলে একেবারে পাঠাইব।' কিন্তু, আর কিছু হাতে হওয়া দূরে থাকুক, হয়ত এমন একটা খরচ পড়িয়া যাইত যে উপরন্তু আরও কিছু দেনা দাঁড়াইয়া যাইত।

যখন দেশে ছিলাম তখন আমার নিজের জন্য কিইবা খরচ ছিল? যখন জ্যেঠাইমার কাছে ছিলাম, তখন আমার সমস্ত খরচ তিনিই চালাইতেছিলেন। উপরন্তু, দাদার জন্য মাসিক চার টাকা তিনি নিজেই পাঠাইয়া দিতেন,—আমার হাতেও তাহা আসিত না। কিন্তু এখানে আমার খরচ অনেক। আমার পদের মর্য্যাদা ত' আমায় রাখিয়া চলিতে হইবে!—কত লোক আমার সঙ্গে দেখা করিতে আসে, কত লোকের সঙ্গে আমায় আলাপ রাখিতে হয়,—কত জায়গায় আমায় যাইতে হয়!

সকল রকমেই আমার বিস্তর খরচ।—দাদাকে পাঠাইবার মত আমার কিছুই থাকে না। একটা চাঁদার খাতায় আমি পাঁচ টাকার কম সই করি না—আমি নিজের দাদাকে পাঁচ-সাত টাকা পাঠাই কেমন করিয়া? আমার মনে হইত, এই সামান্য টাকায় দাদার কি বা উপকার হইবে এবং তিনি ইহা পাইয়া মনেই বা করিবেন কি? যখন দাদার ছেলেদের জামা পাঠাইয়াছিলাম, তখন তিনি লিখিয়াছিলেন, ছেলেরা ত' জামা কখনও পরেই না। অনর্থক এত টাকা নষ্ট করিয়া এত ভাল ভাল জামা পাঠাইয়াছ কেন? আমি তাঁহার পত্র পড়িয়া ভাবিয়াছিলাম, পাড়াগাঁয়ে থাকিলে মানুষের অমন বুদ্ধি-শুদ্ধিই হয় বটে! ইহাকে কি টাকা নষ্ট করা বলে? জামা না পরিলে কি ছেলেপিলেদের স্বাস্থ্য ভাল থাকে? আর ও-জামার চেয়ে আরও কিরূপ জামা ভদ্রলোকের ছেলেরা পরিতে পারে? এবং পরিলেই বা আমি এখানে লোকের সামনে তাহা পাঠাই কেমন করিয়া?—এই যে এখানে আমি কত

ভাল ভাল পোষাক-পরিচ্ছদ পরি, তবুও যে কত লোকে তাহার কত দোষ ধরে।

যাহা হউক, সেই অবধি দাদার ছেলেদের আর জামা কাপড়ও পাঠাইতে পারি নাই। পূজার সময় কিছু দিবার জন্য ঝুঁকিয়াছিলাম; কিন্তু টাকায় কুলাইতে পারিলাম না। স্বকুকে একটা সাঁচ্চা জরির জামা উপহার দিতেই আমার এত বেশী খরচ হইয়া গেল যে, আমার হাতে অতি সামান্য টাকাই রহিল। যে টাকা ছিল, তাহাতে একটু সামান্য রকম পোষাক কিনিয়া ছেলেদের দেওয়া চলিতে পারিত। কিন্তু সেরূপ পোষাক আমার সঙ্গিনীদের মধ্যে কেহ পছন্দ করিলেন না, আমারও পাঠাইতে লজ্জাবোধ হইতে লাগিল। স্বকুর জামাটা পূজার মধ্যে না দিলে খারাপ দেখায়, কিন্তু ঘরের ছেলেদের দু'দিন পরে দেওয়া চলে। এই ভাবিয়া আগে বাহিরের মান বজায় রখিতে চেষ্টা করিলাম। কিন্তু আর ঘরের ছেলেদের কিছুতেই দিয়া উঠিতে পারিলাম না।

আজও মনে আছে যে বাড়ীতে থাকিতে দ্বাদশীর দিন দু'খানা বাতাসা খাইয়া জল খাইবার সময় যদি একটী ভাইপো কাছে আসিয়া দাঁড়াইয়াছে ত' তাহার হাতে একখানা দিয়া নিজে একখানা খাইয়াছি। কিন্তু এখন কলিকাতায় আসিয়া মাসে পঞ্চাশ টাকা বেতন পাইয়াও কদাচিৎ দু'টাকার খাবারও তাহাদের পাঠাইতে পারি না। এখন মান রক্ষার জন্য যতটা ব্যস্ত হইয়াছি তখন প্রাণ রক্ষা করিবার জন্যও তাহার সিকি পরিমাণ ব্যস্ত ছিলাম না। লোকে আমাকে কত দরের মনে করে তাহা ঠিক মত খতাইতে না পারিয়া আমি নিজের দরটা এত বেশী করিয়া ধরিয়া আনিয়াছি যাহার কল্পিত সম্ভ্রম বজায় রাখিতে গিয়া আমি সর্ব্বস্বান্ত হইয়া গিয়াছি। আমার রোজগারের হাত যত শীঘ্র যে পরিমাণে বাড়িয়াছে,—খরচের হাত তাহা অপেক্ষা অনেক দ্রুত, অনেক বেশী পরিমাণে বাড়িয়াছে। গরীব ভাইপোদের কথা মনে ছিল না। যদি তাহারা নিজের গর্ভজাত সন্তান হইত তাহা হইলে কখনই এমনটা হইত না।

যাহা হউক, এখন বৃথা আক্ষেপে ফল নাই। এখন আমার কাহিনীটাই বলি। যখন বোর্ডিংয়ে আসিয়া থাকিলাম, তখন আশা করিয়াছিলাম গিরীন্-দা' মাঝে মাঝে আমায় দেখিতে না আসিয়া থাকিতে পারিবেন না। কিন্তু অনেকদিন কাটিয়া গেলেও তিনি বা তাঁহাদের বাড়ীর কেহই আমার কোনও খোঁজও লইলেন না। আমায় ভর্ত্তি করিয়া দিবার সময় গিরীন্-দা আমার যে পরিচয় দিয়া গিয়াছিলেন, তাহাতে আমার মনের মধ্যে অনেকটা অভিমান থাকায় আমিও তাঁহাদের কোনও খোঁজ লই নাই। শেষে নিজেই জ্যেঠাইমাকে একখানি পত্র লিখিয়া অনেক খোঁজ জানাইয়া গিরীন্-দাকে একবার পাঠাইতে অনুরোধ করিলাম।

অনেক পরে পত্রের উত্তর আসিল যে বোর্ডিংয়ে আমাকে দেখিতে আসা তিনি নিন্দনীয় মনে করেন বলিয়া গিরীন্-দা'কে পাঠাইতে পারেন না, বরং আমি যেন তাঁহাদের বাড়ী গিয়া তাঁহাদের সঙ্গে দেখা করি।

এই উত্তরের মর্ম্ম আমি ঠিক বুঝিতে পারিলাম না। কাহার পক্ষে নিন্দনীয়? আমার পক্ষে না, গিরীন্-দার পক্ষে? কেনই বা নিন্দনীয়? এমন অনেক ত' অনেকের সঙ্গে দেখা করিতে আসিতেছে!

নিজে যাওয়াই সাব্যস্ত করিলাম। আমাদের পরস্পরের অবস্থার পার্থক্যই গিরীন্-দা'র এখানে আসিবার আপত্তির কারণ মনে করিয়া, আমি খুব জাঁকালো রকমের সাজ-সজ্জা করিয়া বেড়াইতে গেলাম যে আমার অবস্থা এখন আর হীন নহে।

বাড়ীতে ঢুকিয়া প্রথমেই গিরীন্-দা'র সহিত সাক্ষাৎ হইল। নিজের সাজ-সজ্জার জন্য একটু লজ্জা বোধ হওয়ায় একটু হাসিয়া ফেলিয়া তাঁহার সহিত কথা কহিতেই তিনি গম্ভীরভাবে দুই একটা জবাব করিয়াই, কি কাজের জন্য, (তাচ্ছিল্য করিয়া কি না জানি না) বাহিরে চলিয়া গেলেন। আমার পূর্ব্ব পরিচিত একটা সঙ্গী আমায় দেখিয়া মুখ টিপিয়া হাসিয়া সরিয়া গেল। আমি বাড়ীর মধ্যে ঢুকিয়া গেলাম। জ্যেঠাইমাকে দেখিয়া প্রণাম করিলাম। তিনি শুধু 'কিরে সুধা, ভাল আছিস ত?' এই কথাটুকু জিজ্ঞাসা করিয়া পার্শ্বের ঘরে ঢুকিয়া যাইতেই সেই দাসীটা কোথা হইতে আসিয়া আমার গায়ের উপর ঘেঁসিয়া দাঁড়াইয়া মৃদু মৃদু হাসিতে হাসিতে আমার জামা-কাপড়-গুলিতে হাত দিয়া দেখিতে দেখিতে, আমার ব্রোচটা হাতে করিয়া ধরিয়া বলিল, "হ্যাঁগা, এটা বুঝি গিল্টি করা?"

আমি বড়ই লজ্জিত হইলাম। ব্রোচটা প্রকৃতই রোল্ড-গোল্ডের ছিল। যদিও দাসীটার উপর আগে হইতেই যথেষ্ট রাগ হইয়াছিল এবং তাহার কথার উত্তর দিতেই ইচ্ছা হইতেছিল না, তবুও লাজ-লজ্জা চাপা দিবার জন্য প্রকৃত কথাই স্বীকার করিয়া ফেলিলাম। ফিরিয়া আসিয়াই এমন একটা ব্রোচ্ গড়াইতে দিলাম যে সুকুমারীরও তেমন একটীও নাই। এই ব্রোচ্ গড়াইতে আমার যে টাকা দেনা হইল তাহা শোধ করিতে প্রায় এক বৎসর আমার খোরাকে টান পড়িল।

এইভাবে দিন কাটিতে লাগিল। মাঝে মাঝে গিরীন্-দা'র বাড়ীতে যাই। ক্রমে বুঝিতে পারিলাম যে তাঁহারা আজও আমাকে আমার অবস্থার এত উন্নতিসত্ত্বেও সেইরূপ হীন মনে করেন। আমিও সাধ্যমত তাঁহাদের দেখাইবার চেষ্টা করিতে লাগিলাম যে এখন আমি আর সেরূপ হীন নাই। কিন্তু, ফলে আমারই খরচ বাড়িয়া যাইতে লাগিল, আর কিছুই হইল না।

এমন সময়ে গিরীন্-দা'র বিবাহ উপস্থিত হইল। আমার নিমন্ত্রণ হইল। আমি আগে হইতেই স্থির করিয়া রাখিয়াছিল যে এই বিবাহে এমন সব উপহার দিব যে নিমন্ত্রিত সকলের মধ্যে আমার বেশ একটু বিশেষত্ব দাঁড়াইবে।

সেই মত আয়োজন করিয়া খুব জাঁকজমকে নিমন্ত্রণ রক্ষা করিতে গেলাম। পূর্ব্বোক্ত সেই দাসীটা আমায় গাড়ী হইতে নামাইয়া লইয়া গেল। আমার উপরহারগুলি সেই দাসীটাই অতি সামান্য জিনিসের মত ঘরের কোণে লইয়া গিয়া রাখিল। কেহই উৎসুক হইয়া তাহা দেখিতে আসিল না। আমার বড় ইচ্ছা ছিল, আমি স্বহস্তে সর্ব্বসমক্ষে সেগুলি সভার মাঝখানে ধরিয়া দিব; কিন্তু দসীটা যেন সেগুলি আমার হাত হইতে একপ্রকার কাড়িয়াই লইয়া গেল,—আমিও লজ্জায় আর তাহা কাড়াকাড়ি করিতে পারিলাম না।

বাড়ীর একজন নিকট আত্মীয়া জিনিসগুলি তুলিতে আসিয়া আমার মুখের পানে চাহিয়া, নিকটস্থা সুকুমারীকে আমার পরিচয় জিজ্ঞাসা করিতেই, পার্শ্বস্থিতা সেই দাসীটা তাড়াতাড়ি জবাব দিল, "সেই যে, পিসীমা, তিনি দিদি-মণির কাছে আগে ছেলে, এখন স্কুলে চাকরি করে।—" তারপর তাড়াতাড়ি আমার কাছে আসিয়া আমার নূতন ব্রোচটায় হাত দিয়া বলিল, 'হ্যাগা, এইটা বুঝি দিদিমণির দেখাদেখি এবার গড়িয়েছে?"

আমি মাথা তুলিতে পারিলাম না। সুকু দাসীটাকে ধমক দিয়া বলিল, 'তুই নিজের কাজে যা।'

সেই অবধি আর গিরীন্-দা'র বাড়ীতে যাই নাই। গিরীনদা'র বাড়ীতে থাকিতেই তাঁহার অনেক বন্ধুর সঙ্গে আমার আলাপ হইয়াছিল। তাঁহাদের অনেকেই মাঝে মাঝে বোর্ডিংয়ে আমার সহিত দেখা করিতে আসিতেন। তাঁহাদের মধ্যে বিজলী-দা'র সঙ্গে ইদানিং আমার খুব বেশী ঘনিষ্ঠতা হইয়াছিল। আমার মনে হইত যে, তিনি আমায় খুব শ্রদ্ধার চক্ষে দেখিতেন। গিরীন্-দা'র সম্পর্কে পদে পদে অপমান লাভ করিয়া তাঁহার উপর হইতে আমার মন সরিয়া আসিয়া বিজলী-দা'র কাছে তাঁহার শ্রদ্ধার মূল্যে বিক্রিত হইতে চাহিল। বিজলী-দা'কে সন্তুষ্ট রাখিবার জন্য সর্ব্বস্বান্ত হইতেও আমি কুণ্ঠিত হইলাম না। আমি স্বেচ্ছায় আমার রোজগারের অনেক পয়সা তাঁহার জন্য ব্যয় করিতে লাগিলাম। তিনিও সদাসর্ব্বদা আসিয়া আমার সঙ্গে একান্ত ঘনিষ্ঠভাবে মিশিতে লাগিলেন।

ক্রমে আমার অবৈধ আলাপনের সংবাদ স্কুলকর্ত্তৃপক্ষের কাণে উঠিল। আমার কৈফিয়ৎ তলব হইতেই আমি বিজলী-দা'র সঙ্গে আমার ঘনিষ্ঠ আত্মীয় সম্বন্ধের দোহাই দিয়া পার পাইবার চেষ্টা করিলাম। কিন্তু যখন তাহা সমর্থন করিবার জন্য বিজলী-দা'কে হাজির করিয়া দিবার হুকুম হইল, তখন আর কিছুতেই তাঁহাকে খুঁজিয়া বাহির করিতে পারিলাম না। তিনি ব্রাহ্ম ছিলেন; তাই ভিতরে ভিতরে খবরটা পাইয়াই, হিন্দু ললনার সঙ্গে আত্মীয়তা স্বীকার করিবার ভয়ে সরিয়া পড়িয়াছিলেন।

অসচ্চরিত্রের অপবাদে আমার চাকুরি গেল। চরিত্র সম্বন্ধে আমি যে খুব সাঁচ্চা ছিলাম, এমন কথা যদিও শপথ করিয়া বলিতে পারি না, তবুও আমার সহযোগিনী অন্যান্য শিক্ষয়িত্রীদিগের চরিত্র যে আমার চেয়েও অনেক বেশী কলুষিত ছিল,—তাহা আমিও জানিতাম, কর্ত্তৃপক্ষও জানিতেন। কিন্তু, সে অপরাধে তাঁহাদের চাকুরি না যাইবার কারণ এই ছিল যে, বাহিরে তাঁহাদের কোনওরূপ ধরা-ছোঁয়ার উপায় ছিল না।—যাঁহাদের সহিত তাঁহারা

আলাপ করিতেন, তাঁহাদের কেহই তাঁহাদের পরস্পরের মধ্যে একটা না একটা ঘনিষ্ঠ সম্পর্ক স্বীকার করিয়া লইতে কখনও কুণ্ঠিত হইতেন না।

আমি হিন্দু ঘরের দরিদ্রা বিধবা,—নিজে যাহা নহি তাহা সাজিয়া, যাহাদের আমি কেহই নহি, তাহাদের সঙ্গে মিশিয়া,—ভাবিয়াছিলাম যে আমিও তাহাদের একজন হইয়াছি, ভাবিয়াছিলাম তাহারাও আমার সঙ্গে মিশিয়া গিয়াছে! আমার ভুল এতই শক্ত ছিল যে গিরীন্‌-দা'-দিগের আচরণ চক্ষের উপর দেখিয়াও তাহা ভাঙ্গিল না। বারে বারে একই ভুল করিলাম। আমার দাদা আমার ব্যবহারে আমার উপর চটিয়া গিয়াছিলেন,—তাঁহার স্নেহ ফিরিয়া পাইতে কিন্তু আমি কোনও চেষ্টাই করিলাম না।

আজ দশ বৎসর কলিকাতায় আসিয়া আছি। ইহার মধ্যে আমার জাতি গিয়াছে, কলঙ্ক রটিয়াছে, নিজের সমাজে আমার স্থান গিয়াছে, যাহাদের সঙ্গে মিশিতে এত চেষ্টা করিয়াছি, তাহাদের সমাজে আমার জন্য শুধু উপহাস ও ঘৃণা মাত্র আছে, আমার আপনার যাহারা তাহারা আমায় ত্যাগ করিয়াছে। বনের পশুর মত মানুষ কি সমাজ ছাড়া হইয়া থাকিতে পারে? সমাজে ঢুকিয়া আমার কোনও ক্রিয়া-কলাপ করিবার আবশ্যক নাই বলিয়া উড়াইয়া দিতে চেষ্টা করিলেও, সমাজের জন্য আমার প্রাণ কাঁদে। এখনও সেই সমাজে ফিরিয়া গিয়া তাহাদের সঙ্গে মিশিতে পাইবার জন্য আমার প্রাণ অধীর হইয়া উঠে। সেই সব প্রতিবেশী, যাহারা আমার মত সামান্য প্রাণীরও নিত্য খবর রাখিত,—আমার নিজের ঘরে আমার সেই সব আপনার জন, যাহারা আমার তুচ্ছ জীবনের মায়ায় আমার সামান্য একটু পীড়া হইলেও মুখের উপর মুখ রাখিয়া পড়িয়া থাকিত,—সেই তাহাদের স্নেহ যত্ন রচিত নীড়ে ফিরিয়া যাইবার জন্য আমার প্রাণ আকুল হইয়া উঠে।

স্বাধীন জীবিকা আমি এখানে অর্জ্জন করিতেছি, সেখানেও করিতাম। এখন চাকুরি যাওয়ায় শিল্পকলা ফলাইয়া খাইতেছি, পরিতেছি; সেখানেও চরকা ঘুরাইয়া খাইতাম পরিতাম।—তবে পার্থক্য এই যে, নিজের খরচপত্র এত বাড়াইয়া ফেলিয়াছি যে আগেকার চেয়ে এত বেশী টাকা রোজগার করিয়াও আমার ব্যয় সঙ্কুলান হয় না, দেনা হয়। গিরীন্‌-দা'র বিবাহে অনর্থক চাল দেখাইয়া নিজের সম্ভ্রম বাড়াইতে গিয়া যে দেনা করিয়াছি, আজও তাহা শোধ হয় নাই। অথচ সেখানে আমার পরিচয়, সেই 'পুরাতন দাসী' ছাড়া আর কিছুই বাড়িল না।

দেশে সামান্য রোজগার করিয়াও নিজের অভাব ত' দূর হইতই, সঙ্গে সঙ্গে অন্যের জন্যও কিছু খরচ করিতে পারিতেছিলাম। তাহাতে আমার এত তৃপ্তি ছিল যে, কখনও নিজের জন্য অভাব বোধ করিতাম না। যাহাদের জন্য অভাব বোধ করিতাম, এবং যে অভাব দূর করিবার আশায় নূতন উপায় অবলম্বন করিয়াছিলাম—তাহাদের সে অভাব ঘুচাইতে পারা ত' দূরের কথা, সে চিন্তা পর্য্যন্ত ত্যাগ করিতে বাধ্য হইলাম, বরং নিজের জন্য নিত্য নূতন অভাবের সৃষ্টি করিয়া বসিলাম।

সম্প্রতি একদিন আমার একজন শিক্ষিত বন্ধুর সঙ্গে এইরূপ আক্ষেপ করিতেছিলাম। তিনি আমায় বুঝাইলেন যে, মানুষ নিত্য নূতন অভাব অনুভব না করিলে উন্নতির পথে অগ্রসর হইতে চেষ্টা করে না। সামান্য পাইয়া যথেষ্ট পাইয়াছি মনে করিয়া তৃপ্ত থাকাও ঘোর অজ্ঞানতার পরিচায়ক। শিশু যে এক পয়সা দামের একটা পুতুল পাইলে একশত টাকা দামের একটা নোটকে সামান্য কাগজ মনে করিয়া ফেলিয়া দেয়,—তাহাও ঐ নোটের মূল্য সম্বন্ধে তাহার অজ্ঞতার কারণে।

আজ কিন্তু, আমি সেই অজ্ঞতাকেই বরণ করিয়া লইয়া পরিতৃপ্তি লাভের কামনা করিতেছি। আজ আমার এমন বন্ধু কে আছে যে আমার কাগজের দামি নোটখানা কাড়িয়া ফেলিয়া দিয়া আমার সেই সস্তার ভালবাসার পুতুল ফিরাইয়া দিবে?

অনেকদিন পূর্ব্বে আমার সমাজের জন্য আমি অত্যন্ত দুঃখ করিয়াছিলাম বলিয়া আমার নব্যতন্ত্রের সেই বন্ধুটী আমায় বলিয়াছিলেন, 'আপনার সমাজের সঙ্গে সম্পর্ক ত' শুধু ঘাড়ে করিয়া গঙ্গায় দিবার জন্য!—তা' মরিয়া গেলে যে যেমন করিয়া যেখানে ইচ্ছা ফেলিয়া দিউক না কেন, তাহাতে কি আসে যায়?'

তখন বুঝিয়া দেখিয়াছিলাম যে, কথাটা কতকটা ঠিক বটে! কিন্তু, আজ আমার মনে পড়ে যে, যখন আমারই মত কাহারও মৃতদেহ আমাদের গ্রামের প্রান্তস্থিত শ্মশানে আসিত, এবং পথের যত লোক বলিতে বলিতে যাইত,

'আহা, অমুকের বিধবা বোনটীকে ঘাটে এনেছে!'—তখন আমিও মনে মনে বলিতাম, 'আহা, আমায় কবে অমন করে ঘাটে নিয়ে যাবে?'

আমার একান্ত আশাহীন জীবনেও 'অমন' করিয়া ঘাটে যাওয়ার আশা আমি মনে মনে পোষণ করিতাম। অথচ সে 'অমন', যে কেমন, তাহা ভাবিয়া বুঝিয়া সে আশা করিতাম না। যদিও তেমন মৃত্যুতে কোনও ঘটা ছিল না, তবুও আজ বুঝিতেছি যে, সে তেমনি করিয়া, তাহাদের রাখিয়া, তাহাদের কাঁধে চড়িয়া ঘাটে যাওয়া, যাহারা আমাকে চেনে, আমার খবর রাখে, আমার মৃত্যুতেও একবার 'আহা' বলে, আমার তুচ্ছ মৃতদেহটা কাঁধে করিয়া গঙ্গায় দেওয়া পুণ্য কাজ মনে করে।

তেমন করিয়া ঘাটে যাওয়ার আশায় বঞ্চিত হইয়া, আমার প্রাণে মরণের জন্য আর সে উৎসাহ নাই। আজ যদি আমি সোণা দিয়া পেট ভরাই, রত্নখচিত পরিচ্ছদ পরিধান করি, তবুও আমার মরণে আর তেমন জিনিস কখনও ঘটিতে পারে না। যুক্তি দিয়া মনকে যতই বুঝাইতে চেষ্টা করি যে, মরণের পর আর কিছুরই সঙ্গে সম্পর্ক নাই, তবুও মন তাহা বুঝে না। যে পাশ্চাত্য দেশের আলোক পাইয়া আজ এরূপ যুক্তি মনে আনিতে সক্ষম হইতেছি, পুস্তক পড়িয়া বুঝিতেছি যে সে দেশের লোকেরাও মনের মত মরণ মাগিয়া মরে।

পথহারা

শ্রীদেবপ্রসন্ন মুখোপাধ্যায় এম-এ বি-এল

তরুণী কিশোরী, তোমার জীবন যে-জন ভরেছে লাজে,
ছিঁড়িয়া লতিকা, দলি পদতলে, ফেলে গেছে পথমাঝে,
সরল হৃদয়ে তুমি তারে হায়! বেসেছিলে বড় ভালো,
ভেবেছিলে তুমি, হবে বুঝি সেই, তোমার নয়ন আলো!
অবোধ বালিকা, কেন করেছিলে, এত বড় মহাভুল,
কেন দিয়েছিলে' তনুমন তব, নাহি যার সমতুল?
দস্যু-অধম, ঘৃণিত সেজন, তোমারে ভুলাল হায়!
লোকালয়ে তবু, আছে তার ঠাঁই, সমাজ ঠেলেনা তায়;
জগতের চোখে, দোষ নাহি তার, দোষ শুধু অবলার,
কঠোর বচনে, তোমারে শাসায়, করি গুরু অবিচার!
অনাবিল প্রেমে, তোমার জীবন, দিল নাত' কেহ ভরি,
এসেছিল যারা, লয়ে গেল শুধু, মধুটুকু সব হরি'!
সোনার স্বপন, এল নাক আর, তোমার জীবন মাঝে,
উষা না উদিতে, ঘেরিল তোমায়, আলোক বিহীন সাঁঝে!
যদিও হেথায়, অবহেলা শুধু, তোমার পাথের সার,
তোমার গলায়, পাতকীর হরি, দুলাবে কুসুম হার!
একদিন আসি, মৃদু মধু হাসি, দিবেই সে তোরে দেখা,
তাঁহার মধুর, কোমল পরশ, হরিবে কালিমা লেখা!

ভারতবর্ষ—বৈশাখ—১৩৩৮

শরৎবাবুর "শেষ প্রশ্ন" এবার শেষ হইল, বাকী কেবল "বিপত্তি"। কিন্তু ইহার শেষ কোথাও সহসা দেখা যায় না ; একবার ঘটিলেই মুস্কিল।

এ সংখ্যায় ছোট গল্প আছে মাত্র দু'টি। প্রথম গল্প শ্রীপ্রণব রায়ের "মর্ম্মর"। এক আঠাশ বছরের বিগত যৌবনা নারীর চরিত্র বর্ণনা—কারুণ্য ও শ্লেষ ইহাতে পরিস্ফুট। তবে রচনাটিকে গল্প না বলিয়া চিত্র বলিলে ঠিক মানায়। আর বিদেশী গল্পের একটু তীব্র গন্ধ ছাড়িলেও গল্পটি বেশ হইয়াছে! কিন্তু যে সংসারে ভাত কাপড়ের দুঃখটা তেমন নাই ও যে নারীর সন্তান-সন্ততির সংখ্যা মাত্র তিনটিতে কায়েমী থাকে মাত্র বারো বৎসরে তার দেহের সকল সৌন্দর্য্য ও শ্রী এবং মনের সবটুকু রস যে নিঃশেষিত হইয়া মাত্র রিক্ত, রুক্ষ, কঠিন পাত্রটিকে রাখিয়া যায়, এ কথা অনভিজ্ঞতা দিয়া বলা গেলেও, অভিজ্ঞতায় অন্যরূপ দাঁড়াইবে। নারী যখন আপনাকে বৃদ্ধা ভাবে, তখনই তার নারীত্বের মৃত্যু। আর এই কথাটা সে সহজে স্বীকার করিতে চাহে না। আয়ুষ্মতী বৃদ্ধার সযত্ন প্রসাধনই তার সাক্ষ্য।

গল্পটি কলিকাতারই চলিত ভাষায় লিখিত এবং কয়েকটি ক্রীয়ার বানানে এমন খাস "কোলকাতাই" রূপ আছে যে সোণা মুগ আর মটর দালের মিশ্রণের মত অদ্ভুৎ দেখায়। যেমন "গ্যালো, গ্যাচে, স্বাখে" ইত্যাদি। উচ্চারণই যদি এগুলির আত্মকরের য ফলার বেণী ও আকারের যষ্ঠী ধারণের ভিত্তি হয়, তাহা হইলে "বল্‌লে", "চল্‌ল", "করুব" প্রভৃতি ওকার চক্রে বন্দী না হইয়া উচ্চারণের আশায় ভূমিসাৎ হইয়া থাকিবে কেন? এবং "ছিল", "করছিল",—প্রভৃতি "ছেল", "কোরছেল" হওয়াই স্বাভাবিক।

দ্বিতীয় গল্প শ্রীসৌরীন্দ্রমোহন মুখোপাধ্যায়ের "বড়বাবুর বিপত্তি।" একটী অর্থলোলুপ পুরুষের চরিত্র কথা। ইহারও মনের সবটুকু রস খামোখা উড়িয়া যায়, যার ফলে তাঁর তরুণী স্ত্রী সোহাগরসাভাবে শুষ্ক, শীর্ণ ও ক্লিষ্ট হইয়া উঠে। পরিশেষে ভদ্রলোকটীর শ্যালক-পত্নী বি-এ পাশ স্ত্রী এণার বাক্‌-চাতুর্য্যে মুগ্ধা হইয়া গৃহিণী তার কথামত কায করে. এবং গঙ্গার ঘাট হইতে ঘরে ফিরিয়া স্বামীকে তার হাতের নূতন সোণার চুড়ী ও গলার হার দেখাইয়া বুঝাইয়া দেয় যে "পয়সাকে একমাত্র ধ্যানের বস্তু না করে আমার পানে একটু চেয়ো গো...মন আমার সত্যি আজও মরে যায় নি!"

ইহার উত্তরে "বড়বাবু একটা নিঃশ্বাস ফেলিয়া তাকিয়াটা টানিয়া তাহাতে হেলান দিয়া শুইয়া পড়িলেন।" এই নিশ্বাসটা "বিরক্তি", "দুঃখ" কি "তৃপ্তির" সে কথা রসগ্রাহী পাঠক অনুমান করিবেন। গল্পটী উপেক্ষিতা তরুণী ভার্য্যার অর্থলোলুপ কৃপণ স্বামীগণের অবশ্য পাঠ্য। রচনাটিতে নূতনত্ব কিছুই নাই ; "সৌরীন্‌ বাবুর" হাত হইতে না বাহির হইলেই ভাল হইত। ইহার মধ্যে তাঁর লিপিকুশলতা ও সহজসিদ্ধ রস খুঁজিলে তবে মেলে ; পাঠককে তা আপনা হইতেই অভিসিঞ্চিত ও তৃপ্ত করে না।

বড়বাবুর গৃহিণীর মুখে দু'একটা পরিষ্কার ইংরাজী শব্দ ও চমৎকার বাংলা শোনা যায়। কিন্তু শ্রীমতী এণার বিদ্যার দৌড় দেখাইয়া গৃহিণীর সম্বন্ধে তিনি কিছুই বলেন নাই যাতে বোঝা যায় তার মুখের এই শব্দগুলির পিছনে আছে আধুনিক ইংরাজী বিদ্যায়তনের শিক্ষা।

মনে হয় সৌরীনবাবু গল্পটি মন দিয়া লেখেন নাই।

এ সংখ্যায় রঙিন ছবি আছে তিনখানি। প্রথম ছবি শ্রীযুক্ত অশ্বিনীকুমার রায়ের "গায়ত্রী"। ব্রহ্মার মুখখানি

অবশ্য চৈনীক ; দক্ষিণ পদের পল্লবখানি চীনা নারীরই মত এবং বাহনটিও কুক্কুট, শ্যেন ও হংসের সংমিশ্রণ। তবে ছবিখানিতে ভাবের দ্যোতনা আছে।

দ্বিতীয় ছবি তারাস্বামী আসারীর "শিবদুর্গা"। (পর্ব্বতগাত্রে) মন্দ লাগে নাই।

তৃতীয় ছবি শ্রীচিত্রসেন বড়ুয়ার "ভজন।" শ্রীকৃষ্ণের বিগ্রহের সম্মুখে এক বৈরাগিণী ভজন গাহিতেছেন। তাঁর বাম হাতে তানপুরা, দক্ষিণ হাতে খঞ্জনী। হাত দুটির গতি আছে, কিন্তু ভজন তো কেবল বাজাইলেই গাওয়া হয় না, কণ্ঠস্বরও নিঃসৃত হওয়া চাই। ছবিতে বৈরাগিণীর অধর দুখানি অবশ্য পরস্পর সংলগ্ন দেখা যাইতেছে। ইহাতে মনে হয়, তালের ফাঁকে গায়িকা একটু দম লইতেছেন। ছবিখানি ভাল লাগিল না।

প্রবাসী—বৈশাখ—১৩৩৮

এ সংখ্যায় অনেকগুলি প্রবন্ধ আছে ; সেগুলির মধ্যে প্রমথবাবুর "পাঠান-বৈষ্ণব রাজপুত্র বিজুলী খাঁ" সবিশেষ উল্লেখযোগ্য। শ্রীযুক্ত ব্রজেন্দ্রনাথ বন্দোপাধ্যায়ের "আমাদের দেশে প্রথম সংবাদপত্র" পাঠে সংবাদপত্রের ক্রমোন্নতির সূত্র ও একটী নূতন কথা পাওয়া যায়।

শ্রীযুক্ত শৈলেন্দ্রকৃষ্ণ লাহার "সমাজ ও সাহিত্য" শীর্ষক প্রবন্ধটি দেখিতেছি "কাশীপুর ইনষ্টিটিউটে পঠিত" লেখা আছে। কিন্তু লোক পরম্পরায় শোনা গেল, লেখক ইহা রবিবাসরের একটী অধিবেশনে বিশেষ করিয়া রবিবাসরের জন্য লিখিত বলিয়াই পাঠ করিয়াছিলেন। ইহা ছাপার ভুল না শ্রোতাগণকে ঠকাইবার বক্তাগণের স্বভাবসিদ্ধ চালের একটী ?

এ সংখ্যায় দুইখানি উপন্যাস আছে। একখানি পূর্ব্বের সেই "অপরাজিত" ; অন্তর্দ্ধানের কোন সম্ভাবনা দেখা যাইতেছে না, অপরখানি শ্রীসুরেশচন্দ্র বন্দোপাধ্যায়ের "পোর্ট আর্থারের ক্ষুধা"—জাপানী গ্রন্থের অনুবাদ।

ছোট গল্পও আছে চারিটি। প্রথম গল্প শ্রীসীতাদেবীর "বিষে বিষক্ষয়।" স্ত্রীর প্রতি শাশুড়ী ও স্বামীর অত্যাচার কাহিনী।

স্বামী মাত্র আই-এ পাশ করিয়া "দুশো" টাকা মাহিনার চাকরী করিতে করিতে যখন সর্ব্বগুণভূষিতা ম্যাট্রিক-ক্লাস-অবধি-পড়া সপ্তদশী তরুকে বিবাহ করিয়া নিজেকে ভাগ্যবান্ মনে করে, তখন তার বয়স পঁয়ত্রিশ। পুরুষজাতি স্বভাবতই আরাম প্রিয়। কাজেই স্বামী বিবাহের অব্যবহিত পরেই দস্তুরমত স্ত্রীর প্রতি সোহাগ-ভালবাসা ঢালিয়া দিলেও তিন বৎসর যাইতে না যাইতে আত্ম-স্বভাব প্রকট করিতে থাকেন। স্ত্রীর মনেও উচ্চাকাঙ্ক্ষার অভাব ছিল না—"সে খানিকটা নিরাশ হইল বটে, তবে মর্ম্মান্তিক বেদনা কিছু পাইল না। যেমনই হউক, ইহাকে লইয়াই তাহার চিরদিন ঘর করিতে হইবে, অতএব স্বামীকে ভালবাসিতে সে যথা সম্ভব চেষ্টা করিতে লাগিল।" তার চেষ্টা বোধহয় তখনও চলিতেছিল, শেষ অবধি সে বোধহয় স্বামীকে ভালবাসিতও কিন্তু "তরুর প্রাণ অস্থির হইয়া উঠিল। সারাদিন কাজ আর শাশুড়ীর খোঁটা। * * * স্বামী যদি আগের মতই থাকিতেন, তাহা হইলে তরু কোনোমতে সহিয়া যাইত, তাহার জ্বালা জুড়াইবার একটা স্থান থাকিত। কিন্তু * * * এই সঙ্কটাপন্ন অবস্থায়, অর্থাৎ এই বিষের জ্বালা জুড়াইতে তরু আর এক বিষ পান করিল—সে গেল জেলে। প্রিজন্ ভ্যানে উঠিবার সময় সাহেব-ঘেঁষা অত্যাচারী স্বামীকে কহিল "স্বামিত্বের দাবী যত বড়ই হোক, পুলিসের দাবী তার চেয়েও কড়া।" ইহাই গল্প।

কিন্তু জেলে যাওয়াটা স্বামীর ও শাশুড়ীর হাত হইতে নিস্তার পাইবার একটা উপায়স্বরূপ না করিয়া সত্যই দেশের কাজকে উপলক্ষ্য করিলে তাহা সঙ্গত হইত নিশ্চয়। যাঁদের স্বামী ভালবাসে, শাশুড়ী স্নেহ করে, তাঁদের পক্ষে জেলে যাওয়া অবিবেচনার কাজ কি ? ইহাই কঠিন এবং মহৎ। আর সেই কারণেই ভারতের নারীগণ আজ যে শ্রদ্ধা কুড়াইতেছেন, নিজেদের যথার্থ অধিকার ও আসন গ্রহণ করিতেছেন, তাহা আধুনিক কালের ইতিহাসে অভিনব। নতুবা ঐভাবে যা লাভ করা যায় তার পিছনে শ্রদ্ধা থাকে না, সম্মান থাকে না এবং আন্তরিকতার অভাবটাও হইয়া পড়ে প্রকাণ্ড। তবে আশা করা যায়, এই ক্ষুদ্র আদর্শটিকে সহসা কেহ গ্রহণ করিবেন না এবং এই রচনাটি শেষের দিকে এত তরল ও লঘু যে মনের উপর একটী আঁচড়ও ফেলিবে কিনা সন্দেহ।

দ্বিতীয় গল্প শ্রীশান্তাদেবীর "মোটবাহী।" গল্পটি বড় করুণ। সমগ্র রচনাটির মাঝে একটী গভীর অনুভূতি

সুস্পষ্ট। শতপাকে বন্দিনী এক অসহায় নারীর গভীর অন্তর বেদনা এমন সংযত বাক্যে ও স্বাভাবিক রঙে ব্যক্ত হইয়াছে যে মনকে অশ্রুসিক্ত করিয়া তোলে। তারপর, একখানি চিত্র ইহাতে এমন ভাবে অঙ্কিত হইয়াছে, যা নিপুণতায় উজ্জ্বল। নিশীথে চোর স্বামীর সহিত স্ত্রীর অপ্রত্যাশিত সাক্ষাৎ—স্বামী স্ত্রীর পিতৃগৃহেই চুরি করিতে আসে—তার সহিত স্ত্রীর কথোপকথন এবং পরদিন সকলের কাছে পরপুরুষাসক্ত কুৎসায় স্ত্রীর অপমানিত হওয়া, একটী প্রকাণ্ড Tragedy! নারীর সহনশীলতার আশ্চর্য্য রূপ ইহাতে সুপরিস্ফুট।

তৃতীয় গল্প শ্রীপ্রবোধকুমার সান্যালের "অজানা"। গল্পটিতে সুরু হইতে শেষ অবধি বেশ জমাট ভাব আছে; গতিও বেশ সহজ, স্বচ্ছন্দ ও বেগবতী। গল্পটি মনের উপর একটু ছাপ রাখিয়া যায়। সুন্দরী তরুণী "শেয়াস্তি দেবী" বা শান্তি দেবীকে কেন্দ্র করিয়া যে রস সৃষ্টি হইয়াছে, তা অতি উপাদেয়। কিন্তু গোয়ালার ছেলে বদ্‌রিকে সময় সময় মনে হয় যেন ঝুমঝুমিওয়ালার বেশে এক "নব্য কবি।" সে মানস-লোকের স্বপ্নময় পথে বিচরণকালে এই সুদূর পঞ্জাববাসিনী টাটানগর যাত্রিণীকে চকিতে চলিয়া যাইতে দেখে, তার রূপের সুষমা বদ্‌রির চোখে অঞ্জন-রেখা আঁকিয়া দেয়। তাই এই অজানা তরুণীকে সে "চিনি" বলে। কল্পনার এমন মোহন দীপ্তিতে কি সত্যই "গাঁওয়ার" তরুণের মন উদ্ভাসিত হইয়া উঠে? এইখানে সত্যদৃষ্টির অভাব ঘটিয়াছে।

চতুর্থ গল্প শ্রীমনোজ বসুর "বাঘ।" গল্পটি মন্দ নয়—ইহার সমপদী একটী গল্প আছে—ডডের Mistrie's of Cornie

এ সংখ্যায় রঙীন ছবি আছে তিনখানি। প্রথম ছবি শ্রীকনু দেশাইয়ের "রামচন্দ্র ও কাঠবেড়ালী।" কিন্তু কাঠবেড়ালীটা হইয়াছে খরগোসের মত। হয়ত গুজরাতের কাঠবেড়ালী এমনিই দেখিতে।

দ্বিতীয় ছবি শ্রীমণীন্দ্রভূষণ গুপ্তের "গালার কাজ।" গালার মিস্ত্রী তার সামান্য যন্ত্র-পাতি লইয়া খেলনা ও পুতুল গড়িতেছে।

তৃতীয় ছবি শ্রীইন্দুভূষণ রক্ষিতের "চাবীর ঘর।" একেবারে অন্দর মহল। কিন্তু ছবিখানিতে বেশ একটী শ্রী আছে। বাংলার নিরালা পল্লীকে মনে করাইয়া দেয়।

বসুমতী—চৈত্র—১৩৩৭

বসুমতীর পঞ্চ উপন্যাসের বিপুল যজ্ঞ যথারীতি চলিতেছে।

এ সংখ্যায় ছোট গল্পও আছে পাঁচটি। প্রথম গল্প শ্রীপ্রমথ চৌধুরীর "ঝাঁপান খেলা।"

দ্বিতীয় গল্প শ্রীমাণিক ভট্টাচার্য্যের "সত্য ও মিথ্যা।" গল্পটি বেশ; কিন্তু মাণিকবাবুর সবটুকু রচনা-বৈশিষ্ট্য ইহাতে নাই। মানুষ বাহিরের সত্যকে বজায় রাখিতে গিয়া অন্তরের সত্যকে ক্ষুণ্ণ করে ইহাই গল্পটির ভিত্তি।

তৃতীয় গল্প শ্রীসৌরীন্দ্রমোহন মুখোপাধ্যায়ের "সুখে-দুঃখে।" গল্পটি বড় চমৎকার কিন্তু মার্কিন গাল্পিক O' Henryর একটী গল্পের মাল-মশলা ও ছাপ ইহাতে এত বেশী যে পাদটীকায় তাঁরই রচনা বলিয়া স্বীকারোক্তি করিলে শোভন হইত। অবশ্য ইহাও হইতে পারে যে "Great minds think alike" কিন্তু O' Henryকে অন্ততঃ Great mind বলা চলে না। তা ছাড়া তিনি সৌরীন্ বাবুর এই গল্পটি লেখার বহু পূর্ব্বে গল্পটি রচনা করেন।

চতুর্থ গল্প শ্রীপাঁচুগোপাল মুখোপাধ্যায়ের "সহধর্ম্মিণী।" লেখক ইহাতে একটী বড় সত্য কথা বলিয়াছেন - "মিস্ রায় আপনাদের সমাজের একটা প্রধান দোষ দাঁড়িয়েছে এই যে, কোন একটা বিষয়ে বেশীক্ষণ চিন্তা করবার ক্ষমতা সকলের থাকছে না। প্রজাপতির মত একটা চঞ্চল অস্থিরতা তাঁদের মন. ছেয়ে ফেলেছে।" সমাজের পক্ষে, জাতির পক্ষে ইহা যে বড় ভয়ের কথা।

গল্পের বিষয়টুকু নূতন না হইলেও বলিবার ভঙ্গিমায় মন্দ লাগে না।

পঞ্চম গল্প কুমার শ্রীধীরেন্দ্রনারায়ণ রায়ের "নবগ্রহ।" গল্পটিতে হাসি কান্না-শ্লেষ-রঙ্গের উপাদান যথেষ্ট আছে। কিন্তু রচনাটি এত দীর্ঘ যে সুরু হইতে শেষ অবধি পাঠে ধৈর্য্যচ্যুতি ঘটে। ফলে মনে যে ভাবটুকু টানিয়া আনে তা অবশ্য তৃপ্তি নয়। লেখনী সংযমে রচনা সুন্দর, উপাদেয় ও চিত্তগ্রাহী হইয়া উঠে।

ইহা ছাড়া স্থানে স্থানে লেখকের অলসতা দেখা যায় এবং গল্পের সুরুতেই তার সূত্রপাত। রমেন কৃপণ পিতার পুত্র—সে পিতার "কড়া শাসন" ও "যথেষ্ট চেষ্টার"

বিদ্যায়তনের তৃতীয় শ্রেণীর প্রাচীর উল্লঙ্ঘন করিতে পারে না ; ফলে, তার লেখাপড়া এইখানেই শেষ হয় ! "সে পিতৃ-বন্ধুর দ্বারা জিজ্ঞাসিত হইলে স্পষ্ট ভাষায় বলিয়া দিত যে, সে সৃষ্টি করিবার জন্য জন্মগ্রহণ করিয়াছে, সৃষ্ট হইতে আসে নাই।" রমেনের এই উত্তর, টুকুর অর্থ আশা-করি পাঠকগণ কুভাবে ধরিবেন না। তারপর "সৃষ্টি-ক্ষমতা প্রতিভার মারফতেই আসিয়া থাকে, এমন কথার উল্লেখ কেহ করিলে, রমেন নজীর দেখাইয়া বলিত রবীন্দ্র নাথ, অমৃতলাল প্রকৃতির বরপুত্র ! ইত্যাদি।" এতবড় নজীর দেখাইবার বুদ্ধি তার ছিল ; সে কবিতাও লিখিত, কিন্তু "দারুণ গ্রীষ্মে শাল, কম্ফর্টার ও মোজা ব্যবহার করিত" কোন্ নিতান্ত গ্রাম্য বুদ্ধির বলে যা হউক, রচনাটি সংযত হইলে, চমৎকার হইত।

শ্রীযুক্ত দীনেন্দ্রকুমার রায় একটী শিকার কাহিনী অনুবাদ করিয়াছেন। কাহিনীটি মিঃ আর্ সমারভিলষ্টগ কর্তৃক রচিত ও বিলাতের কোন প্রসিদ্ধ মাসিকে প্রকাশিত। কিন্তু খুব লোমহর্ষকভাবে কাহিনীটি রচিত নয় এবং অনেক আজগুবি কথাও ইহাতে আছে। সেজন্য ইহাতে সত্য যে কতখানি আছে পাঠক তাধরিতে পারিবেন এদেশীয় নরনারী সম্বন্ধে যে জ্ঞান তাঁর কতখানি তাও জানা যাইবে। তার আরও এক নিদর্শন ছবিতে নৌকার বাঙালী আরোহী দুটির চেহারা। কাহিনীটিকে Adapt করিলে বোধহয় ভাল হইত।

এ সংখ্যায় রঙীন ছবি আছে তিনখানি। প্রথম ছবি শ্রীহেমেন্দ্রনাথ মজুমদারের "সিক্তা কুসুম"। কুসুম কথাটি অবশ্য ক্লীবলিঙ্গ। জলে ভিজিয়া বোধকরি লিঙ্গ পরিবর্ত্তন করায় "সিক্তা" হইয়াছে। ছবিখানি অনেকেরই ভাল লাগিবে।

দ্বিতীয় ও তৃতীয় ছবি শ্রীচারুচন্দ্র সেনগুপ্তের "ওমর-খৈয়াম" ও "পূজার ফুল।" দুইখানি পট ; অবশ্য কালিঘাটের নয়, জগন্নাথের নয়, বৃন্দাবনেরও নয় বহুবাজারের বসুমতী কাগজের চৈত্রসংখ্যার পটেরও শ্রী আছে। ইহাও শ্রীহীন নয়—রঙে রঙে রামধনু।

রবীন্দ্র প্রশস্তি

৺সত্যেন্দ্রনাথ দত্ত

নমস্কার ! করি নমস্কার !
কবিতা-কমল-কুঞ্জ-উল্লসিত আবির্ভাবে যার,
আনন্দের ইন্দ্রধনু মোহে মন যাহার ইঙ্গিতে,
আত্মার সৌরভে যার স্বর্গনদী রহে তরঙ্গিতে,
কূজনে গুঞ্জনে গানে মর্ত্ত হ'ল স্ফুর্ত্তি-পারাবার
অন্তরের মূর্ত্তিমন্ত ঋতুরাজ বসন্ত সাকার,—
নমস্কার ! করি নমস্কার !
ফটিক জলের তৃষ্ণা যে চাতক জাগাইল প্রাণে,
অমর করিল বঙ্গে মৃত্যু-হরা মৃত্যু-হারা তানে ;
ছাতারে-মুখর যুগে গাহিল যে চকোরের গান,—
করিল যে করা'ল যে জনে জনে চন্দ্র-সুধাপান ;
তন্ত্রের শিখরে যেবা বিথারিল রসের পাথার,—

নমস্কার ! করি নমস্কার !
চন্দন তরুর বনে বাঁধিল যে বাণীর বসতি,
দুর্লভ চন্দন-কাঠে কুঁড়ে বাঁধা শিখেছে সম্প্রতি—
আকিঞ্চন কবিজন গৌড়ে বঙ্গে আশীর্ব্বাদে যার,
বেণু বীণা জিনি মিঠা বাণী যার ধনি সুষমার,
চিত্ত প্রসাধনী পরী দিল যারে নিজ কণ্ঠহার,—
নমস্কার ! করি নমস্কার !
প্রতিভা-প্রভায় যার ভিন্ন-তমঃ অভিচার নিশি,
আবেদনে আস্থাহীন, 'আত্মশক্তি' মন্ত্র-দ্রষ্টা ঋষি,
ভীরুতার চিরশত্রু, ভিক্ষুতার আজন্ম অরাতি,
শোণিত নিষেক-শূন্য নৈষ্কর্ম্যের নিত্য-পক্ষপাতী,
বঙ্গের মাথার মণি, ভারতের বৈজয়ন্ত হার,—

নমস্কার ! করি নমস্কার !
রুদ্ধ-কণ্ঠ পাঞ্জাবের লাঞ্ছনার মৌনী অমারাতে
নির্ভয়ে দাঁড়াল একা বাণী যার পাঞ্চজন্য হাতে
ঘোষিল আত্মার জয় কামানের গর্জ্জন ছাপায়ে
অতিচারী ফিরিঙ্গীর ঘাঁটা-পড়া কলিজা কাঁপায়ে
তুচ্ছ করি' রাজ-রোষ উপরাজে দিল যে ধিক্কার,
নমস্কার ! করি নমস্কার !

দাঁড়ায়ে প্রতীচ্যভূমে যে ঘোষে অপ্রিয় সত্য কথা,—
"জঘন্য জন্তুর যোগ্য পশ্চিমের দস্তুর সভ্যতা।"
ছিন্নমস্তা ইয়োরোপা শোনে বাণী স্বপ্নাহত-পারা
ছিন্নমুণ্ডে শিবনেত্র, দেখে নিজ রক্তের ফোয়ারা—
শিহরি' কবন্ধ মাগে যার আশে শান্তিবারি-ধার—
নমস্কার ! তারে নমস্কার !

স্বদেশে যে সর্ব্বপূজ্য, বিদেশে যে রাজারও অধিক,
মুখরিত যার গানে সপ্ত সিন্ধু আর দশদিক্,—
বিশ্বকবি-ছত্রপতি, ছন্দরথী, নিত্য বন্দনীয়,
বিতরে যে বিশ্বে বোধি,—বিশ্ববোধিসত্ত্ব জগৎপ্রিয়,
নিত্য তারুণ্যের টীকা ভালে যার, চিত্ত চমৎকার,—
নমস্কার ! তারে নমস্কার !

ঘাটের পাটনে এসে দেশে দেশে বরযাত্রা যার,
নিশীথে মশাল জেলে যার আগে নাচে দিনেমার,
ওলন্দাজ খুলি' তাজ যার লাগি কাতারে কাতারে
শীতে হিমে রাজপথে দাঁড়াইয়া ছবি প্রতীক্ষার
ষণ্ডভূমি "হুণ" "গল্" যার লাগি রচে অর্ঘ্যভার
নমস্কার ! তারে নমস্কার !

নয়নে শান্তির কান্তি, হাস্য যার স্বর্গের মন্দার;
পক্ক কেশে যে লভিল বরমাল্য রম্যা অরোরার ;
বুদ্ধের মতন যার 'আনন্দ' সে নিত্য সহচর,
সর্ব্ব ক্ষুদ্রতার উর্দ্ধে মেলে পাখা যাহার অন্তর,
বিশ্ব যোগে যুক্ত যে গো "বাণী-মূর্ত্তি স্বদেশ আত্মার"—
বারম্বার তারে নমস্কার !

চারি মহাদেশ যার ভক্ত, করে ভক্তি নিবেদন,
গুরু বলি' শ্রদ্ধা সঁপে উদ্বোধিত আত্মা অগণন,
ভাবের ভুবনে যার চারি যুগে আসন অক্ষয়,
যার দেহে মূর্ত্তি ধরে ঋষিদের অমূর্ত্ত অভয়,
অমৃতের সন্ধানী যে ধ্যানী যে নির্ব্বন্ধ সাধনায়—
নমস্কার ! নমস্কার ! বারম্বার তারে নমস্কার !

গান

শ্রীমনোমোহন ঘোষ বিদ্যাবিনোদ

নতুন করে গাইব আজি গান !
দুখের ধূলো ঝেড়ে ফেলে, সুখের সুরে—
(আমার) বাঁধব বীণাখান ॥
আলোকের এই বিমল বিভায়,
কিশলয়ের রঙীন শোভায়,
অজানা-মোর কোন্ প্রেয়সী আনলে পুলক বাণ ॥
আকাশ আজ দেখে চাঁদে
তারে স্মরেই পরাণ কাঁদে,
গানের চুমায় ভাঙব তার আজ সকল অভিমান ॥

"পান্থ"

শ্রীসুধীর কুমার সেন

আমার হৃদয় দুয়ারখানি রেখেছি খুলিয়া,
এতকাল পরে পান্থ ; তোমারি লাগিয়া ;
নৈরাশ্যের কশাঘাতে পড়ি আঁখিলোর,
বিধৌত করেছে এই কুঁড়ে ঘর মোর !

গাঁথিয়াছি ফুলমালা তব অনুরাগে,
পরাব তোমার গলে কতই সোহাগে ;
এস তুমি প্রিয়তম ! ললিত নর্ত্তনে—
প্রাণ মন বিকাইব, তব ও চরণে।

রবীন্দ্র জয়ন্তী

গত ২৫শে বৈশাখ রবীন্দ্রনাথের সপ্ততিতম জন্মতিথি গিয়াছে। রবীন্দ্রনাথ ভারতের কবি হইয়াও বিশ্ব-কবিরূপে সম্মান অর্ঘ পাইতেছেন—স্বাধীন, অ-স্বাধীন সকল দেশেরই শ্রেষ্ঠ কবি, বৈজ্ঞানিক, রাজনীতিবিদ্ সকল স্তরের গুণীরাই কবিকে শ্রদ্ধা অর্ঘ দিয়া ধন্য হইতেছেন—তাঁহার সহিত নিজেদের মত সামঞ্জস্য করিয়া লইতেছেন। সাহিত্যের সাধনার মধ্য দিয়া নিজের বাণীকে কতটা মূর্ত্ত করা যাইতে পারে রবীন্দ্রনাথ তাহার জ্বলন্ত দৃষ্টান্ত। রবীন্দ্রনাথ ঊনবিংশ শতাব্দীর শেষভাগ হইতে বিংশ শতাব্দীরও প্রায় মধ্যভাগ পর্য্যন্ত দেশের চিন্তা ও ভাবধারা লইয়া বিশ্বব্যাপী যে খেলা খেলিয়া যাইতেছেন তাহাতে বিশ্বের চিন্তা-জগতে নূতন সুর আসিতেছে—চলিত মানব-সভ্যতার ধারায়ও একটা বিবর্ত্তনের সূচনা দেখা যাইতেছে। অপূর্ব্ব ব্যক্তিত্বসম্পন্ন রবীন্দ্রনাথ চিরদিন তাঁহার ব্যক্তিত্বকে আড়ালে ফেলিয়া ভাব-মূর্ত্তিকেই উজ্জ্বল করিয়া ধরিয়াছেন। কবি নিজে বেশী ধরা ছোঁয়ার মধ্যে না গিয়া—এক স্তর উর্দ্ধেই চলিয়াছেন। রবীন্দ্র-সাহিত্য তাঁহার অবিনশ্বর কীর্ত্তি—কাব্যে-উপন্যাসে গল্পে ভাবধারার বিন্যাসে তাহা অতুলনীয়। শান্তি-নিকেতনে কবি তাঁহার শিক্ষা ও আদর্শকে রূপময় করিতে চাহিতেছেন। রবীন্দ্রনাথের তুলনা রবীন্দ্রনাথই—অপর কাহারও সহিত তাঁহার তুলনা চলে না, এমনি অতুলন মানব তিনি। রবীন্দ্রনাথ বিংশ শতাব্দীর গৌরব। জীবনের সত্তর বৎসর চলিয়াছে কবি এখনও নবীন—যেমন চির-নবীন তিনি চিরদিনই রহিয়াছেন। রবীন্দ্রনাথের কাছে জগৎ এখনও অনেক আশা রাখে—জাগতিক সভ্যতার যোগাযোগে তাঁহার দান যে অমূল্য। প্রাচ্য ও প্রতীচ্য দুই বিভিন্নমুখী সভ্যতা জগতে একটা মহামারী কাণ্ডের সৃষ্টি করিয়া চলিয়াছে। সভ্যতার নামে মানবের হাহাকার বাড়িয়া যাইতেছে—মানুষ অমানুষিক কাণ্ড করিতেছে, রবীন্দ্রনাথের মত ক্ষণজন্মা প্রতিভাই ইহার যোগাযোগে সক্ষম—অন্ততঃ ইঁহাদের সভ্যতার বাণীতেই তাহার ভিত্তি গড়িয়া উঠিবে—তাই রবীন্দ্রের বাণী শুনিতে বিশ্বজগৎ উন্মুখ। বাংলার গৌরব, বিশ্বের গৌরব কবি রবীন্দ্র আরো দীর্ঘকাল সুস্থদেহে বাঁচিয়া থাকিয়া জগতকে অমৃতের সন্ধান দিন—

অনুন্নতদের প্রতি মহাত্মা

বোচাসাল গ্রামে বাড়িয়া নামক অনুন্নত শ্রেণীর একটি বিদ্যালয় স্থাপনকালে মহাত্মা বলিয়াছেন—"আমি আশা করি সাময়িক এই যুদ্ধ-বিরতির মেয়াদের পর আমরা পূর্ণ স্বরাজ লাভ করিব এবং স্থায়ী শান্তি প্রতিষ্ঠিত হইবে। কিন্তু সে স্বরাজ সকল সম্প্রদায়ের এমন কি ভাঙ্গিদের ও মেথরদেরও স্বরাজ হইবে। সকল সম্প্রদায় যে স্বরাজে যোগ দিবে না, সে স্বরাজ স্বরাজই নহে।" সাময়িক যুদ্ধ বিরতিতে মহাত্মা কি আশা করেন এবং পূর্ণ স্বরাজে সকল শ্রেণী সম্বন্ধে কি ব্যবস্থা হইবে তাহা এই উক্তিতে সুস্পষ্ট।

খৃষ্টধর্ম্ম ও মহাত্মা

সর্ব্বধর্ম্মে সম আস্থাবান মহাত্মা ভারতে খৃষ্টানী-প্রচার সম্বন্ধে মন্তব্য করায় কোন কোন মিশনারী উক্ত হইয়াছেন—

উত্তরে মহাত্মা বলিয়াছেন—'খৃষ্টধর্ম্মই একমাত্র সত্য এবং অন্যান্য ধর্ম্ম মিথ্যা এ দাবী আপত্তির বিষয়। খৃষ্টধর্ম্ম ব্যতীত ভারতের প্রচলিত অন্যান্য ধর্ম্মও খৃষ্টধর্ম্ম অপেক্ষা অসত্য নহে। ভারতে খৃষ্টধর্ম্ম প্রচারের প্রণালীর আলোচনা করা সত্বেও মিশনারীরা জানেন খৃষ্টানদের মধ্যেও আমার চেয়ে বড় বন্ধু তাঁহাদের কেহ নাই।'

অহিংসার শক্তি

মহাত্মা লিখিয়াছেন—"অহিংসায় যদি আমাদের অবিচলিত বিশ্বাস থাকে তবে ইহা ক্রমে সমগ্র জগৎ প্লাবিত করিবে। অহিংসার প্রসার জগতে সর্ব্বাপেক্ষা শক্তিশালী প্রচার কার্য্য করিবে। সময়ের গতির সঙ্গে আমরা বুঝিতে পারিব, অহিংসা ব্রহ্ম-শক্তির উৎস।'

কানপুরের দাঙ্গা

কানপুরের অতি শোচনীয় দাঙ্গায় বহু হিন্দু-মুসলমান খুন জখম হইয়াছে, মন্দির-মসজিদ ধ্বংস হইয়াছে, গৃহ ভস্মীভূত হইয়াছে—এসব হইবার পর দাঙ্গার ব্যাপার সম্বন্ধে যে তদন্ত হইয়াছে তাহাতে দেখা যাইতেছে যে শান্তি রক্ষায় নিয়োজিত সরকারী কর্ত্তৃপক্ষেরা দাঙ্গা বন্ধ করিবার চেষ্টা করেন নাই—পুলিশ প্রভৃতি নির্লিপ্ত দর্শকের মত এই বীভৎস তাণ্ডব দেখিয়াছে। ঢাকায় যেমন হইয়াছিল কানপুরেও তেমনি উচ্চ রাজকর্ম্মচারীরা সাহায্য প্রার্থীদের গান্ধীর কাছে যাইয়া সাহায্য চাহিবার উপদেশ দিয়াছেন। দাঙ্গা নানা প্ররোচনায় স্বার্থসিদ্ধির জন্য কাহাদেরও দ্বারা ঘটিতেও পারে—যতটা সম্ভব এ তদন্তে তাহার উদ্ধারও সম্ভব—দাঙ্গা হিন্দু-মুসলমান যাহারা করিয়া নিজেদের সর্ব্বনাশ নিজেরা করিয়াছে তাহারা অতি দুর্ভাগ্য সবই সত্য—কিন্তু যাহাদের উপর দেশের শান্তি-শৃঙ্খলা রক্ষার ভার ন্যস্ত, যাহাদের হাতে শক্তি প্রয়োগের সম্পূর্ণ সুবিধা রহিয়াছে, তাহাদেরও দেশবাসীর সর্ব্বনাশ চোখের উপর দেখিয়াও এরূপ ঔদাসিন্যে কি মনে হয়? ভারতে এরূপ সম্প্রদায়িক দাঙ্গা দেখিয়া রাজপুরুষেরা কেহ স্বরাজের আমলের ভয়াবহ অবস্থা সম্বন্ধে আমাদের চোখে আঙুল দিয়া সজাগ করিতে পারেন, আমরা স্বরাজের যোগ্য নহি বলিয়া হিতোপদেশ দিয়া নিজেদের সু-বুদ্ধির পরিচয় দিতে পারেন, কিন্তু এসব ভারতহিতৈষীদের নিজেদের নয়ন ও মনের দুয়ার একটু সরলভাবে খুলিয়া বোঝা উচিত যে এসব হাঙ্গামা স্বরাজ-রাজে ঘটিতেছে না—ঘটিতেছে বৃটিশ-রাজেই—ভারতীয় শান্তি ও শৃঙ্খলা রক্ষার জন্যই যাহারা ভারতীয় রাজস্বের শ্রেষ্ঠ অংশ সৈন্য ও পুলিশেই ব্যয় করিয়া আসিতেছেন তাহাদের রাজেই।—এরূপ শোচনীয় সাম্প্রদায়িক দাঙ্গা ভারতীয়দের স্বরাজ-প্রাপ্তির অন্তরায়, তাহাদের ধন, প্রাণ, মান সব বিসর্জ্জন দিবার পথ তাহা সত্য—এবং এ সত্য কঠোরতম ভাবে হিন্দু-মুসলমান দু'য়েরই উপর কতবার আপতিত হইবার পরও যে এখনও তাহাদের তেমন চৈতন্য হইল না, ইহা খুবই দুর্ভাগ্যের বিষয়। কানপুরের দাঙ্গার তদন্ত এ সম্বন্ধে দেশের হিন্দু-মুসলমানকে প্রকৃত অবস্থা সম্বন্ধে আরও সজাগ করিতে পারে বলিয়া আশা করা যায়। এই দাঙ্গার পর 'ইদের' সময়ও অনেক স্থানে দাঙ্গার আশঙ্কা করা গিয়াছিল, কিন্তু 'ইদে'র পূর্ব্ব হইতেই কানপুর দাঙ্গার তদন্তে যে সব মজার রহস্য প্রকাশ পাইতে লাগিল, তাহাও বোধহয় দাঙ্গার ছোঁয়াচ অনেকটা নিবারণ করিতে পারিয়াছিল। এই সব আত্মঘাতী ব্যাপারের পর হিন্দু-মুসলমানকে সর্ব্বদা স্মরণ রাখিতে হইবে—কোন স্বার্থপর প্ররোচকের উত্তেজনায়ই যেন দাঙ্গা করিয়া সাম্প্রদায়িক প্রভুত্ব বাড়াইতে যাইও না—তাহাতে নিজেরাই মরিবে—প্ররোচক তখন দূরে দাঁড়াইয়া হাসিবে ও নিজের স্বার্থ বুঝিয়া লইবে। এসব দাঙ্গা ক্রমাগত দেখিয়া আরো একটা কথা জোর করিয়া বলা যায় যে ভারতের আভ্যন্তরিণ শাসন-ব্যবস্থার ভার অবিলম্বে ভারতবাসীর হাতে আসা কর্ত্তব্য। তাহা হইলে এরূপ শোচনীয় দাঙ্গা আর বিস্তারলাভ করিতে পারিবে না সম্ভব।

সাম্প্রদায়িক সমস্যায় সংবাদপত্র

বাংলার সাংবাদিক সংঘ 'Indian Journalists Association' এই সমস্যা সমাধানের জন্য যে পন্থা অবলম্বন করিয়াছেন, তাহা বিশেষ প্রশংসার যোগ্য। হিন্দু-মুসলমান প্রায় সকল সংবাদপত্রসেবীই 'ইদে'র দুই দিন পূর্ব্বে শ্রীযুক্ত যোগেশচন্দ্র গুপ্তের ভবনে সমবেত হইয়া এই সমস্যার আলোচনা করিয়াছিলেন এবং সকলে মিলিয়া

হিন্দু-মুসলমান সব সংবাদপত্রেই দু' সম্প্রদায়ের সম্প্রীতি রক্ষার আবেদন জানাইয়াছিলেন। কোন সম্প্রদায়কে উস্কাইবার জন্য কাগজে উত্তেজক লেখা যাহাতে না বাহির হয় সেজন্যও 'সাংবাদিক সঙ্ঘ' চেষ্টা করিতেছেন এবং তাহা ফলপ্রদও হইতেছে। সাংবাদিকগণ সংবাদপত্র দ্বারা দেশের হিতকর অনেক কিছুই করিতে পারেন—এবিষয়ে সংবাদিক সংঘ যে সব কার্য্যে এখন হাত দিতেছেন তাহাতে দেশের পূর্ণ সহানুভূতি তাঁহারা পাইবেন সন্দেহ নাই।

জাতীয় মুসলমান সম্মেলন

দিল্লীর মুসলেম সম্মেলনের মনোভাব দেখিয়া হতাশা আসিতেছিল; লক্ষ্ণৌ জাতীয় মুসলেম সম্মেলনের মনোভাবে আবার আশার সঞ্চার হইতেছে। এই সম্মেলনের সভাপতি সার আলী ইমাম ভারত বিদিত ব্যক্তি—ইনি বলেন 'স্বতন্ত্র নির্ব্বাচন নীতি জাতীয়তার অভাবেরই দ্যোতক।··· মুসলমানেরা যদি নিজেদের রক্ষা করিতে না পারে এবং হিন্দুরা তাহাদের রক্ষা না করে, তাহা হইলে সে শক্তি নিশ্চয়ই তৃতীয় পক্ষের হাতে বর্ত্তিবে। ইহা কি জাতীয়তার বিরোধী নহে—ইহাতে কি ইহাই প্রতিপন্ন হয় না যে এ দেশে যে সমর্থন পাওয়া যাইতে পারে না তাহার উপরই স্বতন্ত্র নির্ব্বাচনবাদীদের ভরসা? ইহার অর্থ চিরন্তন শিক্ষা-নবিসিতে থাকা। জাতীয় মুসলমানগণ স্বাধীনতার আশা পোষণ করেন—এ অবস্থায় যে তাঁহারা স্বতন্ত্র নির্ব্বাচনে ঘৃণা বোধ করিবেন ইহাতে আশ্চর্য্যের কিছু নাই।··· কোনরূপ সর্ত্ত বা বাধা নিষেধ ছাড়া অধিকৃত যুক্ত নির্ব্বাচন-নীতি সমর্থন করাই একান্ত আবশ্যক।···স্বার্থ সুবিধা লুটের ব্যাপারে ভারতীয় মুসলমানদের ভাগ-বাটোয়ারা সম্বন্ধে অনেক কথা হইয়াছে। কোন বিধানের দ্বারা যে এই বাটোয়ারা স্থির হইতে পারে এ বিশ্বাস করি না। ভারতের স্বাধীনতা লাভে এবং রক্ষাকল্পে মুসলমানদের দানের অনুপাতেই তাহারা সে সুখ সুবিধার ভাগী হইবে।··· ভবিষ্যৎ ভারতে হিন্দু বা মুসলমান রাজ বলিয়া কিছুর স্থান হইবে না। স্বদেশ প্রেমের উদার ভিত্তির উপর ভারতীয় জনগণের রাষ্ট্রীয় স্বাধীনতা প্রতিষ্ঠিত থাকিবে, সাম্প্রদায়িকতার কলঙ্ক স্পর্শ তাহাতে থাকিবে না।'

যুক্ত নির্ব্বাচন ও পৃথক নির্ব্বাচন এই ব্যাপারই এখন মুসলমানদের মধ্যে মহা সমস্যার বিষয়। সুতরাং যুক্ত নির্ব্বাচন সম্বন্ধে স্যর আলি ইমামও যেমন বলিয়াছেন ডাক্তার আনসারীও তেমনি বলিয়াছেন—'রাজনীতির দিক হইতে স্বতন্ত্র নির্ব্বাচন প্রথা যে সাম্প্রদায়িক ভেদ-বিরোধ চিরস্থায়ী করিবার একটি সর্ব্বোত্তম কৌশল এ কথা কাহাকেও বুঝাইয়া দিতে হইবে না।' ডাঃ সৈয়দ মামুদও এ সম্বন্ধে যাহা বলিয়াছেন উল্লেখ যোগ্য—তিনি বলেন "কতিপয় মুসলমান গৃহে আরাম কেদারায় শয়ন করিয়া মুসলমানের অধিকার গেল বলিয়া চীৎকার করিতেছেন বটে কিন্তু হাজার হাজার প্রকৃত কর্ম্মী মুসলমান জাতীয়-সংগ্রামে মৃত্যু ও কারা-যন্ত্রণা বরণ করিয়া লইয়াছেন।···ভারতীয় মুসলমানেরা ভারতকেই মাতৃভূমি মানিয়া লইয়াছে। এবং তাহারা বুঝিয়াছে মাতৃভূমির মঙ্গলের সহিতই তাহাদের মঙ্গলামঙ্গল জড়িত। ভারতের কোন সম্প্রদায় কাহাকে ছাড়িয়া উন্নতি লাভ করিতে পারে না। সমবেত উন্নতি প্রচেষ্টা দ্বারাই সকলের উন্নতি সম্ভবপর।···" জাতীয়তাবাদী মুসলমানদের স্বদেশিকতা ও ভারতীয়ের সর্ব্বাঙ্গীন উন্নতির উদার অভিমতের কাছে সাম্প্রদায়িকতাবাদী মুসলমানদের সঙ্কীর্ণ স্বার্থতন্ত্রবাদ যে অদূর ভবিষ্যতেই পরিম্লান হইয়া যাইবে তাহাতে সন্দেহ কিছু নাই।

নারী সম্মেলনের প্রস্তাবাদি

কলিকাতা টাউনহলের এই সম্মেলনে নারীরা কতকগুলি প্রস্তাব করেন, তাহার কয়েকটি গৃহীত ও কয়েকটি পরিত্যক্ত হইয়াছে। নারীরা ভাবী রাষ্টতন্ত্রের নির্ব্বাচনে পুরুষদের সমান ভোটাধিকার চাহিয়াছেন। এ প্রস্তাব গৃহীত হইয়াছে। নিখিল বঙ্গ-নারী-প্রতিষ্ঠান ও সেবিকাদল গঠনের প্রস্তাব গৃহীত হইয়াছে। শ্রীযুক্তা বাসন্তী মজুমদার প্রস্তাব করেন বিভিন্ন সম্প্রদায়ের মধ্যে মিলন ও ঐক্য প্রতিষ্ঠার জন্য বিভিন্ন জাতি, বর্ণ ও ধর্ম্ম সম্প্রদায়ের মধ্যে সামাজিক মেলামেশা ও আদান-প্রদান আবশ্যক। এজন্য ভিন্ন জাতি, বর্ণ ও ধর্ম্ম সম্প্রদায়ের মধ্যে বিবাহে বাধা না দেওয়া হয়। শ্রীযুক্তা অনুরূপা দেবী বলেন অস্পৃশ্যতা নিবারণে আপত্তি করিবার কিছু নাই কিন্তু বিভিন্ন জাতি, বর্ণ ও ধর্ম্ম সম্প্রদায়ের মধ্যে বিবাহে বাধা না

দেওয়ার যে কথা বলা হইয়াছে উহার কোন প্রয়োজন নাই। কেন না কেহ ঐরূপ বিবাহ করিলে কার্য্যতঃ কেহই তাহাতে বাধা দেয় না। ভোটে দিলে অনেকেই বলেন 'আমরা ঐরূপ বিবাহের পক্ষপাতিনী নহি।' শ্রীমতী শান্তি দাস এই প্রস্তাবের সমর্থনে এই মর্ম্মে বলেন যে, 'এ সমস্যাটি সাধারণ ও ক্ষণস্থায়ী নহে। যাহারা সবদিক বিবেচনা করিয়া অপর সম্প্রদায় হইতে সঙ্গী বা সঙ্গিনী গ্রহণ করিতে চান ইহাতে তাঁহাদের সেই স্বাধীনতা দেওয়া হইতেছে। এরূপ স্বাধীনতা থাকা প্রয়োজন হইয়াছে, কারণ সামাজিক উৎপীড়নের ভয়ে ইচ্ছামত বিবাহ করিতে না পারিয়া অনেকের জীবন দুঃখময় হইতেছে, আরও একটি কারণ আছে—বিভিন্ন সম্প্রদায় ও জাতির নরনারীর রক্তের মিশ্রণের ফলে শক্তি ও সাহস সম্পন্ন বংশধরের সৃষ্টি হইতে পারিবে এবং এই সব নরনারী সমগ্র দেশকে সম্প্রদায়ের ও জাতিভেদের ঊর্দ্ধে ভাবিতে সক্ষম হইবে। সুতরাং এই ভাবে সাম্প্রদায়িক সমস্যার প্রতিকার হইবে। শ্রীযুক্তা অনুরূপা দেবী ইহার উত্তরে বলেন—হিন্দুমুসলমানের মধ্যে বিবাহ হইলেই দুই সম্প্রদায়ের মধ্যে মিল হইবে এমন নহে। এভাবে মিলন করিতে গেলে হয়ত সমস্ত হিন্দুকে মুসলমান হইতে হইবে নয় সমস্ত মুসলমানকে হিন্দু হইতে হইবে কিন্তু তাহা সম্ভব নহে। কিন্তু কেহ এরূপ বিবাহ করিলেও কেহ বাধা দেয় না সুতরাং ঐরূপ আইনের কোন প্রয়োজন নাই। শ্রীযুক্তা অনুরূপার সংশোধন প্রস্তাবের পক্ষে ৮০ ও বিপক্ষে ১৪ ভোট হইয়াছিল। শ্রীযুক্তা প্রতিভা রায় তাঁহার প্রস্তাবে বহু বিবাহপ্রথা রোধ, বিধবা বিবাহ প্রচলন পর্দ্দা ও পণপ্রথা তুলিয়া দেওয়া ও অবস্থা বিশেষে বিবাহ বিচ্ছেদের অধিকার সাব্যস্তের কথা বলিয়াছেন। শ্রীযুক্তা অনুরূপা দেবী ইহারও সংশোধন করিয়া বলেন—অবস্থা বিশেষে হিন্দুনারীর অধিকার সাব্যস্তের কথা বর্জ্জন করা হউক। ইহা আমাদের সনাতন ধর্ম্মের বিরোধী, দুশ্চরিত্র হইলেও আমরা যেমন পিতা ও ভ্রাতা ত্যাগ করিতে পারি না তেমনি স্বামীকেও পারি না। শ্রীযুক্তা অনুরূপার সংশোধন গৃহীত হয়। নারী সম্মেলনের সামাজিক বিষয়ে বিশেষ করিয়া দাম্পত্য-ব্যাপারে যে মনোভাব পরিস্ফুট হইয়াছে তাহা বিদ্রোহের ভাব বিবেচিত হইলেও এ সম্বন্ধে পুরুষের ভাবিবার কথা আছে সামান্যই। আর এই ছোটখাট মহিলা মজলিসের কতিপয় ১২।১৪ জন মহিলামাত্র এই সব সম্পর্কে যে মনোভাবের পরিচয় দিয়াছেন তাহা যে অন্ততঃ বাংলার নারীদের মনোভাব নহে তাহাতে সন্দেহ মাত্রও নাই। ঘরোয়া ভাবে বা ব্যক্তিগত ভাবে দাম্পত্য সম্পর্ক স্থাপনে যাহার যেমন মনোভিলাষই থাকুক না কেন তাহা এ ভাবে কোন বৈঠকে বিশেষতঃ বাংলার নারী মহাসম্মেলন নামে যাহা চালান হইয়াছে তাহাতে প্রকাশ করা সঙ্গত হইয়াছে কি? ব্যক্তিগতভাবে কাহারও যদি ভিন্ন ধর্ম্মীকে বরণ না করিলে জীবন একান্ত দুঃখময়ই হইয়া ওঠে তবে স্বচ্ছন্দে তিনি তাহা করিতে পারেন—তবে সে জন্য হিন্দু সমাজ তাহাকে নাও নিতে পারে এজন্য আক্ষেপ করিবারই বা কারণ কি? বাঙ্গালীর মধ্যে সাহসী ও শক্তিসম্পন্ন লোকের অভাব আছে একথা সত্য নহে—আর ভিন্ন ধর্ম্মে বিবাহ করিলেই যে তজ্জাত সন্তান এই সব গুণসম্পন্ন হইবে একথা যে নারী একান্ত বিশ্বাস করেন ও বীর জননী হইবার যাহার একান্ত সাধ তিনি ভিন্ন ধর্ম্মীকে বিবাহ করিয়া বীর-জায়াও হইতে পারেন! নারীর আর্থিক স্বাধীনতা অবশ্য প্রয়োজনীয় এবং ইহা না থাকাতেই নারীর যতপ্রকার দুর্দ্দশা আসা সম্ভব আসে, তাহাও সত্য কিন্তু আর্থিক স্বাধীনতা কি ভাবে পাওয়া যায় সে সম্বন্ধে কেহ কোন বিশেষ আলোচনা করেন নাই। সভানেত্রীর বক্তৃতায় পুরুষের উপর আক্রোশের ভাব সমধিক দেখা যায়—কিন্তু ইহার সঙ্গত কোন কারণ পাওয়া যায় না। পুরুষ ও নারীর পূর্ণ সহ-যোগেই সুখের সংসার-জীবন সম্ভব—রাজনৈতিক বিষয়ে নারীরা যে সব অভিমত ব্যক্ত করিয়াছেন তাহা ধীরে ধীরে কার্য্যক্ষেত্রে কিরূপ ফল প্রসব করে দেখা যাইবে।

ময়মনসিং গুণ্ডামী

ময়মনসিংহে দেশনেতা শ্রীযুক্ত যতীন্দ্রমোহন সেনগুপ্তের উপর আক্রমণ হইয়াছিল। প্রকাশ কংগ্রেসী দলাদলির জন্যই এরূপ হওয়া সম্ভব হইয়াছিল। দেশোদ্ধারের জন্য যখন অহিংস সংগ্রাম চলিয়াছে এবং কংগ্রেসই যখন তাহা চালাইতেছে তখন একজন কংগ্রেস নেতার উপর কংগ্রেস উপলক্ষেই এ আক্রমণ দেখিবার মত বটে!

সামরিক শিক্ষা

আমাদের সামরিক শিক্ষা পাওয়া এবং সমর বিভাগে অধিকার থাকা যে অতি প্রয়োজন সে বিষয়ে সন্দেহ মাত্রও নাই, ডাঃ মুঞ্জে এ বিষয়ে বিশেষ চেষ্টা করিতেছেন, সম্প্রতি কলিকাতায় বক্তৃতা প্রসঙ্গে তিনি বলিয়াছেন—বাংলায় সামরিক বিদ্যালয় স্থাপন ৩ লাখ টাকা হইলেই হইতে পারে এবং জাতীয় শিক্ষা পরিষৎ এ ভার লইতে পারেন।

মহাত্মা কটিবাস কেন পরেন ?

খদ্দরের অত্যধিক মূল্য জানিয়া মহাত্মা প্রমাণ ধুতি ত্যাগ করিয়া কটিবাস গ্রহণ করেন। মহাত্মা বলেন—কটিবাস পরিধানে ভারতীয় সভ্যতার সরল জীবন আনয়ন করে। অভাবের প্রাবল্যের জন্যই আজ মানবজাতির এই দুর্দ্দশা উপস্থিত হইয়াছে। ঐহিক সুখ স্বাচ্ছন্দ্যের প্রতি এই তীব্র আকাঙ্ক্ষার দরুণই আজ মানব সমাজ এমন দোষ দুষ্ট হইয়াছে। ইওরোপ ঐহিক ঐশ্বর্য্যের মোহ হইতে নিজেকে মুক্ত করিয়া আবার তাহার সমাজকে নূতন করিয়া গড়িতে বাধ্য হইবে। ভারতের পক্ষে স্বার্থের পেছনে ধাবমান হওয়া আর মৃত্যুকে আলিঙ্গন করা একই কথা। এই দারুণ অভাবের দিনে মহাত্মার বাণী লোককে হৃদয়ঙ্গম করিতেই হইবে।

কলিকাতায় খুন জখমের প্রাবল্য

রাজধানী কলিকাতায় কয়দিন হইতে খুনের বেশী প্রাবল্য হইয়াছে। অর্থ লোভে দুইজন সম্ভ্রান্ত মহিলা খুন হইয়াছেন—তারপর দিবা দ্বিপ্রহরে কলেজ ষ্ট্রীট এলবার্ট হলের প্রসিদ্ধ পুস্তক ব্যবসায়ী সেন ব্রাদাসের ভোলানাথ সেন ও দু'জন কর্ম্মচারী একসঙ্গে ছোড়ার আঘাতে দোকানের মধ্যে নিহত হইয়াছেন। দু'জন মুসলমান এই সম্পর্কে ধৃত হইয়াছে। এমন ভয়াবহ কাণ্ড কি উপায়ে বন্ধ করা যাইতে পারে সে সম্বন্ধে কলিকাতা পুলিশ বিশেষ তৎপর হইতেছেন এমন আশা করিতে পারি।

নারী ফিল্ম পরিচালিকা

ইংলণ্ডের চলচ্চিত্র জগতে কুমারী ডায়না সারেই একমাত্র মহিলা পরিচালিকা। ইনি এইচ-ভি এসমণ্ডের সেক্রেটারী থাকা কালে তাঁর নাট্যগুলির ফিল্ম অভিনয়ের বন্দোবস্ত নানা ফিল্ম কোম্পানীর সঙ্গে করিতেন। তারপর এসমণ্ডের মৃত্যু হইলে তিনি ফিল্মকেই ব্যবসায় হিসাবে গ্রহণ করতে দৃঢ় সঙ্কল্প করেন—এইভাবে ইনি বৃটানিয়া ফিল্মস্ লিমিটেড নামে নিজের কোম্পানী গড়িয়া তোলেন। আধুনিক ধরণে ফিল্ম তুলিবার খরচা অনেক তাই অর্থের বন্দোবস্ত করিতে তাঁকে অনেক ভুগিতে হইলেও এখন ধনী পৃষ্ঠপোষকের সহায়তায় তিনি ফিল্ম ব্যবসায় দৃঢ় ভিত্তির উপর দাঁড় করিতে পারিয়াছেন।

'Every mother's Son' ও 'Second to None' তাঁর অন্যান্য ফিল্মগুলির মধ্যে খুব নাম পাইয়াছে। এঁর 'carry on' জল যুদ্ধ সম্বন্ধীয় দ্বিতীয় চিত্র। ইনি শুধু যে নিজ কোম্পানীর চিত্র পরিচালনই করেন তা নয় অধিকাংশ 'সিনারিও' ইনিই লিখিয়া থাকেন।

বার্ণার্ডশ ও অভিনেতা

জগৎপ্রসিদ্ধ লেখক বার্ণার্ডশ তাঁর অদ্ভুত ব্যবহারের জন্যও অনেকের মনোযোগ আকর্ষণ করিয়াছেন, এই খেয়ালী প্রতিভার সঙ্গে আবার একজন অভিনেতা কেমন খেয়ালে চলে বাজিমাৎ করিয়াছিলেন শুনুন—একজন অভিনেতার ভারি ইচ্ছা যে তিনি শ'র you never can Tell' অভিনয় করেন, কি বন্দোবস্তে অভিনয় হইতে পারে সে সম্বন্ধে কথাবার্ত্তা কহিতে তিনি গেলেন বার্ণার্ডশ'র বাড়ীতে। নানা কথাবার্ত্তার পর শ' এমন টাকা চেয়ে বসিলেন যে অভিনেতা একেবারে হতভম্ব, তিনি ভাবিতেই পারেন নাই যে এত টাকার কথা উঠিতে পারে। তাই অভিনেতা নিরাশ হয়ে বেড়িয়ে এলেন।

বাইরে এসে ঘুরিতে ঘুরিতে তাঁর মাথায় কেমন খেয়াল চাপিল তিনি পোষ্টাফিসে গিয়ে শ'র কাছে 'তার' পাঠালেন—

'নাটকখানা আমায় অমনি দিন না কেন ?'

এই তারখানা পেয়ে বার্ণার্ডশ্ তো একেবারে 'থ' হয়ে গেলেন।

এই অবাক্ বিস্ময়ের মধ্যেই শ' তাকে তার করে দিলেন যে সেই বন্দোবস্তেই তিনি রাজী।

এই অভিনেতা হচ্ছেন বিখ্যাত James Welch।

স্পেন রাজের রাজ্য ত্যাগ

স্পেন রাজ আলফান্সো রাজ্য ছাড়িয়া ফ্রান্স হইয়া ইংলণ্ডে গিয়াছেন। স্পেনে সাধারণতন্ত্র ঘোষিত হইয়াছে। স্পেনের রাজতন্ত্রের পতন বর্ত্তমান সময়ের বিশেষ উল্লেখ-যোগ্য ঘটনা। রাজা সময়ে জন-মত মানিয়া লইলে তাঁহার স্বৈরাচার সংযত করিতে হইত কিন্তু হয়তো সিংহাসন হারাইতে হইত না।

বাংলায় অন্নাভাব

অর্থাভাবে বাংলা এখন বিশেষ বিব্রত। অন্নাভাবও এখন এমন প্রকট হইয়াছে যে প্রায়ই কোননা কোন স্থান হইতে অনাহার মৃত্যুর সংবাদ পাওয়া যাইতেছে। এখন হইতে জন সাধারণ ও সরকারের এ বিষয়ে অবহিত হওয়া বিশেষ প্রয়োজন।

নূতন মেয়র

ডাঃ বিধানচন্দ্র রায় এবার কলিকাতার মেয়র নির্ব্বাচিত হইয়াছেন। প্রত্যেকবারই মেয়রের কাছে কলিকাতা বাসীরা এই নিবেদন করে যে তাঁহার আমোলে যেন কর্পোরেশনে দলের স্বার্থের চেয়ে কলিকাতার জন-সাধারণের স্বার্থই বিশেষ করিয়া দেখা হয়। এবারেও অবশ্য কলিকাতা বাসীরা তেমন ইচ্ছাই করিতেছে। মেয়র ডাক্তার রায়কে আমরা স্বাগত অভিনন্দন জানাইতেছি।

আচার্য্য জগদীশচন্দ্রের অভ্যর্থনা

আচার্য্য জগদীশচন্দ্র করপোরেশনে অভিনন্দিত হইয়াছেন—ইহা অতি আনন্দের কথা।

রবীন্দ্র সম্বর্দ্ধনা

শ্রীযুক্ত জগদীশচন্দ্র বসু, প্রফুল্লচন্দ্র রায়, রামানন্দ চট্টোপাধ্যায়, রাজেন্দ্রনাথ মুখোপাধ্যায় প্রভৃতি জানাইতেছেন—'২৫শে বৈশাখ কবিবর রবীন্দ্রনাথ ঠাকুর মহাশয়ের বয়ঃক্রম সপ্ততি বৎসর পূর্ণ হইল। আমরা মনে করি যে এই শুভ ঘটনা উপলক্ষ্য করিয়া সমগ্র দেশবাসীর পক্ষ হইতে, কলিকাতা নগরীতে তাঁহার যথোচিত সংবর্দ্ধনা এবং একটী আনন্দোৎসবের অনুষ্ঠান করা কর্ত্তব্য। ঐ সংবর্দ্ধনা ও তাহার আনুষঙ্গিক উৎসব-অনুষ্ঠানাদির ব্যবস্থা করিবার জন্য, আগামী ২রা জ্যৈষ্ঠ সন্ধ্যা ছয় ঘটিকার সময় কালিকাতা ইউনিভারসিটি ইনষ্টিটিউট গৃহে একটি পরামর্শ সভার অধিবেশন হইবে।

গ্রন্থ-পরিচয়

বৈজয়ন্তী—শ্রীযুক্ত বিজয়মাধব মণ্ডল প্রণীত; রঘুনাথ পুর, বসিরহাট হইতে শ্রীযুক্ত সুধাংশু শেখর মণ্ডল কর্ত্তৃক প্রকাশিত। ডবল ক্রাউন, ষোড়শাংশিত ১০৪ পৃষ্ঠা—মূল্য একটাকা। প্রকাশকের নিকট এবং কলিকাতার প্রধান প্রধান পুস্তকালয়ে প্রাপ্তব্য।

শ্রীযুক্ত বিজয়মাধব মণ্ডল 'মাসিক বসুমতী' ও অন্যান্য সাময়িক পত্রিকায় কবিতা লিখিয়া যশস্বী হইয়াছেন। 'বৈজয়ন্তী' তাঁহার প্রকাশিত ও অপ্রকাশিত কবিতা সমষ্টি। ইহাতে তাঁহার প্রায় ৪০টি স্বরচিত কবিতা স্থান পাইয়াছে।

বিজয় বাবু শক্তি শালী কবি—তাঁহার কাব্য আবেগ-প্রধান এবং তাঁহার বলিবার ভঙ্গীটি বলশালী। 'বৈজয়ন্তী'তে তাঁহার নানা শ্রেণীর কবিতা স্থান পাইয়াছে। ঠিক একটি সুরকে ইহার মধ্য হইতে পাওয়া যায় না—অনেকগুলি তারে আঘাত করিয়া কবি তাঁহার বীণা বাজাইয়াছেন। কাব্যামোদী পাঠক বইখানি পড়িতে আরম্ভ করিয়া নানা সুরের ঝঙ্কারে মুগ্ধ হইবেন। বিজয় বাবুর এই শ্রেণীর দুই একটি কবিতার নমুনা এখানে তুলিয়া দিতেছি—

"ফুলটি বড়ই ভালো বাসো নাকি—
এনেছি তাই ফুলশয্যার ফুল,
দিতে পার—কি তুমি এর লাগি—
এমন কুসুম—পরশ তুষাকুল?"
—ফুলের মূল্য

"আজি পহেলা আষাঢ়!
নীলমেঘ মন্থর ধূসরিত অম্বর

[illegible]—
আজি পহেলা আষাঢ়।

কৈলাসে বিরহিণী ওগো বিধুরা—
যক্ষ দয়িতা তুমি কোথা আতুরা!
গবাক্ষে দেখ চেয়ে এনেছে আকাশ বেয়ে
'রাম গিরি' হতে দূত সংবাদ কার—
আজি—পহেলা আষাঢ়!"

—পহেলা আষাঢ়

"ঊপরে ঝরিবে চাঁদের তারার কিরণ-অলকানন্দা,
মুহুমন্থর লুটাবে সমীর, মদির সুরভি-ভারে—
আমি প্রেমালোকে তারি মাঝখানে ফুটিব রজনীগন্ধা,
নিশি ভোরে হিয়া রিক্ত করিয়া দিয়ে যাব দেবতারে!"

—অভিশাপ

"আঁধার সাগরে তব বিশ্বব্যাপী আসে যে জোয়ার,
মিলনের সেতু কাল অলক্ষেতে রচে তার বুকে;
মিলনের মহালয়া। মর্ত্ত্যে নর অর্পে তোর-ধার;
ঊর্দ্ধ স্বর্গে পিতৃলোক ছায়া পথে ফিরে তৃপ্তসুখে।

—অমাতিথি

উদ্ধৃত কবিতাংশ কয়টি হইতে পাঠক সহজেই তাঁহার কবিত্ব শক্তির পরিচয় পাইবেন। ভাষা ও ছন্দে কবির অধিকার আছে একথা নিঃসন্দেহ;—কাব্যে আবেগ-আন্দোলিত কবি হৃদয়ের পরিচয় ও যথেষ্ট পাওয়া যায়, কিন্তু সেই আবেগই যেন তাঁহাকে কয়েকটি সুন্দর কবিতার পথ ভ্রষ্ট করাইয়াছে বলিয়া মনে হয়। ভাষা বিন্যাসের সংযত রূপ সত্ত্বেও যেন তাঁহার কয়েকটি ভালো কবিতার শেষ-রক্ষা হয় নাই।

বিজয় বাবু অনেকটা প্রাচীন রীতির পথানুসারী; তাঁহার অক্ষর বৃত্ত ছন্দের কবিতাগুলি পড়িলে কবি নবীন সেনের কবিতার পদগুলি মনে আসে—

"লক্ষ্মী পূর্ণিমার উষা ধীরে ধীরে ধীরে—
…প্রভাসের তীরে বসি কৃষ্ণ-ধনঞ্জয়
শিলাসনে ধ্যানমগ্ন।"

বাংলা কাব্য সাহিত্যের পূর্ব্বাকাশে যে নবারুণ-রশ্মি দেখা যাইতেছে, যে [illegible] বোধহয় তাহা [illegible]।

উৎকৃষ্ট কাব্য-পাঠের অনুশীলন করিতে করিতে অবহিত সাধনায় কবি বিজয়মাধব উত্তর কালে নিঃসংশয়ে যশস্বী হইবেন—একথা আমরা তাঁহার বৈজয়ন্তী পাঠ করিয়া বুঝিতে পারিয়াছি।

শ্রীহেমচন্দ্র বাগচী

ভ্রমণের নেশা—শ্রীমণীন্দ্র নাথ মুখুজী। প্রকাশক মেসার্স এম, সি, সরকার এণ্ড সন্‌স্ কলিকাতা।

বাঙালীর ছেলেদের যে Adventure স্পৃহা কতখানি, ঘোর বিপদের মাঝেও তাঁরা যে চিত্তের ধৈর্য্য, সাহস ও বুদ্ধি হারান না; সর্ব্বোপরি পরিহাস-রস-পিপাসা যে তাঁদের মনে পরিপূর্ণ-রূপে উচ্ছ্বলিত থাকে, পুস্তকখানি তার একটী চমৎকার উদাহরণ।

কয়েকটি বাঙালীর ছেলে বাইসাইকেলে কলিকাতা হইতে চিল্কা, পুরী, দার্জ্জিলিং, বারাণসী, ভারতের সুদূর উত্তর-পশ্চিম প্রান্ত ও কাশ্মীর ভ্রমণ করেন। ইহাতে ভ্রমণের আনন্দটুকু যেমন পরিপূর্ণ ভাবে ইঁহারা ভোগ করিয়াছিলেন, তেমনি আবার বিপদ ও বিপত্তির মাঝেও পড়িয়া ছিলেন কম নয়। পুস্তকে পথের ও বনের সৌন্দর্য্য বর্ণনায় মন যেমন উধাও হইয়া চলে তেমনি আবার আঁধার রাতে বাঘের জ্বলন্ত চোখ, বনের ধারে মত্ত করীর দল ও গাছের ডালে দোদুল্যমান অজগরের কথায় থমকিয়া দাঁড়ায়। বর্ণনা-ভঙ্গী ও দৃশ্য-বৈচিত্র্যে পুস্তকখানি বার বার পড়িয়াও আশা মিটে না।

এই-তো গেল এক দিক। আর একটী দিক, যেটিকে আমরা বাঙালীরা উপেক্ষা করিয়া চলি—ইঁহাদের নিয়মানুবর্ত্তিতা। এই গুণটি যে সকল কাজের ধারা সুনিয়ন্ত্রিত করে, এই-কথাটি সম্যক্ বুঝিয়া ইঁহারা কয়েকটি অতি সাধারণ ও সহজ নিয়মে নিজেদের সুশৃঙ্খলিত করিয়া চলিয়াছিলেন। সেই কারণেও বোধ করি ঘোর বিপদ ও বিপত্তি ইঁহাদের পক্ষে কাটাইয়া উঠা সম্ভব হইয়াছিল। পুস্তক-শেষে যে পথ ধরিয়া ইঁহারা ভ্রমণ করিয়াছিলেন, তার চমৎকার একখানি মানচিত্র আছে যাহা পদ-চারী বা মোটর-চারী-সকলের পক্ষেই বিশেষ প্রয়োজনীয় বলিয়া মনে হয়। পথের বিশেষ বিশেষ স্থানের অনেকগুলি ছবিও আছে।

পুস্তকখানি বিশেষ করিয়া প্রত্যেক কিশোর ও যুবকের পাঠ করা উচিত। এবং ইহা ঘরে রাখিবার মত সামগ্রী। ছাপা ও কাগজ ভাল; কাপড়ে বাঁধা প্রচ্ছদ পটে ভ্রমণকারীদের সজ্জের—ক্যালকাটা হুইলার্স—একটী নিদর্শন আছে। মূল্য মাত্র দেড় টাকা।

মিলন

বিদ্যাসুন্দর

শিল্পী— চারু সেনগুপ্ত

৮ম বর্ষ | আষাঢ়, ১৩৩৮ | ৩য় সংখ্যা

মহাত্মা গান্ধী ও বর্ত্তমান সভ্যতা

শ্রীভারত কুমার বসু

—প্রবন্ধ—

মহাত্মা গান্ধী ভারতের বস্তুতান্ত্রিকতার একান্ত বিরোধী ; অর্থাৎ, তিনি মোটেই চান না যে, পাশ্চাত্য সভ্যতার দ্বারা অন্ধ হ'য়ে ভারতবর্ষ তার প্রাচীন সভ্যতাকে হারায়। তাই তিনি বলেন, "মিল্," রেলপথ, মোটর ইত্যাদি ইত্যাদির কোনোই দরকার নেই এখানে। এস্থলে এই রকম প্রশ্ন ওঠা খুবই স্বাভাবিক যে, মোটর-ইত্যাদির দ্বারা ভারতবাসীদের তা হ'লে কি কোনোই সুবিধা-স্বাচ্ছন্দ্য হচ্ছে না? এর উত্তরটি-ই আলোচনা করা হবে :—

প্রথমতঃ জানা উচিৎ, মোটর-ইত্যাদি প্রধানতঃ কাদের সুবিধার জন্ত সৃষ্ট হ'য়েছে?—নিঃসন্দেহে ধনীদের জন্ত ;—গরীবদের জন্ত নয়। মহাত্মা গান্ধী বার্‌বার্ ঐ গরীবদের কথাই উল্লেখ করেন। বর্ত্তমান-সভ্যতা আমাদের দেশকে যে কত উন্নত ক'রেছে, তার প্রকৃত পরিচয় পেতে হ'লে, প্রত্যেক দরিদ্র-পল্লীতে ভাল ক'রে ঘুরে আসা দরকার। মহাত্মা গান্ধী তাঁর জীবনের অনেকগুলি দিন এই দরিদ্র-পল্লীতে কাটিয়ে যথেষ্ট ব্যক্তিগত অভিজ্ঞতা সঞ্চয় ক'রেছেন। তিনি গরীবের চির-বন্ধু। গরীবদের জন্ত তাঁর গৃহ-দ্বার সদাই উন্মুক্ত। এইজন্যই, গরীবের ব্যথা কোথায়, ধনীরা তা না জানলেও, মহাত্মাজীর কাছে তা অজানা নেই। তিনি আরও জানেন যে, ভারতবর্ষে ধনীর চেয়ে গরীবের' সংখ্যাই বেশী। সুতরাং গরীবদের উন্নত করা মানেই ভারতের উন্নতি করা।

বর্ত্তমান সভ্যতা হয়ত আপত্তি তুলে ব'লতে পারে যে, মোটর-ইত্যাদি এখানে চ'লবে না কেন? কিন্তু এর উত্তরে, কোটি-কোটি অভাব-ক্ষুণ্ণ অর্দ্ধোপবাসী গরীবের কণ্ঠ সাড়া দেবে, "আগে আমাদের অনাহার থেকে বাঁচাও! তারপর তোমার বিলাসিতা!"—নিরন্ন দুঃখীর আত্মা যেখানে অশ্রু ফেলছে, সভ্যতার ধনিক-বাদ সেখানে কতখানি অপরাধী, সে-কথা একটু ভেবে দেখলেই বুঝতে পারা যাবে। এবং যত দিন পর্য্যন্ত এই ধনিক-বাদ দেশে বর্ত্তমান থাকবে, গরীবের দুঃখও ততদিন একটুও ক'মবে না ; রাস্কিন, টলষ্টয়, রোমাঁ রোলাঁ, এইচ্. জি, ওয়েলস্,

আনাটোল্ ফ্রাঁস্ প্রভৃতি চিন্তাশীল ব্যক্তিদেরও এই ধারণা এবং বিশ্বাস।......

বর্ত্তমানে পৃথিবীর যে-কোনো দেশের বিষয় আলোচনা ক'রতে গেলে, কেবল যে এই জানতে পারা যাবে যে, ধন-তান্ত্রিক সভ্যতা সেই দেশে যথেষ্ট গোলযোগের সৃষ্টি ক'রেছে, তা নয়। জানতে পারা যাবে যে, উক্ত সভ্যতা একমাত্র বিংশ শতাব্দীতেই জন্ম গ্রহণ করেনি ;—তা ক'রেছে বহু—বহু বছর আগেই। ক্ষয়, ধ্বংস এবং মৃত্যুকে পিছনে-আনা রোগের মতো উক্ত সভ্যতা এক কালে সারা পৃথিবীতে ছড়িয়ে পড়েছিল। মিশর-দেশের ফ্যারাও-'সভ্যতা' ইতিহাস প্রসিদ্ধ। এই সভ্যতা একদিন যখন মিশরের নির্দ্দিষ্ট কতিপয় ব্যক্তির জন্য স্বাচ্ছন্দ্য ও বিলাসিতার পথ প্রশস্ত ক'রে দিয়েছিল, সেই সময়ে সেই-খানকার-ই অবিশিষ্ট অসংখ্য লোক জীবিকার জন্য মাথার ঘাম পায়ে ফেলতো এবং প্রত্যহ প্রায় অনাহারেই থাকতো। এই সময়েই সেখানে অভ্যুথান হয়েছিল—গরীবের বন্ধু এক মহাপ্রাণ ব্যক্তির। নাম তাঁর মুশা (Moses)। ফ্যারাও-রাজতন্ত্রের প্রতি অসাধারণ ঘৃণা নিয়ে তিনি তথা-সভ্যতা'র বিরুদ্ধে দাঁড়ালেন। উৎপীড়িত হিব্রুদের উন্নতি ও মুক্তি বিধান করাই তাঁর জীবনের এক-মাত্র উদ্দেশ্য হ'লো। এইজন্যই, বর্ত্তমান কালে ফ্যারাও-দের নাম বিস্মৃতির গর্ভে ডুবে গেলেও, আজও পর্য্যন্ত কি-খৃষ্টান, কি-মুসলমান—উভয় ধর্ম্মাবলম্বীদের-ই কাছে ঈশ্বরের প্রেরিত ব'লে এক ব্যক্তি যার-পর-নাই শ্রদ্ধা ও সম্মান পান। বাইবেলে এই পুণ্যাত্মার-ই সম্বন্ধে লেখা আছে :—

"বয়স্থ হবার পর মুশা ঈশ্বরের প্রতি বিশ্বাস নিয়ে ফ্যারাও-র দৌহিত্র ব'লে অভিহিত হ'তে চাইলেন না। পাপের আনন্দ উপভোগ করার চেয়ে তিনি বরং ঈশ্বরের সৃষ্ট মানুষদের সঙ্গে অনাচার সইতে চাইলেন। ঈশ্বরের প্রতি বিশ্বাস নিয়ে তিনি মিশর ত্যাগ ক'রলেন। রাজার ক্রোধের জন্য তিনি ভয় ক'রলেন না, কারণ, যে-মহাপুরুষ লোক-লোচনের অন্তরালে অবস্থান ক'রছেন তাঁর-ই দেখা পাবার জন্য তিনি ধৈর্য্য ধ'রেছিলেন।"

আর-একটা দৃষ্টান্ত ধরা যাক। দরিদ্র প্রজাদের প্রতি অবহেলা করার জন্য রোম্যান্ সাম্রাজ্যের পতন হ'য়েছিল। এবং এ-পতনের একমাত্র কারণ, ব্যাবিলন্ ও মিশর-দেশের সভ্যতার মতো উক্ত সাম্রাজ্যের সভ্যতা-ও অসংখ্য শ্রমিক ক্রীতদাসের অশ্রু এবং রক্তের ওপর প্রতিষ্ঠিত হ'য়েছিল। রোম্যান্ সাম্রাজ্যে অল্প-সংখ্যক লোক-ই স্ফটিক-ভবনে বিভিন্ন প্রকারের আমোদ-সুখ উপভোগ ক'রতো। ক্রীতদাসেরা তাদের হাতের কাছে রাতদিন-ই থাকতো—আদেশের অপেক্ষায়। কিন্তু সেই সময়ে সাম্রাজ্যের দরিদ্র ব্যক্তি যারা, তাদের রুটির টুকরো খেয়েই সন্তুষ্ট থাকতে হ'তো। নেপ্‌ল্‌স্-উপসাগরের তীরে পম্পিয়াই ও হার্কিউলেনিয়ামের সমুদ্র-তীরস্থ ভবনে প্রাচীন রোমের লক্ষপতিরা সম্পদ ও পাপ-কার্য্যের জাঁক-জমকে ফেটে প'ড়তো। ঠিক এই সময়েই দূরস্থ জুডা-প্রদেশে একটি মহা-মানব কৃষকের অভ্যুত্থান হয়। নাম তাঁর যিশু,—নাজারেথের যিশু। গ্যালিলি-সাগরের তীরে ধন-গর্ব্বিত গ্রীসো-রোম্যান্ সহরগুলির মধ্যে মনুষ্যত্ব-ধ্বংসকারী এই সভ্যতার পরিচয় পেয়ে, তিনি তাঁর দুঃখ এইভাবে জানালেন :—

"হায় বেথ্‌সাইদা! হায় কেপার্‌নেয়াম্! আকাশ-স্পর্শী প্রাসাদ নিয়ে তোমরা কি উন্নত হ'য়েছ? নরকে তোমাদের অধঃপতন হবে!"

স্বর্ণ, স্ফটিক, বিলাসিতা এবং উৎসব-প্রধান দেশগুলির দিক থেকে মুখ ফিরিয়ে যিশু শেষে গরীবদের প্রতি তাঁর সহানুভূতি ও শান্তির বাণী দিলেন :—

"এস, যত শ্রমিক! এস যত ব্যথাতুর! এস আমার কাছে! আমি তোমাদের শান্তি দেবো! তোমরা আমার ভার নাও এবং আমার কাছে দীক্ষা নাও! আমার অন্তঃকরণ সরল ও বিনম্র। তোমরা অন্তরে শান্তি পাবে।"

যিশুর এই বাণীতে দৈহিক স্বাচ্ছন্দ্যের ইঙ্গিত ছিল না ;—ইঙ্গিত ছিল—আত্মিক আনন্দের। যিশু তাঁর শিষ্যদের বললেন, তারা যেন ঈশ্বরের পূজা করবার সুযোগ খোঁজে এবং অন্তরের সঙ্গে ঘৃণা করে "ম্যামন্‌কে" অর্থাৎ, উপরোক্ত সম্পদ-গর্ব্বিত বিলাসী সহরগুলির আরাধ্য ধন-দেবতাকে। অক্ষুণ্ণ মনুষ্যত্ব সম্বন্ধে যিশুর যা-আদেশ, তা তিনি বুঝিয়ে দিলেন এই কটী বাণীর সাহায্যে :—

"মাঠের ওই পদ্মফুলগুলি কি-ভাবে জ'ন্মেছে, সে-কথা একবার ভেবে দেখ'! তারা পরিশ্রম করে না, সুতা-ও কাটে না। তবুও আমি তোমাদের ব'লছি যে, সলোমন

(Solomon) তার সমস্ত গৌরব নিয়ে থাকলেও, ওদের একটার মতন-ও তার পরিচ্ছদ ছিল না। সুতরাং, ঈশ্বর যদি মাঠের তৃণকে ওই রকম পরিচ্ছদ দেন, যে-তৃণ আজ আছে, কিন্তু কাল-ই উনুনের মধ্যে যাবে, তা হ'লে, হে নাস্তিকের দল! তিনি তোমাদের আর কত বেশী পরিচ্ছদ দেবেন? সুতরাং, আমরা কি খাবো, কি পান ক'রবো, অথবা, কোথা থেকে পরিচ্ছদ পাবো, এ-সব কথা ব'লে ব্যস্ত হ'য়ো না!...ঈশ্বরের রাজত্বের খোঁজ করো! তাঁর ন্যায়-নিষ্ঠার অনুসন্ধান করো! তা হ'লেই, উক্ত জিনিষগুলি তোমরা পাবে!"

—যিশুর মুখ থেকে এই কথাগুলি উচ্চারণ হবার কিছুদিনের মধ্যেই রোম্যান্-সাম্রাজ্য ধূলিতে মিশিয়ে গেল। বড়-বড় রোম্যান্ সম্রাটদের নাম আজকাল বিস্মৃতির অতল তলে তলিয়ে গেছে। কিন্তু আজও পর্য্যন্ত সেই সময়কার এক ব্যক্তির নাম ইতিহাসের পৃষ্ঠায় উজ্জ্বল অক্ষরে ফুটে আছে—অমর হ'য়ে। পৃথিবীর এ-পার হ'তে আরম্ভ ক'রে ও-পার পর্য্যন্ত প্রত্যেক দেশের প্রত্যেক লোক-ই তাঁকে অন্তরের সঙ্গে শ্রদ্ধা করে, সম্ভ্রম করে, ভক্তি করে—দেবতার মতো। দেবতাত্মা এই মহা-মানব-ই ছিলেন—নাজারেথের সেই দরিদ্র-বন্ধু কৃষক—খৃষ্ট,—যিশু খৃষ্ট। মানুষের কাছে তিনি-ই ঈশ্বরের অভিপ্রায় প্রচার ক'রেছিলেন।...

আর-একটী দৃষ্টান্ত ধরা যাক :—

বাইজ্যান্টাইন্-সাম্রাজ্যও "সভ্যতা"র চরমে উঠেছিল। এর রাজধানী ছিল আড়ম্বরপূর্ণ সহর কন্‌ষ্ট্যান্টিনোপ্‌লে। এর বাণিজ্য-কেন্দ্র ছিল এ্যালেক্-জেণ্ড্রিয়া ও এ্যান্টিয়ক্-নামক স্থানে। এক-হাতে সম্পদ এবং আর-এক হাতে গরীবের রক্ত নিয়ে এই সাম্রাজ্যের "সভ্যতা" গ'ড়ে উঠেছিল। ঠিক এই সময়েই সুদূর আরব্যে এক মানব-ঋষির অভ্যুত্থান হয়। প্রকৃতির উন্মুক্ত হাওয়ার মধ্যে দারিদ্র্যকে বন্ধু ক'রে সমস্ত প্রকার বিলাসিতাকে তিনি দূরে রেখেছিলেন। ত্যাগী ফকির এই মহাত্মার নাম-ই মহম্মদ,—ইস্‌লাম্-ধর্ম্মের হজরৎ মহম্মদ। অনেকেই বিস্ময় প্রকাশ ক'রে থাকেন যে, সিরিয়া ও মিশর-বিজয়ের জন্ত আরবেরা অত চমৎকারভাবে তাদের অভিযান সুরু ক'রেছিল কি ক'রে! কিন্তু এতে বিস্ময়ের কিছু নেই। কারণ, তাদের জীবনের সারল্য, পরিশ্রমের সময়ে হাসি-মুখে তাদের সহগুণ, ঈশ্বরের প্রতি বিশ্বাস নিয়ে তাদের পরস্পরের প্রতি ভ্রাতৃভাব, বাইজ্যান্টাইন্-সভ্যতার বিলাসিতা হ'তে তাদের বিরতি এবং দরিদ্র-পীড়নের অনিচ্ছা—এই জিনিষগুলির মধ্যেই তাদের চরিত্র-গত বিশেষত্ব এবং আদর্শের পবিত্রতা লুকিয়ে ছিল। তারা সিরিয়া ও মিশর জয় ক'রলে। কিন্তু জয় ক'রলে—দেশ-শাসন ক'রতে নয়,—দেশের লোককে মুক্তি দিতে।

সমস্ত পার্থিব সাহায্য ও আশা থেকে বঞ্চিত হবার পর হজরৎ মহম্মদ গুহার ভিতরে ধর্ম্মপ্রাণ আবু বক্‌র্-এর সঙ্গে একদিন যা কথা ক'য়েছিলেন, তা মনে রাখবার উপযুক্ত :—

আবু বক্‌র্ হজরত্‌কে বললেন, "আমরা দুজনে এক পাশে প'ড়ে রইলুম।"

হজরৎ মহম্মদ বললেন, "না, ঈশ্বর আমাদের সঙ্গে আছেন। তিনিই তৃতীয় ব্যক্তি।"

মহম্মদ ব'লতে চেয়েছিলেন যে, মানুষের সত্যকার শক্তি পৃথিবীর জড়-সম্পদের মধ্যে থাকতে পারে না। তা থাকে—অ-পার্থিব আশীর্ব্বাদের মধ্যে, যে-আশীর্ব্বাদ ঈশ্বর নিজের হাতে সর্ব্বদাই বর্ষণ ক'রছেন। মানুষের সমস্ত স্বাচ্ছন্দ্যের দূরে, পরমেশ্বরের পূজার মধ্যে এমন একটী বড় সম্পদ আছে, যা বাইরেকার কোনো জিনিষই এনে দিতে পারে না। বাহ্যিক সুখ-স্বাচ্ছন্দ্য যেদিন বিদায় নেবে এবং মানুষের আত্মা যেদিন মুক্ত হবে, সেদিন মানুষ যে কী পবিত্র বায়ু নিঃশ্বাসে গ্রহণ ক'রবে, বর্ত্তমান সভ্যতার স্বাচ্ছন্দ্যের আবহাওয়ার মধ্যে তা ধারণা করা যায় না। 'বোধি'-বৃক্ষের তলে বুদ্ধের ত্যাগ,—গুহার মধ্যে মহম্মদের সাধনা,—এগুলি দ্বিতীয় বারের জন্য পৃথিবীতে আত্ম-প্রকাশ করে খুব কম। এবং এই প্রকাশের মধ্যে যে-প্রেরণা, যে-শক্তি ঘুমিয়ে থাকে, তা অনন্ত।...

এরই অন্তর্নিহিত সত্যটাকে মহাত্মা গান্ধী চিনেছেন এবং তারই কথা তিনি প্রচার ক'রছেন—সম্পূর্ণ এক অশ্রুতপূর্ব্ব উপায়ে। নাজারেথের যিশুর মতোই যেন তাঁর বাণী সমান গাম্ভীর্য্যে ফুটে উঠছে,—"তোমরা ঈশ্বর এবং ম্যামনের (ধন-দেবতার) পূজা ক'রতে পারবে না!" —"ঈশ্বর ত আমাদের সঙ্গেই আছেন।"—"আগে ঈশ্বরের রাজ্যের অনুসন্ধান করো!"—ধর্ম্ম-নিষ্ঠার প্রত্যেক যুগই

সত্যের এই স্বর্গীয় বাণীকে জাগ্রত শক্তির দ্বারা মানুষের অন্তরের কাছে এনে দেয়। যাঁরা সমস্ত জিনিষ ত্যাগ ক'রে এই সত্যের বাণীকে একান্তভাবে গ্রহণ করেন, তাঁদের প্রায়ই 'উন্মাদ' ব'লে উপহাস করা হ'য়ে থাকে। স্বাচ্ছন্দ্য-ভোগী জগতের কাছে যারপর নাই "নির্ব্বোধ" ব'লে তাঁরা আখ্যা পান। কিন্তু তাঁদেরই এই "নির্ব্বুদ্ধিতা" ঈশ্বরের সেই "নির্ব্বুদ্ধিতার" সঙ্গে সমান, মানুষের বুদ্ধির গর্ব্বকে যা ধূলির সঙ্গে মিশিয়ে দিতে পারে। এবং তাঁদের "দুর্ব্বলতা," ঈশ্বরের সেই "দুর্ব্বলতার" সঙ্গে সমান, মানুষের দাম্ভিকতার তেজকে যা ধ্বংস ক'রে দিতে পারে। মহাত্মা-সাধুদের সম্বন্ধে প্রত্যেক জাতিরই ধর্ম্ম-পুস্তকে লেখা আছে :—"ঈশ্বরের প্রতি তাঁরা বিশ্বাস রাখেন।···ঈশ্বরই তাঁদের শক্তি।"—লোক-লোচনের অন্তরালে সেই পরম-পুরুষের সাক্ষাৎ পাবার জন্যই এই মহাত্মারা কী কষ্টই না সহ্য ক'রে থাকেন!···এইতেই ভগবদ্ভক্তি প্রকাশ পায়। মহাত্মা গান্ধী, কথার দ্বারা নয়, কাজের দ্বারা এই পবিত্র ভক্তির বাণীই প্রচার ক'রছেন,—"ঈশ্বরের অস্তিত্বকে স্বীকার করো! তাঁর উপর নির্ভর করো! তাঁকে বিশ্বাস করো!"—এই বিশ্বাসের দ্বারাই মুশা, মহম্মদ, বুদ্ধ কিম্বা যিশুকে শ্রদ্ধা ক'রতে পারা যাবে, এবং তাঁদের কার্য্যকে আর "উন্মত্ততা" ব'লে অপমান করা যাবে না। সঙ্গে সঙ্গে এটাও মনে থাকবে যে, পৃথিবীর ইতিহাস তাঁদের 'উন্মত্ততা'কেই সার সত্য ব'লে প্রমাণ করে দিয়েছে!···

রোম-দেশের মতো গরীবের রক্তলেহী সভ্যতার অস্তিত্ব ভারতে থাকা মনেই, রোমের সেই স্মরণীয় দুরদৃষ্টের সম্ভাবনা এখানে আশা করা নয় কি?···এইজন্যই, কৃত্রিমতা-পুষ্ট বর্ত্তমান যুগের বিষাক্ত আবহাওয়া থেকে মুক্তি পাবার জন্য ঋষি-গান্ধীজীর পুণ্যাত্মা যেন ছুটে যেতে চাইছে ঠিক সেইখানে, যেখানে মরুভূমির উন্মুক্ত বাতাস—মহম্মদের সারল্য ও দেব-ভক্তিকে সযত্নে গ'ড়ে তুলেছিল;—যেখানে উদার আকাশের তলে গ্যালিলির মাঠের তৃণকে ধন্য ক'রে নাজারেথের যিশু তাঁর প্রথম-শিষ্যদের কাছে ঈশ্বরের মানব-প্রীতি সম্বন্ধে শিক্ষা দিয়েছিলেন;—যেখানে প্রাচীন ভারতের তপোবন-আশ্রমে মানবের অন্তরে সত্যকার আত্ম-প্রকৃতির বিকাশ হ'য়েছিল;—যেখানে বৌদ্ধ সন্ন্যাসীদের মঠে লোকেরা শিক্ষা ক'রতো—অনিষ্টের প্রতিদানে ইষ্ট দিতে এবং ঈশ্বরের সৃজিত সকলেরই প্রতি সহানুভূতি-সম্পন্ন হ'তে।

বর্ত্তমান-ভারতের বস্তুতান্ত্রিক সভ্যতায় মানুষ কি শিখছে? শিখছে কেবল কতকগুলি কু-আদর্শ। শিখছে কেবল গরীবের রক্ত-শোষণ করবার ঘৃণ্য কৌশল। এই শিক্ষার দ্বারা সরলতা, কোমলতা এবং সত্যের অপমান হচ্ছে, ক্ষয় হচ্ছে, ধ্বংস হচ্ছে।

বস্তুতান্ত্রিক সভ্যতার সাড়ম্বর বিলাসিতা যখন সুপ্রচুর মূল্যে এখানে ক্রয় করা হচ্ছে, অভাগা এই দেশের কত গরীব যে তখন নিরন্ন হ'য়ে ঈশ্বরের কাছে তাদের অশ্রু-সজল প্রার্থনা নিবেদন ক'রছে, কে তার গণনা ক'রবে? গরীবের বন্ধু মহাত্মা গান্ধী তা গণনা ক'রেছেন। এবং তা ক'রে রক্ত-লোলুপ উক্ত সভ্যতার প্রতি দারুণ ঘৃণায় মুখ ফিরিয়ে, অসহায়ের আশ্রয় সেই পরম-পিতার কাছে অ-মনুষ্যত্ব-ধ্বংসকারী ঐশ্বরিক শক্তির সাহায্য চাইছেন। ঈশ্বরের উদ্দেশ্যে যিশু-জননী মেরীর মুখ থেকে যে-কথা একদিন গঙ্গাজলের মতোই পবিত্র প্রেরণায় উচ্চারণ হ'য়েছিল, গান্ধীজীর সারা অন্তর যেন তারই পুনরাবৃত্তি ক'রে ব'লছে,—"আমার আত্মা সেই পরম-পিতার প্রশংসায় মুখর। আমার প্রাণ, আমার পরিত্রাতা পরমেশ্বরের ধ্যানে আনন্দ-বিভোর। তিনি আমার ক্ষুদ্রত্বকে মর্য্যাদা দিয়েছেন। তাঁর বাহুর দ্বারা তিনি শক্তি দেখিয়েছেন। গর্ব্বিত ব্যক্তিদের অন্তরের কল্পনাকে তিনি বিক্ষিপ্ত ক'রে দিয়েছেন। ক্ষুধার্ত্তদের তিনি সুখাদ্য দিয়েছেন, এবং ধনীদের তিনি ক'রেছেন নিঃস্ব!"

বিগত 'সভ্যতা' ও সাম্রাজ্যগুলির পতনের কারণ জানতে পারার জন্য, এবং উক্ত 'সভ্যতার' সেই প্রাচীন-পন্থী অসাধুতাকে বর্ত্তমান জগতে জয় করার জন্য, এবং প্রকৃতি-অনুগত মানব-জীবনের সরলতা ও সত্যকে চিনতে পারার জন্য, মহামানব গান্ধী আজ ভারতকে নবীন আশায় উদ্দীপিত ক'রেছেন। শক্তি তাঁর, আত্ম-বিশ্বাস! বন্ধু তাঁর—ভক্তির ভগবান!···

মহাত্মা গান্ধী-প্রার্থিত সরল এবং স্বাভাবিক জীবন একদিন অতীত-ভারতেরই সকলের চেয়ে বড় সম্পদ ছিল। তখনকার লোকেরা এই জীবনকেই ভালবাসতো,—বড় ভালবাসতো, এবং এর মধ্যেই সুখ পেতো, আনন্দ পেতো,

শান্তি পেতো। আক্রমণের ঝড় তাদের মাথার উপর দিয়ে যতই ব'য়ে যাক না কেন, তারা আবার এই শান্তিময় জীবনের মধ্যে ফিরে আসতো। দেশের প্রত্যেক নদী, সরোবর এবং পর্ব্বতকে তারা সশ্রদ্ধ প্রীতির চোখে দেখতো। জন্মভূমির মাটী তাদের কাছে কী পবিত্রই না ছিল। কত বিজেতা রাজাই তাদের দেশকে উপর্য্যুপরি বিধ্বস্ত ক'রে দিয়ে যেতো। কিন্তু তারা বরাবরই তাদের একান্ত-প্রিয় সারল্য-ভরা জীবন অবলম্বন ক'রে সুখী হ'তো, প্রীত হ'তো।···কিন্তু তাদেরই দেশ এই ভারতবর্ষ যেদিন থেকে পাশ্চাত্যের প্রভাবাধীন হ'য়ে প'ড়লো, সেইদিন থেকেই তাদের কোমল এবং সারল্যভরা জীবন আহত হ'য়ে প'ড়লো। এইজন্যই, আধুনিক বস্তুতান্ত্রিক শক্তির দ্বারা প্রাচীন ভারতের হাতে-তৈরী যে-বস্ত্রশিল্প ধ্বংস হ'তে চ'লেছে, তাকে রাহু-গ্রাস থেকে বাঁচাবার জন্য মহাত্মা গান্ধী যে রকম আ-প্রাণ চেষ্টা ক'রছেন, ঠিক সেই রকমই তিনি চেষ্টা ক'রছেন—আধুনিক বস্তুতান্ত্রিক শিক্ষার দ্বারা প্রাচীন ভারতের প্রায়-ধ্বংসশীল কোমল ও সরল জীবনকে বাঁচিয়ে তোলবার জন্য। তাঁর এই পবিত্র প্রচেষ্টাকে, ঘৃণ্য মনোবৃত্তিযুক্ত কোনো কোনো লোক যে অবাঞ্ছনীয় স্পর্দ্ধায় উপহাস ক'রছেন না, তা নয়। তাঁরা "গান্ধী টুপী"কেও আক্রমণ ক'রতে কিছুমাত্র দ্বিধা বোধ করেন না। এমন কি, তাঁদের মধ্যে এক ব্যক্তি (ব'লতে ঘৃণা হয় যে, ইনি ভারতের বুকে জন্মগ্রহণ ক'রে, ভারতেরই অন্নজলে বর্দ্ধিত এবং পুষ্ট হ'য়েছেন। ইনি হিন্দু এবং ডাক্তার।) এ রকম কথাও লিখতে (১৯২১ সালের একখানি ইংরাজী পত্রিকায়) কিছুমাত্র লজ্জা বোধ করেন নি যে, "গান্ধীর সাধারণ-তন্ত্রের জগৎ হচ্ছে টলষ্টয়ের সাধারণ-তন্ত্রের জগতের মতো। তার মধ্যে প্রত্যেক লোক, জঙ্গলের সুখী, বুনো জন্তুর মতো প্রকৃতির অবস্থায় বসবাস করে।"

"জঙ্গলের সুখী, বুনো জন্তুর মতো"—এই ঘৃণ্য কথাগুলো ভারতবাসীর পক্ষে অত্যন্ত অপমানকর। এই অপমানকর কথাগুলোর সার্থকতা কোথায়, তা বিচার করবার প্রয়োজন এখানে নেই। উক্ত শ্রেণীর লেখকদের কাছে, মহাকবি গ্যেটের দ্বারা উচ্চ-প্রশংসিত কালিদাস-লিখিত "অভিজ্ঞান শকুন্তলম্"-এর তপোবন-আশ্রমের পবিত্র, স্নিগ্ধ চিত্র কি-রকম বরদাস্ত হবে, তা জানবারও দরকার নেই। এখানে শুধু এইটুকু ব'ললেই যথেষ্ট হবে যে, লক্ষ্মণকে সঙ্গী ক'রে, সীতাকে নিয়ে অরণ্যের মধ্যে রামের নির্ব্বাসিত জীবনের কাহিনী, প্রত্যেক ভারতবাসীর প্রাণে বন-আশ্রম-জীবনের যে-মধুর আদর্শটিকে এনে দেয়, তা অতুলনীয়। এই আদর্শকেই মহাত্মা গান্ধী ভালবাসেন। এ-ভালবাসাকে তিনি কাজের দ্বারা গৌরবান্বিত ক'রতে চান। এদিক দিয়ে তাঁর প্রথম প্রচেষ্টা—দক্ষিণ আফ্রিকার জোহানেস্‌বার্গ্ থেকে একুশ মাইল দূরস্থ একটী স্থানে তাঁর প্রতিষ্ঠিত "টলষ্টয়-আশ্রম"। বাস্তবিকই এই আশ্রম যেন টলষ্টয়ের-ই চিন্তা-ধারার অনুপ্রেরণায় উদ্দীপিত ছিল। সরল জীবন-যাত্রা এবং উন্নত চিন্তাই ছিল এই আশ্রমের আদর্শ। মহাত্মা গান্ধী তখন জোহানেস্‌বার্গে আইন-ব্যবসা ক'রতেন। কিন্তু আধুনিক সহরের তথা-কথিত সভ্যতা তাঁর কাছে স্রেফ্ ফাঁকা এবং মূল্যহীন ব'লেই প্রতিপন্ন হ'লো, এবং হিন্দুর আদর্শ অনুযায়ী, সে-সভ্যতাকে তিনি অপরাধী ব'লেই মনে ক'রলেন। এরপর-ই তাঁর কর্ত্তব্য সুরু হ'লো। দক্ষিণ আফ্রিকার অনেক উচ্চ-শিক্ষিত এবং স্বাচ্ছন্দ্য-ভোগী ব্যক্তিরা পর্য্যন্ত এসে, "টল্‌ষ্টয়-আশ্রমে" তাঁর সঙ্গে লাঙ্গল ধ'রলেন এবং জমি চাষ ক'রতে লাগলেন। সঙ্গে সঙ্গে তাঁরা সকলেই রেল ও অন্যান্য বিলাসিতা-ও বর্জ্জন ক'রলেন।

মহাত্মা গান্ধী তাঁর দ্বিতীয় আশ্রমের প্রতিষ্ঠা করেন—নেতালের মধ্যে ফিনিক্স-নামক স্থানে। চারিদিকে সুন্দর পাহাড়-ঘেরা এই আশ্রমটীর কাছেই সাগর ব'য়ে গেছে। বাণিজ্য-প্রধান আধুনিক সহর ডারবানে-র কর্ম্ম-কোলাহল হ'তে প্রায় ১৩ মাইল দূরে, ধ্যান-মগ্ন তপস্বীর মতো শান্তি ও সুচিতা ছড়িয়ে এই আশ্রমটী অবস্থিত। আশ্রমটীর সীমানার মধ্যে অত্যন্ত সাধারণ কতকগুলি বাস-ভবন মাথা তুলে দাঁড়িয়ে আছে। প্রত্যেক বাড়ীর সঙ্গে চাষের জন্য জমি সংযুক্ত। মাঝখানকার বাড়ীটী কেবল সৎ গ্রন্থের পাঠাগার। এই পাঠাগারের মধ্যে উপাসনার কাজও হ'য়ে থাকে। কিন্তু এ-আশ্রমের সকলের চেয়ে সুন্দর এবং পবিত্র জিনিষ—সাম্য-ভাব।···শ্বেতাঙ্গী না হওয়ার জন্য নেতালের "জুলু"-মেয়েরা খৃষ্টীয় গির্জ্জায় প্রবেশাধিকার পেতো না। কিন্তু মহাত্মা গান্ধীর আশ্রম ছিল শান্তি ও প্রেমের স্বর্গ। সেখানে মানুষ এক। জাতিগত কিম্বা

ধর্ম্মগত পার্থক্য সেখানে নেই। "জুলু"-মেয়েদের জন্য সে-আশ্রমের দুয়ার নিত্য-উন্মুক্ত থাকতো।

মহাত্মা গান্ধীর তৃতীয় আশ্রম—সবরমতি। কারখানার ধোঁয়ায়-ভরা, কর্ম্ম-কোলাহল-মুখর আধুনিক সহর আমেদাবাদের অনতিদূরেই এই আশ্রমটী প্রতিষ্ঠিত। এইখানে দুটী পরস্পর-বিরোধী জিনিষ লক্ষ্য করবার মতো। একদিকে নিষ্ঠুর কারখানা-দানবের কবলে কত-শত পুরুষ ও নারী জীবন্মৃত হ'য়ে নিরানন্দ দিনগুলি কাটাচ্ছে;—আর একদিকে, স্নিগ্ধ, পবিত্র, শীতল-সলিলা সবরমতি-নদীর তীরে হাতের সাহায্যে কত নীরবে সুশৃঙ্খলার সঙ্গে চরকায় সুতা-কাটা চ'লেছে—কী স্বাভাবিক এবং আন্তরিক আনন্দের অনুপ্রেরণার ভিতর দিয়ে। এই সবরমতি-আশ্রমে লোকে কৃষি, মাতৃভাষা, হিন্দী-ভাষা ইত্যাদি ইত্যাদি বিষয়ের শিক্ষা পায়। উপাসনার সময়ে "গীতা"র গুঞ্জন প্রত্যহ এখানকার আকাশ-বাতাসকে পবিত্র করে, ধন্য করে। এখানেও প্রেমের সেই সাম্য ভাব, এবং সারল্য ও শ্রম-মর্য্যাদার প্রতি বিশ্বাস অটল হ'য়ে আছে। এখানেও প্রকৃতির সান্নিধ্যে জীবন-যাত্রা অভিপ্রেত, এবং সমস্ত প্রকার বিলাসিতা পরিত্যজ্য। তার একমাত্র কারণ, প্রকৃতি দেয় আত্মিক শিক্ষা, কিন্তু বিলাসিতা দেয়—মানুষের কাছ থেকে মানুষকে বিচ্ছিন্ন করবার এবং সত্যকার ভ্রাতৃভাবকে বিনষ্ট করবার কু-শিক্ষা।...

অহিংসার উপর প্রতিষ্ঠিত সবরমতি-আশ্রমের অর্থাৎ মহাত্মা গান্ধীর উপরি-উক্ত পবিত্র আদর্শকে যাঁরা "জঙ্গলের সুখী, বুনো জন্তুর" জীবনের সঙ্গে তুলনা করেন, অর্থাৎ বিদ্রূপ করেন, তাঁদের এই ঘৃণ্য জঘন্য বিদ্রূপের কি-রকম বিচার হওয়া উচিৎ? তাঁদের ওই বিদ্রূপ কি একান্তভাবেই বিদ্বেষ, অথবা, গাত্রদাহ, অথবা, মনুষ্যত্বহীনতা, অথবা, নির্ব্বুদ্ধিতার পরিচায়ক নয়? প্রকৃতি-জীবনের সঙ্গে যে বন্য-জন্তুর জীবনের আকাশ-পাতাল পার্থক্য আছে, তা সদ্যজাত শিশু পর্য্যন্ত-ও জানে।...গান্ধীজীর উক্ত প্রকৃত প্রকৃতি-জীবনের মধ্যে দুঃখ নাই,—আছে ত্যাগের আনন্দ, ধ্যানীর সুখ, আত্মিক তৃপ্তি।...গান্ধীজীর আদর্শ ধ্বংসকারী নয়,—তা রক্ষা করে। তাঁর আদর্শ ফাঁকা, অলীক স্বপ্ন নয়;—তা নূতন এবং পবিত্র এক জীবনের সাড়ায় শক্তিমান। এই নূতন জীবন আধুনিক সভ্যতাকে ঘৃণা করে, তার কাছ থেকে দূরে থাকতে চায় এবং ঈশ্বরের কাছে মনুষ্যত্বের প্রার্থনা করে।

আজ থেকে বহুদিন আগে ভারতের-ই এক শ্রেষ্ঠ মানব, ত্যাগী তপস্বী—স্বামী বিবেকানন্দ-ও পাশ্চাত্য সভ্যতাকে ঘৃণা ক'রতেন। তাই তিনি তাঁর মূল্যবান বাণী দিয়েছিলেন :—

"একদিকে, নব্য ভারত ব'লছেন, 'পাশ্চাত্য ভাব, ভাষা, আহার, পরিচ্ছদ ও আচার অবলম্বন ক'রলেই, আমরা পাশ্চাত্য জাতিদের মতো বলবীর্য্যবান হবো।'—অপর দিকে, প্রাচীন ভারত ব'লছেন, 'মূর্খ! অনুকরণের দ্বারা পরের ভাব নিজের হয় না। অর্জ্জন না ক'রলে, কোনো জিনিষ-ই নিজের হয় না। সিংহের চর্ম্মে ঢাকা হ'লেই কি গর্দ্দভ সিংহ হয়?'—একদিকে, নব্য ভারত ব'লছেন, "পাশ্চাত্য জাতিরা যা করে, তা-ই ভাল। ভাল না হলে, তারা এত প্রবল হ'লো কি করে?'—অপর দিকে, প্রাচীন ভারত ব'লছেন, 'বিদ্যুতের আলো অত্যন্ত প্রবল, কিন্তু ক্ষণস্থায়ী। বালক! তোমার চক্ষু প্রতিহত হচ্ছে, সাবধান!'—"

পাশ্চাত্য "সভ্যতার" কৃত্রিম আলোয় ভারতের স্বাভাবিকতা, ভারতের বৈশিষ্ট্য যাতে না আহত হয়, মহাত্মা গান্ধীও তাই ব'লেছেন, "এখনও সময় আছে, সাবধান!"—আত্মরক্ষার জন্য এই উপদেশ, শুধু ভারত কেন, অবনতির পথে নেমে-যাওয়া পৃথিবীর প্রত্যেক দেশের কাছেই অমূল্য।

লীলাশেষ

শ্রীযতীন্দ্র নাথ মিত্র এম্-এ

—গল্প—

ভাদ্র মাস। পূর্ণিমার পূর্ণ চন্দ্র ভাসা ভাসা মেঘের উপর এক এক বার আত্ম-প্রকাশ করিতেছিল এবং পর মুহূর্ত্তেই ত্রস্ত-পদা হরিণীর ন্যায় মেঘরাশির মধ্যে আত্ম-গোপন করিয়া ফেলিতেছিল। মর্ম্মর প্রস্তরের প্রাসাদস্থিত কেলিগৃহে সম্রাট স্বর্ণ-পালঙ্কের উপর উপবিষ্ট থাকিয়া নব-বিবাহিতা সম্রাজ্ঞীর রূপ-রাশির হিল্লোল দর্শন করিতেছিলেন। তখন রাত্রি এক প্রহর অতীত হইয়াছে। নিশাচরগণ ব্যতীত পৃথিবীর তাবৎ প্রাণীই নিদ্রা-দেবীর শান্ত-শীতল ক্রোড়ে আশ্রয় গ্রহণ করিয়া বিভোর। সম্রাটের চক্ষে কিন্তু নিদ্রার লেশ নাই। আজ কয়েক দিন হইল সারা বিশ্ব মন্থন করিয়া যে অনিন্দ্য-সুন্দরীর সন্ধান পাওয়া গিয়াছিল, সম্রাট তাহাকে দাম্পত্য-সূত্রে আবদ্ধ করিয়া তাঁহার স্বর্ণ বিমণ্ডিত প্রাসাদের জয়ধ্বজা হিসাবে বরণ করিয়া লইয়া আসিয়াছেন। কয়েক দিবস গত হইয়াছে, কিন্তু মোহের এখনও অবধি কোনই নিবৃত্তি হয় নাই। সুরার আবেশ আসিলে সমস্ত পৃথিবীকে যেমন রঙ্গিন করিয়া দেয়, এই রূপসীর রূপ সম্রাটের নিকট সেই-রূপ এক নব-সৌন্দর্য্যের বার্ত্তা বহন করিয়া আনিয়াছিল। সে সমস্ত রত্ন-রাজী তাঁহার নিকট অর্থহীন হইয়া ভারবহ-রূপে প্রতীয়মান হইতেছিল সেই সমস্ত রত্ন হঠাৎ কেমন মন-মাতানো আকর্ষণে সম্রাটের দেহ ও মন উভয়ই আকর্ষণ করিতে লাগিল। যে প্রাসাদ মাত্র কয়েক মাস পূর্ব্বে তাঁহার নিকট একরূপ অসহ্য হইয়া উঠিতেছিল, সেই প্রাসাদেই কে যেন মন্দার পুষ্পের গন্ধ বহিয়া আনিয়া তাকে পরম উপভোগ্য বস্তুতে পরিণত করিয়া দিল। যে সমস্ত সহচর তাঁহার নিকট বিদূষক মাত্র জ্ঞানে ঘৃণার পাত্র হইয়া উঠিতেছিল, তাহারা যেন হঠাৎ কি সম্মোহন মন্ত্রে পুনরুজ্জীবিত হইয়া পূর্ব্বকার পরমাত্মীয়ের সিংহাসন দখল করিয়া বসিল। কয়েকদিন হইতে রাজধানীতেও অবিশ্রান্ত উৎসব-স্রোত বহিয়া যাইতেছিল। রাত্রে প্রত্যেক গৃহ হৈম দীপে দীপান্বিত হইয়া অপূর্ব্ব আকার ধারণ করিতেছিল। নানা প্রকার পুষ্পদাম দিয়া নগরের তোরণ দ্বার-গুলি বিভূষিত হওয়ায় সমস্ত সহরে অমরাবতীর দেব-দুর্লভ সুগন্ধ উদ্ভাসিত হইয়া যাইত। নাগরিকগণের উচ্চহাস্যে, বিলাসিনীগণের বিবিধ সঙ্গীত আলাপনে, সন্ধ্যার অব্যবহিত পরেই সমস্ত নগর এক বিরাট কেলিগৃহে পরিণত হইয়া পড়িত।

সম্রাট দেখিতেছিলেন তাঁহার প্রিয়ার রূপ। তাঁহার মনে হইল যেন দেব-কল্পিত তিলোত্তমা আর কবির কল্পনার সামগ্রী নাই, মূর্ত্তি পরিগ্রহ করিয়া তাঁহার ভোগের জন্য সশরীরে অবতীর্ণা হইয়াছেন। সম্রাটের স্পষ্টই প্রতীতি জন্মিল যে শতদলবাসিনীর শ্বেত শুভ্র বর্ণের সহিত, বিষ্ণু-প্রিয়ার নিরবদ্য মুখ মণ্ডলীর অপূর্ব্ব সংযোগে এই অভিনব রূপের উৎস সৃষ্ট হইয়াছে। পদ-যুগলের প্রতি দৃষ্টি পড়ায় তাঁহার মনে হইল এই যে সুন্দরী এখন শায়িতা ও নিদ্রিতা কিন্তু ইতিপূর্ব্বে সে যখন নৃত্য করিতেছিল তখন তাহার হাব-ভাবের নিকট যে কোন সুর-সুন্দরী পরাস্ত স্বীকার করিত। মৃদুমন্দ পবন-তাড়িত অলক-রাজির দিকে দৃষ্টি পড়ায় সম্রাট স্তম্ভিত হইয়া গেলেন। সুন্দরীর কুন্তল দাম তাঁহার মনে হইল ভ্রমরের বর্ণ অপেক্ষাও কৃষ্ণ এবং বহুমূল্য রেশম অপেক্ষাও কোমল। ভুজ বল্লরী দুইটী বিবিধ রত্না-ভরণে সুশোভিত হইয়া এক অপূর্ব্ব শোভা ধারণ করিয়া-ছিল—তাহার যথার্থ রূপ প্রকাশের ভাষা না পাইয়া সম্রাট আত্ম-হারা হইয়া পড়িতেছিলেন। রূপ এবং ভোগ সম্রাটের নিকট মূর্ত্তিমন্ত হইয়া চতুর্দ্দিকে আত্ম-প্রকাশ করিয়াছিল।

কেলি-গৃহটী ক্ষুদ্র হইলেও বেশ প্রশস্তই ছিল। উহারই সন্নিকটে একটী গোলাপ জলের ফোয়ারা অনবরত বহিয়া যাইতেছিল। কেলি গৃহের বাহিরে রাণীর বয়স্যারা দণ্ডায়-মান হইয়া প্রবল বেগে ব্যজনী সঞ্চালন করিতেছিল তাহাতেই কেলিগৃহ মধ্যে বাতাসের ঢেউ খেলিয়া যাইতে-ছিল। হঠাৎ উদ্ভ্রান্ত চিত্তে সম্রাট সম্রাজ্ঞীকে বাহুপাশে

আবদ্ধ করিয়া মুখ চুম্বন করিলেন। প্রেমিকের দীর্ঘ নিশ্বাসে মহারাণীর নিদ্রা ভঙ্গ হইল! আপনাকে সম্রাটের বাহুপাশ মধ্যে আবদ্ধ থাকিতে দেখিয়া জিজ্ঞাসা করিলেন, "রজনী কয় প্রহর হইয়াছে?' লজ্জিত সম্রাট একটুখানি সঙ্কুচিত হইয়া বলিলেন, 'মহারাণী মাপ করিও, তোমার নিদ্রাভঙ্গ করিলাম। এখনও রজনী গাঢ়ই আছে, এইমাত্র এক প্রহর অতীত হইয়াছে।" রাণী একটুখানি বিস্ময় প্রকাশ করিয়া বলিলেন, "মহারাজ কি তবে জাগ্রতই আছেন?" সম্রাট একটু আত্ম-হারা ভাবে উত্তর করিলেন, "সত্য মহারাণী, তোমার রূপ আমাকে পাগল করিয়াছে, যতই ভোগ করি, ততই আকাঙ্ক্ষা বাড়িয়া যায়, দিবাভাগকে যদি রাত্রিতে পরিণত করিতে পারিতাম তা হইলে হয়ত আরও কত সুখী হইতাম। রজনী প্রভাতে আবার কার্য্য, চিন্তা, কর্ত্তব্য, কতকগুলা বিসদৃশ্য দৃশ্য আসিয়া দেখা দিবে, অপেক্ষা করিতে হইবে এই মধুর রজনীর জন্য। কিন্তু রজনীর ঘণ্টাগুলি দিনমান অপেক্ষা কত অল্প'।

মহারাণী হাসিলেন, কিন্তু কোন উত্তর প্রদান করিলেন না। তিনি রাজার চক্ষের উপর চক্ষু রাখিয়া দেখিলেন, সমগ্র ধরিত্রীর সম্রাট তাঁহার নিকট আজ কেমন ক্ষুদ্র বালকের ন্যায় সমাসীন হইয়া আছেন। নয়নে দারুণ ক্ষুধা, হৃদয়ে ভীষণ আকাঙ্ক্ষা, তাই মস্তিষ্কের কোন সত্বা পাওয়া যাইতেছে না। মহারাণীকে নির্ব্বাক থাকিতে দেখিয়া মহারাজ বলিলেন, 'মহারাণী তুমি কত সুন্দর। আমি এই মাত্র ভাবিতেছিলাম তিলোত্তমা সুন্দরী ছিল সত্য, কিন্তু তাহা বোধহয় কবির কল্পনা মাত্র। কিন্তু তোমার দেহে সরস্বতীর রং, লক্ষ্মীদেবীর মুখ-গরিমা, স্বর্গ-বিলাসিনিগণের মত্ততা, সব একত্রে আসিয়া আবির্ভূত হইয়াছে। বড়ই দুঃখের বিষয় যে, আমার এই রাজ্যে এমন কোন চিত্রকর নাই যে, তাহার নিপুণ তুলিতে তোমাকে ফুটাইয়া তুলিতে পারে, এবং এমন কোন ভাস্করও নাই যে সে পাথরে তোমার আদর্শকে খোদিত করিয়া অমরত্ব দান করিতে পারে। মাত্র কোন মহাকবির লেখনীর মুখে তোমার রূপ ব্যাখ্যাত হইতে পারে, অন্যভাবে হওয়া অসম্ভব। দেখ দেখ, তোমার স্বর্ণখচিত নীলাম্বরী মৃদু মৃদু বাতাসে ঈষৎ চালিত হইয়া তোমার মুক্ত কেশদামের উপর পড়ায় কি সুন্দর শোভা ধারণ করিয়াছে।' মহারাণী শয্যা হইতে গাত্রোত্থান করিয়া মহারাজার বাহুপাশে আবদ্ধ থাকিয়া বলিলেন, "কিন্তু মহারাজ যাহাকে ধরিয়া রাখিতে পারিবে না জানিতেছেন, তাহাকে আরও ব্যগ্রতার সহিত ধরিতে যাওয়া কি উন্মাদের কার্য্য নয়। মাটীর মানুষ রূপে রসে গন্ধে ফুটিয়া উঠে ঐ বাগানের পারিজাতেরই মত, ঐ ফুলও একদিন ঝড়িয়া পড়বে মাটীরই উপর, মিশাইয়া যাইবে ঐ মাটিরই সহিত; আমিও ত তাই যাইব, মহারাজ।" একটা দীর্ঘ-নিঃশ্বাস ত্যাগ করিয়া মহারাজ বলিলেন, "সাম্রাজ্যের বিনিময়ে যদি তোমাকে অমর করিতে পারি, তাহাতে আমি রাজী আছি, কিন্তু তাকি সম্ভব।' সম্রাট-রমণী একটু মৃদু হাসিয়া বলিলেন, "যদি সম্ভবই হয়, তাতে কি ভোগ বাসনা মাখানো থাক্‌তে পারে। সমস্ত জিনিষের জন্ম, বিকাশ, ঝড়িয়া পড়া ও মৃত্যু আছে। রমণী জন্মায় পিতৃগৃহে, ভরা যৌবন লইয়া আসে স্বামীর ভোগের জন্য, যৌবনান্তে পুত্রের সেবায় আত্ম-নিয়োগ করিয়া, ঐ পারিজাতেরই মত ঝরিয়া পড়ে। মদিরায় নেশা আনয়ন করে, নেশা কাটিয়া গেলে অন্তরে বিষাদ টানিয়া আনে। ভোগে আশঙ্কা বৃদ্ধি করে মাত্র—ভোগের দ্বারা উহার নিবৃত্তি করিতে গেলে, বাসনার বৃদ্ধি হয়; ত্যাগই মুক্তির পথ দেখায়,—মানুষকে অনন্ত সৌন্দর্য্য ও চির যৌবনের মধ্যে লইয়া যায়।' মহারাজ বলিলেন, 'রাণী, তোমার বাক্যগুলা আজ আমার নিকট কেমন বিসদৃশ বলিয়াই বোধ হইতেছে। তোমার সহিত বাক্য-যুদ্ধে প্রবৃত্ত হইতে আমার কোন ইচ্ছা নাই; চল ঐ জ্যোৎস্না উদ্ভাসিত উদ্যান বাটিকায় যাই। ঐ ফোয়ারার ধারে বসিয়া তোমার অপ্সরী-নিন্দিত কণ্ঠে একটী গান গাহিবে চল'। মহারাণী বলিলেন, 'চলুন, মহারাজ'।

কয়েক বৎসর কাটিয়া গেল। রাজদম্পতীর উৎসবময় দিনগুলি বেশ সুখেই অতিবাহিত হইল। মহারাণী এখন আর মাত্র বিলাসের সামগ্রী ন'ন, তিনি রাজার উপদেষ্টার পদও অধিকার করিয়া বসিয়াছেন। রাজ্যের তাবৎ সুখ-দুঃখের কথা এবং পরামর্শ মহারাজ মহারাণীর সহিত নিয়মিত ভাবে করেন। একদিন দ্বিপ্রহরের ভোজনান্তর মহারাজ শয়ন কক্ষে শায়িত আছেন, মহারাণী সন্নিকটে বসিয়া তাঁহাকে ব্যজনী সঞ্চালনে হাওয়া করিতেছেন, তখন মহারাণী মহারাজকে জিজ্ঞাসা করিলেন, "মহারাজ

তোমার সাম্রাজ্যটা আমি একবার পরিদর্শন করিতে চাই।" রাণীর কথার উত্তরে মহারাজ একটু সঙ্কুচিত হইয়া বলিলেন, 'সে ত একটা বিরাট কারখানা মাত্র, সেখানে ভোগের দ্রব্য সৃষ্টি হইতেছে, সেখানে কোন সৌন্দর্য্য নাই, কোন গীত নাই, কোন তাল নাই, আছে খালি কাজ, নির্ম্মম কাজ, হৃদয়হীন কর্ত্তব্য এবং রক্ত শীতলকারী উৎসাহ। সেখানে তুমি গমন করিলে, তোমার বিশেষ কষ্ট হইবে, মহারাণী।' মহারাজার কথার কোন উত্তর না দিয়া মহারাণী বলিলেন, 'আমি চাই তাদেরই দেখিতে, যারা আমাদের এই ভোগের দ্রব্যগুলা সৃজন করিতেছে। আমি চাই একবার তাদের সহিত কথাবার্ত্তা কহিতে। সাম্রাজ্যের মহারাণী তাহার পুত্র সম প্রজাদের সযত্নে নির্ম্মিত বিবিধ ভোগ করিবার সামগ্রী উপভোগ করিয়া আসিতেছি, আমি এই প্রাণ-প্রিয়তম প্রকৃতিপুঞ্জকে একবার দেখিতে চাই।' মহারাজ একটুখানি বিব্রত হইয়া বলিলেন, তাহাই হইবে; কল্যই তাহার ব্যবস্থা করিয়া দিব। কিন্তু আমি বলিতেছি মহারাণী সে রাজ্যে আলো নাই, হাওয়া নাই, গন্ধ নাই, রূপ নাই; সত্যই সে একটা বিরাট কারখানা; সুতরাং তোমার শরীর ও মনের স্বচ্ছন্দতা রক্ষার জন্য যে সমস্ত দ্রব্যের প্রয়োজন অনুভব করিবে, তাহাদের সকলগুলিই সঙ্গে লইও; কোনটী লইতে ভুলিলেই কষ্ট হইবে এবং তৎক্ষণাৎ সে স্থান ত্যাগ করিয়া চলিয়া আসিবার প্রবৃত্তি আসিয়া দেখা দিবে।' মহারাণী মহারাজার দিকে মুখ রাখিয়া হাসিয়া বলিলেন, 'প্রয়োজন বোধ করি ত সঙ্গে লইব।'

পরদিন মহারাণী তাঁহার যন্ত্রকলা ও সোমলতা নামক সখীদ্বয়কে সঙ্গে লইয়া রাজ-প্রহরী প্রদর্শিত পথে পদব্রজে চলিলেন। মহারাজার আদেশ ছিল যে, মহারাণী যেরূপ আদেশ করিবেন রাজভৃত্য তাহাই পালন করিবে, তাই মহারাণীর ইচ্ছানুযায়ী তাঁহাকে সঙ্গে লইয়া রাজ-প্রহরী একটা প্রকাণ্ড লৌহ-দরজার নিকট আসিয়া উপস্থিত হইল। এই দরজার বিশালতা যেমন ভয়াবহ, উহার আকৃতিও সেইরূপ ভীতি-প্রদ। রাজ-ভৃত্যের আদেশে মুহূর্ত্তের মধ্যে দ্বার আপনা-আপনি সরিয়া যাইয়া উন্মুক্ত হইয়া গেল, সম্মুখেই এক প্রশস্ত রাজপথ নয়ন-পথে ভাসিয়া আসিল। মহারাণী প্রহরীকে সঙ্গে লইয়া সখী দ্বয়ের সহিত সিংহ দ্বার অতিক্রম করিয়া প্রশস্ত রাজপথে পড়িলেন। এই রাজপথের দুই ধারে বড় বড় কারখানা ভীষণ গর্জ্জন করিয়া অনবরত ধূম বর্ষণ করিয়া চলিয়াছে। রাণী প্রহরীকে জিজ্ঞাসা করিলেন, গৃহগুলি কিসের জন্য নির্ম্মিত হইয়াছে? প্রহরী উত্তর করিল উহারাই কারখানা গৃহ। কোথাও বা লৌহ তৈয়ারী হইতেছে, কোথাও বা খনি হইতে তৈল উত্তোলন করা হইতেছে, আবার কোথাও বা পরিধেয় বস্ত্র ও পাদুকা নির্ম্মিত করিতেছে।' প্রহরীর কথায় রাণীর কৌতূহল উত্তেজিত হইয়া উঠায় তিনি বলিলেন, "দৌবারিক আমাদিগকে ঐ একটী গৃহের মধ্যে লইয়া চল।' কারখানার মধ্যে প্রবেশ করিয়া মহারাণী দেখিলেন দানব-তুল্য কতকগুলা যন্ত্র কি এক ভীষণ আর্ত্ত-নাদ করিয়া অনবরত প্রদক্ষিণ করিয়া যাইতেছে। কতকগুলা মানব কালিমষি মাখিয়া তাহারই সন্নিধানে কি টানিয়া লইতেছে এবং টানিয়া দিতেছে। একটু দূর অগ্রসর হইয়া দেখিলেন, এই যন্ত্রগুলা কেবলই কাপড় বয়ন করিয়া তাহার গাঁট বাঁধিয়া বাঁধিয়া বস্ত্রের কৃত্রিম পাহাড় রচনা করিয়া যাইতেছে। সেখান হইতে বহির্গত হইয়া অন্য কারখানায় প্রবেশ করিয়া দেখিলেন, পৃথিবীকে মথিত করিয়া কি এক যন্ত্রে অনবরত তৈল উত্তোলন করা হইতেছে, এই কার্য্যে স্বয়ং ধরণী দেবী যেন এক অরন্তুদ শব্দে ভীষণ চীৎকার করিতেছেন, কিন্তু বিরাট দেহ দানবগুলা তাহাতে ভ্রূক্ষেপ না করিয়াই তাহাকে মন্থন করিয়া চলিয়াছে। যেখান হইতে নির্গত হইয়া রাণী আর তাঁহার সখিদ্বয় অন্য কারখানায় প্রবেশ করিয়াই ভীষণ চমকাইয়া উঠিলেন। শত সূর্য্যের তেজকে অগ্রাহ্য করিয়া এক ভীষণ অগ্নুৎসব চলিয়াছে। লৌহ গলিত হইয়া জলের ন্যায় বহির্গত হইয়া আসিতেছে। কর্ম্ম-নিরত মানবগণ তাহা হইতে বিবিধ সামগ্রী উৎপন্ন করিতেছে। রাণী এই দারুণ গরমে উত্যক্ত হইয়া উঠিয়া সখীদিগকে চামর দুলাইয়া তাঁহাকে হাওয়া করিবার জন্য অনুরোধ করিলেন। সন্নিকটে একজন কর্ম্মচারী রাণীকে এইরূপ বিপদগ্রস্তা দেখিয়া একজন সঙ্গিকে ইঙ্গিত করিয়া তাঁহা-দিগকে 'হাওয়া-ঘরে' লইয়া যাইতে আদেশ করিল। উক্ত সঙ্গি অভিবাদন করিয়া রাণী এবং তাঁহার সখীদের লইয়া হাওয়া ঘরে আসিয়া উপস্থিত হইল। রাণীর মনে হইল,

তিনি যেন সহসা বরুণের রাজ্যে আসিয়া উপস্থিত হইলেন। পৃথিবীর তাবৎ হাওয়াই যেন এখানে একত্রে বিশেষ করিয়া স্তূপীকৃত করা হইয়াছে। মহারাণী কিয়ৎক্ষণ বিশ্রামের পর প্রহরীকে মহারাজ যেখানে অবস্থিত সেখানে লইয়া যাইবার জন্য আদেশ করিলেন। প্রহরী আদেশ প্রাপ্তিমাত্রই মহারাণীকে সঙ্গে লইয়া মহারাজার বিরাট কক্ষে আসিয়া উপস্থিত হইলেন। মহারাণী দেখিলেন, সমস্ত কক্ষটা বিবিধ অংশে বিভক্ত এবং মহারাজ উহারই একটী অংশে একটী প্রকাণ্ড টেবিলের সম্মুখে একটী সিংহাসনে উপবিষ্ট। টেবিলের উপর স্তূপাকারে বিবিধ কাগজ সাজান আছে। তাঁহার কর্ম্মচারীরা অনবরত মনোযোগ সহকারে রাজাদেশ লিখিয়া লইতেছেন। রাণীকে হঠাৎ তাঁহার কক্ষ মধ্যে প্রবেশ করিতে দেখিয়া রাজা কিছুমাত্র বিচলিত না হইয়া তাঁহার কার্য্য করিয়া চলিলেন। রাণী ধীরে ধীরে রাজার আসনের নিকট আসিয়া তাঁহার স্কন্ধোপরি হস্ত দিয়া দাঁড়াইলেন। রাজা রাণীর প্রতি সপ্রেম দৃষ্টি নিক্ষেপ করিয়া বলিলেন, 'একটু অপেক্ষা করিতে হইবে, মহারাণী।' নিকটেই একটী আসন দেখাইয়া দিয়া বলিলেন, 'ঐখানে বস; আমাকে এই পত্রগুলি শেষ করিতে দাও।' বিনা বাক্যব্যয়ে রাণী ও তাঁহার সখীরা রাজারই সন্নিধানে এক একটী আসনে উপবেশন করিয়া দেখিতে লাগিলেন রাজার কাজের শেষ নাই। মস্তবড় এক একটী আধারে নানা প্রকার কাগজ তাঁহার টেবিলে আসিয়া স্তূপীকৃত হইয়া উঠিতেছে এবং মহারাজ একে একে সে সমুদায়ই পরীক্ষা করিয়া ও তাহাদের উপর আপনার আদেশ লিখিয়া দিয়া আবার ঐ আধারেই নিক্ষেপ করিতেছেন। এক একটী আধার আবার কাগজে ভরিয়া উঠিয়া অদৃশ্য হইয়া যাইতেছে। মহারাণী কিয়ৎক্ষণ বসিয়া থকিবার পর একটু বিরক্তা হইয়া আবার উঠিয়া পড়িলেন। তাঁহাকে উঠিতে দেখিয়া মহারাজ বলিলেন, "মহারাণী আমার এই বিশেষ অমাত্যকে তোমার সহিত দিতেছি এখনও যে সমস্ত স্থল পরিদর্শন করিতে তোমার বাকী আছে ইনি সেইগুলি তোমাকে দেখাইয়া দিবেন। তুমি একটু ঘুরিয়া আইস, তাহার পর উভয়ে একত্রে যাত্রা করিব।' মহারাণী এই কথার কোন উত্তর না দেওয়ায় মহারাজের আদেশানুযায়ী তাঁহার অমাত্যশ্রেষ্ঠ রাণীর অনুগমন করিল। সভাগৃহ হইতে বাহিরে আসিয়া মহারাণী মন্ত্রীবরকে জিজ্ঞাসা করিলেন, 'এই যে লোকগুলা কার্য্য করিতেছে, এরা কোথায় বাস করে? ইহাদের কি গৃহ নাই; স্ত্রী-পুত্র পরিবার নাই? অমাত্যবর ঈষৎ হাস্য করিয়া বলিলেন, উহারাও যখন মানুষ তখন উহাদেরও গৃহাদি না থাকিবে কেন? মহারাজ তাহার সুন্দর ব্যবস্থা করিয়াছেন। সে স্থান যদি দেখিতে চাহেন ত তথায় আপনাকে লইয়া যাইতে পারি।' ঈষৎ মস্তক হেলাইয়া তথায় যাইবার অভিলাষ জানাইলে অমাত্যবর মহারাণীকে সঙ্গে করিয়া এক সুরঙ্গ পথে পাতাল পুরীতে যাইয়া উপস্থিত হইলেন। সেখানে চন্দ্র সূর্য্য উদিত হয়না সত্য, কিন্তু সেখানে আলোকের ও বাতাসের কোন অভাব নাই। হাওয়া কোথা হইতে আসিতেছে জিজ্ঞাসা করায় অমাত্যবর উত্তর করিলেন "উপরে যে হাওয়া ঘর আছে সেইখান হইতে এখানে বাতাস সঞ্চালন করা হইতেছে। রাণীকে অমাত্যবরের সহিত প্রবেশ করিতে দেখিয়া কতকগুলা অস্থিচর্ম্মসার বালক-বালিকা দৌড়াইয়া আসিয়া কেমন হতভম্বভাবে মহারাণীর দিকে তাকাইয়া রহিল। পুত্রস্বাদ বিবর্জ্জিতা মহারাণী তাহাদের একজনকে কোলে তুলিয়া লইয়া জিজ্ঞাসা করিলেন, 'তোমাদের মা কোথায়?' ভীত-বালক মহারাণীর ভাষা বুঝিতে না পারিয়া তাহার মুখের দিকে তাকাইয়া কেমন যেন এক যন্ত্রণা অনুভব করিতে লাগিল। মহারাণীও তাহা হৃদয়ঙ্গম করিয়া বালককে ক্রোড় হইতে নামাইয়া দিলেন। বালকটীও যেন ভয় পাইয়া দ্রুতপদে পলাইয়া গেল। তাহার ভীতিভাব দেখিয়া অপরাপর বালক-বালিকারাও দ্রুতপদে সে স্থান ত্যাগ করিল। বিস্ময়-বিহ্বলা মহারাণী অত্যন্ত কাতর ভাবে অমাত্যবরকে জিজ্ঞাসা করিলেন, বালক তাঁহার সহিত কথা কহিলনা কেন

অমাত্যবর ঈষৎ হাসিয়া বলিলেন, মহারাণী উহারা মানব হইলেও উহাদের ভাষা বিভিন্ন। যাহারা আমাদের সহিত অনবরত মেলমেশা করে তাহারাই আমাদের ভাষা কিছু কিছু বুঝিতে পারে। উহারা বালক, আপনার ভাষা কিছুই হৃদয়ঙ্গম করিতে না পারায় কিছু ভীতই হইয়াছিল সুতরাং উত্তর কি দিবে।'

রাণী একটুখানি আপনাকে সামলাইয়া লইয়া বলিলেন, 'উহারা সকলেই অত ত্রস্তপদে পলায়ন করিল কেন?' অমাত্য শ্রেষ্ঠ উত্তর করিলেন, 'মহারাণী, উহারা মানব-শিশু সত্য, সকলেই জননীর সন্তান তাহাও ঠিক, কিন্তু উহারা মাতার ক্রোড় কি তাহা জানে না। অতি শৈশবে মাতৃ-স্তন্য পান করে সত্য, তাহা শয্যায় শয়ন করিয়া। কাজেই মাতৃ-প্রেমে আত্মবিহ্বলা যখন আপনি উহাদেরই একজনকে ক্রোড়ে করিলেন, তখন সে দৃশ্যে উহারা সম্ভবতঃ ভয়ই পাইয়াছিল, তাই আপনার ক্রোড়স্থ বালকটীকে মাটীতে অবতরণ করাইয়া দিলেই সকলেই দলবদ্ধভাবে পলাইয়া গেল।' মহারাণী একটুখানি দীর্ঘ-নিশ্বাস ত্যাগ করিয়া বলিলেন, 'উহাদের জননীরা কোথায়?'

অমাত্যশ্রেষ্ঠ বলিলেন, 'এখন তাহারা সকলেই ঐ উপরের কারখানাগুলিতে গিয়াছে। সন্ধ্যার পর কারখানা ছুটি হইলে তাহারা আবার আসিবে।' মহারাণী এই মন্তব্যে একটুখানি শিহরিয়া উঠিয়া বলিলেন, 'চলুন বাহিরে যাই, যেখানে আপনাদের সমস্ত উৎপাদিত দ্রব্য একত্রিত হইতেছে সেইখানে লইয়া চলুন'।

শীঘ্রই অমাত্যবরের সহিত মহারাণী এক বিস্তৃত ময়দানে আসিয়া উপস্থিত হইলেন। তথায় নানা প্রকার স্তূপীকৃত দ্রব্য একত্রিত ভাবে সজ্জিত দেখিয়া বলিলেন, 'এই সমস্ত দ্রব্যের কিরূপে বণ্টন হইবে।' মহারাণীর প্রশ্নের অর্থ হৃদয়ঙ্গম করিতে না পারিয়া অমাত্যবর বলিলেন, "মহারাজই তাবৎ দ্রব্যের একমাত্র মালিক। যে সমস্ত মজুর এই সমস্ত দ্রব্য উৎপন্ন করিতেছে, তাহারা তাহাদের ভরণ-পোষণ পাইতেছে। মহারাজের কারখানা না থাকিলে পৃথিবী হইতে তাহাদের অস্তিত্ব লোপ পাইত। মহারাজ স্বয়ং ভগবানের ন্যায় তাহাদের জীবিকা-নির্ব্বাহের ভার গ্রহণ করিয়াছেন।' মহারাণী বলিলেন, 'তা হইলে ঐ লোক গুলাকে আপনারা খাটাইতেছেন—ঐ একজন মহারাজের সেবার জন্য।' অমাত্য স্তম্ভিত হইয়া বলিলেন, "লোকগুলা একমাত্র মহারাজের অনুগ্রহেই জীবন ধারণ করিয়া এখনও জীবিত আছে।"

রাত্রে মহারাজ শয়নকক্ষে প্রবেশ করিয়া দেখিলেন, মহারাণী দক্ষিণের দরজা খুলিয়া দিয়া কেমন একটু অন্যমনস্কভাবে বসিয়া আছেন। আজ তাঁহার বেশ-বিন্যাসের পারিপাট্য নাই। সামান্য একখানি ঈষৎ গোলাপী রঙের শাড়ী পরিধান করিয়া, অযত্ন-বদ্ধ চিকুররাশি গ্রীবার উপর দিয়া বক্ষোপরি ও পৃষ্ঠদেশে ছড়াইয়া দিয়া আনমনে বাহিরে কি যেন দেখিতেছিলেন। মহারাজ ধীরে ধীরে নিঃশব্দে মহারাণীর নিকট আসিয়া তাঁহার পৃষ্ঠদেশে হস্ত স্থাপন করিলেন। চকিতা মহারাণী পশ্চাৎ ভাগে চাহিয়া কান্তের প্রেমপূর্ণ দৃষ্টির সহিত তাঁহার দৃষ্টি বিনিময় হইয়া যাওয়ায় একটুখানি সামলাইয়া লইয়া বলিলেন, 'দেখুন মহারাজ, ঐ দূর আকাশে মেঘগুলার উপর চন্দ্রের জ্যোৎস্নারাশি ইতস্ততঃ বিক্ষিপ্ত হওয়ায় কেমন সুন্দর দেখাইতেছে। আরও দেখুন, ঐ নক্ষত্রগুলা গগনমার্গে বিকশিত থাকিয়া কেমন মনোরম আকার ধারণ করিয়াছে।' মহারাজ দেখিলেন, দৃশ্যটা সামান্যই। অপরাপর দিন ইহা অপেক্ষাও অধিক মনোরম দৃশ্য আকাশপটে প্রতিবিম্বিত হইয়া থাকে; রাণীর মনোভাব খানিকটা যেন হৃদয়ঙ্গম করিতে পারিয়াই সহানুভূতিপূর্ণ কণ্ঠে বলিলেন, 'আরও কত সুন্দর তুমি আমার প্রিয়া। সারা আকাশটা যেন চাঁদ ও নক্ষত্ররূপ শত শত চক্ষু বাহির করিয়া তোমাকে অবিশ্রান্ত দেখিয়া চলিয়াছে, যেন এ দেখার বিরাম নাই, এ ভোগ আকাঙ্ক্ষার তৃপ্তি নাই, এ মোহের নিবৃত্তি নাই। আরও দেখ, সঙ্কুচিত পবন কেমন ধীরে ধীরে গৃহ মধ্যে প্রবেশ করিয়া তোমার কেশদামগুলিকে নাচাইয়া নাচাইয়া তোমার গ্রীবার ও স্কন্ধের উপর ফেলিয়া দিয়া অপূর্ব্ব শোভার সৃষ্টি করিতেছে। এ সৃষ্টির কল্পনা করিতে গেলে আদিম নরের চক্ষে নগ্ন-দেহা আদিম নারীর যে মূর্ত্তি ভাসিয়া আসিয়াছিল তাহাকেই রূপ দিতে হইবে।" মহারাণী মহারাজার নিকট আত্মপ্রশংসা শুনিতে বেশই অভ্যস্তা ছিলেন। অন্যদিন হইলে কৃত্রিম বিরক্তিও হয়ত প্রকাশ করিতেন; কিন্তু অদ্যকার এই বিশ্রম্ভালাপের মধ্যে তিনি মহারাজের হৃদয়ের এক অভূতপূর্ব্ব সরলতার আভাষ পাইয়া বলিলেন, 'মহারাজ আপনার রাজ্যের তাবৎ প্রজাই যদি আমাদের মত সুখী হইত, তাহা হইলে এই পৃথিবী কত সুখের হইত।' মহারাজ রাণীর এই বাক্যে ঈষৎ চমকাইয়া বলিলেন, 'সুখী সকলেই, ভোগজ্ঞানের তারতম্য আছে মাত্র! তুমি

যাহাতে সুখ অনুভব কর, অপর কেহ তাহাতে সুখের সন্ধান না পাইতে পারে ; সুখ ও সৌন্দর্য্য চর্চ্চাই মানব-জীবনের ধ্রুবতারা দেবী, এক অনাদিকাল হইতে ইহারই পিছনে সমগ্র মানবজাতি ছুটিয়া আসিতেছে।" রাণী আপনার অলকদাম গ্রীবার উপর হইতে সরাইয়া লইয়া অশ্রুপূর্ণ ভাসা ভাসা চক্ষু মহারাজের উপর স্থাপন করিয়া বলিলেন, 'আমাকে অনুমতি দিন মহারাজ, আপনার রাজ্যের তাবৎ প্রজামণ্ডলীকে আমি সুখের সেবা করিতে ও সৌন্দর্য্য-চর্চ্চায় অভ্যস্থ হইতে শিক্ষা দিব।' মহারাজ ঈষৎ হাসিয়া বলিলেন, "রাণী তোমার ছাঁচে যদি জগৎটাকে গড়িতে দাও, তবে নিশ্চয় জানিও শৃঙ্খলার স্থলে বিশৃঙ্খলাই আসিয়া দেখা দিবে, শান্তির জায়গায় অশান্তি আসিয়া আপন শাসন প্রতিষ্ঠিত করিবে।' মহারাণীও রাজার কথায় একটু হাসিয়া বলিলেন, 'সেই ভাল মহারাজ; অশান্তির মধ্যে যদি অমৃতভাণ্ড পাওয়া যায় তাহা হইলে কি ভোগের চূড়ান্ত হইবে না, এবং কলহের মধ্যে যদি তিলোত্তমা আত্মপ্রকাশ করে তাহা হইলে কি সেই সৌন্দর্য্য চর্চ্চার শেষ হইবে না?' মহারাজ একটু বিমর্ষ হইয়া বলিলেন, 'তোমাকে অদেয় আমার কিছু নাই। তোমার যাহা অভিরুচি তুমি তাহাই করিতে পার, কিন্তু স্থল-বিশেষে যদি প্রয়োজন বোধ কর ত আমার পরামর্শ গ্রহণ করিও।'

মহারাণী তাঁহার কল্পনানুযায়ী কার্য্য করিয়া চলিলেন। যে সমস্ত মানব অন্ধকারময় পাতাল-পুরীতে বাস করিত তাহাদিগকে তথা হইতে আনয়ন করিয়া রাজধানীতে সুরম্য আবাস গৃহ নির্ম্মাণ করাইয়া বাসস্থান নির্দ্দেশ করিয়া দিলেন। তাহাদের পুত্রকন্যাগণের শিক্ষার জন্য বিবিধ পাঠশালা স্থাপন করিলেন। সন্তানের জননীরা যাহাতে সন্তানগণের তত্ত্বাবধান করিতে পারে, তাহারও ব্যবস্থা করাইলেন। ক্রমশঃ শীর্ণকায় মানবগুলি স্থূল কলেবর বিশিষ্ট সম্ভ্রান্ত জন-সমাজে পরিণত হইয়া আসিল। ভীত ও সচকিত ক্ষুদ্র ক্ষুদ্র মানব শিশুগুলি শান্ত ও ধীর অধ্যয়নশীল বালকে পরিণত হইল। ভগ্ন-হৃদয় জননী তাহার সন্তানের সেবা করিতে যাইয়া ক্রমশঃই উৎফুল্ল-বদনা হাস্যময়ী রমণী মূর্ত্তিতে বিকসিত হইয়া উঠিল। অন্ধকার ও দরিদ্রতা দূর হইয়া গিয়া আলোক ও স্বচ্ছলতা আসিয়া দেখা দিল। সমগ্র রাজধানী একটা বিরাট জনসমাবেশে হাস্যমুখরিত হইয়া নাট্যশালায় পরিণত হইল।

একদিন মহারাণী মহারাজকে নির্জ্জনে পাইয়া বলিলেন, 'দেখুন ত মহারাজ আপনার প্রজামণ্ডলী কত সুখী হইয়াছে। তাহাদের হাস্যময় মুখ দেখিলে কি আপনার আনন্দ হয় না? আপনি পূর্ব্বে আশঙ্কা করিয়াছিলেন যে এই এতগুলা লোকের সুখ-স্বচ্ছন্দতা বৃদ্ধি করিতে গেলে আমাদের নিজেদের সুখ স্বচ্ছন্দতার অনেকটা হ্রাস হইবে, কই আমারত তাহা মনে হয় না'। মহারাজ সপ্রেম দৃষ্টিতে প্রিয়ার দিকে তাকাইয়া বলিলেন, "স্বর্গ সৃষ্টি করিতে গেলে দেবতা সংগ্রহ করা প্রয়োজন ; নরক সৃজন করিতে গেলে, পাতকীর দরকার, মর্ত্ত্যলোকে মানবেরই আবশ্যক ; তুমি স্বর্গ রচনা করিতে চাহিতেছ দেবী, স্বর্গ মর্ত্ত্যে কিন্তু কখনই সৃষ্টি হইবে না।' মহারাণী হাসিয়া বলিলেন, 'মানবই দেবতা হয় তুমি একথা জাননা মহারাজ'। মহারাজ বলিলেন, 'দেবতা যাঁহারা তাঁহারা দেবতা বলিয়াই জানিতাম'। মহারাণী বলিলেন, তোমার ভ্রান্ত ধারণা দূর করিয়া দিব, আর একটু অপেক্ষা কর মানবগুলাকেই দেবতায় পরিণত করিব।'

ক্রমশঃ কারখানার কলগুলা বিগড়াইয়া আসিল। সন্তুষ্ট জনমণ্ডলী পূর্ব্বাপেক্ষা দ্বিগুণ উৎসাহে কার্য্য করিতে লাগিল সত্য কিন্তু আশানুযায়ী ফল পাওয়া যাইতে লাগিল না। মহারাজ বিশেষ চিন্তিত হইয়া স্বয়ং ইঞ্জিন ঘর, ও কারখানার সর্ব্বত্র ঘুরিয়া বেড়াইয়া বিশেষ করিয়া পর্য্যবেক্ষণ করিলেন কিন্তু কোথায় যে কলটা বিগড়াইয়া গিয়াছে তাহা স্থির করিতে পারিলেন না। উৎপন্ন দ্রব্যের পরিমাণ ক্রমশঃ কমিয়া আসায় জনমণ্ডলীর বিশেষ অসুবিধা হইতে লাগিল। মহারাণী আপনাদের তাবৎ অনাবশ্যক বিলাস-ব্যসন কমাইয়া দিলেন। প্রতি ঘরে ঘরে গমন করিয়া জনমণ্ডলীকে উপস্থিত বিপদে সান্ত্বনা দিতে লাগিলেন। মহারাণীর আশ্বাস বাক্যে সকলেই বিপদকে জাপটাইয়া ধরিয়া তাহার সহিত লড়াই করিয়া চলিল। এদিকে মহারাজের কার্য্যের বিরাম রহিল না। সূর্য্যোদয় হইতে সূর্য্যাস্ত পর্য্যন্ত গলদ ঘর্ম্ম পরিশ্রম করিয়াও তাঁহার প্রজামণ্ডলীর তাবৎ আবশ্যকীয় দ্রব্য উৎপাদন করিয়া উঠিতে পারিতেছিলেন না। অবশেষে একদিন হতাশ

হইয়া মহারাণীকে বলিলেন, 'মহারাণী, আমার মনে হয় এই সমস্ত সাম্রাজ্য প্রকৃতিপুঞ্জের হস্তেই অর্পণ করিয়া আমাদের বানপ্রস্থ গমন করার সময় আসিয়াছে।' মহারাণী একটুখানি সপ্রেম হাস্য মুখমণ্ডলে বিকসিত করিয়া বলিলেন, "মহারাজ আমি জনমানবের সহিত মরিতে চাই, তাহাদের নিকট হইতে দূরে গিয়া স্বর্গও চাহি না।'

ক্রমশঃ বিদ্রোহ ভাব দেখা দিল। কারখানার মজুররা তাহাদের ঊর্দ্ধতন কর্ম্মচারীদের সহিত সমানভাবে সুখ-সাচ্ছন্দ্য বণ্টন করিয়া লইবার অধিকার জ্ঞাপন করিল। চির ভোগ সুখে লালিত পালিত ঊর্দ্ধতন কর্ম্মচারীর দল এই বিদ্রোহ মূর্ত্তি দেখিয়া বেশ শিহরিয়া উঠিল। তাহারাও ক্রমশঃ আত্মরক্ষার জন্য প্রস্তুত হইতে লাগিল। রাজধানী হইতে তাহাদিগকে বিতাড়িত করিয়া লইয়া আবার পাতাল-পুরীতে পুরিল। বিদ্যালয় গৃহ উঠাইয়া দিয়া শিক্ষা-প্রদান বন্ধ করিয়া দিল। নির্দ্দিষ্ট ভরণপোষণমাত্র দিয়া তাহা-দিগকে আবার কলের সহিত গাঁথিয়া দিল। কলগুলাও যেন নূতন উৎসাহে পূর্ব্বকার তেজ ফিরিয়া পাইল। তাহারা স্ফীত বক্ষে অনর্গল ধূম উদ্গীরণ করিয়া আবার আবশ্যক দ্রব্য উৎপন্ন করিয়া চলিল। রাজধানীতে পূর্ব্ব সুখ-শান্তি ফিরিয়া আসিল, কিন্তু পাতালপুরীতে অশান্তি ও অত্যাচার স্তূপীকৃত হইয়া উঠিতে লাগিল।

মহারাণী কেমন একটু হতাশ হইয়া পড়িলেন। তিনি চাহিতেছিলেন মানবকে দেবতায় পরিণত করিতে, অগ্রসরও অনেকটা হইয়াছিলেন; কিন্তু হঠাৎ তাঁহার আশা কেমন করিয়া নিরাশায় পরিণত হইল তাহা তিনি বুঝিয়াই উঠিতে পারিলেন না। মহারাণী একদিন নির্জ্জনে বসিয়া ভাবিতেছিলেন, 'তবে তাহাই কি সত্য। স্বর্গ দেবতার জন্য; মর্ত্ত্য মানব জাতির জন্য সৃষ্ট। মহারাণী বহুক্ষণ চিন্তা করিলেন, কিছুই ঠিক করিতে না পারিয়া অবশেষে স্থির করিলেন, তিনি পাতালপুরীতে গিয়াই বাস করিবেন। যেখানে পাপ পুঞ্জিকৃত হইয়া গগনস্পর্শী হইয়া উঠিতেছিল, সেখানেই তাঁহার বাসস্থান হওয়া উচিত স্থির করিয়া তথায় গমন করিবার উদ্যোগ করিতে লাগিলেন। এমন সময়ে সমস্তদিনের কার্য্য শেষ করিয়া মহারাজ তাঁহার নিকট আসিয়া বলিলেন, 'মহারাণী, আবার কলগুলা পূর্ব্বকার মতই চলিতেছে, হারাণ শান্তি আবার ফিরিয়া আসিয়াছে।' মহারাণী বলিলেন, 'সে ত স্তূপীকৃত অশান্তি সৃজন করিয়া, পাপের বোঝা অসম্ভব রূপ বাড়াইয়া।' মহারাজ হাস্য করিয়া বলিলেন, 'পৃথিবীর দিকে চাহিয়া দেখ রাণী, ধ্বংসেরই উপর মানব সমাজ প্রতিষ্ঠিত, অনেক সময় শ্মশানই বাসর-ঘর রচনা করিয়া দেয়।

অবশেষে একদিন অতি ভীষণ ভাবে বিদ্রোহ আত্ম-প্রকাশ করিল। তাহার কারণ যে কি, তাহা নির্ণীত হইতে না হইতেই মহারাণী দেখিলেন, কারখানা গৃহগুলিতে অগ্নি-সংযোগ করিয়া বিরাট জনতা তাণ্ডব নৃত্য সুরু করিয়া দিয়াছে। মহারাজ এই অগ্নি নির্ব্বাণ করিবার জন্য প্রাণপণে চেষ্টা করিতে লাগিলেন, তাঁহার সহচরেরা একে একে সকলেই অগ্নি-কুণ্ডে পড়িয়া আত্ম বিসর্জ্জন করিতে লাগিল; উত্তেজিত জনতা তাহাদের মৃতদেহগুলি লইয়া নৃত্য করিয়া বেড়াইতে লাগিল। আকাশের উপর মৃত্যুর নগ্নমূর্ত্তি ভাসিয়া উঠিল। জলের মধ্যে তাহারই প্রতিবিম্ব পড়িয়া বিকট মূর্ত্তি ধারণ করিল। গৃধিণী, শকুণী প্রভৃতি মাংসাশী পক্ষী-কুল মনের আনন্দে নর-মাংস ভোজন করিতে লাগিল। ক্রমশঃ, বেলা অবসানের সহিত রজনীর গাঢ় অন্ধকার মূর্ত্তি গাঢ়তম হইয়া আসিল কিন্তু প্রলয়ের তাণ্ডব নৃত্য সমান ভাবেই চলিল। কারখানা গৃহগুলি ক্রমশঃ ভস্মীভূত করিয়া দিয়া উদ্ধত জনতা রাজধানীতে প্রবেশ করিল। দেখিতে দেখিতে প্রত্যেক নাগরিকের গৃহ জ্বলিয়া উঠিল। উভয় দলে ভীষণ সংগ্রাম বাধিয়া গেল। বিশিষ্ট কর্ম্ম-চারীরা অস্ত্রহীন মজুরদলকে বিনাশ করিয়া চলিল। কিন্তু কর্ম্মচারীদের সংখ্যা তাহাদের তুলনায় মুষ্টিমেয় মাত্র। কাজেই মজুরদল ক্রমশঃ প্রবল হইয়া কর্ম্মচারীদের বংশ সবংশে নির্ম্মূল করিয়া দিল। প্রসাদ ভস্মীভূত হইয়া ধূলার উপর লুটাইয়া পড়িল। রঙ্গালয় নিমিষে ভস্মস্তূপে পরিণত হইয়া গেল। মানব মানবকে দেখিয়া বন্য জন্তুর ন্যায় বধ করিয়া চলিল। অগ্নি তাহার বহুদিনের বুভুক্ষা জ্বালা মিটাইবার জন্য তাবৎ সৃষ্ট পদার্থের উপরই লেলিহান জিহ্বা বিস্তার করিল।

উদ্যান বাটিকার একটী গৃহে দাঁড়াইয়া মহারাণী দেখিলেন এই ভীষণ প্রলয়ে সকলেই ধ্বংস পাইতেছে। মহারাজ প্রাণপণে চেষ্টা করিতেছেন সত্য কিন্তু ক্ষিপ্ত

জনতা তাঁহার কোন বাক্যেই কর্ণপাত করিতেছে না। ক্লান্ত দেহ মহারাজ অবশেষে অগ্নিকুণ্ডে ঢলিয়া পড়িয়া প্রাণ হারাইলেন। মহারাণী তাহা স্বচক্ষে দেখিলেন। এই দৃশ্য দর্শনান্তর তিনি হঠাৎ জ্ঞান হারাইয়া মাটীতে লুটাইয়া পড়িলেন। হত্যা ও ধ্বংস কার্য্য সমান ভাবেই চলিতে লাগিল।

মহারাণীর যখন জ্ঞানোদ্রেক হইল, তখন চক্ষু চাহিয়া দেখিলেন সমস্ত সাম্রাজ্যটা এক বিশাল ভস্মের সাহারায় পরিণত হইয়াছে। তথায় মানবের কোন সাড়া শব্দ নাই। কোন জীবিত প্রাণী পর্য্যন্ত দেখিতে পাওয়া যাইতেছে না। মধ্যে মধ্যে এক বিরাট ঘূর্ণী বায়ু প্রকৃতির দীর্ঘ-নিশ্বাসের মত বালুকাস্তূপ উড়াইয়া বহিয়া যাইতেছে। মহারাণী ক্রমশঃ প্রকৃতিস্থ হইয়া দেখিলেন, যতদূর দৃষ্টি চলে ততদূরই ভগ্ন ও ভস্ম এবং নরকঙ্কালের স্তূপ। প্রাণী নাই, স্মৃতি নাই; মূর্ত্তিমান ধ্বংস অট্টহাস্যে হাহাকার করিতেছে। প্রস্তর মূর্ত্তিবৎ বহুক্ষণ নির্ব্বাক ও নিশ্চল থাকিবার পর মহারাণী দেখিলেন, কোন অমাত্য এক সামান্য কুলির সাক্ষাৎ পাইয়া তাহাকে ভীষণ ভাবে জাপটাইয়া ধরিয়াছে। কুলীটাও তাহার বংশগত হীনতা ভুলিয়া অমাত্যকে গাঢ় প্রেমালিঙ্গনে আবদ্ধ করিল। মহারাণী চক্ষু মুছিয়া দেখিলেন, এই বিরাট শশ্মানে ক্বচিৎ দুই একটা মনুষ্য দেখা যাইতেছে এবং তাহারা পরস্পরকে দেখিলে এমনভাবে জাপটাইয়া ধরিতেছে যেন, বহুদিন তাহারা কোন মানবের মুখদর্শন করে নাই। ক্লান্ত দেহ ও ভগ্ন-মন লইয়া মহারাণী ভাবিলেন, স্বর্গ কি তবে ভস্মেরই উপর নির্ম্মিত হইব; ধ্বংসের মধ্যেই কি মাহমানব অমৃতের আস্বাদ পাইবে? ক্রমশঃ জ্ঞানহীন হইয়া তাঁহার শরীর সেই বালুস্তূপের উপর ঢলিয়া পড়িল।

"মিলন"

শ্রীমতী রাণু দেবী

অস্তগামী সূর্য্যের রক্তিম আভায় মুক্ত বনপথ আলোকিত, সন্ধ্যার আগমনে আকাশের প্রান্তসীমায় একদল বলাকা শুভ্র রেখার মত উড়িয়া যাইতেছিল। গাছে গাছে যেন আবির মাখিয়ে দিয়েছে। তারই একটী গাছের ডালে পরম নিশ্চিন্তে দুটী পাখী মধুর আলাপনে পরস্পরের তৃপ্তি সাধন করছে। তাদের মধুর গুঞ্জন, পরস্পরকে সুখী করবার কি আকুল আগ্রহ, সুখে তারা মাতোয়ারা, এই পরম সুখ-সম্মেলনে বাধা পড়তে পারে আনন্দের আতিশয্যে তারা ভুলে গেছে।

সমস্ত দিনের অক্লান্ত পরিশ্রমে, নিষ্ফল ব্যাধ যখন রিক্ত হস্তে গৃহে ফিরছিল তখন দূরে গাছের ডালে একজোড়া পাখী দেখে লোভে তার চক্ষু উজ্জ্বল হয়ে উঠলো। না ভেবেই সে শর ক্ষেপণ করলে, চকিতে মিলন-সুখরত পাখী সাবধান হবার আগেই তীর বিদ্ধ হয়ে লুটিয়ে পড়ল, তার বুকের সমস্ত লাল রক্ত, অস্তাচলগামী সূর্য্যের আরক্ত আভাকে অভিনন্দিত করল। বেদনার ভারে ব্যথিত দিবাকরও লজ্জায় মুখ লুকালেন।

প্রিয়র মৃত্যুতে কাতরা, আর তার মরণের ভয় নেই, করুণ বিলাপে দিগন্তে প্রতিধ্বনি তুলে, ব্যাধের চারিপাশে ঘুরতে লাগল, বিলাপের মূর্চ্ছনায় ইহাই সে ব্যক্ত করতে লাগল, ওগো দাও আমায়ও শেষ করে দাও, আমরা নিরীহ প্রাণী কি তোমার ক্ষতি করেছিলাম যে আমাদের এই মিলন সুখের এমনি পরিণতি করিলে।

অভিভূত ব্যাধ ছুটে চলে এলো, সমস্ত রাত তার কুটীরখানিতে প্রিয়হারা পাখীটির বিলাপের ধ্বনি যেন দূর অতি দূর হতে ভেসে আসতে লাগলো। সে যন্ত্রণা অনুশোচনায় ছটফট করতে লাগলো।

স্তব্ধ জমাট অন্ধকার ভেদ করে বিরহিণীর মর্ম্মভেদী ক্রন্দনে জগত মুখরিত করছে।

রাতের জাগরণে, অনুতাপে অতিষ্ঠ হয়ে ভোর হতে না হতেই ব্যাধ নিজের অজ্ঞাতে বনের সেই গাছতলায় এসে দেখলে, নিষ্ফল বিলাপে কাতরা, তার সেই প্রিয়র প্রাণহীন বুকে চির মিলন উদ্দেশ্যে চলে গেছে।

মহান প্রেমের-মিলনে নির্দ্দয় ব্যাধের চোক দিয়ে দুই ফোঁটা অশ্রু ঝরে পড়ল। সে তার ধনুর্ব্বাণ ফেলে বনের পথে অদৃশ্য হলো।

(পূর্ব্বপ্রকাশিতের পর)

১১

জরুরী কাজের জন্য দিন দশেকের জন্য সুশীলকে ডায়মণ্ড হারবারে আসিতে হইয়াছে।

কাল সকালেই সে কলিকাতায় ফিরিয়া যাইবে, এখানকার কাজ সারাদিন কঠিন পরিশ্রম করিয়া শেষ করিয়াছে।

প্রথমে সে এখানে নিরঞ্জনকে পাঠাইবার চেষ্টায় ছিল, কিন্তু নিরঞ্জনের পিতৃবিয়োগ হওয়ায় সে আসিতে অসমর্থ হইয়াছিল, অগত্যা সুশীলকেই আসিতে হইয়াছে।

সুন্দর জ্যোৎস্নাময়ী রাত্রি, যতদূর দেখা যায় সব চাঁদের আলোয় ভরিয়া গিয়াছে। দূরে সমুদ্র সৈকতে সর্ব্বাঙ্গ চাঁদের আলো মাখিয়া বাতাসে দোলা খাইতেছে।

সারাদিনের পরিশ্রমে শ্রান্ত সুশীল বিশ্রাম লাভাশায় ডাকবাংলোর খোলা বারাণ্ডায় চাঁদের আলোয় একখানা চেয়ারে বসিয়াছিল।

সুশীলের মনটা কখনও কলিকাতায় একটা অপরিচ্ছন্ন গলিতে একটা বাড়ীর ঘরে ঘুরিয়া বেড়াইতেছিল।

কলিকাতায় আছে ইরা, জাপানে আছে তাহার ভাবী বধূ ইন্দিরা।

কোনদিন যে ইন্দিরার সঙ্গে কাহাকেও একই পর্য্যায়ে রাখিয়া মিলাইয়া দেখিতে হইবে তাহা সে স্বপ্নেও ভাবে নাই। যাহা জীবনে কোন দিনই করে নাই আজ সে তাহাই করিতেছিল।

জীবনের মধ্যে অনেক সময়ই তাহাকে অনেক সুন্দরী তরুণীর সংস্পর্শে আসিতে হইয়াছে, তাহাকে স্বামীরূপে পাইবার জন্য কেবলমাত্র ভারতীয় মেয়েরাই নহে অনেক সুন্দরী ধনবতী ইউরোপিয়ান মহিলাও উৎসুক ছিলেন, সে চিরদিনই এই সব মেয়েদের অবহেলা করিয়াই আসিয়াছে ইহাদের পানে চাহিয়া হাসিয়াছে। কোনদিন কাহারও কথা ভাবিতে গিয়া ইন্দিরার অনিন্দ্য সুন্দর মুখখানিই তাহার মনে জাগিয়া উঠিয়াছে, সে আর কাহারও নহে—সে ইন্দিরার, এই কথাটা ভাবিতে তাহার অন্তর পূর্ণ হইয়া গিয়াছে।

মাঝখানে ইরা কোথা হইতে কেমন করিয়া ভাসিয়া আসিল কে জানে, কেমন করিয়া সে যে সুশীলের অন্তরে স্থান পাইল, কোন দুর্ব্বল মুহূর্ত্তে সেখানে নিজের প্রতিষ্ঠা করিল তাহা আজ সুশীল ভাবিয়া ঠিক করিতে পারে না।

সুশীল অস্থির হইয়া উঠে, ইরার কথা ভুলিয়া যাইবার জন্য চেষ্টা করে, কিন্তু তবু তাহার কথাই মনে জাগে।

সে যে তাহার অন্তরে এতখানি স্থান দখল করিয়া রহিয়াছে তাহা কলিকাতায় থাকিতে সুশীল জানিতে পারে নাই। কলিকাতা ত্যাগ করিবার দিনে সে বুঝিতে পারিল ইরাকে সে ভালবাসে, ইরাকে ছাড়িয়া কোথাও যাওয়া তাহার পক্ষে যেন অসম্ভব বলিয়াই মনে হয়।

এই কয়েকটা দিন হাজার কাজের মধ্যে ইরার কথাই তাহার মনে জাগিয়া উঠিয়াছে, তাড়াতাড়ি কাজ সারিয়া সে কলিকাতায় ফিরিবার জন্য ব্যগ্র হইয়া উঠিয়াছে।

একটা কথা আছে করুণা সহানুভূতি প্রভৃতি বৃত্তিগুলি হইতে অনেক সময় প্রেমের উদ্ভব হয়। একি তাহাই, সুশীল তাহা বুঝিতে পারে না। সে মনকে প্রশ্ন করে সত্যই কি সে ইরাকে ভালবাসিয়াছে? কিন্তু ইহাই বা কিরূপে সম্ভব হইবে, ইরাকে ভালবাসার মত কিছু কি ইরার মধ্যে আছে? মানুষ প্রথমেই যাহা দেখিয়া মুগ্ধ হয় সেই রূপ তাহার কোথায়? ইরা সাধারণ একটা মেয়ে

মাত্র, নিসর্গ সুন্দরী সুশিক্ষিতা ইন্দিরার পার্শ্বে দাঁড়াইবার যোগ্যতা তাহার কতটুকু আছে? তাহার উপরও যদি তাহার অর্থ থাকিত,—কিন্তু সে তো দরিদ্রা, নিজের জীবিকার্জ্জনের জন্য তাহাকে বেড়াইতে হয়। আর ইন্দিরা, সে প্রচুর ঐশ্বর্য্যশালিনী, সে তাহার ঐশ্বর্য্য দিয়া সুশীলকে ধনবান করিয়াছে।

কিন্তু কে ইহা চাহিয়াছিল? সুশীল পরের ঐশ্বর্য্যে ঐশ্বর্য্যশালী হইতে চাহে নাই, সে চাহিয়াছিল যেন সে দরিদ্র পিতার সন্তান রূপেই পরিচিত হয়, যেন সে নিজের জীবিকা নিজেই অর্জ্জন করিতে পারে। সেই অশুভ মুহূর্ত্তে তাহার পিতা তাহার ভার মিঃ রায়ের হাতে দিয়া গিয়াছেন, আজ সুশীল ভাবে—তিনি তাহার কেবল বাহিরের দিকটাই দেখিয়া গিয়াছেন, তাহাকে যে চির দাসত্বশৃঙ্খলে আবদ্ধ করিয়া গেলেন তাহা তিনি ভাবেন নাই।

সে ইরার এই দিকটাই কেবল দেখিয়া ছিল। দারিদ্র্য-দুঃখ তাহাকে কষ্ট দিলেও সে স্বাধীন; দৃঢ়ভাবে সে দারিদ্র্যের সহিত যুদ্ধ করিয়া নিজেকে অটুট রাখিতে পারিয়াছে। সে ইরার ঐশ্বর্য্য, রূপ কিছুই দেখে নাই, সে শুধু দেখিয়াছিল ইরার সাহস, শক্তি, দৃঢ়তা।

এই দৃঢ়তা, সংসারের সহিত যুদ্ধ করিয়া নিজের প্রতিষ্ঠা অব্যাহত রাখিবার শক্তি, ইহাই সুশীলকে তাহার পানে আকর্ষণ করিয়াছিল। সুশীল এ কয়দিন অবিরত নিজের সহিত যুদ্ধ করিয়াছে; নিজের মনকে বুঝাইবার চেষ্টা করিয়াছে ইন্দিরার প্রতি অবিশ্বাসী হওয়াটাই শুধু মহা পাপ নয়, ইহাতে ইন্দিরার পিতার নিকটও কৃতঘ্ন হইতে হইবে। কেবল মাত্র এই একটী আশা লইয়াই তিনি তাহাকে মানুষ করিয়াছেন, তাহার হাতে সব ছাড়িয়া দিয়াছেন। আজ সে যে কৃতঘ্নতা করিল, ইহার জবাব সে কি দিবে?

কিন্তু মন তো মানে না। অন্তরে কে আঘাত দেয়, কে বলে—পরের অর্থে ধনবান হইয়া থাকা পুরুষের কাজ নয়, পুরুষ আত্মবিক্রয় করিয়া এত হীন হইয়া থাকিতে পারে না। সে যখন নিজের হীনাবস্থা বুঝিয়াছে তখন মুক্ত হইবার চেষ্টা করিবে না কেন?

মিঃ রায়ের যে পত্র কলিকাতা হইতে রিডাইরেক্ট হইয়া এখানে আসিয়াছে তাহাতে তিনি জানাইয়াছেন, তিনি আগামী বুধবার কন্যাসহ কলিকাতায় আসিবেন, মাসখানেক পরে তাহার হাতে ইন্দিরাকে সমর্পণ করিয়া তিনি নিশ্চিন্ত হইবেন।

আজও সে ইন্দিরাকে ভালবাসে, ইন্দিরার জন্য সে নিজের জীবন বিসর্জ্জন করিতে পারে। আজও তাহার মনটা সমুদ্র মধ্যবর্ত্তী জাপান দ্বীপে ঘুরিয়া বেড়ায়, দিনের মধ্যে শতবার ভাবে—এতক্ষণ ইন্দিরা কি করিতেছে, সেও কি তাহার মত তাহার কথা ভাবিতেছে?

কোথা হইতে আসিল ইরা, কেমন করিয়া ইন্দিরার স্থান খানিকটা চুরি করিয়া সে দখল করিয়া বসিল?

ইরার উপর সে রাগ করিবার চেষ্টা করে, কিন্তু রাগ করাও তো যায় না, ইরার আর্ত্ত মুখখানা মনে জাগিয়া উঠে, মনে পড়ে, প্রত্যহ সে কুণ্ঠিতভাবে আসে, কাজ করে—চলিয়া যায়। নিরঞ্জন একদিন তাহার কাজের মধ্যে এতটুকু ত্রুটী পাইয়া সাবধান করিয়া দিয়াছিল, তাহার পর হইতে সে যে অত্যন্ত সতর্ক হইয়া উঠিয়াছে।

ইদানীং সে সুশীলের সঙ্গ এড়াইয়া চলিতে চায়, তাহা সুশীলও বুঝিয়াছিল। সেও সতর্ক হইয়াছিল, ইরাকে এড়াইয়া চলার চেষ্টা করিত, নিতান্ত আবশ্যক না হইলে ইরার সম্মুখে আসিত না।

সুশীল অন্তর যুদ্ধে ক্ষত-বিক্ষত হইয়া উঠিতেছিল,—সে ইন্দিরার নিকট অবিশ্বাসী হইয়াছে। আজ এই জ্যোৎস্নালোকিত প্রকৃতির পানে চাহিয়া সে ভাবিতেছিল—ছি ছি, সে করিয়াছে কি,—ইন্দিরা যে তাহাকে বই জানে না, সেও যে ইন্দিরাকে প্রাণ মন ঢালিয়া ভালবাসিত, আজ সে এ কি করিতেছে?

সুশীল আর্ত্তভাবে দুই হাতে বুকখানা চাপিয়া ধরিল—ইন্দিরা, যত শীঘ্র পার তুমি এসো, তোমার স্বামীকে রক্ষা কর, পাপপঙ্ক হইতে টানিয়া তোল.

যদি ইন্দিরা ঘুণাক্ষরেও জানিতে পারে, সুশীলের অন্তর কলুষিত হইয়াছে, সে ইরাকে ভালবাসিয়াছে, সে কি তাহাকে ক্ষমা করিবে?

না, সে ক্ষমা করিবে না। সুশীল ইন্দিরাকে চেনে, তাহার অভিমানকে চেনে, সে কিছুতেই সুশীলকে ক্ষমা করিতে পারিবে না তাহাও সে জানে।

সুশীল মুহ্যমান ভাবে পড়িয়া রহিল, তাহার মনের মধ্যে তখন ইন্দিরার দৃপ্তমূর্ত্তিখানা জাগিয়া উঠিয়াছিল।

১২

কলিকাতায় ফিরিয়াই সে নিরঞ্জনকে জানাইল মিঃ রায় কন্যাসহ আগামী কাল এখানে আসিয়া পৌঁছাইবেন। নিরঞ্জনকে আজ একবার সন্ধ্যার দিকে তাঁহার বাড়ীতে যাইতে হইবে, সুশীলও সেখানে থাকিবে, উভয়ে মিলিয়া বাড়ীটিকে সুসজ্জিত করিবার ব্যবস্থা করিবে।

সারাটা দিন এদিক-ও দিক ঘুরিয়া সুশীল সন্ধ্যার পূর্ব্ব মুহূর্ত্তে ইরার বাসায় গিয়া পৌঁছাইল। নিজেকে সে বিশ্বাস করিতে পারিতেছিল না, ইরার নিকটে সে সব কথা বলিয়া ফেলিয়া নিশ্চিন্ত হইতে চায়।

ইরা দ্বার খুলিয়া দিয়া সসম্ভ্রমে অভ্যর্থনা করিল, "আসুন।"

মিসেস দাস উপস্থিত কতকটা সামলাইয়া লইলেও এখনও উঠিতে পারেন না। ডাক্তার থাইসিসের আশঙ্কা করিয়াছেন। দু'পাঁচ দিন একটু নরম থাকিলেও যে কোন মুহূর্ত্তে ব্যারাম আবার বাড়িয়া উঠিতে পারে, তিনি একথা বলিয়া দিয়াছেন।

সুশীল গৃহমধ্যে প্রবেশ করিয়া একটা নমস্কার করিয়া শুষ্ক হাসিয়া বলিল, "আজ আবার এসেছি মা, সেদিন আপনার চা খাওয়ার নিমন্ত্রণ নিতে পারিনি, এর জন্যে বড় লজ্জা পেয়েছি।"

মিসেস দাস বলিলেন, "তার জন্যে আমি কিছুই মনে করি নি বাবা, তোমার চাকর বলে গেল কাজেই আমি আর কোনও উদ্যোগ করি নি। বড় ইচ্ছা ছিল মায়ের মত তোমায় একদিন সামনে বসিয়ে খাওয়াব, কিন্তু সে আশা যে মিটবে সে আশা আমি করিনে। তুমি নিজে জোর করে চা খেয়েছ, কোন কুসংস্কার মানো না বলে সেই সাহসেই তোমায় চায়ের নিমন্ত্রণ করেছিলুম।"

সুশীল বলিল, "এর পর একদিন এসে নিশ্চয়ই খাব মা, খাওয়া তো পালাবে না আমিও পালাব না। আপনার যেদিন খুসি সেইদিন আমায় খাইয়ে দেবেন, আজ চা পেলেও হয়।"

ইরা বলিল, "একটু বসুন, আমি এখনি চা করে নিয়ে আসছি।"

ব্যস্ত হইয়া উঠিয়া সুশীল বলিল, "থাক, আর এখন চা দিতে হবে না। এর জন্যে তোমায় এত ব্যস্ত হওয়ার দরকার নেই, আমি চা খেয়ে এসেছি।"

সে আর আপনি বলিত না, তুমি সম্বোধন করিত।

ইরা বলিল, "এক কাপ চা তৈরী করতে আমার একটুও কষ্ট হবে না; আপনি একটু বসুন, আমি এখনই আসছি।"

সুশীল আর বাধা দিল না, ইরা চলিয়া গেল।

কে বলিতে পারে আজই এখানে আসা এবং চা খাওয়া শেষ হইল কিনা। মনের মধ্যে আশঙ্কা জাগিতেছিল, হয়তো আজ রাত্রিটা মাত্র সে স্বাধীন আছে, কাল সকাল হইতে সে পরাধীন হইয়া পড়িবে।

ইরা রন্ধনগৃহে গিয়া তাড়াতাড়ি ষ্টোভ ধরাইয়া তাহার উপর কেটলী বসাইয়া দিল। ষ্টোভের সোঁ সোঁ শব্দে ও ঘরের কোন কথা আর তাহার কানে আসিয়া পৌঁছাইল না।

হঠাৎ পিছনে দরজার উপর শব্দ শুনিয়া সে সত্রস্তে মুখ ফিরাইল বিস্মিত চোখে চাহিয়া দেখিল দরজার উপর দাঁড়াইয়া সুশীল।

তাড়াতাড়ি সে উঠিয়া দাঁড়াইল। সুশীল যে এই ঘরের দরজায় আসিয়া দাঁড়াইবে ইহা তাহার স্বপ্নেরও অগোচর। আজ হঠাৎ তাহাকে এই অপরিষ্কার ঘরে আসিতে দেখিয়া ইরা বাস্তবিকই বিস্মিত হইয়া গেল।

বিস্মিত কণ্ঠে সে বলিল, "আপনি এ ঘরে এলেন যে, ও ঘরে বসতে না পারেন বারাণ্ডায় বসবেন চলুন, আমার চা হয়ে এল বলে।"

শান্তকণ্ঠে সুশীল বলিল, "যাচ্ছি ও ঘরে। রোগীর কাছে বসতে পারিনি বলে যে এ ঘরে এসেছি তা নয়, তোমার সঙ্গে আমার কয়েকটা কথা বলার আছে ইরা। ওঘরে মায়ের সামনে সে সব কথা বলা চলে না বলেই এ ঘরে এসেছি, আফিসে নির্জ্জনতা খুঁজে ছিলুম পাইনি, সেইজন্যে আজ ওদিকে অনেক কাজ থাকা সত্বেও এখানে এসেছি।"

বিস্মিত চোখ তুলিয়া ইরা তাহার মুখের পানে মুহূর্ত্তের জন্য তাকাইয়াই দৃষ্টি নামাইল; তাহার মুখখানা লাল হইয়া উঠিল। সুশীল কি বলিবে তাহা যেন সে অনুভবে

কতকটা বুঝিতে পারিল। মৃদুকণ্ঠে বলিতে গেল, "এই অপরিষ্কার ঘরে আপনি—"

"তা হোক অপরিষ্কার ইরা, তাতে কিছু এসে যাবে না। আমি এইখানেই বসছি, আমার কথাটা শেষ করে এখনি চ'লে যেতে চাই, সন্ধ্যার পরে আমার অন্য অনেক কাজ আছে।"

সুশীল দরজার উপরই বসিয়া পড়িল। অত্যন্ত সচকিত হইয়া উঠিয়া ইরা বলিল, "ওখানেই বসে পড়লেন, এই আসনখানা পেতে দিচ্ছি, এর পরে না হয়—"

সুশীল মাথা নাড়িয়া বলিল, "তোমার অত ব্যস্ত হয়ে উঠতে হবে না ইরা, আমি নিজে ইচ্ছা করেই এসেছি, ইচ্ছা করেই বসছি, তুমি তো আমায় নিমন্ত্রণ করে আন নি যে এতে লজ্জা পাবে।"

জল ফুটিতেছিল, ইরা জল নামাইয়া তাহাতে চা দিল।—

সুশীল বলিল, "চা ততক্ষণ হোক, আমি, তোমায় ততক্ষণ যা বলবার আছে বলে যাই।"

ইরা জিজ্ঞাসুনেত্রে তাহার পানে তাকাইয়া রহিল, সুশীল খানিক চুপ করিয়া থাকিয়া বলিল, "আমি একটা দারুণ ভুল করে ফেলেছি ইরা, সেই ভুলটা সুধরাবার জন্যে এখন অস্থির হয়ে পড়েছি। জানিনে সে ভুল আর সুধরানো যাবে কিনা, আর এখন সুধরাতে গেলেই বা তুমি কি মনে করবে, কিন্তু তবু—তুমি যাই মনে করনা কেন, আমার তা না করা ছাড়া আর উপায় নেই।"

ইরা ঘামিয়া উঠিল, এত ভূমিকা কিসের জন্য তাহা সে বুঝিতে পারিল না, কণ্ঠ পরিষ্কার করিয়া বলিল, "কি ভুল করেছেন?"

সুশীল একটু হাসিবার চেষ্টা করিল, তাহাতে তাহার মুখখানাই বিকৃত হইয়া উঠিল মাত্র, সে বলিল, "আমার মনে হচ্ছে, কেবলমাত্র সাময়িক একটা ঝোঁকের বশে তোমাদের সঙ্গে এতটা মেলামেশা করা আমার উচিত হয়নি। ভবিষ্যতে যখন আমাদের পরস্পরের মধ্যে পরিচয় দিতে গেলে কেবলমাত্র প্রভু কর্ম্মচারী ছাড়া আর কিছুই বলা চলবে না, তখন হঠাৎ মাঝখানে কয়দিনের জন্যে এই আত্মীয়তা করে যাওয়া কি আমার পক্ষে উচিত হল?"

ইরার মুখখানা শবের মুখের মতই মলিন হইয়া উঠিল। সুশীল তাহার মুখে একটি কথা শুনিবার প্রত্যাশায় রহিল, কিন্তু ইরা তাহার পানে চাহিল না, নতমুখে থাকিয়া নিঃশব্দে ধীরে ধীরে মাথা নাড়িল।

সুশীল বলিল, 'তুমি বলতে চাও আগেই তুমি এ জানতে, অর্থাৎ ধনী ও দরিদ্রের মিলতে গেলে শেষটায় যে এমনই একটা ব্যাপার ঘটে তা জানা কথা। কিন্তু না কথাটা সে ভাবে ধরো না ইরা, কেবল এইটুকু ভাব আমার নিজের 'পরে নিজের কোনও অধিকার নেই, আমার দরিদ্র বাপ আমার স্বাধীনতা চিরকালের মতই বিক্রী করে গেছেন, সেই জন্যেই আমি ধনীর জাঁকজমক সহ্য করতে পারিনে, প্রাসাদে বাস করা আমার কাছে অভিশাপ বলেই মনে হয়।"

ইরা চায়ের কাপে চা ঢালিতে ঢালিতে একবার চোখ তুলিয়া তাকাইতে তাহার অনিন্দ্যসুন্দর মুখের উপর যন্ত্রণার যে ছাপটা পড়িয়াছে তাহা স্পষ্টই সে দেখিতে পাইল।

অধীরভাবে সে বলিল, "আপনার মোট কথাটাই আপনি বলুন যে আপনি ভবিষ্যতে আর এখানে আসবেন না আর আমার সঙ্গে আপনার যে বন্ধুত্ব আছে বা ছিল সে যেন আর কেউ না জানতে পারে কেমন, এই তো?"

হঠাৎ তাহার রূঢ় কণ্ঠস্বর সুশীলকে যেন বড় বেশী রকমই আঘাত দিল। ইরা যতখানি রূঢ়তা প্রকাশ করিয়াছিল, সে ততখানি নরম হইয়া বলিল, "কতকটা তাই বটে।"

ইরার যেন বুক ফাটিয়া কান্না আসিতে ছিল, সুশীল যে এমনভাবে তাহাকে অপমান করিবে তাহা সে কোনদিন স্বপ্নেও ভাবে নাই। সুশীল নিজেই সাধিয়া আসিয়া তাহাকে বন্ধু বলিয়াছে, সে চা দিতে চায় নাই, সুশীল জোর করিয়া কেবল চা নয়, তাহার হাতে লুচি তরকারী পর্য্যন্ত খাইয়া গেছে, আজ সেই কিনা জানাইতে আসিয়াছে তাহার সহিত একদিন সে খেয়াল মত বন্ধুভাবে চলিয়াছিল, তাই বলিয়া সে যে তাহাকে বরাবর বন্ধু বলিবে তাহা হইতে পারে না। ইরাকে মনে রাখিতেই হইবে, ইরা কর্ম্মচারী সুশীল তাহার মনিব—প্রভু।"

বেদনা ভরা সুরে ইরা বলিল, "কিন্তু আমি একটা কথা জানতে চাই মিঃ মুখার্জ্জী, আপনি বোধ হয় লক্ষ্য করেননি আপনি দয়া করে আমার বন্ধু বলে ভাবলেও আমি কোনদিন আপনাকে মনিব ছাড়া ভাবিনি? আপনি দয়া করে আমার বাড়ীতে এসেছেন, আমার মাকে মা বলেছেন, আমার তৈরী চা খেয়েছেন আপনি হয়তো এ ব্যবহারগুলোকে আপনার বন্ধুত্বের নিদর্শন ভেবে খুসী হয়ে উঠেছেন। কিন্তু আমি বা আমার মা আপনার এ ব্যবহারগুলোকে কেবলমাত্র দয়ার দান বলেই জেনে নিয়েছি।"

বিস্ফারিত চোখে তাহার পানে তাকাইয়া সুশীল বলিল, "দয়ার দান—?"

বড় দুঃখেও মানুষ হাসে, তাই ইরাও হাসিল, "তা নয় তো কি মিঃ মুখার্জ্জী? আপনি বন্ধুত্ব করতে এলেই আমরা কি তত সহজে আপনার মত লোককে নিতে পারি? আমরা কি জানি না ধনী দরিদ্রে প্রভেদ কতখানি? আপনি যে জানেন না তা নয়, আর তা জানেন বলেই না আজ আমায় এমনভাবে অপমান করতে পারছেন?"

হঠাৎ তাহার চোখ ছাপাইয়া দুই ফোঁটা জল পড়িয়া গেল, লজ্জিতা হইয়া তাড়াতাড়ি মুখ ফিরাইল।

"অপমান—তোমায় অপমান করতে এসেছি—?

আত্মবিস্মৃত সুশীল ইরার একখানি হাত চাপিয়া ধরিল, "না, না অপমান করতে আসি নি ইরা সেকথা যদি ভেবে থাকো জেনো বিষম ভুল করেছ। কিন্তু আমার অবস্থা যদি জানতে ইরা, যদি বুঝতে—আমার বেতন-ভোগী কর্ম্মচারী হয়েও তুমি কতখানি স্বাধীন, কতখানি মুক্ত, তার তুলনায় আমি কতখানি পরাধীন তাহ'লেও ঐ রকম কথা বলতে পারতে না।"

ইরা আস্তে আস্তে হাতখানা ছাড়াইয়া লইল, চায়ের কাপ সামনে ঠেলিয়া দিয়া বলিল, "অধৈর্য্য হবেন না, চা খান।"

সুশীল বলিল, "খাচ্ছি, কিন্তু শোন ইরা, তুমি বুঝতে চেষ্টা কর আমি কতখানি অসহায়। আমি তোমায় একথা কেন বলছি, সেটা এখন তুমি শোননি। কাল সকালে মিঃ আর মিস রায় আসছেন আমার বিয়ের কথা ঠিক হয়ে আছে, আর সেইজন্যেই মিঃ রায় আমার হাতে লক্ষ লক্ষ টাকার ভার দিয়েছেন। তাঁরা এসে যদি শুনতে পান তোমার সঙ্গে আমার—"

এক মুহূর্ত্তে সুশীলের অসহায় অবস্থাটা ইরার চোখের সামনে ফুটিয়া উঠিল, সে গোপনে একটা নিঃশ্বাস ফেলিয়া বলিল, "বুঝেছি।"

সুশীল শুষ্ক হাসিয়া বলিল, "মুখের কথায় বুঝো না ইরা, অন্তর দিয়ে বুঝো। আমার কোন কথাই বোধ হয় তোমার কাছে অজানা নেই, তাই বলছি আমায় ওঁদের সামনে অকম্পিতপদে দাঁড়াতে দিয়ো। আজ আমি উঠলুম, সন্ধ্যা হয়ে গেছে, নিরঞ্জন এখনিই আসবে।"

শূন্য চায়ের কাপ নামাইয়া সুশীল উঠিয়া পড়িল।

সে চলিয়া গেল, ইরা আড়ষ্টভাবে দাঁড়াইয়া তাহার পথের পানে তাকাইয়া রহিল।

সে কি কাজ ছাড়িয়া দিবে? সুশীল যেখানে আছে সেখানে তাহার আর না যাওয়াই ভাল, হয়তো তাহাকে দেখিয়া মিস রায় কি বলিবেন। সে সব সহ্য করিতে পারিবে, মিস রায়ের কথা সহ্য করিতে পারিবে না।

কিন্তু এখনই তো কাজ ছাড়া চলে না, নিজের জন্য তাহার ভাবনা নাই, রুগ্না জননীর ঔষধ পথ্য সে যোগাড় করিবে কি করিয়া?

ও ঘর হইতে মায়ের ক্ষীণ কণ্ঠস্বর ভাসিয়া আসিল,—"ইরা—"

ইরা তাড়াতাড়ি মুখে চোখে জল দিতে দিতে উত্তর দিল—"যাই মা—"

(১৩)

পরদিন নিয়মিত সময়েই ইরা অফিসে গিয়া পৌঁছাইল। ব্যাগ্র চোখে সে একবার চারিদিকে চাহিল কিন্তু সুশীল বা নিরঞ্জন কাহাকেও দেখিতে পাইল না। একটা নিঃশ্বাস ফেলিয়া সে নিজের ঘরে গিয়া বসিয়া কাজ আরম্ভ করিয়া দিল।

দেয়ালের ঘড়িতে যখন টুং টুং করিয়া বারটা বাজিল, তখন সে শ্রান্তভাবে হাত তুলিয়া লইল মুখ ভাসাইয়া ঘামের স্রোত ছুটিতেছিল, রুমালে ঘাম মুছিতে মুছিতে সে কান পাতিয়া শুনিল বাহিরে কয়েকজন লোকের কথা শুনিতে পাওয়া যাইতেছে। ইহাদের মধ্যে সুশীলের কণ্ঠস্বরই তাহাকে বেশী রকম আকৃষ্ট করিল।

দরজার সামনে কাহারা আসিয়া দাঁড়াইল, সুশীল পর্দা সরাইয়া দিয়া বলিল, "আসুন--"

ইরা তাড়াতাড়ি চেয়ার ছাড়িয়া উঠিল।

সুশীলের পশ্চাতে ছিলেন সৌম্যমূর্ত্তি একটি বৃদ্ধ, তাঁহাকে দেখিলে শ্রদ্ধা ও ভক্তিতে অন্তর পূর্ণ হইয়া যায়। তাহার পার্শ্বে একটী তরুণী দাঁড়াইয়া, তাহার পানে তাকাইয়া ইরা চোখ ফিরাইতে পারিল না।

জীবনে সে অনেক সুন্দরী মেয়ে দেখিয়াছে, কিন্তু এমন সুন্দরী সে বোধহয় আর দেখে নাই। ইরা মুগ্ধ নয়নে এক পলকের দৃষ্টিতে তরুণীর পা হইতে মাথা পর্য্যন্ত দেখিয়া লইল, যেন একখানি নিখুঁত ছবি।

সুশীল পরিচয় দিল, "মিস দাস ইনিই মিঃ দেবনারায়ণ রায় আর ইনি মিস ইন্দিরা রায় মিঃ রায়ের মেয়ে।"

মিঃ রায়ের পানে ফিরিয়া সে বলিল, "ইনি আমাদের টাইপিষ্ট মিস ইরা দাস।"

মিঃ রায় কন্যার পানে তাকাইয়া কি বলিলেন ইরা তাহা বুঝিতে পারিল না। সুশীল মৃদুকণ্ঠে কি বলিল তাহাও ইরা বুঝিতে পারিল না।

মিঃ রায় বলিলেন, "ওঁকে এত ছোট বন্ধ ঘরে দেওয়াটা উচিত হয়নি সুশীল, একটা কোন বড় ঘরে দিলেই ভাল হোত। এ ঘরে ভয়ানক গরম, যেন দম বন্ধ হয়ে আসে।

সুশীল বলিল, "ওদিকার সব ঘরগুলোতে অনেক পুরুষ কাজ করে, সেইজন্য ওঁকে স্বতন্ত্র বন্দোবস্ত করে দেওয়া হয়েছে। উনি ভদ্রলোকের সামনে কাজ করতে রাজী নন, নিজেই এন ঘরটা বেছে নিয়েছেন।

ইন্দিরার অনিন্দ্যসুন্দর মুখে একটু হাসির রেখা মুহূর্ত্তের তরে জাগিয়া উঠিয়া তখনই মিলাইয়া গেল, সে সুশীলের হাতটা ধরিয়া টানিয়া বলিল, "ও ঘরে চল, এই ছোট ঘরে আমার দম বন্ধ হয়ে যাচ্ছে।"

তাহারা প্রবেশ করিবার সময় সুন্দরী ইন্দারার পানে তাকাইয়া ইরা অভিবাদন করিতে ভুলিয়া গিয়াছিল, যাওয়ার সময় সে অভিবাদন করিল। মিঃ রায় প্রত্যভিবাদন করিলেন কিন্তু গর্ব্বিতা ইন্দিরা কেবল মাথাটা একটু নত করিয়া সুশীলের হাত ধরিয়া টানিয়া লইয়া চলিল।

ইরা স্থাণুর মত দাঁড়াইয়াছিল, কতক্ষণ পরে যখন তাহার জ্ঞান ফিরিয়া আসিল তখন সে ব্যস্তভাবে আবার টাইপ করিতে বসিল।

কিন্তু আজ সকল কাজেই গোলমাল হইতেছিল। ইরা খানিক চেষ্টা করিয়া অবশেষে কাজ ছাড়িয়া দিয়া অবসন্নভাবে টেবলে ঝুঁকিয়া পড়িয়া দুই বাহুর মধ্যে মুখ লুকাইয়া ভাবিতে লাগিল।

এত সুন্দর—এত সুন্দর কখনও মানুষে হয়? ওই সদ্য প্রস্ফুটিত স্থলপদ্মের বন, ভ্রমরকৃষ্ণ কুঞ্চিত চুলগুলি, কি সুন্দর চোখ ভ্রূ, নাক, ঠোঁট, এত সুন্দর মানুষ হয়? সে যে হাতখানা দিয়া সুশীলের হাত খানা ধরিয়া টানিল সে হাত খানিই বা কি সুন্দর, সে আঙুলগুলি কি চমৎকার। তাহার কানে দুইটা সবুজ পাথরের ইয়ারিং, আঙুলে সবুজ পাথরের আংটী, হাতের তিনগাছি করিয়া চুড়িতে সবুজ পাথর বসানো; পায়ে সবুজ সু, পরনে সবুজ সাড়ি,—পরিচয় দিতেছিল, এই মেয়েটি সবুজ রংটাই বেশী পছন্দ করে।

কিন্তু কি সুন্দর দেখাইতেছিল যখন সে সুশীলের পানে চাহিয়াছিল, সুশীল তাহার পানে চাহিয়াছিল।

জগতে সে সুশীলের—সুশীল তাহার, সুন্দর সুন্দরের জন্যই সৃষ্ট হইয়াছে, অসুন্দরের জন্য নয়।

সুশীল মিঃ রায় ও ইন্দিরাকে নিজের প্রশস্ত অফিস রুমে লইয়া গিয়া বসাইয়াছিল। শ্রান্ত ভাবে বসিয়া পড়িয়া একগ্লাস লেমনেডজল খাইয়া কতকটা সুস্থ হইয়া মিঃ রায় বলিলেন, "আফিসের কাজ চলছে ভাল, সে খবর আমি বম্বেতে থাকতেই আগরওয়ালার কাছে শুনেছি, তবুও বলি আমি যে প্ল্যান করে দিয়েছিলুম যদি সেই ভাবে কাজ করতে হয় তো আরও উন্নতি হতো। কতকগুলো নিয়মের ব্যতিক্রম দেখতে পাচ্ছি, যেটা একেবারেই অস্বাভাবিক বলে বোধ হয়। দেশবিদেশের সঙ্গে আমাদের ব্যবসা চালাতে হবে, দেশবিদেশের লোক অফিসের কাজে রাখা চাই; কিন্তু তুমি তা না করে কেবল ভারতীয়দেরই কাজে রেখেছ। এই সব ভারতীয় কর্ম্মচারী রেখে জগতের প্রত্যেক জাতির সঙ্গে ভাবের বা কাজকর্ম্মের আদান-প্রদান চলতে পারে কি তাই জিজ্ঞাসা করি?"

সুশীল খানিক চুপ করিয়া রহিল, তাহার পর বলিল, "কেন চলতে পারবে না? ভারতীয়েরা এমন কোন কাজ

থাছে যে কাজে অপারগ হবে? আমি দেখছি যত যা কিছু কারবার ব্যবসা বাণিজ্য সবই বিদেশীরা নিজেদের একচেটে করে নিয়েছে, ভারতীয়দের মধ্যে আমাদের নিজের জাতি বাঙালীরা এর মধ্যে, এতটুকু অধিকার পায়নি, অধিকার পাওয়ার যোগ্যতাও তাদের নেই—কিন্তু ওদের শিখিয়ে দিতে হবে তো! আমরা পয়সা খরচ করে বিলাত হতে অনেককিছু শিখে এসেছি, আমাদের গরীব দেশের গরীব ছেলেরা অত পয়সা ব্যয় করে শিখতে যেতে পারবে না; কাজেই আমরা যেটা শিখে এসেছি, সেটা যদি ওদের শিখাই তা হলে অন্যায় কিছু হবে না বলেই আমি মনে করি। আমি যা শিখতে পেরেছি তা আপনার দয়ায়, কিন্তু আমার মত গরীব ঘের ছেলেও তো আছে যারা লেখাপড়া শিখছে, কিন্তু শেষকালটায় তাদের অদৃষ্টে চাকরী করা ছাড়া আর কিছুই জুটছে না। আজ আমি যদি আমার জাতি—এই বাঙ্গালীদের মানুষ করে গড়ে তুলতে চাই, সেটা কি আপনার মতে খারাপ বলে প্রতিপন্ন হবে?"

ইন্দিরা জোর করিয়া বলিল, "বাবার কথার উত্তর আমি দিচ্ছি, তাতে খারাপই হবে।"

সুশীল ধীর কণ্ঠে জিজ্ঞাসা করিল, "আমি যদি জানতে চাই কেন খারাপ হবে—তার উত্তরটাও বোধ হয় পেতে পারি?"

ইন্দিরা বলিল, "উত্তর সোজা, যেহেতু বাঙ্গালী বড় নেমকহারাম জাত, ওদের মত হিংসুক পরশ্রী কাতর জাত ছনিয়ায় আর নেই।"

সুশীল তাহার মুখের উপর শান্ত চোখের দৃষ্টি তুলিয়া ধরিল, পূর্ব্বের মতই ধীর কণ্ঠে বলিল, "একথা বলবার আগে নিজের দিকেও তাকাতে হয় ইন্দু, মনে করতে হয়—পরিচয় দিতে গেলে নিজেকে বাঙ্গালী ছাড়া আর কিছুই বলতে পারবে না। কোনও ইউরোপীয়ানের সঙ্গে কথা বলবার সময় জানিনে—তুমি বাঙ্গালীর সম্বন্ধে এই মন্তব্য কোনদিন প্রকাশ করেছ কিনা, আর তোমার এই মন্তব্য শুনে তাঁর মনের ভাবটা কি রকম হয়েছিল তাও বলতে পারি নে। যাক সে কথা, জিজ্ঞাসা করতে পারি কি কি করে তুমি জানলে বাঙ্গালী পরশ্রী-কাতর, হিংসুক, বিশ্বাসঘাতক? কোন বাঙ্গালী তোমার সঙ্গে কোনদিন এরকম কোন ব্যবহার করেছে কি?"

ইন্দিরা বলিল, "হয় তো করে নি, কিন্তু তুমিই কি জোর করে বলতে পার বাঙ্গালী বিশ্বাসঘাতক নয়?"

সুশীল বলিল, "হ্যাঁ, হাজারে একজন থাকতে পারে। তুমি কি বলতে পার ইন্দু, যে সব সভ্যদেশে তুমি বেড়িয়ে এলে, সে সব দেশে কেউ কোনদিন বিশ্বাসঘাতকতা করে নি? তা যদি হতো—তা হলে রোমের ধ্বংস হতো না, আরও অনেক দেশ আছে—"

বাধা দিয়া মিঃ রায় বলিলেন, "আঃ, যেতে দাও ওর কথা; ছেলেমানুষ, বুঝতে না পেরেই একটা কথা বলে বসে, ওর কথা ধরতে গেলে কি চলে?"

শান্তকণ্ঠে সুশীল বলিল, "না, ওঁর কথা আমি ধরছি নে, তবে নিজের জাতের সম্বন্ধে এই ভুল ধারণাটা আমি নেষ্ট করে দিতে চাই। একথা---বলতে পার তুমিই ইন্দিরা, আর বলতে পারে তারাই যারা বিদেশের বাহিক আড়ম্বর দেখে মুগ্ধ হয়ে গেছে,- নিজেদের ব্যক্তিত্ব বোধ, জাতিত্বজ্ঞান যারা বিসর্জ্জন দিয়েছে। আমি জানি—যতই কেন শিক্ষা পাওনা তবু নিজের মনের মধ্যে জাতীয়তা জাগিয়ে রেখে দেওয়া সকলেরই উচিত, আর সেইটাকেই মনুষ্যত্ব বলে।"

উত্তেজনাবশে তাহার সুন্দর মুখখানা লাল হইয়া উঠিয়াছিল। ইন্দিরা কি বলিবার জন্য উদ্যোগ করিতেই মিঃ রায় বাধা দিলেন, "চুপ, যাক ইন্দু, বেশী কথা বলবার দরকার নেই, এর পর এ সব নিয়ে কথাবার্ত্তা চলবে। আমি ছদিন থেকে ব্যাপার সব দেখি শুনি, তারপর যা হয় বিবেচনা করা যাবে।"

একটু নীরব থাকিয়া তিনি বলিলেন, "আর দেখ, এত বড় অফিসটাতে একজন মেয়ে টাইপিষ্ট, তার ওপর সেও বাঙ্গালী—রাখাটা ঠিক হয় নি। আমাদের দেশে আজকাল ইউরেশীয়ান, ইউরোপীয়ান টাইপিষ্টির অভাব তো নেই কাজেই—"

নিতান্ত নির্লিপ্তভাবে সুশীল বলিল, "আপনি তা বিবেচনা করবেন।"

মিঃ রায় একটা আড়ামোড়া ছাড়িয়া বলিলেন, "অবশ্য আমি যে মেয়েদের শিক্ষা বা কাজের পক্ষপাতী নই তা নয়; তবে এ যে আমাদের দেশ। যে দেশে ছেলেরাই অনেক পেছিয়ে পড়ে আছে সে দেশে মেয়েরা

যে কতটা এগিয়েছে তাই হচ্ছে ভাব্বার কথা। আমি ওকে পরীক্ষা করে দেখব, যদি দেখি কাজের উপযুক্ত, তা হলে থাকবে, নইলে একটা মেম রাখা যাবে। কি বলিস ইন্দিরা ?"

ইন্দিরা সে প্রশ্নের উত্তর না দিয়া ঘড়ির পানে তাকাইয়া বলিল, "এবার ওঠো বাবা, বেলা দুটো বাজল।"

মিঃ রায় সোজা হইয়া বসিলেন, বলিলেন, "হাঁা, হাঁা, এবার উঠতে হবে বটে। বিকেলের দিকে আমার ওখানে যেয়ো সুশীল, তোমার চা খাওয়া ওখানেই হবে। কয়েকটা কাজ আছে, যাওয়া চাই-ই।"

তিনি উঠিলেন, সঙ্গে সঙ্গে ইন্দিরাও উঠিল।

১৪

সেদিন রবিবার ছিল।

ছুটি পাইয়া রতিনাথ দুপুর সময়ে বিছানায় শুইয়া পড়িয়া সংবাদপত্র পাঠ করিতে করিতে একটু দিবা-নিদ্রার উদ্যোগ করিতেছিলেন।

তিনি ঘুমাইয়াছেন ভাবিয়া মনীষা আস্তে আস্তে দরজার পরদা সরাইয়া উঁকি দিল, তাহার পায়ের শব্দ পাইয়া রতিনাথ চাহিয়া দেখিলেন, তিনি জাগিয়া আছেন দেখিয়া মনীষা গৃহ মধ্যে প্রবেশ করিল।

"আপনি ঘুমোচ্ছেন বাবা ? আমি উঁকি দিয়ে দেখছিলুম—জেগে আছেন কিনা।"

একটা আড়ামোড়া ছাড়িয়া রতিনাথ আলস্য জড়িত কণ্ঠে বলিলেন, "ভেবেছিলুম ঘুমোব, তা আর হয়ে উঠল না দেখছি।"

তাঁহার পার্শ্বে বসিয়া মনীষা বলিল, "থাক, দিনের বেলা ঘুমিয়ে আর দরকার নেই। এই তো বলে থাক দিনের বেলা ঘুমোলে তোমার অসুখ করে, চোখে দেখতেও পাই তাই।"

রতিনাথ হাসিমুখে বলিলেন, "কি দেখতে পাও মা জননী ?"

মনীষা বলিল, "বাঃ, কিছু দেখতে পাইনে ? আমি যে আপনার মা, আপনি আমার ছেলে, ছেলের প্রকৃতি মায়ের জানতে কি কিছু বাকি থাকে বাবা ? বিশেষ যে ছেলে মায়ের ওপরই সম্পূর্ণ ভাবে নির্ভর করে, কোন সময়ে তাকে খেতে হবে, কোন সময়ে ঘুমাতে হবে, কোন সময়ে বেড়াতে যেতে হবে এ সব যে মায়ে ঠিক করে দেয়, সে মা ছেলেকে চিনবে না ?"

রতিনাথ গম্ভীর মুখ করিয়া বলিলেন, "তা বটে, আমি ভুলে গিয়েছিলুম যে আবার আমার ছোটবেলা ফিরে এসেছে, আবার আমি মায়ের কোলে ছোট্ট খোকা হয়েছি। তবে উঠেই বসি—কি বল মা, শুলে আবার মাথা ভার হয়ে উঠবে।"

কর্ত্তৃত্বের ভাবে মনীষা বলিল, "না, খানিকটা বরং শুয়ে থাকুন, ওতে শরীরটা বেশ ঝরঝরে বোধ হবে। শুয়ে বরং খানিক গল্প করুন, মনটাও ভাল থাকবে।

রতিনাথ কেবল হাসিতে লাগিলেন।

মনীষা তাঁহার মাথায় হাত বুলাইয়া দিতে লাগিল, খানিক নীরবে থাকিয়া বলিল, "একটা কথা আছে বাবা—"

রতিনাথ জিজ্ঞাসা করিলেন, "কি বল মা যা বলতে সঙ্কোচ বোধ করছ ?"

মণীষা বলিল, "আমি একটা কাজ করব ভাবছি, আপনি এতে আপত্তি করবেন কি না তাই ভাবছি।"

হাতের কাগজখানা পাশে ফেলিয়া রতিনাথ বিস্ময়ের সুরে বলিলেন, "বিলক্ষণ, এমন কি কাজ করবে যাতে আমি আপত্তি করব ?

সঙ্কোচের সহিত মনীষা বলিল, "আমি বাংলার মেয়েদের জন্যে একটা সংঘ গড়ে তুলতে চাই এতে আপনার অনুমতি চাই।"

রতিনাথ আশ্চর্য্য হইয়া গিয়া তাহার মুখের পানে তাকাইয়া রহিলেন।

মনীষা দৃঢ়তার সহিত বলিল, "আমি জানি আমার এ উদ্দেশ্য মহৎ জেনেই আপনি এতে অমত করবেন না, সেই জন্যে ওদিককার ব্যবস্থাও সব ঠিক করে ফেলেছি।"

রতিনাথ বৃথাই হাসিবার চেষ্টা করিয়া বলিলেন, "যদি ঠিকই করে ফেলে থাক মা তবে আবার আমায় জিজ্ঞাসা করতে এসেছ কেন বল দেখি ?"

মনীষা এবার হাসিয়া ফেলিল, বলিল, বাঃ, আপনাকে জিজ্ঞাসা করব না তো জিজ্ঞাসা করতে যাব কি পথের লোককে ? আপনি মত দেবেন তবে তো কাজ করতে পারব, যদি মত না দেন তবে—"

সে কথা শেষ না করিয়া ব্যগ্রদৃষ্টিতে রতিনাথের পানে চাহিল।

রতিনাথ মাথা দুলাইয়া বলিলেন, "ধর, আমি মত দেব না।"

মনীষা বলিল, "আমি কৈফিয়ৎ চাইব কেন মত দেবেন না।"

রতিনাথ বলিলেন, "দেব না এই জন্যে, আমি এক নম্বর স্বার্থপর লোক—তাই। আমি আমার মায়ের একটী মাত্র ছেলে, আমি চাই আমার মা আমাকেই খাইয়ে পরিয়ে, ঘুম পাড়িয়ে খেলা দিয়ে শান্তি পাবে, বাইরের পানে চাইবে কেন? মা যদি বাইরের দশটা কাজে হাত দেন, আমার পানে চাইবে কে, আমায় দেখাশোনা করবে কে?"

কথাটা সমাপ্ত করিয়া তিনি প্রচুর হাসিতে লাগিলেন, কিন্তু সে হাসির মধ্যে প্রকৃত আনন্দ যেন ছিল না, অন্তরের জমাট ব্যথা যেন সেই হাসির মধ্যে গলিয়া পড়িতেছিল।

মনীষা হাসিতে গিয়া হাসিতে পারিল না, মুখখানা বিকৃত করিয়া বলিল, "আমি বাইরের কাজ নিলে আপনার কথা ভুলে যাব এইটেই কি আপনি ধরে নিয়েছেন বাবা?"

হাসি থামাইয়া রতিনাথ বলিলেন, 'ধরে যে নিতেই হয় মা, প্রায়ই যে এই রকমই হয়। মেয়ে পুরুষ সবাই যদি বাইরের কাজ নিয়ে থাকে, ঘরের কাজ কে করবে বল দেখি? যদি তুমি আর আমি দুজনেই কর্ম্মক্লান্ত দেহভার কোন রকমে বয়ে একই সময়ে বাড়ীতে ফিরে আসি, কে কার শ্রান্তি ঘুচাতে ছুটবে বল দেখি?"

মনীষা মুখ নত করিয়া কি ভাবিতে লাগিল, তাহার পর ধীর কণ্ঠে বলিল, "কিন্তু বাবা, আমার দিন যে কাটতে চায় না। এই যে সারাদিনই আপনি বাইরে থাকেন, আমি কেবল সেলাই নিয়ে বই পড়ে কি করে দীর্ঘ দিনগুলো কাটাব?"

হঠাৎ যেন রতিনাথকে কে আঘাত করিল, অত্যন্ত সচকিত হইয়া উঠিয়া রতিনাথ একবার বিস্ফারিত চোখে মনীষার পানে তাকাইলেন।

সত্যই তো,—কি আত্মসুখী লোক তিনি, নিজের আরাম ও শান্তির আশায় অন্ধ হইয়াছেন, আর একজন যে তাঁহার সেই আনন্দ পাওয়ার মূলে নিজের সুখ আনন্দ নিঃশেষে ঢালিয়া দিয়া নিঃস্ব হইতেছে, তাহা তো তিনি একদিনও ভাবিয়া দেখেন নাই।

সত্যই তো, সমস্ত দিনমানটা তাঁহার বাহিরে কাটিয়া যায়, এই এতবড় বাড়ীটার মধ্যে কেবল মাত্র কয়েকটী দাস দাসীর সাহায্যে মনীষার দীর্ঘ দিন কাটিবে কি করিয়া?

একটা নিঃশ্বাস ফেলিয়া তিনি বলিলেন, "বড় স্বার্থপরের মত কাজ করছি—না মা? তোমার বিশ্বের উপর ছড়ানো স্নেহ গুটিয়ে এনে একটীর মধ্যে সীমাবদ্ধ করতে চাই। না মা, আমি যতদিন তোমার বেদনা বুঝি নি, তোমায় বদ্ধ করে রেখেছি, এবার তোমায় মুক্তি দেব। তুমি যাতে শান্তি পাও কল্যাণি—তাই কর।"

মনীষা মাথা নাড়িল, "না বাবা, আর যাব না।"

রতিনাথ বিস্মিত হইয়া গিয়া বলিলেন, "কেন?"

মনীষা বলিলেন, "এ কথা সত্যি যে বাইরের কাজে হাত দিলে ভেতরের কাজ কিছু করতে পারব না। তার চেয়ে আমি যেমন আছি তেমনই থাকি।"

স্নেহভরে তাহার হাতখানা নিজের হাতের মধ্যে টানিয়া লইয়া রতিনাথ বলিলেন, "পাগলী মা, অমনি রাগ হয়ে গেল? না হয় আমি যতক্ষণ বাড়ী থাকব ততক্ষণ তুমিও বাড়ী থাকবে, আমি যখন বার হব তখন তুমিও বার হবে, তা হলে আমার তো কোন ক্ষতিই হবে না।"

একটু থামিয়া তিনি বলিলেন, "কিন্তু এই নারীসংঘের ব্যাপারটা কি আমায় একটু বুঝিয়ে দাও দেখি মা, তোমার কাজটা কি রকম চলবে একটু দেখা যাক। শেষটায় যেন খুব আড়ম্বর করে দশজনকে জানিয়ে কাজে নেমে যেন লোক হাসিয়ো না; এর পর দশজনে যে তোমায় ঠাট্টা বিদ্রূপ করবে সে কিন্তু আমি সহ্য করতে পারব না।"

মনীষা উৎসাহিতা হইয়া বলিল, "না বাবা, আপনি দেখে নেবেন এ কাজ আমি দশজনকে জানিয়ে করব না, চুপি চুপি আরম্ভ করব, পরে যদি ভাল ফল হয় তখন সকলেই জানতে পারবে। এ যে দরিদ্র মেয়েদের নিয়ে কাজ বাবা, ওরা আড়ম্বর করবে কি করে?"

"দরিদ্র মেয়েদের—মানে?"

মনীষা বলিল, "আপনি বুঝি ভাবছেন বাবা আমি বড়লোকদের নিয়ে কাজ করব, কিন্তু তা নয়, আমি গরীব অসহায়া মেয়েদের জন্যেই এই আশ্রয়টা গড়ে তুলব।

যাদের দেখতে কেউ নেই, একদিন যারা সমাজের মধ্যে স্থান পেয়ে আজ হয় তো পরের অত্যাচারে কিম্বা নিজেদের সামান্য ভুলে পথ হারিয়ে ফেলায় সমাজ যাদের তাড়িয়ে দিয়েছে, যাদের আত্মীয় স্বজন কেউ থেকেও নেই, আমার এই প্রতিষ্ঠান কেবল তাদের জন্যেই হবে। যে সব ছোট ছোট ছেলে মেয়েরা বিশ্বের ঘৃণিত ত্যক্ত, যাদের জীবন কেবল অন্ধকারেই থাকবে বলে ভাবা যায়, যারা কোন দিন সৎ হবে আশা করাও ভুল বলে মনে হয়—আমার এ আশ্রমে সেই সব অভাগা ছেলে মেয়ে আশ্রয় পাবে। তারা জন্মেছে এই মাত্র তাদের অপরাধ, তাদের মা বাপের পরিচয় তারা জানে না, এ প্রতিষ্ঠান তাদের জন্যেই তৈরী হবে। বাবা, আপনি চিরদিন উঁচু দিকে নজর রেখেছেন, একবার ঘৃণা না করে এদের দিকে চান দেখি। একদিন হয় তো ওরাই মানুষের মত কাজ করবে, ওদের মধ্যে হয় তো এমন প্রতিভা আছে যাতে তারা বিশ্ববাসীকে চমকে দিতে পারবে, তাদের কি ভাবে ধ্বংস করা হয় দেখুন দেখি। এদের মত হতভাগা দুনিয়ায় আর নেই; এদের জীবন এরা নিতান্ত দুর্ব্বহ বলে মনে করে, ভালো হওয়ার কল্পনা এরা মনেও আনতে পারে না। আবার এরাই এই রকম কতগুলি ঘৃণিত জীবকে জগতে টেনে আনে, এমনি করে দেশ যে ক্লেদে ভরে উঠছে। আমি ওদের ওই ছন্নছাড়া জীবনগুলোকে একটা সূতোয় গেঁথে ফেলতে চাই, ওদের সৎ করতে চাই, ওরাও যে মানুষ, জগতে ভাল কাজ করবার অধিকার যে ওদেরও আছে সেই শিক্ষা ওদের দিতে চাই।"

ধীরে ধীরে রতিনাথের মুখখানা দৃপ্ত হইয়া উঠিল, চোখ দুইটী নিজের অজ্ঞাতে কখন অশ্রুজলে পূর্ণ হইয়া উঠিল; অতি গোপনে কখন তিনি তাহা মুছিয়া ফেলিলেন, মনীষা তাহা দেখিতে পাইল না।

তেমনই গোপনে একটা দীর্ঘনিঃশ্বাস ফেলিয়া রতিনাথ বলিলেন, "তোমার উদ্দেশ্য অতি মহৎ; আশীর্ব্বাদ করছি সফলতা লাভ কর।

আহ্বান

শ্রীবাণী রায়

তোমার আহ্বান
অশান্ত সাগর বক্ষে ঝটিকার গান
বিদ্যুৎ চকিত দৃষ্টি,
ধ্বংসের মাঝারে সৃষ্টি;
কৃপণের সব দেওয়া মহিমার দান
তোমার আহ্বান।

তোমার আহ্বান,
কিশোরীর সহসা সে জেগে ওঠা প্রাণ।
বালিকার লাজ হাসি
পথিকের ভাঙ্গা বাঁশী
কোয়েলার সকরুণ মুখরিত তান
তোমার আহ্বান।

তোমার আহ্বান
দূর হতে ভেসে আসা পুণ্য অবদান।
ভয়ে ভয়ে থাকি কাছে
আমার যা কিছু আছে
বিলাইয়া তব পদে হব অবসান
শুনি ও আহ্বান।

বিশ্রাম

শ্রীঅমলা দেবী

সুদূর নীলিমা তল দিগন্ত বিস্তারি
সজল কাজল মেঘে গেছে আজ ভরি।
চমকে বিজলী ঘন উতলা পবন।
ঘুমাও ঘুমাও ওগো শ্রান্ত প্রাণ মন।
যতনে উজল করা সন্ধ্যা দীপ খানি
বাতাসে নিভিয়া গেছে। উতলা শ্রাবণী
নিশীথ গগন তলে দেছে ফেলে তার
দিগন্ত বিস্তার করি কালো কেশ ভার।
সাথী হীন শূন্য গৃহ শুধু পথ দেখি—
ঘুমাও ঘুমাও ওগো ক্লান্ত দুই আঁখি।

"প্রথম দান"

রাণী শ্রীসুরুচি বালা চৌধুরাণী

কেগো তুমি, এলে আজি, তরুণ সুন্দর !
অজানা অচেনা মোর নবীন অতিথি,
দ্বারে এসে দাঁড়াইলে বুকে ল'য়ে ব্যথা,
তুলিয়া নূতন সুরে গাও মধু গীতি ?

হে নবীন ! নিদ্রালস আঁখি-কোণে তব
এখনো জড়ায়ে আছে স্বপন মাধুরী,
মুছাইতে চাও কেন আধ ঘুম ঘোর
এনেছ কি ওই তব পাত্রখানি ভরি ?

অথবা কমল-করে শুধু ডালি লয়ে
কি দান দিবার ছলে হে চির-ভিখারী,
লুটিয়া ল'বে কি মম জীবনের সার,
নিঃস্ব করিয়া মোর এ বুক নিঙারি ?

সাথে লয়ে ফাগুনের মদির জীবন
এসেছো কি দিতে মোরে নবীন আশ্বাস,
খুলিয়া কি এ দুয়ার করিব বরণ।
মিটাবে কি পরাণের অসীম তিয়াস ?

কিবা আশা আধ সুরে জাগায়ে তুলিলে,
গোপন কথায় কও আধ পরিচয়
আধ খোলা দুয়ারের আলো-ছায়া পথে,
কি মোহন রূপে আজি তোমার উদয় ?

মরমের আধ ভাঙা তারে তুলি তান
কি নব আবেশে মোর হরিলে হে চিত,
ভাঙিলে স্বপন জাল এক লহমায়
কিসের পিয়াসী তুমি হে অপরিচিত ?

জানো কিহে এ জীবনে কত সুধা বহি,
কত ভাব কত ভাষা নাহি তার শেষ
আকুল এ হিয়া মাঝে কত আছে গান
জানাতে কাহারে চাই বেদনা অশেষ ?

যুগ যুগ ধরি' প্রিয় কাহার লাগিয়া
জীবনের অফুরাণ যত মাধুরিমা,
বিরহের ব্যথা ভরা অপূরিত আশা,
[illegible]লন মাগিয়া কভু পায় নাই সীমা ?

ওগো সখা ! কৌমার্য্যের পীত বাস পরি,
আজি কি এ শুভ লগ্নে দিলে মোরে দেখা।
কে বাজালো শঙ্খে ওই শান্ত উলু ধ্বনী
সাজাইয়া দীপ দেয় আলিপনা রেখা ?

হে কুমার ! তোমারি ও মোহময় আঁখি
প্রথম মিলন কি সে যাচে মোর সনে,
মিলনের মধুমাখা এ সুখের স্মৃতি
র'বে কি উজল সদা তোমারি ও মনে ?

তোমার অরুণ রঙে আমারে রাঙায়ে
প্রথম সোহাগ হার পরাইলে গলে,
প্রথম তিলক সাথে, বরণ-মালায়
অভিষেক করিলে কি নয়নের জলে ?

চাইনা তোমার কিছু লও মোর দান,
শূন্য হোক মোর এই ভরা ঘর খানি,
তোমাতেই মিশাইয়া যত কিছু মম
ফুটাইব চির মধু প্রণয়ের বাণী।

তোমার হিয়ার পাতে প্রথম লিখন,
লিখিনু উজাড় করি সব ভাষা মোর,
তোমারই বীণার তারে প্রথম রাগিণী
বাজাইনু প্রিয়তম ! মুছি' আঁখি-লোর।

সুধা

শ্রীহরিপদ গুহ — গল্প —

এক

স্বামী-স্ত্রীতে কথা হইতেছিল।

স্ত্রী মন্দাকিনী বলিল—'আর কতদিন মেয়েকে এমন করে পুরুষের সাজে রাখ্‌বে? এদিকে যে সুধার বারো বছর বয়স হতে চল্‌ল, সে খেয়াল কি তোমার আছে? মেয়ের যা বাড়ন্ত গড়ন, চৌদ্দয় বে দিতেই হবে;—আর মেয়েই বা কি, ওতো কিছুতেই শাড়ী-সেমিজ পর্‌তে চাইবে না!'

স্বামী হেমেন্দ্রনাথ হাসিল।

বলিল—'ভালই তো; ঠিক্‌ই তো কর্‌ছে ও। তুমি ওকে মেয়ে মনে কর্‌ছ কেন? ধরেই নাওনা কেন—ও আমাদের ছেলে। আমি তো কিছুতেই ভাব্‌তে পারি না যে, সুধা আমার মেয়ে। ছেলেতে-মেয়েতে কিছু প্রভেদ আছে বলে তো আমার মনে হয় না। আমরা জোর করে মেয়েদের কতকগুলি গণ্ডির মধ্যে সীমাবদ্ধ করে রাখি বলেই না তারা মেয়ে! আমি সুধাকে দিয়ে সেটা দেখাতে চাই।—'

মন্দাকিনী আশ্চর্য্য হইয়া দুই চোখ বিস্ফারিত করিয়া বলিল—'সে কী গো? লোকে তা' হলে বল্‌বে কি? সুধার বে দেবে না?'

হেমেন্দ্রনাথ হাসিল; বলিল—'আমি তো বলিনি যে, সুধার বে দেবো না!'

মন্দাকিনী আগ্রহ ভরে ব্যগ্রস্বরে বলিল—'দেবে? কার সঙ্গে? ছেলে, না মেয়ে?'

হেমেন্দ্রনাথ সহাস্য বদনে বলিল—'ধর যদি মেয়েই হয়; কেমন হয় তবে?'

মন্দাকিনী এইবার হো-হো শব্দে উচ্চহাস্য করিয়া বলিল—'বেশ হয়। শীগ্‌গিরই তবে নাতির মুখ দেখ্‌তে পাবে।'

হেমেন্দ্রনাথ গম্ভীর স্বরে বলিল—'তা আর আশ্চর্য্য কি। তোমাদের ধর্ম্মগ্রন্থ রামায়ণে ভগীরথ যখন একটি জলন্ত দৃষ্টান্ত রয়েছে।—'

সহসা সুধা সেখানে উপস্থিত হওয়ায় আলোচনাটা চাপা পড়িয়া গেল।

সুধা বলিল—'বাবা, এক্ষুণি আমার বাইকের ব্রেক্ ঠিক্ করে দাও। ওটা একেবারে বেঁকে গেছে।'

হেমেন্দ্রনাথ বলিল—'সে কীরে সুধা, নতুন সাইকেল, এরি মধ্যে ব্রেক বেঁকে গেছে কীরে? পড়ে গিয়েছিলি বুঝি?'

সুধা কহিল—'না বাবা, আমি পড়্‌ব কেন, অত আনাড়ী তোমার সুধা নয়! পড়ে গেছে রায়েদের শিবু। আমি কত বারণ কর্‌লুম;—ও তা শুন্‌লে না, বল্‌লে—'দে ভাই, একটিবার চড়ি।' তারপর যেই দিয়েছি,—ওই মোড় থেকে ফিরে আস্‌বার সময় মারলে এসে গ্যাস্‌পোষ্টে এক ধাক্কা। হুড়মুড় করে সাইকেল নিয়ে সে পড়ে গেল। ছুটে গিয়ে দেখি—ব্রেকটা একেবারে বেঁকে গেছে আর ষ্টুপিড্‌টার কাপড় ছিঁড়ে হাতটা অনেকখানি ছড়ে গেছে।'

হেমেন্দ্রনাথ প্রশংসমান-দৃষ্টিতে কিছুক্ষণ কন্যার মুখের দিকে চাহিয়া থাকিয়া চাকর নিধেকে ডাকিয়া দিল—তখনই যেন সে ব্রেক্‌টা ঠিক করিয়া আনিয়া দেয়।'

দুই

হেমেন্দ্রনাথ ধনীর সন্তান। পিতা খুব অল্প বয়সেই মন্দাকিনীর সহিত তাহার বিবাহ দিয়াছিলেন। তাহার পর সংসারের অনেক পরিবর্ত্তন ঘটিয়াছে।

স্নেহময় পিতা এবং মাতা উভয়েই পুত্রের মায়া কাটাইয়া ধরণীর এই পান্থশালা হইতে বিদায় লইয়া নূতন জগতে সংসার পাতিয়া বসিয়াছেন।

মন্দাকিনী অনেকদিন পর্য্যন্ত নিঃসন্তান ছিল। একটি

সন্তানের জন্য স্বামী-স্ত্রীতে কী আকুল প্রার্থনাই না করিয়াছিল! ব্রত, উপবাস, কবচ ধারণ যে যখন যাহা বলিয়াছে, মন্দাকিনী তখনই তাহা করিয়াছে। কিন্তু কোন ফলই ফলে নাই। মন্দাকিনী নিজে তো একেবারেই হতাশ হইয়া পড়িয়াছিল।

সকলে যখন বলিতেছিল যে, সন্তান হইবার আর কোন আশা নাই, ভগবানের এমন লীলা,—ঠিক্ তখনই কিন্তু আশার লক্ষণ দেখা গেল। অধিক বয়সে মন্দাকিনী সন্তান-সম্ভাবিতা হইল। তাহার সমস্ত দেহে এক নূতন লাবণ্য দেখা দিল। মাতৃত্বের বিকাশের সূচনা হইল।

স্বামী-স্ত্রীর মনে আনন্দ আর ধরে না। তাহারা রাতদিন কত জল্পনা-কল্পনা করিত; কত ভাঙ্গিত, কত গড়িত।

কি সন্তান হইবে তাহা লইয়া দুইজনে বাদানুবাদ চলিত।

হেমেন্দ্রনাথ বলিত—'ছেলে।'

মন্দাকিনী বলিত—'মেয়ে।'

তখন হইতেই এই অনাগতের জন্য দুই সেট্ করিয়া সমস্ত জিনিষ প্রস্তুত আরম্ভ হইয়া গেল।

তারপর সেই শুভ আসন্ন কালের জন্য এক বুক আশা-আকাঙ্ক্ষা লইয়া উভয়ে অপেক্ষা করিতে লাগিল।

ইহার কিছুদিন পর তাহাদের চির আকাঙ্ক্ষিত ধন সুধার জন্ম হইল। অনেকেই ভয় দেখাইয়াছিল যে, অধিক বয়সের সন্তান, প্রসবের সময় আশঙ্কা আছে। কিন্তু মন্দাকিনীর খুব সু-প্রসবই হইয়াছিল।

সুধা ছিল একাধারে তাহাদের ছেলে এবং মেয়ে। এক মুহূর্ত্তও তাহারা তাহাকে চোখের আড়াল করিত না। শিশুকাল হইতেই হেমেন্দ্রনাথ সুধাকে ছেলের মতো পোষাক পরাইয়া ছেলের মতোই ব্যবহার করিয়া আসিয়াছে। সুধার মুখখানিও ছিল অবিকল পুরুষের ছাঁচে ঢালা। সে কোন দিনও মেয়েদের মতো বউ-বউ কিম্বা ঘর-সংসার পাতিয়া পুতুল লইয়া কোন খেলা খেলে নাই। মার্ব্বেল, লাট্টু, ফুটবল ইত্যাদি ছিল তাহার ক্রীড়নক, আর খেলার সাথী ছিল পাড়ার যত ছোট ছোট ছেলেরা। তাহার বয়স বাড়িবার সঙ্গে সঙ্গে সাঁতার, ঘোড়ায় চড়া, সাইকেল, হাইজাম্প লঙ্ জাম্প ইত্যাদিও শিখিয়া ফেলিয়াছিল। তাহার চলাফেরা, কথাবলার মধ্যেও পুরুষালী ভাব্‌টা এমন প্রবল ছিল যে, কোন অপরিচিতের পক্ষে তাহাকে মেয়ে বলিয়া অনুমান করা বড়ই কঠিন।

শৈশবে মন্দাকিনী কয়েকবার কন্যার নাক-কান ফুঁড়িয়া তাহাকে গহনা পরাইবার চেষ্টা করিয়াছিল; কিন্তু সুধার চীৎকারে ও হেমেন্দ্রনাথের আপত্তিতে তাহা কাজে লাগাইতে পারে নাই। মাথায় মেয়েদের মতো বড় চুল রাখিতেও সুধার ঘোর আপত্তি। প্রথম প্রথম বব্‌ড ছিল, এখন দশ আনি ছ' আনি করিয়া ছাঁটা।

প্রতি ঘটনাতেই বাপ ও মেয়ে একদিকে আর মা একা একদিকে থাকিত। কাজেই মন্দাকিনী কোনটাতেই বিশেষ সুবিধা করিতে পারিত না। তাহার কোন যুক্তি-তর্কই টিকিত না। ইদানীং তাই সে প্রায় একেবারে নীরবই থাকিত।

তিন

বছর খানেক পরেই কিন্তু হেমেন্দ্রনাথের মতের পরিবর্ত্তন ঘটিল।

সুধার দেহ-লতা বর্ষার নদীর মতো কূলে কূলে ভরিয়া উঠিয়াছে। এখন সুধার নিজেরও ছুটাছুটি করিতে সময় সময় কেমন একটু লজ্জা করে। মন্দাকিনী তো প্রায় সকল সময়ই তাহার উপর খড়্গ হস্ত। বাহিরের ছেলেদের সহিত খেলা তো একেবারেই বন্ধ হইয়া গিয়াছে। এখন তাহাকে শাড়ী-সেমিজ-জ্যাকেট পরাও অভ্যাস করিতে হইতেছে। এমন কি কানে এক জোড়া দুল পর্য্যন্ত পরিতে হইয়াছে। এত করিয়াও কিন্তু মন্দাকিনী তাহার দেহে নারীর মাধুর্য্যটুকু ফিরাইয়া আনিতে পারে নাই। শাড়ী-সেমিজ পরিলে কি হয়, তাহার চলা এখনও ঠিক্ পুরুষের মতো। গলার স্বরে, মুখের হাসিতে, চোখের চাহনিতে রমণীসুলভ কমনীয়তা-টুকুর একান্ত অভাব।

হেমেন্দ্রনাথ আজকাল মধ্যে মধ্যে সুধাকে সতী, সীতা, সাবিত্রীর উপাখ্যান পড়িয়া শোনাইয়া বলে—'তুমিও ওদের মতো স্বামীকুল উজ্জ্বল করে নারীর গৌরব অটুট রেখো কিন্তু।'

সুধা হাসিয়া বলে—'বিয়ে করলে তো! বয়ে গেছে।

মন্দাকিনী ঝঙ্কার দিয়া বলিয়া ওঠে—'বে করবে কেন? বি-এ, এম্-এ পাশ দিয়ে বিলেত যাবে।—'

হেমেন্দ্রনাথ বাধা দেয়। বলে—'তুমি চুপ কর না।' তারপর সুধাকে কাছে টানিয়া আনিয়া উপদেশ দিতে থাকে। বলে—'তুমি তো এখন বড় হয়েছ সুধা! ছেলেদের সঙ্গে আর খেলতে যেও না! তোমাকে এক সেট্ ভাল পুতুল এনে দেবো, তাই দিয়ে খেলো। সঙ্গে সঙ্গে মার কাছ থেকে ভাল করে রান্না-বান্নাটাও শিখে নিয়ে আমাকে দিন কতক রেঁধে খাওয়াও দেখি! তোমার মার হাতের রান্না খেয়ে খেয়ে একেবারে অরুচি ধরে গেছে!'

সুধা কোন কথা কহে না মুখ ভার করিয়া বসিয়া থাকে।

চার

পূর্ণোদ্যমে ঘটক লাগিয়া গিয়াছে।

নানাস্থান হইতে দুই-একটি করিয়া সম্বন্ধও আসিতে লাগিল। মেয়ে দেখিয়া পছন্দ না হওয়ায় আবার ফিরিয়াও যাইতে লাগিল। আবার নূতন সম্বন্ধ আসিতে থাকে।

সুধাকে সু-সজ্জিত করিয়া আসরে আনিয়া বসাইয়া দিলে বরপক্ষ যখন তাহাকে কোন প্রশ্ন করে,—সে তখন হয় দুলিতে থাকে, না হয় শিস্ দেয়, কিম্বা আশেপাশে পরিচিত কোন সখীকে দেখিতে পাইলে—'হাঁ করে দাঁড়িয়ে তোরা এখানে কী দেখছিস্?' বলিয়া চীৎকার করিয়া ওঠে।

বরপক্ষ পরক্ষণেই পলাইবার পথ খুঁজিতে থাকে।

হেমেন্দ্রনাথ বড়ই চিন্তিত হইয়া পড়িল। সুধাকে এতো করিয়া বুঝাইয়াও কোন ফল হইল না। সে কিছুতেই বালক-সুলভ চপলতা ছাড়িতে পারিল না।

মন্দাকিনী তর্জ্জন করিয়া বলিল—'কেমন, তখনই বলেছিলুম না,—এখন ঠ্যালা সাম্‌লাও!'

হেমেন্দ্রনাথ কোন উত্তর দিল না।

* * * *

প্রজাপতির খেলা; ফুল ফুটিলে নাকি বিবাহ হইবেই। সুধার বিবাহ সম্বন্ধে যখন সকলেই একেবারে হতাশ হইয়া পড়িয়াছে, তখন অন্তরীক্ষে দেবতা হাসিলেন। শীঘ্রই একটী সম্বন্ধ আসিল। বড় লোকের একমাত্র মেয়েকে দেখিয়া খুব সহজেই পছন্দ হইয়া গেল।

পাছে এমন দাঁও হাত ছাড়া হইয়া যায়, তাই বরপক্ষ তখনই পাকা-পাকি বন্দোবস্ত করিতে ইচ্ছা প্রকাশ করিল।

হেমেন্দ্রনাথ কিন্তু চট্ করিয়া তাহাতে রাজী হইতে পরিল না। বলিল—'বেশ তো ভেবে-চিন্তে দেখি, উভয় পক্ষের মত হলে পরে একটা ভাল দিন ঠিক্ করে পাকা দেখ্‌লেই চল্‌বে'খন!' অগত্যা বরপক্ষ আর কি করেন! তাহাতেই স্বীকৃত হইয়া উঠিয়া পড়িলেন।

পাঁচ

মন্দাকিনী হেমেন্দ্রনাথকে ধরিয়া বসিল—'অমত করো না; এখানেই সুধার বিয়ে দাও! যাহোক্, ছেলেটি তো ভাল; এবার বি-এ দিয়েছে। জমীদারীর অবস্থা খারাপ;—তার আর কি করবে বল? সুধার অদৃষ্ট তো কেউ আর নিতে পারবে না! আমাদের আর কেই বা আছে? যা আছে, তা তো ওরাই পাবে। ছেলেটি বি-এ পাশ দিয়ে আর কোন্ বড় কাজ-টাজ না করবে। এদিকে মেয়ে যা গুণবতী; এখানে যদি না দাও, তবে জেনো ওর বরাতে আর বিয়ে নেই!'

হেমেন্দ্রনাথও এই বিষয়টা খুব ভাল করিয়া ভাবিয়া দেখিতেছিল। কয়েকদিন চিন্তার পর সে মত করিয়া পাত্রের পিতার নিকট এক পত্র দিল।

তাঁহারা একটা দিন ঠিক্ করিয়া একদিন পাকা-দেখা করিয়া সুধাকে আশীর্ব্বাদ করিয়া গেল।

* * * *

বৈশাখের এক শুভ দিনে নলিনী মোহন চৌধুরীর সহিত শ্রীমতী সুধার বিবাহ হইয়া গেল। বিবাহের পূর্ব্বে সুধা বায়না ধরিয়া বসিল—সে বড় করিয়া ঘোম্‌টা দিতে পারিবে না কিন্তু!

মন্দাকিনী হাসিয়া বলিল—'অত বড় করে তোমাকে

ঘোম্‌টা দিতে হবে না। মাথার কাপড়টা সাম্‌নের দিকে একটু টেনে দিলেই চল্‌বে 'খন !'

পরদিন হেমেন্দ্রনাথ বৈবাহিককে ডাকিয়া বলিল—'দেখুন, আমাদের একটি মাত্র সন্তান সুধা, বড় আদরের। একে তেমন করে শিক্ষা দিতে পারি নি। বড় অভিমানী সে, পদে পদে হয় তো ভুল কর্‌বে ;—দয়া করে সব ক্ষমা করে সংশোধন করে নেবেন !'

বৈবাহিক নরেন্দ্রবাবু জোর করিয়া হাসি টানিয়া আনিয়া বলিলেন—'তা তো বটেই। তা নেব বৈকি। সব জেনে, দেখে-শুনেই তো বধূমাতাকে ঘরে নিলুম। আপনি সে জন্ম কোন চিন্তা কর্‌বেন না !'

বৈকালে অশ্রুর বন্যা বহাইয়া জনক জননী স্নেহের দুলালীকে বিদায় দিল। সুধাও আজ অশ্রু রোধ করিতে পারিল না।

ছয়

নলিনী খুব আপ-টু-ডেট্‌ ছেলে। সুধাকে খুব ফরওয়ার্ড দেখিয়া তাহার বেশ ভালই লাগিল। সে তাহাকে চট্‌ করিয়া ভালবাসিয়া ফেলিল। সে যে জিনিষটা পছন্দ করিল, বাড়ীর অন্যান্য লোকেরা ঠিক সেটাকেই বেয়াদপি ও লজ্জাহীনতা আখ্যা দিয়া বসিল।

নলিনী মধ্যে মধ্যে মাসিক পত্রিকায় লিখিয়া থাকে। স্ত্রী-স্বাধীনতা সম্বন্ধে ইতঃপূর্ব্বে সে কয়েকটি প্রবন্ধও লিখিয়াছিল। তাহাতে সে দেখাইয়াছে যে, এদেশের মেয়েরা কাপড়ের বস্তা ব্যতীত আর কিছুই নহে ; নিজের কোন সত্বা নাই। কাজেই সে সুধাকে পাইয়া সুর ফেরতা ধরিল এবং মনে মনে খুব গর্ব্ব অনুভব করিল। এখন হইতে সে নূতন উদ্যমে প্রবন্ধ লিখিয়া নীচে নাম সহি করিতে লাগিল—শ্রীসুধানলিনী চৌধুরী বি-এ।'

বন্ধু-মহলে এই যুগল নাম লইয়া খুব হাসি-তামাসা চলিতে লাগিল।

* * *

নলিনীর মা এবং বড়দিদি সুধাকে বিষ-দৃষ্টিতে দেখিয়াছিল। বড়লোকের মেয়ে বলিয়াই হোক্‌ বা অন্য যে কোন কারণেই হোক প্রথম প্রথম সুধাকে কিছু বলে নাই। কিন্তু, যখন তাহারা দেখিল—নলিনী তাহার বড় অনুরক্ত হইয়া পড়িয়াছে ;—নিজের ছেলে পর হইয়া যায়—তখন যত রাগ গিয়া পড়িল কালনাগিনী ধিঙ্গী মেয়ে সুধার উপর। সুযোগ পাইলে তাহাকে তাহারা কুট্‌ কুট্‌ করিয়া কামড়াইতে লাগিল। তাহার পিতামাতার নিন্দা করিতে লাগিল।

সহ্য করিবার মেয়ে সুধা নয়। তবুও বিদায়কালীন মায়ের অনুরোধ স্মরণ করিয়া অনেক দিন সে নীরবে সহ্য করিয়াছে ; কিন্তু, ধৈর্য্যেরও একটা সীমা আছে। একবার বাঁধ ভাঙ্গিয়া গেলে, তাহাকে আর আটকান যায় না।

একদিন মা-বাপ তুলিয়া গালি-গালাজ করাতে সুধাও তাহাদের কড়া-কড়া দুই কথা শুনাইয়া দিল। ইহাতে তাহার শাশুড়ী ও ননদ কাঁদিয়া-কাটিয়া একেবারে বিভ্রাট বাধাইয়া ছাড়িল। পাড়ার আশে-পাশের বাড়ীতে সত্য-মিথ্যা নানা কথা বলিয়া সুধাকে সকলের কাছে একেবারে হেয় করিয়া দিল।

সুধা তাহার মাকে সমস্ত ঘটনা লিখিয়া জানাইল। মন্দাকিনী মেয়ের লাঞ্ছনার সংবাদে অশ্রু সংবরণ করিতে পারিল না। হেমেন্দ্রনাথকে ধরিয়া বসিল—'কিছুদিনের জন্য সুধাকে এখানে নিয়ে এসো !'

হেমেন্দ্রনাথ বৈবাহিককে পত্র দিল—যে, একটা ভাল দিন দেখিয়া সুধাকে দিন কতকের জন্ম এখানে লইয়া আসিবে।

নরেন্দ্রবাবু পত্রোত্তরে জানাইলেন—'বধূমাতা সন্তান সম্ভাবিতা ; এই অবস্থায় এখন পাঠান অনুচিত।'

হেমেন্দ্রনাথ মন্দাকিনীকে ডাকিয়া শুভ-সংবাদটা শুনাইয়া বলিল—'দেখো, এইবার কেউ আর সুধার কোন নিন্দা কর্‌তে পার্‌বে না। মাতৃত্বেই নারীর পূর্ণ বিকাশ !'

মন্দাকিনী স্বামীকে পূর্ব্বের কথা স্মরণ করাইয়া দিয়া বলিল—'তুমিই কিন্তু একদিন এর বিরুদ্ধে বলেছিলে।'

সাত

সেদিন সন্ধ্যা হইতেই টিপ্‌ টিপ্‌ করিয়া বৃষ্টি পড়িতেছিল। মন্দাকিনী সুধার ছেলের জন্য একখানি নক্সী-কাঁথা শেলাই করিতেছিল।

সহসা চির-পরিচিত কণ্ঠের ডাক আসিল—'মা !'

তারপরই সে ঘরে প্রবেশ করিল সুধা; কোলে ফুলের মতো ফুটফুটে একটি সুকুমার শিশু।

মন্দাকিনী তাড়াতাড়ি উঠিয়া খোকাকে কোলে তুলিয়া নিল। সুধা মাতার পদধূলি লইয়া বলিল—'কতদিন তোমাদের দেখিনি, আমার মন কেমন কর্‌ছিল তাই কোন খবর না দিয়েই হঠাৎ চলে এলুম। ওঁরা এখন আমাকে খুব ভালবাসে। সেই সুধা আর এখন নেই মা, একেবারে বদ্‌লে গেছি !'

মন্দাকিনীর মুখ খুসীতে ভরিয়া উঠিল।

নলিনী আসিয়া মন্দাকিনীকে প্রণাম করিতেই, সুধা ঘোম্‌টা টানিয়া দিয়া এক পাশে সরিয়া দাঁড়াইল।

সত্য সত্যই সুধার অদ্ভুত পরিবর্ত্তন ঘটিয়াছে। সমস্ত দেহে তাহার এমন একটা লালিত্য আসিয়াছে, যাহা অতি সহজেই সকলে মুগ্ধ করে। তাহার সেই রূঢ় ভাবও আর নাই। এখন সে একেবারে শান্ত, অনেক কিছু সে এখন সহ্য করিতে পারে ! যেন কোন সোনার কাঠির স্পর্শে তাহার নূতন জীবন লাভ হইয়াছে।

হেমেন্দ্রনাথ সস্নেহে কন্যাকে পাশে বসাইয়া হাসিয়া বলিল—'ওরে সুধা, তোর সেই সাইকেলটায় একবার চাপ্‌বি না ?'

সুধা—'যাও।' বলিয়া হাসিতে লাগিল।

———

দৈবাৎ

শ্রীশরদিন্দু বন্দ্যোপাধ্যায় বি-এল, [দৃশ্য গল্প]

পরিচয়

পরিতোষ বাবু—ভদ্রলোক, অবস্থাপন্ন, বিপত্নীক, নিঃসন্তান।

শৈলেন—যুবক, উচ্চ শিক্ষিত, মাতৃ পিতৃহীন, মাতুল পরিতোষ বাবু কর্ত্তৃক পুত্রবৎ পালিত।

উষা—শৈলেনের কনিষ্ঠা ভগিনী।

ফটিক—বালক ভৃত্য।

ভাগিনেয়—আগন্তুক

———

সকলেই বায়ু পরিবর্ত্তনের জন্য দেওঘরে আসিয়াছেন।

প্রথম দৃশ্য

জসিডি জংসন। ডিগরিয়া পাহাড়ের প্রায় পাদমূলে। সন্ধ্যা হইয়াছে; বৃষ্টি হইতেছে, জোরে ঝড় বহিতেছে। কিছুই স্পষ্ট দেখা যাইতেছে না। কেবল মাঝে মাঝে বৃষ্টির জল জমিয়া একটা মলিন শ্বেতাভার সৃষ্টি হইয়াছে।

উষা অতি সাবধানে পা ফেলিয়া পাহাড়ের দিক হইতে প্রবেশ করিল। তাহার গা ওয়াটার প্রুফে ঢাকা—পায়ের শাদা চাম্‌ড়ার জুতা জল ও কাদায় অত্যন্ত ভারী হইয়া উঠিয়াছে। উহাকে দেখিয়া মোটেই ভীত বা উৎকণ্ঠিত বোধ হইতেছে না। বরং সে যেন এই ঝড় বৃষ্টির মধ্যে পথ হারাইয়া যাওয়ার ব্যাপারটাকে বেশ উপভোগ করিতেছে।

বিদ্যুৎ চমকিল এবং পরক্ষণেই বজ্রের একটা বিকট আর্ত্তনাদ উঠিল।

উষা হঠাৎ ভয় পাইয়া চেঁচাইয়া উঠিল ;—'মামা—মামা—'

পাহাড়ের দিক হইতে সাহেব বেশধারী এক ব্যক্তি প্রবেশ করিল। পিছিল জমির উপর পা হড়্‌কাইয়া পড়িতে পড়িতে দু'বার সামলাইয়া লইল। কিন্তু তৃতীয়বার আর পারিল না—হঠাৎ তিন চার হাত দূর পর্য্যন্ত পিছ্‌লাইয়া গিয়া কাদার মধ্যে উপুড় হইয়া

পড়িয়া গেল। সেই সঙ্গে তাহার মাথার টুপীটা দমকা হাওয়ায় উড়িয়া গিয়া ব্যোম-পথে অদৃশ্য হইল।

উষা অন্ধকারে ঠিক ঠাহর করিতে না পারিয়া ছুটিয়া কাছে আসিয়া ডাকিল ;—'মামা—'

সে ব্যক্তি উঠিয়া বসিল। নাসিকার অগ্রভাগ হইতে কর্দ্দম মুছিয়া ঝাড়িয়া ফেলিল। তারপর বলিল ; 'আমি মামা নই—আমি ভাগ্নে।'

উষা অবাক হইয়া গেল।

উষা।—ভাগ্নে ?

ব্যক্তি। হ্যাঁ—ভাগ্নে। কিন্তু মামা আমার সঙ্গে সদ্ব্যবহার করেন নি। আমাকে এই ঝড় বৃষ্টির মধ্যে ফেলে তাঁর অন্ত যাওয়া মোটেই উচিৎ হয়নি।

উষা।—আপনার মামা কে ?

সে ব্যক্তি উঠিয়া দাঁড়াইল।

ব্যক্তি।—আমার মামা—সুয্যি মামা।

কিছুক্ষণ অবাক হইয়া তাকাইয়া থাকিয়া উষা খিল খিল করিয়া হাসিয়া উঠিল।

উষা।—সুয্যি মামা—(হাসি)

সুয্যিমামার ভাগ্নে ঘাড় বাঁকাইয়া বীরদর্পে দাঁড়াইল। চক্ষু পাকাইয়া বলিল ;—হাসি ! এই ঝড় বৃষ্টির সময় হাসি ! আমি পা পিছ্‌লে কাদার মধ্যে হেঁডেড়ুডু খেল্‌ছি আর হাসি ! (পদদাপ)

পদদাপ করিতে গিয়া আবার পদস্খলন ও চিৎ হইয়া পড়ন। উষার উচ্চ হাস্য। সে ব্যক্তি শয়ান অবস্থাতেই হস্তভঙ্গী করিয়া ক্রুদ্ধভাবে কহিল ;— 'হাসি ! ফের হাসি ! আমি পড়ে গেছি তাই— তুম্ কোন হায় ? কে তুমি ? তোমার বাড়ী কোথায় ? তুমি বাঙালী কি বেহারী কি মারাঠী কি গুজ্‌রাটী কি উড়ে—

উষা।—আমি বাঙালী।

সে ব্যক্তি অর্দ্ধোপবিষ্ট হইয়া চিন্তা করিল।

ব্যক্তি।—বাঙালী ? ঠিক ! বেহারী কিম্বা উড়ে হলে 'মামা' না বলে 'মামু' বলতে।—কিন্তু তোমার অত হাসি কিসের ? তুমি কি জাতি ?

উষা।—আমি স্ত্রীজাতি।

সে ধড়মড় করিয়া উঠিয়া দাঁড়াইল।

ব্যক্তি।—স্ত্রীজাতি ? আপনি বাঙালী স্ত্রীজাতি ! (টুপী তুলিবার জন্য মাথায় হাত দিয়া) আমার টুপী কোথায় ?

উষা।—আমি তাকে উড়ে যেতে দেখেছি।

সহসা সে ব্যক্তি ভীষণ চটিয়া উঠিল।

ব্যক্তি।—কি ! আমার টুপী উড়ে যেতে দেখেছ ? (আত্মসম্বরণ করিয়া) ওঃ আপনি বাঙালী স্ত্রীজাতি ! তা—ইয়ে হয়েছে—আপনি এখানে কি মনে করে।

উষা।—আমি আর আমার মামা পাহাড়ে বেড়াতে এসেছিলুম। তারপর এই দুর্য্যোগে মামাকে আর খুঁজে পাচ্চিনা।

ব্যক্তি।—আপনার মামা—ই'য়ে—তাঁকে আর খুঁজে পাবেন না।

উষা।—অ্যাঁ ! সেকি !

ব্যক্তি।—দিঘরিয়া পাহাড়ে ভয়ানক বাঘ—আপনার মামা বোধ হয় তাদের সঙ্গেই রাত্রি যাপন করবেন।

উষা।—[ব্যাকুলভাবে চারিদিকে দৃষ্টি নিক্ষেপ করিয়া] অ্যাঁ—না না—মামা মামা—

ব্যক্তি।—[নিজমনে] হাসি ! হাসি ! আমি কাদায় আছ্‌ড়া পি্‌ছড়ি খাচ্চি আর হাসি ! [উষার নিরুপায় ভাব লক্ষ্য করিয়া] না—এটা উচিৎ হচ্চে না—নেহাত বর্ব্বরতা হচ্ছে।—[প্রকাশ্যে] ই'য়ে—তা কোনো ভয় নেই। বাঘেরা আপনার মামার সন্ধান নাও পেতে পারে।

উষা নীরব মিনতির চক্ষে তাহার পানে তাকাইয়া রহিল।

ব্যক্তি।—দেখছেন না এই পেছলে বাঘ কখনো বেরুতে পারে ? আর যদি বা বেরোয় আর কোথাও যেতে পারবে না সড়াৎ করে এইখানে এসে হাজির হবে।

উষা।—কিন্তু কৈ এসে হাজির হচ্ছে না ত !

ব্যক্তি।—তার মানে তারা বেরোয়নি। আমাদের চেয়ে তাদের অভিজ্ঞতা বেশী।

উষা।—কিন্তু মামা—

ব্যক্তি।—তিনি ত নিশ্চয় বেরোন নি নিরাপদেই আছেন। অথবা হয়ত আপনাকে খুঁজতে খুঁজতে ষ্টেশনের দিকে এগিয়ে গেছেন।

উষা।—ষ্টেশন কোন দিকে ?

ব্যক্তি। সেটা দিগ্‌দর্শন যন্ত্রের অভাবে বলা শক্ত। খুঁজে নিতে হবে।

উষা। তাহলে—

ব্যক্তি।—হ্যা—ডিঘ্‌ড়িয়া পাহাড়কে পেছনে রেখে যেদিকে হোক এগোনই ভাল। দাঁড়িয়ে দাঁড়িয়ে ভিজলে নিউমোনিয়া হতে পারে হাঁটলে সে ভয় কম।

সে ব্যক্তি অগ্রসর হইল। একাকিনী দাঁড়াইয়া থাকা অপেক্ষা ইহার সঙ্গে যাওয়া শ্রেয় বিবেচনা করিয়া উষা তাহার অনুসরণ করিল।

ব্যক্তি [যাইতে যাইতে সহসা থামিয়া] মাফ্‌ করবেন— [ইতস্ততঃ] ওর নাম কি—

উষা।—আমার নাম উষারাণী দত্ত।

ব্যক্তি। না না সে কথা নয়। আপনি কি জংসনেই থাকেন ?

উষা। না। দেওঘরে বম্পাস টাউনে। আপনি ?

ব্যক্তি। আমিও।

উষা। [সাগ্রহে] বম্পাস টাউনে!

ব্যক্তি।—হুঁ।

উষা। আপনার নাম ?

ব্যক্তি। আমার নাম [মাথা চুলকাইয়া] শ্রীভাগিনেয় বসু।

এই বলিয়া বড় বড় পা ফেলিয়া প্রস্থান। উষার অনুগমন। উভয়ে অন্ধকারে মিলাইয়া গেল।

পাহাড়ের দিক হইতে সাহেব বেশধারী আর একজনের প্রবেশ। প্যাণ্টালুন কর্দ্দমাক্ত, মাথার টাকের উপর হইতে বৃষ্টির জল চারিদিকে গড়াইয়া পড়িতেছে। ইনি উষার মামা পরিতোষ বাবু।

পরি। ঘোড়ার ডিম! ভারী পেছল। [পা পিছ্‌লাইল] উঃ ঘোড়ার ডিম—গিয়েছিলুম আর একটু হলে। উষা—উষা! [হতাশভাবে] ঘোড়ার ডিম! [দাঁড়াইয়া টাক হইতে জল মুছিলেন] কোথায় গেল মেয়েটা! কেন তাকে একলা ছেড়ে দিলুম! ঘোড়ার [উৎকর্ণ হইয়া শুনিলেন] ঐ যে কে 'মামা' 'মামা' করে ডাকছে! কিন্তু ওত উষার গলা নয়। ঘোড়ার ডিম—আরও মামা এখানে আছে নাকি!

দূর হইতে শব্দ হইল—'মামা'—'মামা' পরে। ঐ যে উষার গলা! উষা—উষা কিছু দেখবার যো নেই। ঘোড়ার ডি—বিদ্যুৎ চমকিল।

পরে। ঐ যে সামনে কিছু দূরে দুজন লোক দেখলুম না! একজন ওয়াটার প্রুফ পরা উষা বলেই বোধ হল। ঘোড়ার ডিম—বিদ্যুৎ আর একবার চম্‌কালে হত যে। একে পেছল তায় অন্ধকার ঘোড়ার ডিম—(নিষ্ক্রান্ত হইলেন।)

দ্বিতীয় দৃশ্য

দেওঘর। বম্পাস টাউনে একটি সুদৃশ্য কুটির। নাম—প্রেম কুটির। তাহারে পাচিল ঘেরা বাগানের মধ্যে বাঁধানো চাতালের উপর টেবিল-চেয়ার প্রভৃতি সজ্জিত। সূর্য্য এই মাত্র অস্ত গিয়াছে—আকাশে বৃষ্টির কোনও লক্ষণ নাই। হাওয়া ঝরঝরে।

পরিতোষ বাবু একটি বেতের মোড়ায় বসিয়া একটি চুরোটের অতি ক্ষুদ্র শেষাংশ চুষিতেছিলেন। পরিধানে কোঁচানো ধুতি ও পিরান কিন্তু গলায় উলের গলাবন্ধ, পায়ে মোজা এবং চটিজুতা।

পরিতোষ বাবুর মোড়ার পিছনে দাঁড়াইয়া তাঁহার বালক ভৃত্য ফটিক নিদ্রাসুখ উপভোগ করিতেছে। সে কিছু হৃষ্টপুষ্ট—গালদুটি উঁচু হইয়া নাসিকার বিশেষ খর্ব্বতা সাধন করিয়াছে। কপাল নাই বলিলেই হয়। বর্ণ নিকষকৃষ্ণ।

অন্য কেদারায় বসিয়া একটি যুবক;—সান্ধ্য ভ্রমণের উপযুক্ত সাজ—চেহারা সুশ্রী ও গম্ভীর কিন্তু অধরোষ্ঠ ঈষৎ চপলতার পরিচায়ক। সে নিবিষ্ট মনে সংবাদ-পত্র পাঠ করিতেছিল।

বাড়ীর ভিতর হইতে বাদ্য সংযোগে সঙ্গীতের আওয়াজ আসিতেছিল। উষা গাহিতেছিল;—

'আমার এই পথ চাওয়াতেই আনন্দ'—যে যুবকটি সংবাদ পত্র পাঠ করিতেছিল তাহার নাম শৈলেন। সে উষার দাদা।

পরিতোষ বাবু চুরোটের দগ্ধাবশেষ হইতে আর কিছুমাত্র ধূম বাহির করিতে না পারিয়া বিরক্ত হইয়া সেটা ফেলিয়া দিলেন। কিছুক্ষণ চুপ করিয়া বসিয়া থাকিয়া শেষে বলিলেন ;—'আজ্‌কের খবর পড়লে ?'

শৈলেন।—(কাগজখানা মুড়িয়া রাখিয়া) হ্যাঁ।

পরি।—জাপানের ব্যাপারখানা দেখেছ ?

শৈলেন।—(একটু হাসিয়া) হ্যাঁ।

পরি।—এমন ফন্দিবাজ জাত আর পৃথিবীতে নেই—ঘোড়ার ডিম—ওরা ভয়ানক ধূর্ত্ত। এই যে জাহাজের পর জাহাজ তৈরী করছে সেকি মিছিমিছি? ঘোড়ার ডিম—মোটেই নয়। ভারতবর্ষ যদি না জাপানীরা আক্রমণ করে ত বোলো তখন। ওই যে সব জাপানী ফেরিওয়ালা বস্তা ঘাড়ে করে দেশময় ঘুরে বেড়াচ্ছে ওরা কি সাধারণ লোক মনে করেছ। ওরা সব ঘোড়ার ডিম—সিপাই—দেশের প্ল্যান করে বেড়াচ্ছে। সুবিধে পেলেই আক্রমণ করবে।

শৈলেন। তা যদি করে আমাদের বেশ সুবিধে আছে—ওদের বস্তাগুলো কেড়ে নিলেই হবে।

পরি।—তারা কি ঘোড়ার ডিম—বস্তা নিয়ে লড়াই করতে আসবে? সঙীন উঁচিয়ে—কামান দাগ্‌তে দাগ্‌তে এসে হাজির হবে।

'ওঃ' বলিয়া শৈলেন এমনভাবে স্তব্ধ হইয়া রহিল যেন এ সম্ভাবনা সে কল্পনাই করে নাই।

উষার প্রবেশ।

উষা।—কৈ, মিঃ বোস এখনো এলেন না ?

পরি।—ফটিক! ফটিক! ঘোড়ার ডিম—ঘুমিয়ে পড়েছে। (উচ্চ কণ্ঠে) ফটিক!

জাগরণের চিহ্নস্বরূপ ফটিক প্রথমে বাম চক্ষু পরে দক্ষিণ চক্ষু সাবধানে উন্মীলন করিল এবং পরক্ষণেই কাঁদিয়া ফেলিল।

পরি। গেটের কাছে গিয়ে দাঁড়াগে যা। একটি বাবু আস্‌বেন, এইখানে নিয়ে আস্‌বি।

চক্ষু মুছিতে মুছিতে ফটিকের প্রস্থান। উষা অন্যমনস্কভাবে আশে-পাশে ঘুরিয়া বেড়াইতে লাগিল; একটা ফুটনোন্মুখ গোলাপের কুঁড়ি ছিঁড়িয়া একবার তাহার আঘ্রাণ গ্রহণ করিয়া চুলের মধ্যে গুঁজিয়া রাখিল। শৈলেন আড় চোখে তাহাকে কিছুক্ষণ নিরীক্ষণ করিয়া খুব গাম্ভীর্য্যের ভাণ করিয়া বলিল;—উষা, কালকের ঘটনাটা কবিতায় লিখে ফেল—তারপর সেটা 'মন্দাকিনী'তে পাঠিয়ে দিলেই হবে। একে তোমার লেখা, তার ওপর নায়কের নামটি যে রকম চিত্তাকর্ষক—

উষা দাদাকে লক্ষ্য করিয়া ভ্রূকুটি করিল তারপর অন্য দিকে মুখ ফিরাইয়া লইল।

পরি।—কেন শৈলেন তুমি ওকে ক্ষেপাও। ওর বাস্তবিক লেখবার ক্ষমতা আছে—তুমি ঘোড়ার ডিম—তুমি ওর 'অস্ফুট' পড়ে যতই হাসো না কেন, তার বুঝ্‌বে কি? তার মধ্যে বাস্তবিকই ভাল কবিতা আছে। এই ধরনা কেন 'প্রার্থনা', 'আশ্রয় যাচ্ঞা',—এগুলো ঘোড়ার ডিম উৎকৃষ্ট রচনা। ওইটুকু মেয়ের হাত থেকে অমন লেখা বেরোন কি যে-সে কথা! তুমি হাজার চেষ্টা করলেও অমন একটা পদ্য লিখতে পারো না।

শৈলেন।—'মন্দাকিনী'তে তার যে রকম প্রশংসা বেরিয়েছিল তাতে সে রকম লেখবার উচ্চাশা আমার বড় একটা—

উষা আসিয়া তাহার মুখ চাপিয়া ধরিল। ছেলেবেলার প্রথম লেখা ছাপানোর লজ্জাকর অধ্যায়টা এমনিই উষাকে ত্রস্ত-সঙ্কুচিত করিয়া রাখিত,—তার উপর শৈলেন যখন সেই কথা লইয়া তাহাকে বিঁধিতেও ছাড়িত না তখন তাহার দাদার প্রতি রাগ ও নিজের বিগত নির্ব্বুদ্ধিতার জন্য লজ্জার সীমা পরিসীমা থাকিত না। এক এক সময় শৈলেনের জ্বালায় সত্য সত্যই তাহার লোক-সমাজে মুখ দেখানো ভার হইয়া উঠিত।

উষার বয়স এখন উনিশ; তাই সে পনেরো বছর বয়সে লেখা নিজের কবিতার মধ্যে অক্ষমতা ও ছেলে-মানুষী ভিন্ন আর কিছুই খুঁজিয়া পায় না, এবং লজ্জায় মরিয়া গিয়া ভাবে—কেন মরিতে এগুলাকে ছাপিতে গিয়াছিলাম!

ভাগিনেয় বোসের প্রবেশ ও সকলের পরস্পর অভিবাদন। পরিতোষ বাবু মোড়া ছাড়িয়া উঠিবার উদ্যোগ করিয়া আবার বসিয়া পড়িলেন। শৈলেন আগন্তুককে কিছুক্ষণ বিস্ময় বিস্ফারিত নেত্রে নিরীক্ষণ করিয়া কি একটা বলিতে গিয়া থামিয়া গেল। উষা পূর্ব্বদিনের সেই কাদা মাখা অদ্ভুত জীবটির পরিবর্ত্তে এই সুবেশ সুশ্রী অতিথিটিকে দেখিয়া সহসা সম্ভাষণ করিবার মত উপযুক্ত কথা খুঁজিয়া পাইল না এবং মনে মনে চঞ্চল হইয়া উঠিল। সকলে উপবিষ্ট হইলেন।

ভাগিনেয়।—আপনাদের গেটের কাছে একটি বালক দেখলাম যার প্রকৃতি কিছু অস্বাভাবিক বলে বোধ হল। আমাকে দেখেই সে কেঁদে ফেল্লে; তাই দেখে আমার মনে দয়া হল, আমি তার পিঠে হাত বুলিয়ে সান্ত্বনা দিতে লাগলাম। পরক্ষণেই দেখি সে ঘুমিয়ে পড়েছে।

পরি।—ওটি আমার বেয়ারা ফটিক!

ভাগি।—ভারি আশ্চর্য্য! বাস্তব জগতে ফ্যাট্ বয়্ এবং যব্ ট্রটারের এমন অপূর্ব্ব সংমিশ্রন বোধহয় আর কোথাত নেই। ওকে যাদুঘরে পাঠিয়ে দিন:—(উষার দিকে ফিরিয়া) কাল আপনার সঙ্গে আমি সদ্‌ব্যবহার করিনি। সে জন্যে মাপ চাইছি। মনুষ্য সমাজে যে ব্যবহার একেবারে অমার্জ্জনীয় ডিঘরিয়া পাহাড়ের ধারে হয়ত ততদূর নাও হতে পারে এই মনে করে এই দুষ্প্রাপ্য জিনিষ চাইতে সাহস কর্চ্ছি।

উষা।—(সস্মিত মৃদুস্বরে) সাহসের বলে মানুষ অনেক জিনিষ লাভ করে—আপনিও করলেন।

ভাগি।—আমাকে বেশী সাহসী মনে করবেন না। প্রথমতঃ আমি বাঙালী, সুতরাং বিখ্যাত সাহিত্যিকদের মতে আমার ভীরু হওয়া একটা জাতীয় কর্ত্তব্য; দ্বিতীয়তঃ—

শৈলেন।—কিন্তু আপনার নামটি অসম সাহসিকতার পরিচয় দিচ্ছে।

ভাগি।—কি ভাবে?

শৈলেন।-নাম করণ সম্বন্ধে সামাজিক বিধি বাঁধন গুলোর বিরুদ্ধে প্রকাশ্য যুদ্ধ ঘোষণা করে।

ভাগি—(কিয়ৎ কাল ভাবিয়া) দেখুন—আমার নামটা একটা মহামুহূর্ত্তের প্রেরণার ফল। ওটির জন্য আমাকে ঈর্ষা করবেন না।

উষা।—আচ্ছা ভাগিনেয় বাবু, এ নামটি আপনার কে রেখেছিল?

ভাগি।—আমি স্বয়ং। ছেলেবেলা থেকেই মামাদের প্রতি আমার একটু পক্ষপাত আছে।

শৈলেন।—তাই নিঃসংশয়ে পৃথিবী সুদ্ধ লোকের ভাগ্নে হয়ে বসে আছেন। কিন্তু এতে কোন কোনও লোকের কিছু অসুবিধা হওয়া সম্ভব।

ভাগি।—কি করে?

শৈলেন।—(ইতস্ততঃ করিয়া) আপনার মহিলা বন্ধুরা সকলে এ সম্বন্ধ স্বীকার করতে রাজি না হতে পারেন।

ভাগি।—আমার জানিত একটি লোক আছেন—তাঁর নাম প্রাণেশ্বর! তাঁর বান্ধবীরা, তাঁকে প্রাণেশ্বর বলে ডাকতে দ্বিধা করেন না।

সকলে স্তব্ধ। পরিতোষ বাবু অভিভূত, শৈলেন পরাজিত, উষা লজ্জাহত।

সন্ধ্যা হইয়াছিল। পরিতোষ বাবু দু' একবার কাশি চাপিবার চেষ্টা করিয়া শেষে বলিলেন;—'ঘোড়ার ডিম—কাল জলে ভিজে ঠাণ্ডা লেগে গেছে। আর বাইরে থাকা ঠিক নয়। উষা, তোমারও ত—

উষা। না মামা, আমার কিছু হয়নি। তুমি বরং ভেতরে যাও আমরা আর একটু পরে—

পরি। আচ্ছা। ভাগিনেয় বাবুকে ছেড়ে দিও না। আমি তোমাদের জন্যে ড্রইং রুমে অপেক্ষা করব। উষা, একবারটি শুনে যাও।

উভয়ে নিষ্ক্রান্ত

শৈলেন। [উত্তেজিত ভাবে] বিজন তুমি—?

ভাগি। চুপ—ব্যস্। আমি ভাগিনেয়। সব মাটি করে দিও না। পরিতোষ বাবু তোমার—?

শৈলেন।—মামা।

ভাগি।—মেয়েটি?

শৈলেন।—বোন।

ভাগি।—[উৎকণ্ঠিত] 'অস্ফুট'র—?

শৈলেন:—লেখিকা!

ভাগি। [মাথায় হাত দিয়া] উঃ—চুপ!

উষার প্রবেশ

উষা।—মামা বল্লেন আজ আমাদের সঙ্গে ডিনার খেয়ে তবে বাড়ী যেতে পাবেন। কিন্তু ডিনারের এখনো ঢের দেরী আছে। ততক্ষণ না হয় এখানে বসে—

শৈলেন। কাব্য আলোচনা করা যাক। কি বলেন ভাগিনেয় বাবু? আপনি বোধ হয় জানেন না, আমার ভগিনী খুব একজন উঁচুদরের—

উষা। আঃ দাদা—চুপ কর।

শৈলেন।—কবি। বাঙলা ভাষার সঙ্গে যদি আপনার পরিচয় থাকে, এমন কি মুখ দেখা-দেখিও থাকে তাহলে নিশ্চয় আপনি 'অস্ফুট' নামক অপূর্ব্ব কাব্যগ্রন্থের নাম শুনেছেন। তার মধ্যে 'প্রার্থনা' 'আশ্রয় যাচ্ঞা' প্রভৃতি যে সব উচ্চ অঙ্গের কবিতা আছে তা পড়লে চোখের জল সজোরে বেরিয়ে পড়ে। অন্ততঃ আমার পড়ে। আপনি বল্‌বেন ভগিনীর কাব্য সম্বন্ধে ভ্রাতার মনে একটু দুর্ব্বলতা থাকা সম্ভব। প্রত্যুত্তরে আমিও বল্‌তে পারি যে ফটিক উষার ভাই নয় তথাপি সেও কেঁদে ফেলেছিল।

উষা।—দাদা—তুমি—

শৈলেন। আমি কিছুমাত্র অত্যুক্তি করছি না। দরকার হয় আমি এখনি ফটিকের ঘুম ভাঙিয়ে তার সামনে তোমার একটা কবিতা আবৃত্তি করে একথা প্রমাণ করে দিতে পারি। তাছাড়া 'মন্দাকিনী'র সম্পাদক বিজন বোস এই কাব্যখানির যে মর্ম্মস্পর্শী সমালোচনা করেছিলেন—

উষা। তবে যাও—[প্রস্থানোদ্যতা]

ভাগি। ওর নাম কি—যাবেন না। দশানন সীতা-হরণ করেছিল সেই অপরাধে সাগরের বন্ধন হল। আপনার দাদার ধৃষ্টতার জন্যে আপনি আমাকে শাস্তি দিয়ে চলে যাচ্ছেন কেন?

উষা।—[ফিরিয়া আসিয়া চেয়ারে বসিয়া] বেশ যত ইচ্ছে বল। আমি ওসব গ্রাহ্য করি না।

ভাগি। এই ত চাই! সমালোচনা গায়ে মাখ্‌তে নেই; সমালোচককে জব্দ করবার ঐ একমাত্র উপায়।— আমার যখন বয়স অত্যন্ত কম তখন একবার নিমন্ত্রণ খেতে গিয়ে একটা আস্ত ডিম খোলাসুদ্ধ কচ্‌মচিয়ে চিবিয়ে খেয়ে ফেলেছিলাম। তার পর থেকে আমার সামনে ডিমের নাম উচ্চারণ করলেই আমার মুখমণ্ডল রক্তবর্ণ ধারণ করত এবং নিজের মাথাটা দেয়ালে ঠুকতে ইচ্ছে করত। কিন্তু এখন দেখুন, আমার চোখের সামনে লক্ষ লক্ষ মুর্গী এবং হাঁস অনবরত ডিম পাড়তে থাক্‌লেও আমি অবিচলিত হয়ে তা দেখতে পারি। আমার মনে কোনও বিকার উপস্থিত হয় না।

শৈলেন।—আচ্ছা উষা, বিজন ঘোসের সঙ্গে যদি তোমার দেখা হয় তাহলে তুমি কি কর?

উষা কুঞ্চিত ভ্রূ, নীরব।

ভাগি।—একথা আমি নিঃসঙ্কোচে বলতে পারি যে সে ব্যক্তি যত বড় দুর্ব্বৃত্তই হোক না কেন উনি তাকে ক্ষমা করবেন।

উষা। কথ্‌খনো না—কথ্‌খনো না। আমি আপনাকে বলছি ভাগিনেয় বাবু। দাদা যদি রাতদিন এই কথা নিয়ে আমাকে জ্বালাতন না করতেন তাহলে হয়ত আমি এই বিজন বাবুকে ক্ষমা করতে পারতুম। কিন্তু—শুনেছি বিজন বাবু দাদার বন্ধু—এঁরা দুজনে মিলে আমাকে পাগল করে দেবেন।

উষা রোদনোন্মুখী।

ভাগি। [উষার পাশে চেয়ার টানিয়া লইয়া] আপনার দাদা যখন সেই নরাধমের বন্ধু তখন আপনার দাদার সম্বন্ধেও আমার ধারণা বদলে গেল। বুঝ্‌লাম, উনিও একজন পাষণ্ড। কিন্তু পাপী এবং পাষণ্ডদের ক্ষমা করাই হচ্ছে ধর্ম্ম। ভেবে দেখুন, ইংরেজদের যীশুখৃষ্ট পর্য্যন্ত ঐ কথা বলে গেছেন।

উষা। যীশুর উপদেশ ইংরেজরা যেমন মানে আমিও তেমনি মান্‌ব।

ভাগি। সেটা কি ভাল দেখাবে? আপনি একজন খাঁটি আর্য্যনারী, নিমাই নিতাই শুক সনকের দেশে আপনার জন্ম। আপনিও যদি কতকগুলো অস্পৃশ্য কদাকার ইংরেজের দেখাদেখি যীশুকে অবহেলা করেন— তাহলে প্রভু নিত্যানন্দ কি মনে করবেন এবং আমাদের এই সনাতন উদার হিন্দুধর্ম্মেরই বা কি গতি হবে?

উষা।—হয়ত সদ্গতি হবে না; কিন্তু সেজন্য আমি চিন্তিত নই। আমি চিন্তিত হচ্ছি, আপনি এদের জন্য এত ওকালতি কর্চ্ছেন কেন?

ভাগি। নিঃস্বার্থভাবে পরোপকার করার যে মহৎ আনন্দ আমি তাই উপভোগ করছি। যে হতভাগ্য নরপিশাচ আপনার কবিতার নিন্দা করে তার লেখনীর মুখ কালিমালিপ্ত করেছে তার ইহকাল এবং পরকালের অসীম দুর্গতির কথা ভেবে আমি আপনাকে সদয় হতে অনুরোধ করছি।

উষা। ভাগিনেয় বাবু, আপনার অনুরোধ এক্ষেত্রে নিষ্ফল! এতখানি বাগ্মিতা অনর্থক অপব্যয় করলেন।

ভাগি।—আচ্ছা সে ব্যক্তি অর্থাৎ সেই বিজনবাবু যদি স্বয়ং এসে আপনার কাছে মার্জ্জনা ভিক্ষা করে—তাহলে কি—?

উষা। তাহলেও না। বিজন বাবুকে আমি কথনো দেখিনি আর দেখ্‌তেও চাইনে।—আসুন ভেতরে যাই। ফটিক বোধ হয় আমাদের ডাকতে আসছিল, রাস্তার মাঝখানে ঘুমিয়ে পড়েছে।

উষা নিষ্ক্রান্ত। ভাগিনেয় কিছুক্ষণ স্তব্ধভাবে বসিয়া রহিল।

শৈলেন। কি ভাব্‌ছ?

ভাগি। [দীর্ঘশ্বাস ফেলিয়া] ভাব্‌ছি যীশুর কথা—Repent For the kingdom of Heaven is at hand.

উভয়ে নিষ্ক্রান্ত।

তৃতীয় দৃশ্য

পরিতোষ বাবু ও শৈলেন ড্রয়ং রুমে আসীন। দুজনের হাতে চায়ের বাটি। কাল প্রভাত। উষা একটু বেলা পর্য্যন্ত ঘুমায় তাই এখনো যোগ দিতে পারে নাই।

পরি। সেদিন ঘোড়ার ডিম তোমার ভাব দেখে ত এমন কিছু বোধ হলনা যে তুমি ওকে আগে থাক্‌তেই চেন!—তা কথাবার্ত্তা যদিও একটু অদ্ভুত রকমের তবু ছোকরাটি মন্দ বলে বোধ হল না। বড় ঘরের ছেলে পয়সা আছে বলছ। বদ্‌ খেয়ালের মধ্যে বাঙলা কাগজ চালায়। তা সে ঘোড়ার ডিম বড়মানুষের ছেলেদের একটা বাতিক না থাকলে সময় কাটবে কি করে? আমি কিছুদিন থেকে 'জাপানী গুপ্তচর' বলে একটা প্রবন্ধ লিখবো ভাব্‌ছিলুম তা সেটা না হয় ওর কাগজেই লিখব। কি নাম বল্লে কাগজখানার?

শৈলেন। উষার কাছে এখন ফাঁস করে দিওনা 'মন্দাকিনী'।

পরি।—তা দেবনা। কিন্তু তোমরা দুই বন্ধুতে মিলে ঘোড়ারডিম—মেয়েটারি বিরুদ্ধে কোন রকম ষড়যন্ত্র আঁটছো না ত?

শৈলেন। তুমি কি পাগল হয়েছ মামা! আসল কথা, বিজন ভয় কচ্চে যে, উষা যদি আগে জানতে পারে যে ওই বিজন বোস তাহলে হয়ত—যাক, তোমার অমত নেইত?

পরি। ছোকরা দেখ্‌তে শুন্‌তে ত মন্দ নয়—তা উষার যদি ওকে পছন্দ হয় তাহলে—

শৈলেন। থামো—উষা আসছে।

দুজনে চায়ের বাটিতে মনোনিবেশ করিলেন।

উষার প্রবেশ।

উষা। বড্ড দেরী হয়ে গেছে-না? কি যে আমার ঘুম সাতটার আগে কিছুতেই ভাঙে না। ফটিক কৈ?

শৈলেন। তাকে পাঠিয়েছি ভাগিনেয় বাবুকে ডেকে আনতে। ওর পাগ্‌লাটে ধরণের কথাবার্ত্তা আমার বেশ লাগে।

উষা।—(ভ্রূ কুঞ্চিত করিয়া) পাগ্‌লাটে ধরণের!

শৈলেন।—তা নয় ত কি! আমার বোধহয় লোকটির মাথায় একটু ছিট্‌ আছে।

উষা (মনে মনে ক্রুদ্ধ হইয়া) ভারি ত জানো তুমি! তোমা:—তোমার বন্ধু ঐ অজিত গুহ'র চেয়ে ঢের ভাল।

শৈলেন।— (চক্ষু বিস্ফারিত করিয়া) অজিতের চেয়ে ভাল! কিসে শুনি? রূপে না গুণে না বিদ্যেয়?

উষা।—সব তাতেই। তোমার বন্ধুদের মধ্যে এমন একটাও নেই—

বলিতে বলিতে হঠাৎ মহালজ্জায় থামিয়া গেল।

পরি।—কি বলে ভাল, যদি তোমার বন্ধুদের সঙ্গে তুলনায় সমালোচনাই করতে হয় শৈলেন, তাহলে ঘোড়ার ডিম একথা না মেনে উপায় নেই যে ঐ অজিত গুহটা আস্ত জিরাফ্‌, অশোক সাণ্ডেলটা নিরেট গুণ্ডা, হসিত সামন্তটার যেমন ভাল্লুকের মত চেহারা তেমনি উল্লুকের মত বুদ্ধি—আর ঐ কিংশুক গুপ্তটা—ওটাকে দেখ্‌লে আমার গা জ্বলে যায়।

উষা।—(সোৎসাহে) আমারও—

শৈলেন।—আসল কথা, তোমরা আমার বন্ধুদের দেখতে পারো না।

উষা।—আর মামা—সেই মীনধ্বজ হালদার—

পরি।—সেটাকে ঘোড়ার ডিম শিম্পাঞ্জি বল্লে শিম্পাঞ্জির মানহানি করা হয়।

উষা।—আর জানো মামা, এঁরা সব কেউ এক বর্ণ বাঙলা লিখ্‌তে জানেন না।

ারি।—সব ঘোড়ার ডিম আন্‌কোরা গোরার বাচ্চা কনা!

শৈলেন।—ওরা সব ইংরাজী শিক্ষা পেয়েছে—তাই—

পরি।—আমরাও ত ইংরিজী শিক্ষাটা-আস্‌টা পেয়েছি ্র বাপু; উষাও ত ঘোড়ার ডিম জুতোটা মোজাটা ারে, চা বিস্কুটও খায় আর ইংরিজীতে তোমার ঐ বকটা বন্ধুর ঘোড়ার ডিম কান কেটে নিতে পারে কন্তু কৈ অমন ট্যাঁস্‌ ফিরিঙ্গি ত হয়ে যায়নি। তুমিও ত ঘোড়ার ডিম টেব্‌লে বসে খানা ডিনার খেয়ে থাকো কিন্তু তাই বলে কি বাঙ্‌লা কথা ভুলে গেছ?

উষা দাদার বন্ধুদের এই লাঞ্ছনা খুব উপভোগ করিতেছিল। দাদার উপর প্রতিশোধ তুলিবার এত বড় সুযোগ সে বড় পায়না তাই তার এত আমোদ।

সে গম্ভীর মুখে বলিল;—'এক কথায় দাদার বন্ধুগুলো সব একদম রদ্দি।'

শৈলেন।—সব বন্ধু—একটাও বাদ নয়?

উষা। একটাও বাদ নয়।

শৈলেন। [দীর্ঘশ্বাস ছাড়িয়া] আচ্ছা বেশ, এর বিচার পরে হবে।

ভাগিনেয় বোসের প্রবেশ।

ভাগি। মাফ্‌ করবেন, আপনারা বোধ হয় আমায় ডেকে পাঠিয়েছিলেন?

শৈলেন।—বোধ হয় কি রকম—নিশ্চয় ডেকে পাঠিয়েছিলুন।

ভাগি। ঠিক ধরেছি তাহলে। চা খাবার আগে একটু বেড়িয়ে আস্‌ব বলে বেরুচ্ছি দেখি আপনার ফটিক আমার দোরগোড়ায় দাঁড়িয়ে ঘুমচ্চে। আন্দাজে ব্যাপারটা বুঝে নিলুম। পাশ কাটিয়ে সটান এখানে চলে এসেছি। তার কাঁচা ঘুম ভেঙ্গে দেবার আর প্রবৃত্তি হল না। সে বোধ হয় নিদ্রিত অবস্থায় এখনো আমার সিংহদ্বারে পাহারা দিচ্ছে।

পরি। বোসো বোসো ভাগিনেয়—উষা চা দাও।

ভাগিনেয় উপবিষ্ট হইল।

শৈলেন। (সহসা) আপনি বাঙলা জানেন?

ভাগি। (অবাক হইয়া কিছুক্ষণ তাকাইয়া থাকিয়া) ওর নাম কি, এতক্ষণ কি আমি না-জেনে চীনে ভাষায় কথা কইলাম!

উষা।—দাদার যত সব অদ্ভুত কথা।

শৈলেন।—অর্থাৎ আমি জানতে চাই, আপনি বাঙলায় পদ্য লিখ্‌তে পারেন কিনা?

ভাগি।—একবার এক বন্ধুর বিয়েতে লিখেছিলাম কিন্তু ছাপা হয়নি।

উষা।—[সাগ্রহে] কি পদ্য বলুন না!

ভাগি।—তার প্রথম দু'ছত্র কেবল মনে আছে—

'গজুর অদ্য বিবাহ
পদ্ম বনে ঢুকিবে একটি বরাহ—"

পদ্য শুনিয়া উষা মুখ ফিরিয়া গেল।

শৈলেন।—[খুসী হইয়া] খাসা পদ্য ত! আপনিও দেখছি তাহলে একজন কবি। অবশ্য ঠিক উষার সঙ্গে এক শ্রেণীর না হলেও—

উষা।—দাদা—ফের—

শৈলেন।—না না তোমার সঙ্গে যে ভাগিনেয় বাবুর তুলনাই হয় না সে আমি জানি—

উষা। দাদার কথা শুনবেন না, খালি আপনাকে জ্বালাতন করবার চেষ্টা। আপনি নিশ্চয় ভাল কবিতা লিখ্‌তে পারেন। দাদার বন্ধুরা কেউ এক অক্ষর বাঙলা লিখতে জানে না। আচ্ছা, আপনার লেখা একটা ভাল পদ্য বলুন না।

ভাগি।—দেখুন, আমি যে ভাল পদ্য লিখ্‌তে পারি এটা আজ আপনার মুখ থেকে শুন্‌লাম বলেই সত্যি বলে বিশ্বাস হচ্ছে। এবং আপনার দাদার বন্ধুরা যা পারে না আমি তাই পারি এ কথা প্রমাণ করবার জন্য যদি আমাকে আত্মহত্যা পর্য্যন্ত করতে হয় তাতেও আমি প্রস্তুত আছি—পদ্য বলা ত দূরের কথা।

উষা। [সোল্লাসে] আচ্ছা বেশ। তাহলে একটা বেশ ভাল—এই—ভালবাসার পদ্য বলুন।

শৈলেন। ভাগিনেয় বাবু, কিছু মনে করবেন না, কিন্তু আপনি যদি আর কোনও কবির কাব্য নিজের বলে এখানে চালিয়ে দেন, তাহলে তস্কর বলে আপনাকে সনাক্ত করবার ক্ষমতা আমাদের কারুর নেই এক উষা ছাড়া। অতএব আপনাকে একটি কাজ করতে হবে।

ভাগি। কি বলুন। সকল রকম পরিক্ষায় উত্তীর্ণ হবার জন্যে আজ আমি বদ্ধ পরিকর।

শৈলেন। আপনাকে একটি ইংরিজী কবিতা তর্জ্জমা করতে হবে।

ভাগি। বেশ কথা। কবিতা বলুন।

শৈলেন। ঊষা, বিষয় নির্ব্বাচনের ভার তোমার ওপর। তুমি একটা কবিতা বল।

ঊষা। [কিছুক্ষণ ভাবিয়া তারপর লজ্জিত নতমুখে]

When we two parted
In silence and tears
Half broken-hearted
To sever for years—তারপর আর—

তারপর আর মনে পড়ছে না।

শৈলেন।

Pale grew thy cheek and cold
Colder thy kiss;
Truly that hour foretold
Sorrow to this!

ভাগি। কঠিন পরীক্ষা। আচ্ছা কাগজ কলম দিন।

পরি।—ঘোড়ার ডিম! এইখানে বসে বসেই পদ্য লিখবে নাকি?

ভাগি। আজ্ঞে হ্যাঁ। ফটিক যখন দাঁড়িয়ে দাঁড়িয়ে ঘুমতে পারে তখন আমি বসে বসে পদ্য লিখ্‌ব এ আর বিচিত্র কি?

ঊষা কাগজ পেনসিল আনিয়া দিল ও উৎসুক হইয়া লিখনরত ভাগিনেয়ের প্রতি চাহিয়া রহিল।………

ভাগি। হয়েছে। ঠিক যে বায়রণের যোগ্য হয়েছে তা বলতে পারিনা—তবু, আচ্ছা শুনুন,—

'যখন মোরা দোঁহে বিদায় নিয়েছিনু
নীরব নীর-নত চোখে,
আধেক ভাঙা বুকে সুখের স্মৃতি ল'য়ে
সাঁঝের ম্লান দিবালোকে;
কপোল হ'ল তব পাংশু হিমবৎ
অধর হ'ল হিমতর—
তখনি জানিলাম সুখের বিভাবরী
পোহাবে ব্যথা-জরজর!'

ঊষা। [মুগ্ধভাবে ক্ষণকাল নীরব থাকিয়া] চমৎকার হয়েছে। এমন কি ছন্দটি পর্য্যন্ত!

শৈলেন। ও কিছুই হলনা,

Truly that hour foretold
Sorrow to this—ওর কি এই তর্জ্জমা!

ঊষা। আপনি দাদার কথা শুনবেন না, সত্যিই ভারী সুন্দর হয়েছে!

ভাগি। [পরিতোষ বাবুর দিকে ফিরিয়া] আপনি কি বলেন?

পরি। ও ইংরিজী বাঙলা কোনোটারই ঘোড়ার ডিম কিছু মানে হয় না।

ভাগি। যাক, তাহলে দেখা যাচ্ছে যে সমালোচনা দুই ভাগে বিভক্ত, একজন বলছেন চমৎকার হয়েছে আর একজন বলছেন কিছুই হয়নি। এ ক্ষেত্রে যিনি কবি আমি তাঁর মন্তব্যটিই গ্রহণ করলাম। কারণ শাস্ত্রে বলেছে 'কবিতারস মাধুর্য্যং কবি বেত্তি

শৈলেন। ঊষার মন্তব্য কিন্তু অন্য রকম হত যদি আপনি না লিখে আমার কোনও বন্ধু ঐ কবিতাটি লিখ্‌তেন।

ঊষা। [আরক্তিম হইয়া] তার মানে?

ভাগি। মানে অতি সহজ—কবিকে না জানলে তাঁর কাব্য বোঝ্‌বার সুবিধা হয় না। আপনি আমাকে জানেন বলেই এত সহজে আমার কবিতাটি উপভোগ করতে পারলেন। ধরুন, আপনাকে জানবার আগে যদি আমি আপনার 'অস্ফুট' নামক ঐ অপূর্ব্ব কাব্যগ্রন্থটি পড়তাম হয়ত ভাল না বুঝতে পেরে, সম্যক রসগ্রহণ না করে আমি ওটির নিন্দা করতাম। কিন্তু সে সমালোচনা কি যথার্থ হত? কখনই না!

শৈলেন। আপনার যুক্তির মধ্যে একটুখানি গলদ রয়ে গেল। তা থাক, আমাকে এবার একবার উঠতে হবে, গোটা কয়েক চিঠি লেখা দরকার। মামা তুমিও উঠ্‌ছ নাকি?

পরি। ঘোড়ার ডিম হ্যাঁ। কোমরটাতে মালিশ করাতে হবে সেই ব্যথাটা এখনো গেল না। দেখি ফটিক এলো কি না।

প্রস্থান করিলেন।

শৈলেন। উষা, ভাগিনেয় বাবু তাহলে তোমার জিম্মায় রইলেন। তুই কবিতে যত ইচ্ছা কাব্য-চর্চ্চা হোক কিন্তু আমার বন্ধু বাঙ্‌লা লিখতে পারে না একথাটা ভবিষ্যতে আর বোলো না।

নিষ্ক্রান্ত।

উষা ও ভাগিনেয় কিছুক্ষণ নির্ব্বাক হইয়া বসিয়া রহিল। উষার বুকের ভিতরটা দুরুদুরু করিতে লাগিল। এই লোকটির সহিত একলা থাকিলেই উষার ঐ রকম হয়।

ভাগি। কাল পরশুর মত চলুন আজ বিকেলেও কোনও দিকে বেড়িয়ে আসা যাক।

উষা। [নিম্নস্বরে] আজ কোনদিকে যাবেন ?

ভাগি। যেদিকে হয়। সোজা একটা রাস্তা ধ'র সহর বাজার পার হয়ে এমন কোথাও গিয়ে পৌছনো যাক যেখানে মানুষ নেই, গরু-ভেড়া নেই শুধু আমি আর-শুধু দুজন পথিক—

উষা। - আর বাঘ যদি থাকে ?

ভাগি।—থাকুক বাঘ। বাঘ না থাকলে পথিক দুজনের আনন্দ যাত্রার পথে বৈচিত্র্য আসবে কোথা থেকে ? বাঘ থাকাই চাই।

উষা।—সেদিন ডিঘড়িয়া পাহাড়ে বাঘের নামে কিন্তু বৈচিত্র্যের বদলে আতঙ্কই এসেছিল।

ভাগি।—(কিছুক্ষণ সুখ চিন্তায় নিমগ্ন থাকিয়া) ওঃ—ডিঘড়িয়া পাহাড়! চলুন আজ সেইখানেই যাওয়া যাক।—আচ্ছা উষা—(বলিয়াই সহসা থামিয়া গিয়া) রাগ করলে নাকি ? (উষা ঘাড় নাড়িল) আমি তোমার চেয়ে বয়সে অন্ততঃ সাত আট বছরের বড়, তার ওপর তোমার দাদার—ইয়ে—সমবয়সী। আর আমাদের আলাপও হল প্রায়—ক'দিন হ'ল উষা ?

উষা।—(মৃদুস্বরে) আজ নিয়ে ন'দিন।

ভাগি।—ন' দিন! দুদিন নয়, চারদিন নয়, এক হপ্তা নয়—পুরো ন'দিন! সুতরাং তোমাকে আমি উষা বলেই ডাকবো এবং আর 'আপনি' বলতে পারব না। —হ্যাঁ কি কথা হচ্ছিল ?

উষা।—ডিঘরিয়া পাহাড়।

ভাগি।—হ্যাঁ ডিঘরিয়া পাহাড়। চল আজ সেইখানেই যাওয়া যাক।

উষা।—এত যায়গা থাকতে আজ সেখানে কেন ?

ভাগি।—সেখানে—আমার টুপীটা হারিয়ে গেছে খুঁজে দেখতে হবে।

উষা।—(হাসিয়া) আপনার টুপী আর খুঁজে পাবেন না।

ভাগি।—পাবনা ? বেশ, কিন্তু আর কিছু যদি হারিয়ে থাকে সেটা ত খোঁজা দরকার।

উষা।—(আরক্তিম নতমুখে কিছুক্ষণ চুপ করিয়া থাকিয়া) না, আমি ওখানে যাব না। আমার বড্ড ভয় করবে। কি জানি যদি ফের কোনও রকম দুর্ঘটনা হয় ?

ভাগি।—(অনেকক্ষণ উষার মুখের পানে তাকাইয়া থাকিয়া) সম্প্রতি তোমার ভাগ্যে একটা গুরুতর দুর্ঘটনা ছাড়া আর কোনও আশু বিপদ ত আমি দেখ্‌ছি না।

উষা। (সকৌতুকে) আপনি হাত গুণতেও জানেন নাকি ?

ভাগি।—জানি বৈকি।

উষা।—(করতল প্রসারিত করিয়া) কৈ গুণুন দেখি আমার হাত। কি দুর্ঘটনা হবে শুনি।

ভাগি।—(উষার হাতখানি নিজের হাতের মধ্যে লইয়া পরীক্ষা করিয়া গম্ভীর ভাবে) শীগ্‌গির তোমার বিয়ে হবে—

উষা।—(হাত টানিয়া লইবার চেষ্টা করিয়া) যান্‌!

ভাগি।—তোমার দাদার এক বন্ধুর সঙ্গে—

উষা।—(রাগ করিয়া) ছেড়ে দিন—আমার হাত দেখ্‌তে হবে না।

ভাগি।—বেশ ছেড়ে দিচ্ছি—(উষার করতলে একটি চুম্বন করিয়া হাত ছাড়িয়া দিল)

উষা।—(ক্রন্দনোন্মুখী হইয়া) আর আমি আপনার সঙ্গে কথ্‌খনো—

ভাগি।—কথ্‌খনো ছেলে মানুষী কোরো না। যেটা নিলাম ওটা গণৎকারের দক্ষিণা।—উষা, একটা ভারী গোপনীয় কথা তোমায় বলব ?

উষা।—আমি শুনতে চাই না—

ভাগি।—তুমি না চাইলেও আমি বলবই।—উষা, আমাকে বিয়ে করবে ?

উষা।—যাও!

উষা দুহাতে মুখ ঢাকিল।

ভাগি।—উষা—

উষা।—যাও।

ভাগি।—(উঠিয়া দাঁড়াইয়া) বারবার যাও বল্‌ছ? বেশ, চললাম। (দ্বার পর্য্যন্ত গিয়া) একটু গুরুতর অপরাধ স্বীকার করবার ছিল—তা আর হল না।

উষা। কি অপরাধ শুনি!

ভাগি।—(ফিরিয়া আসিয়া) আগে বল আমায় বিয়ে করবে?

উষা।—না।

ভাগি।—করবে না?

উষা।—না।

ভাগি।—দুবার না বল্লে। বারবার তিন বার বল্লেই বুঝব মনের কথা বল্‌ছ। বিয়ে করবে না?

উষা নীরব। ভাগিনেয় দুহাত ধরিয়া উষাকে জোর করিয়া তুলিল।

ভাগি।—উষা—

উষা।—আগে শুনি কি অপরাধ।

ভাগি।—আগে বল রাগ করবে না।

উষা।—আগে শুনি।

ভাগি।—আচ্ছা বলছি। রাগ করলে এখন ত আর কথা ফিরিয়ে নিতে পারবে না—বিয়ে করতেই হবে। উষা আমার নাম ভাগিনেয় নয়, আমার নাম—বিজন বোস।

উষা।—(বিস্ফারিত নেত্রে) তুমি—আপনি—তুমি আপনি—

ভাগি।—তুমি—তুমি। 'আপনি' নয়।

উষা।—তুমি—দাদার বন্ধু—

বিজন।—হ্যাঁ। বলেছিলাম কিনা গণনা করে যে তোমার দাদার বন্ধুর সঙ্গে শীগ্‌গির তোমার বিয়ে হবে?

উষা। তুমি 'মন্দাকিনী'র—

বিজন।—হতভাগ্য সম্পাদক!

উষা।—যাও, তোমার সঙ্গে আমি আর একটা কথাও কইব না।

বিজন।—কথা কইবে না? তুমি জানো এই ক'দিনে আমি 'অস্ফুট' থেকে সমস্ত কবিতা আগা গোড়া মুখস্থ করে ফেলেছি! সত্যি বলছি উষা, তোমাকে যতদিন না চিনতাম ততদিন তোমার কাব্যের সৌরভ আমার প্রাণে গিয়ে পৌঁছায়নি। এখন বুঝ্‌তে পেরেছি, আধ-ফুটন্ত অপরিণত প্রাণের কি তরল-মধুর সীধু ঐ বইখানির মধ্যে ভরা আছে। শুনবে? আচ্ছা—'আশ্রয় যাচ্ঞা' কবিতাটি আবৃত্তি করছি—

উষা। (বিজনের মুখ চাপিয়া ব্যাকুল ভাবে) না—না তুমি থামো—

সহসা শৈলেনের প্রবেশ। উষা লজ্জায় জড়সড়।

শৈলেন।—একি! কবি আর সমালোচকে দিব্যি ভাব হয়ে গেছে দেখছি যে!

বিজন।—কবি এবং সমালোচকে যেখানে মিলন হয় সে স্থান মহাপুণ্য তীর্থে পরিণত হয়—মানো কি না?

শৈলেন।—নিশ্চয় মানি।

বিজন।—ব্যস। আজ থেকে দেওঘরও এক মহাতীর্থ হল।

উষা।—দাদা, কি দুষ্ট তুমি! আগে যদি জানতে পারতুম—তাহলে কিন্তু—

শৈলেন।—(উষার গালে আঙুলের টোকা মারিয়া) আগে জানলে সমস্ত ভেস্তে যেত—না? উষা, আমার সব বন্ধুরাই একদম রদ্দি—কি বলিস?

উষা (বিনত ভুবনবিজয়ী নয়না) একদম রদ্দি!

শৈলেন।—আমাকে একবার পোষ্ট-অফিস যেতে হবে। বিজন, আস্‌ছ নাকি?

বিজন।—তুমি এগোও। সামান্য একটু কাজ সেরে আমি এই এলাম বলে। শৈলেন প্রস্থান করিল।

বিজন।—(উষার খুব কাছে গিয়া) সামান্য কাজটুকু সেরে নিতে পারি?

উষা।—(বুকে মুখ গুঁজিয়া) না—

বিজন দুই আঙুল দিয়া উষার চিবুক তুলিয়া ধরিয়া গভীর স্নেহদৃষ্টিতে ক্ষণকাল সেইদিকে তাকাইয়া রহিল।

বিজন। —পারি?

উষা চোখ খুলিল না, অনুমতিও দিল না। সহসা পরিতোষ বাবু ঘরে প্রবেশ করিয়া এই দৃশ্য দেখিয়া আবার দ্রুতবেগে নিষ্ক্রান্ত হইয়া গেলেন। অস্ফুটস্বরে কহিলেন; ঘোড়ার ডিম!

মোগলের প্রাসাদে ও শ্মশানে

শ্রীজ্ঞানেন্দ্রনাথ চক্রবর্ত্তী

ভ্রমণ স্মৃতি

(২)

আগ্রায়ও প্রথমে সমাধি। সেকেন্দ্রার বিরাট প্রান্তরে আকবর নিজের সমাধি নিজে নির্ম্মাণ করান। মোগল বাদশারা অনেকেই নিজের সমাধির সব যোগাড় নিজেরাই করিয়াছেন। আকবর যাহা করিয়া গিয়াছিলেন, জাহাঙ্গীর তার উপরে এই সমাধির বিশেষ উন্নতি করিয়াছিলেন। প্রকাণ্ড প্রান্তর দেয়াল দিয়া ঘেরা, চারিদিকে চারটা ফটক—একটি সত্য তিনটি মিথ্যা—প্রায় মাঝখানে বিরাট সমাধি সৌধ। প্রধান ফটকটির গায় কত আরবি, পার্শি বয়ানে আকবরের কীর্ত্তিগাথা লেখা রহিয়াছে—সে লেখার আর্টও দেখিবার জিনিষ! ফটক হইতে সমাধি মন্দির প্রত্যেকটি ভাস্কর্য্যের চরম নিদর্শন। প্রাঙ্গণে নির্ভয়ে হরিণগুলি চড়িয়া বেড়াইতেছে। আকবর বাদশাহের সমাধি—বিরাট মন্দিরের সম্মুখেই বিরাট অন্ধকারে রহিয়াছে—আলো নিয়া দেখিতে হয়—সামনের প্রবেশ কক্ষের প্রস্তর সন্নিবেশ—ও রংএর খেলা অপূর্ব্ব অতুলনীয়। রাজা পঞ্চম জর্জ্জের আগমন সময়ে লর্ড কার্জ্জন এই কক্ষের হাতখানেক স্থান সংস্কার করিতে গিয়া অসম্ভব খরচা দেখিয়া পিছাইয়া পড়েন। লর্ড কার্জ্জন পুরাতন কীর্ত্তি রক্ষা আইনে অনেক প্রাচীন কীর্ত্তি তাড়াতাড়ি লোপ করিতে না দিয়া ভারতের অতীত স্মৃতি রাখিবার ব্যবস্থা করিয়াছেন বটে কিন্তু ভারতীয়দের তরফ হইতে সে ব্যবস্থাকে উন্নত করিবার বিশেষ চেষ্টা হয় নাই। ভারতের এই সব অতীত কীর্ত্তি রাখা যে কত প্রয়োজন তাহা ভারতীয়দের বোঝা কর্ত্তব্য। অনেক প্রাচীন কীর্ত্তি কার্জ্জনের আইনে রক্ষিত হইতেছে বটে, কিন্তু অর্থাভাবে অধিকাংশই অতি দুর্দ্দশাগ্রস্ত—উপযুক্ত সংস্কারাভাবে ধ্বংসের মুখে যাইতেছে। ব্যবস্থাপক সভাগুলি দিল্লী সিমলা ঘুরিয়া মাথা ঠাণ্ডা রাখিবার সঙ্গে সঙ্গে এই সব প্রাচীন কীর্ত্তিগুলির দিকে একটু তাকাইবার অবসর পান না কি? এসব কথা সভ্যদের প্রাণে একটুও জাগে না কি?

জাহাঙ্গীর মহল

আগ্রার প্রাসাদেও পরিখা, তোরণ ইত্যাদি পার হইয়া যোধবাইয়ের মহলে পড়িতে হয়—আকবরের হিন্দু রাণী—জাহাঙ্গীর বাদশাহের মায়ের ঘরে ও মহলে অসংখ্য দেবদেবী ছিল; সম্রাট ঔরংজেব তাহা ধ্বংস করেন। এ মহলের সৌন্দর্য্য ঔরংজেব নষ্ট করিয়াছিলেন। রাণী যোধবাইয়ের শয়নকক্ষ, বসিবার কক্ষ, ছেলেদের নিয়া খেলিবার চত্বর সব রহিয়াছে, এখানেও প্রাসাদের নীচ দিয়াই যমুনা বাহিয়া যাইত। পরে খাল কাটিয়া যমুনার বেগ ঘুরাইয়া দেওয়া হয়। মহল হইতে পাতালপুরের সিঁড়ি দিয়া যমুনায়

যাওয়া যাইত। অলিন্দে বসিয়া বেগমেরা গীতবাদ্য শুনিতেন।

জাহাঙ্গীরের পাঠকক্ষ, নূরজাহানের শয়ন কক্ষ—সাজাহানের সেইকক্ষ যে কক্ষে বসিয়া, শুইয়া তিনি পরপারের তাজ দেখিতেন সবই তেমনি রহিয়াছে। অনেক কক্ষে কপাট নাই—খোলা, তাঁহারা যখন বাস করিতেন তখন নিশ্চয়ই ছিল। অনেক কক্ষ যেন গুপ্ত-ধনাদি পাইবার জন্য খোঁড়া হইয়াছে মনে হয়।

আকবর বাদশাহের সাধের নওরোজের আনন্দ-বাজারের স্থান এখনো তেমনি আছে। ঔরংজেব

মোতি মসজিদ

পিতাকে যে কক্ষে বন্দী রাখিয়াছিলেন, সে কক্ষও রহিয়াছে। বাদশাহের বাহিরের ও অন্দরের বিচারের সিংহাসনও রহিয়াছে। বেগমেরা বিচার দেখিতেন—তাঁহাদের স্থান অন্তরালে রহিয়াছে। এখানেও স্নান কক্ষে আলো জালিলে এখনো বিচিত্র বর্ণ সম্পাতে উজ্জ্বল হইয়া ওঠে। ছাদের উপরে প্রকাণ্ড একখানি কৃষ্ণপ্রস্তর রহিয়াছে—তেমন প্রস্তর আর দেখি নাই—এখানি বাদশাহের বসিবার প্রিয় আসনই ছিল।

জনশ্রুতি ভরতপুরের জাঠ মহারাজ প্রাসাদ লুণ্ঠন করিয়া যখন এই সিংহাসনে পা রাখেন তখন এই সিংহাসন ফাটিয়া রক্ত বাহির হইয়াছিল! এই প্রাসাদেই সাজাহানের
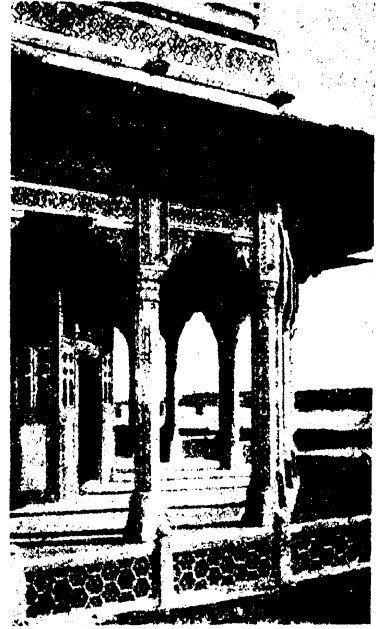
সামন বুরুজ

মোতিমসজিদ। সমস্ত মার্ব্বেলের তৈরী—মসজিদ বসিবার চত্বর, মেয়েদের বসিবার স্থান কত সুন্দর। একদিন, সুদিনে এই মসজিদে আমিরওমরাওরা নমাজ করিতে পারিলে ধন্য হইতেন, আর আজ এ মসজিদে নামাজ দিবার ভক্ত জোটে না। মোল্লা কত দুরবস্থার কথা জানাইয়া অতি ভদ্র ও বিনীতভাবে কিছু সাহায্য চাহিলেন—এই সব সমাধি ও মসজিদের রক্ষক বা মোল্লাদের যেখানে যাহা দিয়াছি তাঁহাই তাহারা অতি হৃষ্টচিত্তে গ্রহণ করিয়াছেন। কেবল তাজের নকল কবরের দোতালায় মোল্লারা বোলেচালে বিভ্রম জন্মাইয়া কিছু ঠকাইল মনে হইয়াছে। আগ্রার প্রাসাদে সাজাহান বাদশাহের পায়খানাটি পর্য্যন্ত রহিয়াছে, তাহাও দেখিলাম।

—সেই হারেম, সেই প্রাসাদ—স্বপ্নের সেই কল্প লোক আজ কত জনে দেখিতেছে—মরমীর মনে এ সব দেখিয়া কি কথা জাগে তা সেই জানে।

এসব দেখিয়া তাজ দেখিতে গিয়া ঠকিয়াছি কি জিতিয়াছি জানি না। কিন্তু বিশ্বের অষ্টম আশ্চর্য্যের চেয়েও যেন আমার মন আগ্রার সেই মোগল প্রাসাদই বেশী অভিভূত করিয়া রাখিয়াছিল। শ্বেত প্রস্তরের বিরাট সে সৌধ কত প্রকাণ্ড জিনিষটি অথচ কত ছোট ও কোমল। সৌন্দর্য্য ও প্রেমের সাধনার মূর্ত্ত বিকাশ তাজ,—কিন্তু এর উৎস ছিল আগ্রার প্রাসাদ। মমতাজ সাজাহান এঁদের জীবনের সব লীলা-খেলা তো ঐ আগ্রার প্রাসাদেই হইয়াছে। প্রাসাদও যেমন স্থানে স্থানে জীর্ণ হইয়া খসিয়া পড়িতেছে তাজেরও দু'চার স্থানে তেমনি দেখা গেল। তাজের গা খসা এ যে কত বড় কলঙ্কের চিহ্ন যে চোখে পড়ে! এর সংস্কারে অনেক খরচ—তাজের জন্যেই যখন তা জুটছে না তখন অন্য কোন কীর্ত্তির জন্যে তা জুটাও যে কত মুস্কিল তা সহজেই বোঝা যায়।
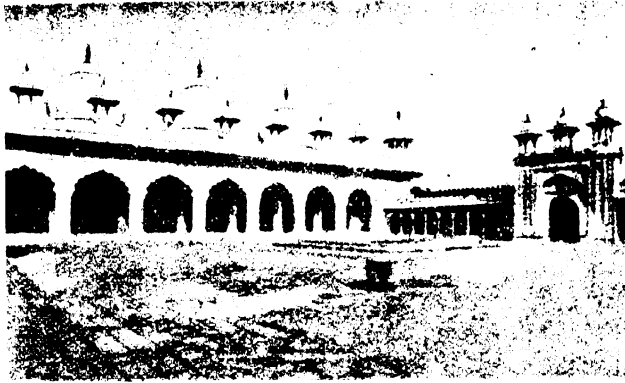
মোতি মসজিদ

মোগলের প্রাসাদ ও শ্মশান বিচরণ করে মনে হয় প্রাসাদই যেন চিত্তকে বেশী অভিভূত করে রেখেছে। এসব প্রাসাদ ইংরেজ জয় করবার আগে জাঠ ও রোহিলারা বার বার জয় করে। মসজিদের, প্রাসাদের মহার্ঘ কারুকার্য্যমণ্ডিত কক্ষগুলিতে তাদের সৈন্যেরা সব রান্না করে খেত—এতে অম্লান কারুকার্য্য ম্লান হয়েছে, কত স্থানে নষ্টও হয়েছে। রোহিলারা অবনত মোগল বাদশাকে অন্ধও করে দেয়। আর প্যানইশ্লামিক ভাই সব আবদালী, নাদীর শা প্রভৃতি যা করেছেন সে তো কহতব্যই নয়। মোগল যুগের শেষে ভারতে এমন একটা অন্তর্বিপ্লব আরম্ভ হয়েছিল যে, তখন একটা তৃতীয় শক্তি প্রাধান্য না নিলে ভারতের অতীত কীর্ত্তি আজ একটিও থাকতো কিনা সন্দেহ।

সিকান্দ্রা
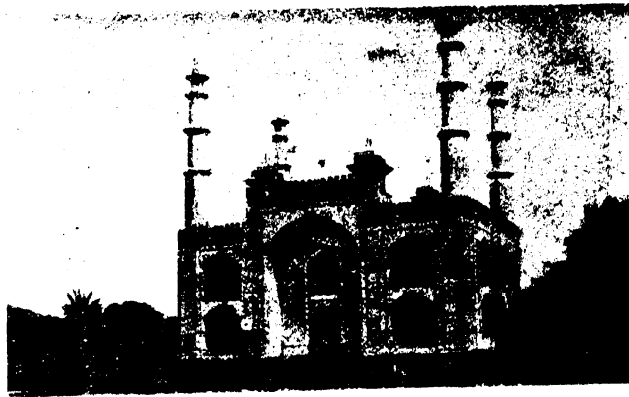
মোগলের প্রাসাদ ও শ্মশানের স্মৃতি যখন মনে আসে, তখন রাষ্ট্রীয় সমস্যা, হিন্দু মুসলমান সমস্যা, ভারতের উন্নতি অবনতি অনেক কথাই মনে পড়ে। মোগলের প্রাসাদে ও শ্মশানে যারা আমার মত ভ্রমণ করেছেন, তাদের মনেও একথা আমার মতই কখনো কখনো জাগে বোধ হয়।

আছে। ইনি নাচেন নৃত্যশাস্ত্রের বাঁধাধরা কোন বিধিনিয়মকে মেনে নয়—স্বতঃস্ফূর্ত্ত সৃষ্টির আনন্দে, প্রাণের উচ্ছ্বসিত আবেগে। এর স্বতঃ উৎসারিত সে নৃত্যের উচ্ছ্বল গতি সকলেরই মনে সাড়া জাগায়। সেদিন স্বর্গীয় সৌন্দর্য্যের কত রুদ্ধ দ্বার খুলে গিয়েছিল এই অমরকান্তি যুবকের নৃত্য সুষমায়। সেদিনের সে স্বর্গীয় সুষমার স্বপ্ন আজও আমাদের চোখ থেকে মুছে যায় নি।

ভারতের নানা স্থানে মনোক্ষুন্ন হয়ে কলিকাতার কলারসিক দর্শকদের কাছ হ'তে ইনি যে আন্তরিক সমাদর পেয়েছেন তার জন্য বিদায় কালে কলিকাতাবাসীকে ইনি আন্তরিক ধন্যবাদ জ্ঞাপন করেন। আরো বলেন যে উনিশ-শো বত্রিশ খৃষ্টাব্দে ইনি সদলবলে আবার এখানে আসবেন।

কিছুদিন হতে এক নূতন আদর্শ এঁর মনে জাগে। ভারতীয় নৃত্যের সঙ্গে প্রতীচ্যের অর্চেষ্ট্রা কেমন যেন বিসদৃশ লাগে—কোথায় যেন অসামঞ্জস্য রয়ে যায়, তাই ইনি চান ভারতীয় বাদ্যশিল্পী নিয়ে একটা অর্চেষ্ট্রা গড়ে তুলতে। তারই জন্য ইতিমধ্যে ছোট বড় দেড়শো রকমের বাদ্যযন্ত্র ইনি সংগ্রহ করেছেন এদেশ হতে। এই বাদ্যযন্ত্র শিক্ষা দেবার জন্য বারো জন শিক্ষিত বাঙালী যুবককে ইনি সঙ্গে নিয়েছেন। নিজে বাঙালী বলে বাঙালীদের উপর সহানুভূতি এঁর একটু বেশী।

ভারতে আসবার সময় প্যারীর প্যাথী কোম্পানী এঁকে একটি প্যাথী মেশিন উপহার দেন আর অনুরোধ করেন ভারতের বিভিন্ন সাংসারিক অবস্থা আর প্রাকৃতিক দৃশ্যের ছবি তুলে আনতে। তাদের এ অনুরোধ রক্ষা করতে ইনি ছবি তুলেছেন অনেক। এ বিষয়ে তাঁর আগ্রহ যথেষ্ট ভারতের আসল রূপ প্রতীচ্যের কাছে দেখাবার জন্য।

কলিকাতা থেকে ইনি যাত্রা করেন উত্তর ভারতের দিকে। কাশী, সেখান হতে অজন্তা তারপর বোম্বাই হয়ে ইনি গিয়েছেন প্যারীতে। এঁর এক খুড়তুতো বোনকে ইনি সঙ্গে নিয়েছেন নৃত্যে তাকে মনের মত করে তৈরী করবেন বলে—এই চতুর্দ্দশ বর্ষীয়া বালিকাটির নাম শ্রীমতি কনকলতা দেবী—দেখতে সুশ্রী, নৃত্যোপযোগী দেহ।

আমরা শুনেছিলাম এঁর নাচ ধরা হবে চলচ্ছবিতে এম্পায়ার থিয়েটারে এঁর নৃত্য প্রদর্শনীর দিন, কিন্তু মেঘ ও বৃষ্টির জন্য তা হতে পারে নি—এ বড় ক্ষোভের কথা। আমাদের দেশে ভাল ষ্টুডিও দুর্ল্লভ তাই এমন হোল।

উদয়শঙ্কর জানুয়ারী মাসের শেষ সপ্তাহ হতে প্যারীতে ভারতীয় নাচ দেখানো সুরু করে দিয়েছেন। গেল বারে য়ুরোপ ভ্রমণে গিয়ে ইনি ভারতীয় যন্ত্র-সঙ্গীতের অভাবে ভারতীয় নাচের রূপ ফোটাতে গিয়ে বিশেষ অসুবিধা ভোগ করেছিলেন—এবার তাঁর সে অসুবিধা আর নেই। কারণ এবার তাঁর সহযাত্রী তিমির বরণ ভট্টাচার্য্যের সহায়তায় যে নূতন ধরণের ভারতীয় অর্চেষ্ট্রার দলে গড়ে তুলেছেন সেই দলের নৈপুণ্য উদয়শঙ্করের নাচের সঙ্গে বিশেষ উপভোগ্য হয়েছে—এরই মধ্যে প্যারীর রসিক সমাজে এই ভারতীয় অর্চেষ্ট্রা সম্প্রদায় প্রচুর আনন্দ চাঞ্চল্যের সঞ্চার করতে পেরেছেন।

প্যারিতে কিছুদিন নাচ দেখিয়ে মার্চ্চমাসের মাঝামাঝি উদয়শঙ্কর ও তিমিরবরণ সদলবলে জেনেভা যাবেন। টিউনিক্, ভিনিস, ভিয়েনা, বুডাপেষ্ট, ষ্টাটগার্ট, হামবার্গ, বার্লিন লিপ্‌জিগ্, ন্যুরনবার্গ, ড্রেস্‌ডেন, আমষ্টার্ডাম, ব্রুসেল্‌স্—প্রভৃতি ইউরোপের বিভিন্ন সহরে নাচ দেখাতে যাবেন। এঁর জয়যাত্রার পথ পুষ্পাকীর্ণ হোক!

প্যারিতে এঁর রাধাকৃষ্ণের নাচের সবাক্ ছবি তোলা হয়েছে—ছবি শীঘ্রই এদেশে আসবে। প্যারিসিয়ানদের কাছে এজন্য আমাদের কৃতজ্ঞ হওয়া উচিত। এই রাধাকৃষ্ণের নাচের একটি বিশেষত্ব হচ্ছে যে এতে উদয়শঙ্কর সেজেছেন রাধা আর এঁর সহযোগী নর্ত্তকী 'সিমকি' কৃষ্ণ সেজে নৃত্য করেছেন।

এদেশ থেকে প্যারিতে যাবার কদিন পরেই পৃথিবী প্রসিদ্ধ পণ্ডিত 'সিল্‌ভা লেভি' এঁর নৃত্য দেখতে যান। তিনি প্রশংসায় পঞ্চমুখ হয়ে ওঠেন—এঁর সেদিনকার শিবনৃত্য দেখে আর তিমিরবরণের স্বরোদ শুনে। বিস্মৃত প্রায় অতীতের কোন একদিনের গৌরব স্মৃতি নর্ত্তক শ্রেষ্ঠ উদয়শঙ্কর ভারতের বুকে আবার জাগিয়ে তুলেছেন—পাশ্চাত্যকে ইনি জয় করেছেন ভারতের শ্রেষ্ঠত্বের দাবী জানিয়ে—ধন্য এঁর মনীষা।

নৃত্যকলা প্রাচীন ভারতের গৌরবময় যুগের একটি শ্রেষ্ঠ নিদর্শন। ভারত সুদীর্ঘকাল চর্চ্চার অভাবে এই অতুলনীয় শিল্পকে হারাতে বসেছিল, শ্রীযুক্ত উদয়শঙ্কর তাঁর ঐকান্তিক সাধনা আর অধ্যবসায়ের গুণে সেই মৃতপ্রায় কলাবিদ্যাকে পরিপূর্ণ গৌরবে পুনরুদ্দীপিত করেছেন। সমস্ত ভারত এজন্য এঁর কাছে ঋণী, বিশেষ করে বাংলা দেশ—সেই অক্ষয় সম্মান মুকুটের জন্য, যা ইনি স্বজাতীয় শিরে আজ পরিয়ে দিয়েছেন এর তপস্যার সুমহান সিদ্ধির দ্বারা, ভগবান এঁকে দীর্ঘজীবি করুন, এঁর যশোপথ পুষ্পাকীর্ণ হোক—এই আমাদের প্রার্থনা।

—

সেখ ইফ্‌তেখর্ রাসূল্ :—

মুলতানের একটি অতি সাধারণ পরিবারে রাসূলের জন্ম হয়। লাহোর হতে মুলতান সহরটি একশো ছয় মাইল দূর। লেখাপড়া শেখবার জন্য একে চলে আসতে হয় লাহোরে। লাহোর বিশ্ব-বিদ্যালয় হতে ম্যাট্রিক পাশ করে ইনি কলেজে প্রবিষ্ট হ'ন। কিন্তু কলেজে পড়া এঁর সুবিধা হোল না—ছায়াছবির প্রতি এঁর জন্মগত একটা ঔৎসুক্য ছিল প্রাণে, তাই দু-বছর পড়ে একে কলেজ ছেড়ে দিতে হোল। উনিশ-শো-তেইশ সালে ইনি বিলাতে গেলেন ছায়াছবি সম্বন্ধে জ্ঞান অর্জ্জন করতে।

বিলাতে পৌছেই বিভিন্ন চলচ্চিত্রের প্রযোজকদের কাছে ইনি ছবি পাঠাতে সুরু করে দিলেন, ছবির পিছনে নিজের পরিচয় দিয়ে লিখতেন—দীর্ঘাকৃতি, কৃষ্ণবর্ণ, সুঠাম সুপুষ্ট দেহ এবং প্রেমাভিনয়ে বিশেষ দক্ষ—যদিও এ সম্বন্ধে তখন এঁর কোন জ্ঞান ছিল না।

কিন্তু ছবি পাঠিয়েও কোন ফল হোল না। একখানা উত্তরও আসতো না। সব দেখে শুনে রাসূল হতাশ হয়ে পড়লেন।

ইনি ইংলণ্ড ত্যাগ করলেন ; কিছুদিন ফ্রান্সের উপকূলে অবস্থিত 'নাইস্' সহরে বাস করবেন এই উদ্দেশ্যে।

নাইসে এসে পৌছুবার কদিন পরেই বিখ্যাত প্রযোজক 'রেক্‌স্ ইন্‌গ্রামের' সঙ্গে এঁর দেখা হোল। ইন্‌গ্রাম তখন 'আল্লার উদ্যান' ছবিখানির প্রযোজনা করছিলেন তাতেই রাসূল একটি ছোট অংশ অভিনয় করবার জন্য নিযুক্ত হন, ক' পাউণ্ড মাইনেও পান কয়েকদিনের জন্য। পাশ্চাত্যের ছায়া জগতে অভিনয় করবার এই সুযোগে সাফল্য অর্জ্জন করবার জন্য ইনি ঐকান্তিক চেষ্টা করেন।

অভিনয় এঁর বেশ ভালই হোল, প্রশংসাও হোল খুব। একজন ফরাসী প্রযোজকের দৃষ্টি পড়লো তখন তাঁর উপর। তিনি তখন "নীল নদের সর্প" নামে একটি ছবির প্রযোজনার আয়োজন করছিলেন এবং কয়েকজন শিল্পীরও সন্ধানে ছিলেন। রাসূল এর সঙ্গে

প্যারীতে এলেন এবং এই ছবিখানিতে "শাহজাদা হাসানের" ভূমিকা অভিনয় করলেন বেশ সাফল্য গৌরবে।

এই সময়ে ইনি ভারতীয় নৃত্য সম্বন্ধেও কিছু কিছু চর্চ্চা করতে সুরু করেন। "নীলনদের সর্প" ছবিখানির তোলবার পর প্রযোজক মহাশয় একে অনুরোধ করেন প্যারীর রঙ্গমঞ্চে এর নৃত্য দেখবার জন্য, সাহস করে ইনি নেমে পড়লেন প্যারীর রঙ্গমঞ্চে—এঁর নৃত্য প্রশংসা অর্জ্জন করলো অতিরিক্ত ভাবে। তারপর একে একে বার্লিন, বুডাপেস্ত, ভিয়েনা এবং লণ্ডনের রঙ্গমঞ্চে ভারতীয় নৃত্য দেখিয়ে অসাধারণ সাফল্য অর্জ্জন করেন।

তখনো কিন্তু চলচ্চিত্রে একটি ভাল ভূমিকায় নামবার জন্য ইনি উৎসুক হয়েছিলেন। হঠাৎ সে সুযোগ ইনি—

পেলেন, আরবে।পন্যাসের একটি শ্রেষ্ঠাংশ এঁকে দেওয়া হোল অভিনয় করতে। এই ছবিখানি অভিনয় করবার পর অভিনেতা হিসাবে এঁর খ্যাতি চারিদিকে ছড়িয়ে পড়লো।

এই সময়ে হোলিউড থেকে এঁর ডাক এল। কিন্তু আমেরিকা ইনি গেলেন না য়ুরোপেরই বিভিন্ন চলচ্চিত্র কোম্পানী কর্তৃক ইনি কয়েকবার নিযুক্ত হলেন প্রাচ্য প্রথায় ছবিগুলির প্রযোজনা করবার জন্য। কয়েকটি ছবি প্রযোজনা করবার পর ইনি "প্রাচ্যের ভ্যালাণ্টিনো" এই আখ্যা পান—এর চেয়ে বড় সম্মান বোধ হয় প্রাচ্যে কোন অভিনেতার ভাগ্যে য়ুরোপে ঘটে না।

তারপর এল সবাক চিত্রের যুগ। মূকছবি তখন আর লোকের মনে কোন সাড়াই জাগাতে পারছে না দেখে ইনিও একখানি সবাক চিত্রের প্রযোজনা করবার চেষ্টা করতে লাগলেন। অনেকগুলো বই পড়বার পর "লালা রুক্" বইখানি এঁর বিশেষ পছন্দ হয়। সকল উদ্যোগ আয়োজন শেষ করে ইনি ছবিখানির প্রযোজনা দিবার জন্য এঁর দল নিয়ে কাশ্মীরে চলে এলেন—কেননা এই গল্পটি কাশ্মীরেরই। এই সবাক ছবিখানিতে পাশ্চাত্য বাদ্যযন্ত্র ব্যবহার না করে সেতার, জলতরঙ্গ, তবলা প্রভৃতি এদেশীয় বাদ্যযন্ত্র ইনি ব্যবহার করেন—একেবারে প্রাচ্যের আবহাওয়ার মধ্যে ইনি এই ছবিখানি তোলেন।

ছবিখানি তোলবার পর ইনি আবার য়ুরোপে ফিরে গেছেন। ছবিখানি সেদেশে দেখবার জন্য এঁর ইচ্ছা আছে। প্রাচ্যের ক'খানা সবাক চিত্রের প্রযোজনা করে পাশ্চাত্য দেশবাসীর চোখের সামনে মেলে ধরবেন প্রাচ্যের সব কিছু গৌরবের সঙ্গে।

বিলাত সম্বন্ধে ইনি বলেন—"ও দেশটা প্রাচ্যকে বোঝবার কোন চেষ্টা কখনো করে না—আমেরিকার মত ক্ষণপরিবর্ত্তনশীল মতামত নিয়েই এরা থাকে। বেশ উত্তেজক গোয়েন্দা কাহিনী কিম্বা ডাকাতির ছবি দেখতেই এদের আগ্রহ খুব বেশী—এমন কি এই ধরণের বইগুলোরও বাজারে কাটতি অত্যন্ত বেশী।"

নিজের সম্বন্ধে ইনি বলেন—বিলাতের এই রকম হাবভাব দেখে শুনেও প্রতিভাবান শিল্পীর একদিন আদর হবেই—এই বিশ্বাস নিয়েই আমি ছায়াছবিতে প্রবেশ করি।

রাস্থল এখন প্রাচ্যের একমাত্র প্রবাসী 'নক্ষত্র' এঁর অভিনয় নৈপুণ্য পাশ্চাত্যে এত সমাদৃত হয়েছে যে সকলেই এঁর সঙ্গে পরিচিত হবার জন্য বিশেষ উৎসুক—বড় বড় ডিউক, প্রিন্স পর্য্যন্ত। ভোজ সভায়, সমিতিতে, থিয়েটারে বায়োস্কোপে—যেখানে ইনি যান, সেখানেই অসম্ভব রকম জনতা জমে ওঠে এঁর সঙ্গে আলাপ করবার জন্য।

অবসর সময়ে ইনি পাশ্চাত্য-দর্শন অধ্যয়ন করতে ভালবাসেন। তা না হলে সিনারিও লেখেন ও প্রযোজনা সম্বন্ধে আলোচনা করেন অধিকাংশ সময়, এইসব বিষয়ে এঁর অভিজ্ঞতা পাশ্চাত্যের অনেক প্রযোজকের চেয়ে বেশী।

চিত্তবিনোদনের জন্য পিয়ানো বাজাতে ইনি ভালবাসেন—পিয়ানো বাজানোতে এঁর হাত ভারি সুমিষ্ট—যিনি একবার শুনেছেন তিনি আর ভুলতে পারবেন না।

প্রাচ্যকে যে সম্মানের মুকুট ইনি পরিয়ে দিয়েছেন—তারই এই কৃতিত্বের জন্য প্রাচ্য ধন্য। এর ভবিষ্যৎ উজ্জ্বল হোক এই আমাদের প্রার্থনা।

অদ্ভুত হত্যা

কুমারী বিজনপ্রভা দেবী গল্প

১

অনেক দিনের কথা। বি, এ পাশ করার পর আমি তখন সবেমাত্র সরকারী তদন্ত বিভাগে ঢুকেছি, তদন্ত কার্য্যে আমি তখন পর্য্যন্ত তেমন পারদর্শিতা লাভ করিতে পারি নাই, তবে নেহাৎ যে একেবারে ফেলান তাও নয়।…

সেদিন সাহেবের খাস কামরায় বসে আছি, সাহেব আমায় তাঁর জীবনের সব চেয়ে আশ্চর্য্য ঘটনাগুলো এক এক করে বলছিলেন, আর মাঝে মাঝে তদন্ত সম্বন্ধে আমায় উপদেশ দিচ্ছিলেন, আমিও মনোযোগের সঙ্গে তাঁর কথাগুলো শুনে যাচ্ছিলুম। তিনি বল্‌তে আরম্ভ করলেন :—

বুঝেছ বাবু, যখন আমি খুব পারদর্শিতা লাভ করলুম এই তদন্ত বিভাগে আমি তখনকার কথা বল্‌ছি, বয়স আমার তখন বিশ কি বাইশ। একদিন বসে বসে ভাবছি এমন সময় বড় সাহেব আমায় কোনে ডেকে বল্‌লেন, জন্ তোমায় একবার চীনা মুলুকে যেতে হবে, একটা খুনের তদন্ত করতে হবে, খুনটা খুবই অদ্ভুত। খুনের তদন্তে আমি খুব চট্‌পটে ছিলুম, কাযেই সাহেব আমাকেই মনোনীত করলেন।

আমিও তখন নূতন দেশ দেখবার আশায় কোন বিবেচনা না করেই সম্মতি দিলুম, কিন্তু তখন কি জানতুম বাবু, সে এই চীনা দেশটা কি এক রহস্যময় দেশ।…

এই চীনে লোক গুলো যেমন ধূর্ত্ত তেমনি কূট, আবার একধারে তেমনই সরল। এমনই একটা দৃঢ়তা এদের মধ্যে প্রকাশ পায় যে, যখনই এরা কোন কাজে হাত দেয় সেটা ভাল হ'ক মন্দ হ'ক, তা তারা প্রাণপনেই শেষ করে থাকে। সাহেব আমায় এই লোকগুলো সম্বন্ধে একটা বাহ্যিক রকমের মোটা-মুটি কিছু বুঝিয়ে দিয়েছিলেন। কিন্তু যখন ওদের সঙ্গে মিশে গেলুম তখন দেখলুম, ওদের ভেতর ও বাহির উভয়েই উভয়ের নিকট পৃথক্।…যে যে ঘটনাগুলো প্রধান ওপর ওপর আমি তোমায় সে গুলোই বলে যাচ্ছি, কেন না সব ঘটনা বলা সম্ভব নয়।…

বছর সাতেক পূর্ব্বে সাংহাইর কোন এক জনবহুল অংশে কোলুন নামে একজন চীনা এসে কিছু দিনের জন্য ছিল। চীনা রাজত্বের মধ্যে সাংহাইর নাম জানে না এমন লোক খুব কমই আছে। এখানে কোকো, তামাক, চাল প্রভৃতি দ্রব্যের আমদানি ও রপ্তানি খুব বহুল পরিমাণেই হয়ে থাকে। ঐ সময়ে চেংফু নামে একজন চীনা বণিক নগরের মধ্যে ঐশ্বর্য্যশালী নামে পরিচিত ছিল।

হুফ্ ষ্ট্রীটের এক দ্বিতল বাটীতে ছিল তার অফিস, সে নিজে তারই পার্শ্বে একটা বাড়ীতে বাস করত, অফিসের কাজ থেকে সে নিজেকে সর্ব্বদা পৃথক রাখতে চেষ্টা করত এবং সে নিজে সর্ব্বদা সঙ্কুচিত থাকৃত।

অত বড় কারবার থাকতেও সে কৃপণ স্বভাব ছিল, কিন্তু লোকে বল্‌ত যে লোকটার অগাধ টাকা, নানা রকম দুর্ল্লভ মাণিক্যের সে মালিক, সে সব জিনিষ সব সময়েই তার কাছে কাছে থাকে।…

যাহা হউক, অতগুলো দোষ থাকা সত্ত্বেও গুণের মধ্যে সে ছিল খুব বিনয়ী, নম্র স্বভাব ও শান্ত। এবং এই জন্যই সে যত কিছু অভিসন্ধি গোপনে পূর্ণ করত, চীনা পুলিশ তা বুঝ্‌তে পারত না।

যাক্ এবার আসল ঘটনা বলা যাক্। একদিন কোলুন এসে এই সাংহাইতে তার আস্তানা গাড়লে, শুনা যায় সে পাডাং থেকে এসেছিল, ডি রয়টার

এভিনিউতে সে এক খানা ছোট বাংলা ভাড়া নিলে, এই কোলুন একজন পাকা জহুরী ছিল। সাংহাইতে তার খুব বড় একটা দোকান খোলার ইচ্ছা ছিল এবং এই জন্যই সে রোজ হুক্ ষ্ট্রীটে যাতায়াত করত। হুক্ ষ্ট্রীটে একটা বড় রকমের ঘর তৈয়ার হতে লাগল, প্রত্যহ কোলুন এই দোকানে যেত, কোথায় কি করতে হ'বে তার পরামর্শ দিত, আর রাত্রে সহরের ধনীদের কাছে গিয়ে আড্ডা দিত, ক্রমে ক্রমে কোলুন এই ধনী চেংফুর সঙ্গেও বেশ আলাপ জমিয়ে ফেল্‌ল।...

তারপর থেকে সে রোজই চেংফুর অফিসে যেত, অবশ্য চেংফুর অফিসেরই একজন কেরাণীর কাছ থেকে আমরা এটা জান্‌তে পেরেছিলাম...।

যদিও চেংফু খুব ভাল ভাল দামী হীরা জহরত কিন্‌ত, ছোটখাট অল্প দামী হীরা-জহরত সে মোটেই পছন্দ করত না, কেননা তার বিশ্বাস ছিল ছোট খাট জিনিসে কোন লাভ নেই।...

কিন্তু কোলুন সেরূপ ছিল না, তাঁর মতলব ছিল অন্য রকমের। সে হুক্ ষ্ট্রীটে বেশ বড় রকমের দোকান খুল্‌বে, ছোট বড় সব রকমের জিনিস থাকবে, সহরের ছোট বড় ধনী গরীব সবার কাছ থেকে সে টাকা চায়, কোলুন ছিল ব্যবসায়ী, আর চেংফু যা কিন্‌ত তা নিজের জন্য।

ক্রমে ক্রমে কোলুন জান্‌তে পারল যে চেংফু সমস্ত মূল্যবান জহরতগুলো তার নিজের কাছেই রাখে, তখন সে এক ফন্দি করল, প্রায় প্রত্যহই সে চেংফুর কাছে গিয়ে নানারকমের জহরতের আলোচনা করত। একদিন কোলুন চেংফুকে তাঁর বাড়ীতে নিমন্ত্রণ করলে, এবং আরও বল্‌লে, বাড়ীতে আরও অনেক প্রকার জহরত আছে, যা সে গেলে তাকে দেখাবে।

চেংফুর না যাওয়ার কোন কারণ ছিল না, কাজেই সে যেতে সম্মত হল, এবং একদিন বিকেলে যাবে বলে স্বীকার করল।

কোলুন বার বার তাকে যেতে অনুরোধ করে, এবং যেন ঠিক বৈকালেই যায়, বার বার তাহা স্মরণ করাইয়া নমস্কার করে চলে গেল। চেংফু তার কথা রেখে ছিল।

২

পরদিন সন্ধ্যাবেলা সে ট্রামে এসে উঠল, সন্ধ্যার ধূসর ছায়া তখন মেদিনী আবৃত করছিল, সাংহাইয়ের পথে লোক চলাচল তখন ক্রমেই কমে আসছিল। স্থানে স্থানে দোকান পাট বন্ধ হয়ে গিয়েছে, যাদের দোকান পাট কেবল মাত্র রাত্রের জন্য তারা সবেমাত্র দোকান খুলতে আরম্ভ করেছে। ..

কিছুক্ষণ পরে চেংফু একেবারে কোলুনের বাটীর সামনে এসে নামল্। এই রয়টার এভিনিউর উপরিস্থিত বাড়ীগুলি পরস্পর পৃথক, এবং প্রত্যেক বাটীর ভিতরই নানারূপ ফুল ফল বৃক্ষে পরিপূর্ণ বাগান আছে, কিন্তু কোলুন যে বাংলোয় থাকৃত, তার ভিতরকার বাগানটী তত্ত্বাধবানাভাবে এক প্রকার জঙ্গলে পরিণত হয়েছিল, এবং যে কেহ নূতন এই স্থানে প্রবেশ করত সেই একবার ভয় পেত।

চেংফু আস্তে আস্তে বাগান পার হ'য়ে কোলুনের বাটীর ফটকের ভেতরে ঢুকল, কোলুনের একটী ভৃত্য ছিল, তার নাম ছিল ওয়াঙ্। এই লোকটা ছিল বেঁটে, স্থূলকায়, কদাকার ও বদ্‌রাগী—একটা জানোয়ার বিশেষ ছিল। ওয়াঙ্ যদি কখনও কারও উপর রাগত তাকে খুন না করে ছাড়ত না।...

ওয়াঙ্ এসে দরজা খুলে চেংফুকে ভিতরে নিয়ে গেল, চেংফু যে কোলুনের বাড়ীতে গিয়েছিল, তার প্রমাণ আমরা এই ওয়াঙের মুখে শুনেছিলুম।

৩

যেদিন আমি সাংহাই পৌছেছিলুম তারপর দিন আমি থানায় বসে বড় সাহেব মিঃ হ্যারিপিলের সঙ্গে বসে কথাবার্ত্তা বলছিলুম, তখন টেবিলের উপর টেলিফোন্‌টা ঝন্ ঝন্ করে বেজে উঠল। মিঃ হ্যারি টেলিফোন ধরলেন, কিছুক্ষণ কথাবার্ত্তার পর তাড়াতাড়ি মোটর তৈরি করতে আদেশ দিলেন। তারপর আমার দিকে চেয়ে বল্‌লেন—মিঃ জন্, যে ঘটনার জন্য তুমি তদন্তে এসেছ এ সেই ঘটনা, কিছুদিন পূর্ব্বে কোলুন নামে একটা চীনা জহুরী এই সাংহাইতে এসে বাস করতে থাকে, কয়েকদিন হ'ল সে কাহারও দ্বারা হত হয়েছে,

আমি এখুনি যাচ্ছি, ইচ্ছা করলে তুমি আমার সঙ্গে আসতে পার।"

যাহ'ক, অল্পক্ষণের মধ্যেই আমরা ঘটনাস্থলে উপস্থিত হলুম, গিয়ে দেখি, একজন পুলিশ ফটকে দাঁড়িয়ে পাহারা দিচ্ছে। একটু এগিয়ে গিয়ে দেখি আরও একজন পুলিশ, দেখে আমার মনটা একেবারে ক্ষেপে উঠল, কারণ আমার অভিজ্ঞতায় এটুকু বুঝেছিলুম যে, হত্যাকাণ্ড হ'বার পর যারা ঘটনাস্থলে উপস্থিত হয়, তারা শুধু হত্যাকারীকে পলায়নের সুযোগ দিয়ে থাকে।

রাগ করে আর কি করব, আমি চুপ করে হ্যারির সঙ্গে সঙ্গে চল্‌তে লাগলুম। সামনেই একখানা বড় ঘর, এই ঘর দিয়ে আমরা উভয়েই একটা বারেণ্ডায় এসে উপস্থিত হ'য়ে যা দেখলুম তাতে তিন হাত পেছিয়ে গেলুম।

দেখলুম, বারাণ্ডার উপর একটী মৃতদেহ, মাথাটা তার চূর্ণবিচূর্ণ, দেহ দেখে চিনবার কোনও উপায় নাই, ইহাই নাকি প্রসিদ্ধ চীনা জহুরী কোলুনের শবদেহ। কোলুনের ভৃত্য ওয়াঙ্ প্রভুর দেহ সনাক্ত করেছে। হত্যাসম্পর্কে ওয়াঙ্‌কেও গ্রেপ্তার করা হয়েছে, কিন্তু সে বলল যে সে ইহার কিছুই জানে না। তার প্রভু তাকে গতকল্য সাংহাই হতে দশ মাইল দূরবর্ত্তী পালীনগরে যেতে হুকুম করিয়াছেন, সেখানে কোলুন একটী বাংলো ভাড়া করেছেন প্রতি শনিবার সে এই বাংলোয় গিয়ে বাস করে, সেদিনও ওয়াঙ ঘরদোর পরিষ্কার করার জন্য গিয়েছিল···

ওয়াঙ যখন পালী যাত্রা করে তখন বণিক চেংফু তার প্রভুর নিকট আসে, সে তাহার প্রভু ও বণিক চেংফুকে একত্র রেখে চলে যায়, পরদিন সকাল বেলা ফিরে এসে দেখে তাহার প্রভু মৃত এবং যে সিন্দুকে তাহার বহুমূল্য জহরতাদি থাকত তা খোলা, তখনই সে ছুটে পুলিশে খবর দেয়।··

ওয়াঙ যে কথাগুলো বলল তা সম্পূর্ণ সত্য বলেই মনে হ'ল, অন্ততঃ যতক্ষণ না প্রকৃত ঘটনা প্রকাশ পায়, মিঃ হ্যারি তাকে তদন্ত শেষ হওয়া পর্য্যন্ত আটক রাখলেন। ওয়াঙও কোনরূপ আপত্তি করল না, শুধু সে অনুরোধ করল যে পালী গিয়া তার কথা সত্য কিনা তা দেখতে।···

যাহ'ক একজন পুলিশ তাকে নিয়ে গেল, আমরা তখন ঘরটী পরীক্ষা করতে লাগলুম, ঘটনাটী খুবই সোজা, সিন্দুক খোলা তাতে চাবি লাগানই ছিল, কোলুন কাকেও কিছু দেখাবার জন্য সিন্দুক খুলেছিল, মিঃ হ্যারি অস্ফুটস্বরে চীৎকার করে উঠলেন—"চেং ফু" খুনী?

আমরা উভয়ে তৎক্ষণাৎ হুফ্ ষ্ট্রীটে চেংফুর বাড়ীতে গেলুম, কিন্তু শুনলুম সে কাল থেকে এখনও ফিরে নাই, তার ভৃত্য এইমাত্র পুলিশে খবর দিয়েছে যে তার প্রভুকে পাওয়া যাচ্ছে না।

এখন বুঝতে পারছ বাবু যদি কোন লোক একজন জহুরীর কাছে যায়, তারপর উধাও হয়, এবং সেই জহুরীকে মৃত অবস্থায় পাওয়া যায় ও তার সিন্দুক খোলা থাকে। তাহলে কে খুনী। কাজেই মিঃ হ্যারি প্রথমেই এই কাজ করলেন—

তিনি তৎক্ষণাৎ চেংফুর নামে একখানা ওয়ারেণ্ট বার করে তার ফটো নগরের পথে ঘাটে টাঙিয়ে দিলেন, যদি কেও তাকে ধরে দিতে পারে। উপরন্তু তিনি একজন লোককে পালী পাঠিয়ে দিলেন, ওয়াঙ যা বলেছিল তার কতটা সত্য কি না তাই পরীক্ষা করতে, তারপর আমরা পরস্পর বিদায় নিলুম, মিঃ হ্যারি তাঁর মোটরে চলে গেলেন।

৪

নিজের ঘরে ফিরে এসে ঘটনাটা একবার ভাল করে আগাগোড়া ভেবে দেখলুম, তারপর ভাবলুম আচ্ছা, চেংফু একজন প্রসিদ্ধ ধনশালী বণিক, সে এই সাংহাইতে ছোটবেলা থেকে বাস করে আস্‌ছে, আর কোলুন সবেমাত্র সেদিন এসেছে, সহরের দু একজন ছাড়া আর কেউ কোনদিন জীবনে তাকে দেখেনি। অথচ এই কোলুন, চেংফুকে নিমন্ত্রণ করেছিল, আবার এই কোলুনই মৃত, ব্যাপারটা যত সহজ মনে হয়েছিল, এখন দেখলুম ততটা সহজ নয়।···

খানিকক্ষণ চিন্তা করার পর ভাবলুম, আচ্ছা মৃত দেহটার মস্তক ওরূপ চূর্ণবিচূর্ণ করেছিল কেন, ওটা চেং-

ফুর মৃতদেহ নয় তা শুনেছি চেংফু তাঁর সঙ্গে বহুমূল্য জহরতাদি সদাসর্ব্বদা রাখত. এমনও ত হ'তে পারে কোলুন তাকে নিজ বাড়ীতে নিমন্ত্রণ করে এনে হত্যা করেছে, মৃতদেহে কোলুনের পোষাক ছিল, ওয়াঙ্ প্রভুর দেহ বলে শনাক্ত করিয়াছে, কিন্তু একজন, একজনকে হত্যা করে পরিচ্ছদ বদল করতে পারে। ওয়াঙ হয়ত মিথ্যা বলিয়াছে।...

আমি তৎক্ষণাৎ, মিঃ হ্যারিকে আমার মন্তব্য ফোনে জানালাম, তারপর কোলুনের অনুসন্ধানের জন্য বিজ্ঞাপন দিতে বললাম, মিঃ হ্যারি বলিলেন—"উত্তম, তুমি যদি ভাল মনে কর তবে তাই হ'ক তবে বিশেষ ফল হবে না।" তার বিশ্বাস চেংফুই খুনী। আহত কোলুনের জন্যও বিজ্ঞাপন দেওয়া হল। তার কোন বিশেষত্ব ছিল না, ফলতঃ সে এই সাংহাইতে নূতন অনেক লোকেই তাকে চেনে না, তবে এইটুকু ঠিক যে কোলুন একজন চীনা ও প্রায় চেংফুর সমবয়সী।...

কিন্তু চেংফু সকলেরই পরিচিত, যাঁরা তার বিশেষ পরিচিত তারাও মৃতদেহ শনাক্ত করে গেল, ব্যাপারটা আরও একটু জটিল হল।...

আমি আমার বিশ্বস্ত ভৃত্য টম্‌কে ওয়াঙ্ ও কোলুনের বাড়ীর প্রতি দৃষ্টি রাখতে বলেছিলুম।

কয়েকদিন পরের কথা, একদিন ঘরে বসে চা খাচ্ছি, এমন সময় টম্ এসে যা বল্‌ল তাতে ব্যাপারটা আরও গভীর হ'য়ে উঠল। সে বল্‌ল, ওয়াঙ্ কোলুনের গৃহে মাত্র দশদিন কাজ করেছে। তার পূর্ব্বে মাপোঁ নামে একটা লোক তার কাছে কাজ করত, ওয়াঙ্ বলেছে সে যেদিন পালী যায় সেদিন সে এই মাপোঁকে একটা লোহার দাওা হাতে কোলুনের বাড়ীর দিকে আসতে দেখেছে।" টমের নিকট উক্ত ঘটনা শুনে তৎক্ষণাৎ মাপোঁকে নিয়ে আসিলাম, তাহাকে জিজ্ঞাসা করিলে সে বলতে লাগল, "তিন সপ্তাহ পূর্ব্বে যখন কোলুন প্রথম এই সাংহাইতে আসে তখন সে আমাকে তার জন্য রান্না-বান্না করতে রাখে, আমি আমার প্রাণপণ শক্তিতে এই কার্য্য করতুম, একদিন আমি একটা কাপ ভেঙ্গে ফেলায় আমায় খুব মার ধোর করে ও তাড়িয়ে দেয়, সেইদিন থেকে আমি আর কিছু জানিনে এবং তার হত্যা সম্বন্ধেও কিছু জানিনে, ওয়াঙকে আমি জীবনে কোনদিন দেখিনি বা কালকে আমি কোলুনের বাংলোর নিকটে ছিলুম না।"

টম্‌কে দিয়ে এই মাপোঁকে থানায় পাঠিয়ে দিলুম, তারপর টমকে কোলুনের বাড়ী যেতে বলে আমিও বেরিয়ে পড়লুম।

আমি যখন কোলুনের বাড়ী গেলুম তখন মধ্যাহ্ন—কয়েকজন পুলিশ বাড়ীখানা পাহারা দিচ্ছে।

পথে যেতে যেতে ভাবলুম, আচ্ছা যদি এই মাপোঁই খুন করে থাকে, কোলুন ও চেংফু যখন বসে গল্প করছিল তখন হয়ত এই মাপোঁ চুপি চুপি বাড়ীতে প্রবেশ করে, তারপর উভয়কে হত্যা করে, জহরতগুলো আত্মসাৎ করে, চেংফুর মৃতদেহ হয়ত কোন কূপে ফেলে দেয়। কিন্তু কোলুনকে সরাবার আর সুযোগ না ঘটায় পলায়ন করে, যাহ'ক বাড়ীর আশপাশ একবার খুঁজে দেখতে হ'বে, ইতিমধ্যে টম্ এসে উপস্থিত হ'ল।

আগে থেকেই আমার মন নিশ্চিন্ত হ'য়ে গিয়েছিল, যে চেংফু খুনী নয়, তার কারণ কেউ যদি কাউকে খুন করে ত সে হাত মুখধুয়ে আপন ঘরে ফিরে যায় যেন সে কিছুই জানেনা, কিন্তু এমন বোকা খুবই কমই আছে যারা খুন করেই পালিয়ে যায়, খুনের প্রমাণটা স্পষ্ট করে নিজের ঘাড়ে নিয়ে·

* * *

যাহ'ক মাপোঁর গল্পটা আমার অনেক কাজে এল, এখন বোঝা গেল যে চেংফ কিংবা কোলুন কেহই খুনী নয় এর মধ্যে এমন একজন আছে যে এই উভয়কে হত্যা করেছে যে এই বাংলো চিনে এবং কোথায় জহরত থাকত তা জানে, কিন্তু কে এই লোকটা ? মাপোঁ কি ?...

কিন্তু তার প্রমাণ কি, মৃতদেহ কার, চেংফুর না কোলুনের—ওয়াঙ্ ও মাপোঁর গল্পের কতটা সত্য এই সম্পূর্ণ ঘটনায় মাত্র একটা উপায় আছে, কিন্তু মাপোঁকে ত খুনী মনে হয় না, তাকে দেখলে সাধারণতঃ দয়ার উদ্রেক হয়, আর যদি সে প্রকৃত খুনী হ'ত তাহ'লে সে অতটা খোলা-খুলি থাকতে পারতনা, কাজেই মাপোঁর গল্পটায় বিশ্বাস না করে, আবার একেবারে ছেড়ে না দিয়ে মনের এক কোণে চাপা দিয়ে রাখলুম।

সেদিন সন্ধ্যে হ'য়ে যাওয়ায় কোলুনের বাড়ীর ভিতর বা বাগান অনুসন্ধান করা হ'ল না, কাজে কাজেই ফিরে আসতে হ'ল, টম্‌কে ওয়াঙের গল্পের সত্যতা আর পরদিন কোলুনের বাগান বাড়ী অনুসন্ধানের ভার দিয়ে বাড়ী ফিরে গেলাম, টম্‌ও আমাকে সান্ধ্য প্রণাম জানিয়ে একদিকে চলে গেল।

বাড়ী ফিরে আমি খাওয়া দাওয়া শেষ করে রাত্রি প্রায় এগারটার সময় শুতে গেলাম।······

৫

কাজ অনেক দূর গড়িয়ে গেল। রহস্য আরও গভীর হয়ে উঠল পরদিন মিঃ হ্যারির খাস কামরায় বসে খুন সম্বন্ধে আলোচনা করছি এমন সময় টমের প্রেরিত লোক পালী হইতে ফিরিয়া আসিল, সে বলিল- পালীতে কোলুনের একটা কুঁড়ে আছে সত্য এবং সে ঘটনার আগের দিন বিকেলে কোলুন ঘরটী পরিস্কার পরিচ্ছন্ন করতে গিয়েছিল তাও সত্য, সে রাত্রে সে পালীতেই ছিল এবং পরদিন সকালে সে পালী হইতে ফিরিয়া আসে।

মিঃ হ্যারি সত্য তা কি অস্বীকার কর্চ্ছি, কিন্তু সে নিজেও খুনী হতে পারে। মিঃ হ্যারী "কি রকম তোমার মাথা খারাপ হ'ল নাকি?" শুনলে জন্‌, ওয়াঙের কথা সত্য কিনা।'

জন—"না এখনও হয়নি, তবে হ'বার যোগাড়ে আছে, আচ্ছা হ্যারি, মনে কর ওয়াঙ্‌ বিকেলে চেংফু ও কোলুনকে হত্যা করে তারপর পালী যায়।······

সঙ্গে সঙ্গে টেলিফোন বাজিয়া উঠিল; রিসিভার কানে দিয়া বুঝিলাম টম্‌ কথা কহিতেছে, সে কহিল— "মিঃ জন, আমি সকাল বেলা কোলুনের বাড়ী অনুসন্ধান করিতে আসি, সেখানে কিছু না পাইয়া বাগানের দিকে যাই, সেখানে একটা অব্যবহার্য্য কূপের মধ্যে কেহ কিছু পূর্ব্বে কোন কাজ করিয়াছে বলিয়া মনে হয়, আপনি কি দয়া করিয়া একবার আসিবেন।"

আমরা তৎক্ষণাৎ সেখানে গেলাম, গিয়ে দেখলাম টম যাহা বলিয়াছে তাহা ঠিক। তৎক্ষণাৎ আগাছাগুলি সাফ্‌ করিয়া ফেলা হইল, একটী দড়ী ধরিয়া এক জন লোক নীচে নামিয়া গেল। কূপের ভিতর এক ফোঁটাও জল ছিল না। লোকটী একটা কাপড়ের পুটলী লইয়া উপরে উঠিয়া আসিল, পুটলিটী খুলিয়া তার ভিতরে কতগুলি কাপড় ও রক্তমাখা একটা লোহার ডাণ্ডা পাওয়া গেল, ইতিমধ্যে হ্যারির মটর গিয়া চেংফুর ভৃত্যকে লইয়া আসিল, সে কাপড়গুলি দেখিয়া সনাক্ত করিল যে ইহাই তাহার প্রভুর পোষাক। আর লোহার রড্‌টী গভীরভাবে আপনার কার্য্যের পরিচয় দিতে লাগিল।

হ্যারি বলিল, "ব্যাপার অতি সোজা, যদি চেংফুকে হত্যাকরা হইয়াছে তবে নিকটেই কোথাও তাহার মৃতদেহ পাওয়া যাইবে, কিন্তু তন্ন তন্ন করিয়া সমস্ত খুঁজিয়াও তাহার কোন সন্ধান পাওয়া গেল না। তখন হ্যারি বলিল—"ওহে জন ঠিক হইয়াছে, চেংফু, কোলুনকে হত্যা করিয়া নিজের কাপড়চোপর এই স্থানে ফেলিয়া ছদ্মবেশে বাহির হইয়া গেছে।"

কিছুক্ষণ চুপ করিয়া থাকিয়া আমি বলিলাম, "মিঃ হ্যারি আপনার কথা হয় ত সত্য, কিন্তু এই লোহার রড্‌ সম্বন্ধে আপনার মত কি? ওয়াঙ্‌ বলিয়াছে সে এই মাপোকে এই রড্‌ হাতে বাংলোর কাছে ঘুরিয়া বেড়াইতে দেখিয়াছে, আবার এই লোহার রড্‌ দ্বারাই হত্যা করা হইয়াছে, এই রক্ত তার প্রমাণ, আশ্চর্য্য নয় কি? মাপো লোহার রড্‌ হাতে বাংলোর দিকে আসিতেছে আর চেংফু সেই সময়ই কোলুনকে হত্যা করিয়াছে, তাও আবার একই যন্ত্রের সাহায্যে।······

তারপর আরও শুনুন, চেং নিশ্চয়ই ঐ বাগান জানত না। এবং দুর্গম স্থানে একটা জল শূন্য কূপ আছে তাও জানত না, উপরন্তু সে লোহার রড্‌ কোথা পেল, সে কি ইহা নিজ হইতে সঙ্গে করিয়া লইয়া গিয়াছিল, আপনি বলিতে চান যে চেংফুর মত একজন প্রসিদ্ধ বণিক একজন জহরীর সঙ্গে দেখা করতে ওরূপভাবে সশস্ত্র হইয়া গিয়াছিল।···না, শুধু এই বোঝা যায় ওয়াঙের কথা হয় সত্য নয় মিথ্যা; যদি তার কথা সত্য হয় তবে মাপো হত্যাকারী বা খুনীর সহকারী, আর মাপো সমস্তই জানত, এবং সে এই লোহার রড্‌ হাতেই আশে পাশে ছিল।

অন্যদিকে যদি ওয়াঙের কথা মিথ্যা হয় তবে, সে নিজেই দূষী।

"বেশ তোমার কথাই মেনে নিলুম, মনে কর তোমার কথাই ঠিক তাহ'লে তুমি বলতে চাও সে খুনী নয়, যতক্ষণ না এই মাপো বা ওয়াঙ্ কাওকে দোষী প্রমাণ না হয়, চেং খালি নিমন্ত্রিত হয়েছিল, সে ইহার কিছুই জানে না, কিন্তু এই চেংফু কোথায়? সে যদি মৃত তবে তার দেহ কোথায়, আর সে যদি খুনই না করবে তবে কেন সে পলায়িত?...

"তার উত্তরও আমি তোমায় বলছি হ্যারি, যে মৃত দেহ আমরা কোলুনের বলে জানি, মনে কর এই মৃত দেহই চেংফুর; কেবল মাত্র কোলুনের পোষাক পরিহিত ছিল, ওয়াঙ্ নিশ্চয়ই মিথ্যা কথা কহিয়াছে, নয় সে, প্রভুর দেহ সনাক্ত করিতে ভুল করিয়াছে, আমার বিশ্বাস এইই চেংফুর দেহ; কোলুন নিশ্চয়ই জীবিত, হয় সে হত্যাকারী, নয় সে এই ওয়াঙ্ ও মাপোর সঙ্গে জড়িত; এই লোহার ডাণ্ডা সম্বন্ধে উভয়েই জানে।...

উপরন্তু এই মাপোও কিছুই জানে না, ঘটনাবলী প্রকাশ কচ্ছে যে কোলুন ও ওয়াঙই হত্যাকারী। মনে কর কোলুন ও ওয়াঙ্ উভয়ে চেংকে হত্যা করিয়াছে, তারপর পোষাক বদল করিয়া, মৃতদেহের মস্তক এমনভাবে চূর্ণ করিয়াছে যে তাহা চেনা না যায়, তারপর ওয়াঙ্ পালী চলিয়া গিয়াছে, আর কোলুন ভগবান জানে কোথায়?"

ওয়াঙ্এর কার্য্য ছিল পালী যাওয়া, ফিরে এসে প্রভুর দেহ সনাক্ত করা তারপর খুন মাপো ও চে'ফুর ঘাড়ে ফেলিয়া পলায়ন করা, কোলুন এখন মস্ত বড় লোক হইয়াছে, আমরাত তাকে চিনিনা, মাত্র জানি সে অল্প দিন হইল সাংহাইতে আসিয়াছে।

হঠাৎ আমার মাথায় একটা খেয়াল চাপল, আমি বললাম—"মিঃ হ্যারি, আমরা খুব মস্ত বড় ভুল করেছি, আমরা পদচিহ্ন অস্ত্র অথবা এই জহরত যা এই হত্যার কারণ, কিছুইত অনুসন্ধান করিনি।

যদিও আমাদের অক্লান্ত পরিশ্রমে আমরা জহরতগুলো এক রকম চোখের সামনেই দেখ্‌তে পাচ্ছি, কিন্তু যদি এক টুক্‌রাও এই বাড়ীতে অথবা বাগানে পাওয়া যেত তবে আমাদের কাজে লাগত।"

মনে মনে আমি ভাবতে লাগ্‌লুম, "মনে কর এই বাংলোয় অথবা বাগানে কোথাও নেই, তাহ'লে কোথায় যদি বাংলোয় না থাকে তবে নিশ্চয়ই কোলুনের অথবা ওয়াঙ্এর কাছে, অথবা এমন কোন স্থানে লুকান আছে যা এই কোলুন বা ওয়াঙ্ উভয়ে জানে।...

কিন্তু এমন কেউ বোকা নেই যে এগুলো কোন স্থানে লুকিয়ে রাখ্‌বে জেনে শুনে যে সে স্থান উদ্ধার করা আবার কত কষ্ট হ'বে।

যাক্, হত্যার পর কোলুন কোথায় কি ভাবে আছে তা জানিনা, কিন্তু ওয়াঙ সে কোথায়, তাকে ত ছেড়ে দেওয়া হয়েছিল, আমরা জানি সে পালী গিয়েছিল, ফিরে ত এসেছে, পুলিশ তার কাছে সন্দেহের মত এমন কিছু পায়নি। কিন্তু এখন ওয়াঙ্ কোথায়?

"কিহে ব্যাপার কি চুপ করে রইলে যে?"

ব্যাপার কিছু না, আমি তোমার মটর নিয়ে পালি যাচ্ছি, কিছু মনে কর না।" বলিয়া দ্রুত বেগে বাহির হইয়া গেলাম।

* * * *

ঘণ্টাখানেকের মধ্যে আমি একজন পুলিশ লইয়া পালী উপস্থিত হইলাম। মাত্র দশ মাইল পথ, কিন্তু রাস্তা বড়ই খারাপ, কাজেই বিলম্ব হইতে লাগিল।

আমরা সন্ধ্যার শেষে গিয়ে পৌছুলুম, দেখলুম, সব চীনা জেলে তাদের নৌকোগুলো টেনে ডাঙ্গায় তুলে আপনাপন কুটীরে প্রবেশ কচ্ছে।

একজন লোক আমাকে কোলনের কুটীরে নিয়ে গেল, যা অন্যান্য সব ঘর থেকে অনেক দূরে অবস্থিত।

বাড়ীর ভিতর ঢুকে ঘর পরীক্ষা করতে লাগলুম, কিছুনা, মাত্র দুখানা ঘর পুলিশের লোক দেখে আর কেও আপত্তি করলেনা, আমি তন্ন তন্ন করে সব খুঁজে দেখলুম, দেওয়াল ছবি, চেয়ার টেবিল, মায় জমি পর্য্যন্ত খুঁজে দেখলুম, কিন্তু কিছুই পাওয়া গেল না, মনটা খুবই দমে গেল, এতটা পথ তবে আসা বৃথায় গেল।

যাক্ তারপর বাইরে বেড়িয়ে এলুম, চাঁদের আলো পূর্ণ মাত্রায়ই ছিল, আমি আস্তে আস্তে বালি খুড়িতে

ধুড়িতে দেওয়াল ঘেষিয়া চলিলাম, পেছনের দরজায় যখন গেছি তখন দেখলুম বালির উপর কিছু নীচে একটী সিল্কের ব্যাগ, মনে হ'ল যেন কিছু ভরা।

ব্যাগ খুলে দেখলুম, আটটী মাণিক, চারটী ডায়মণ্ড, দুইটী রুবি, ও বাকী দুটী বিড়ালের চক্ষু, সবগুলিই খুব বড় ও দামী, অবশ্য পরে দাম জানা গিয়েছিল প্রায় ১০ লক্ষ টাকা।···

ঐ ব্যাগটীর গলায় একটি কাগজে চীনা অক্ষরে লেখা আছে, "চেংফু," ব্যাগটীর মুখ চারটী লাল ও হলদে সূতায় বাঁধা।

আনন্দে আমি তখন পাগল হ'বার উপক্রম হলুম, মনে মনে বললুম কোলুন, তুমি খুব চালাক; কিন্তু তোমার থেকেও একজন চালাক আছে, যার নাম, জন্ ষ্টুয়ার্ট, যে সুদূর ইউরোপ থেকে তোমাদের দেশে এসেচে তোমাদেরই মত চালাক লোকদের ঘোল খাওয়াতে···সে প্রথম থেকেই সব বুঝতে পেরেছিল। কে খুনী, কোলুন, এখন দেখবে সে আরও কত চালাক, এতদিন সে কেবল সুযোগের অপেক্ষায় ছিল। কোলুন এইবার তোমার জীবন মরণ সমস্যা!

৭

পরদিনই আমি সাংহাইতে ফিরে এলুম।

তারপর দিন আমি হ্যারির কাছে গেলুম, ঘটনাটা শুনে সে খুবই খুসি হ'ল। তারপর জিজ্ঞাসা করলে, কি কার্য্য তাকে পালীতে নিয়ে গেল। আমি তখন তাকে সব ঘটনা বেশ করে বুঝিয়ে দিলুম। তারপর তাকে বললুম, প্রথম থেকে এই ওয়াঙ্ আমাদের সন্দেহের চক্ষে ছিল, এমন দেখছি এই ওয়াঙ্ই কর্ত্তা। সে সবই জানে। আচ্ছা ভেবে নেও, কোলুন, হত্যা করে ওয়াঙের হাতে ঐ জহরতগুলো দিয়ে বললে, পালী যাও এবং এগুলো লুকিয়ে রেখে এসে পুলিশ ডেকে বলবে এই মৃত দেহ আমার। তুমি কি মনে কর তখন কোলুন এটা ভাবে নি সে এই জহরতগুলো ওয়াঙের হাতে ছেড়ে দিয়ে হয়ত সে তা নিয়ে আমাদের কদলী প্রদর্শন করতে পারে।···

অন্যদিকে কিন্তু সবই মিথ্যে, ঘটনাটা এই যে ওয়াঙ্ পালী গিয়ে এগুলো লুকিয়ে রেখে, ফিরে এসে নিজেকে একজন বলে প্রচার কল্লে যেন সে কিছুই জানে না।

কিন্তু হ্যারি বল্‌তে পার, ওয়াঙ্ কে, আর কোলুনটা কে। বা কোথায়?"

হ্যারি বল'ল—"বোধ হয় এই ওয়াঙ্ ও কোলনকে হত্যা করিয়াছে কাজেই তাহাকে পাওয়া যাইতেছে না।"

এক চোট হাসিয়া লইয়া আমি বলিলাম, "মিঃ হ্যারি, এতদিন পুলিশে কাজ করে দেখছি তোমার বুদ্ধিশুদ্ধি মোটেই হয়নি, আচ্ছা চল গারদ ঘরে তোমায় দেখাচ্ছি কোলুন কোথায়।" আমরা তখন সবাই মিলে থানায় গেলুম, চেংফুর চাকর, মা পো, চেংফুর কেরাণী সকলকেই তখন থানায় নিয়ে গেলুম, কেননা এরাই কোলুনকে চাক্ষুষ চেনে।

অল্পক্ষণ পরেই ওয়াঙ্‌কে দুই জন পুলিশ সমভি-ব্যাহারে আমাদের সামনে আনা হইল। আমি প্রায় এক ঘণ্টা ওয়াঙ্‌কে দেখলুম। তারপর তাকে জিজ্ঞাসা করলুম, সে জানে কিনা, কোলুন কোথায়, তখনও সে বলল যে কোলুন মৃত ও ঐ দেহই তাঁর প্রভুর।

আমি তখন তাহার কাছে গিয়ে তার দাঁত দুপাটী বাহির করিয়া লইলাম। সঙ্গে সঙ্গে সকলে চীৎকার করিয়া উঠিল "কি আশ্চর্য্য কোলুন!"

বুঝলে বাবু চীনারা কত চালাক, ভগবানের সৃষ্টি হ'তেও তারা কাল্পনিক সৃষ্টিতে ওস্তাদ। তারা যদি কোন কুকর্ম না করে মাত্র ভোল বদ্‌লে থাকে ত দুনিয়ায় কেও তাকে সন্দেহ করেনা বা কেও তাকে জীবনের শেষ দিন পর্য্যন্ত চিন্‌তে পাবে না।···

* * * *

যা হ'ক পরে সে সবই স্বীকার করলে। এখন শোন বাবু কেমন করে কোলন এমন কাজ করলে, আর কোলুনের ভোল বদলে গেল, এই কোলুন একজন প্রসিদ্ধ ডাকাত। হংকংএ একে চেনে না এমন লোক নেই। এর কাজ হচ্ছে, ধনী লোকদের সঙ্গে জহুরী সেজে আলাপ করা, তারপর সুযোগ বুঝে বুকে ছুরি বসিয়ে চম্পট দেওয়া। এমনি সে জীবনে অনেক করেছে, কিন্তু ধরা পড়ে সে জীবনে এই প্রথম।

সেখানেও সে সাংহাইতে এসে বাংলো ভাড়া করে, একটী চাকর রাখে, তাকে চেন নাম মাপো। এর সঙ্গে একটা অন্তঃসার শূন্য বড় বাক্স থাকত যাতে তাকে খুব বড় জহুরী বলে ভ্রম হ'ত। খুনের কিছুদিন পূর্ব্বে সে মাপোঁ কে জবাব দেয়, তারপর যখন চাকরের দরকার হয় তখন নিজেই নিজের কাজে লেগে যায়, তখন তার নাম হল ওয়াঙ্।

সে আগে নিশ্চিত জেনে নিয়েছিল যে চেংফু সর্ব্বদাই জহরত নিয়ে চলাফেরা করে, সুযোগ বুঝে সে চেংকে নিজবাটীতে নিমন্ত্রণ করে তারপর হত্যা করে ঐ জহরতের জন্য, এবং সে পায়ও ঐ পূর্ব্বোক্ত জহরতগুলিই তার প্রমাণ। চেংফুকে হত্যা করার পর কোলন পোষাক বদল করে, চেংএর পোষাক কূপে ফেলে দেয়, তারপর ওয়াঙ্ সেজে পাল্কী গিয়ে জহরতগুলো লুকিয়ে এসে পুলিশ ডাকে। নিজে সাধু সেজে মাপোঁর ঘাড়ে সমস্ত দোষ দেয়। দেখ লোকটা কি ধূর্ত্ত।...

যদি আমি ঘটনাটা না দেখে চুপ করে থাকতুম, তাহলে এই নির্দ্দোষী মাপোঁর যাবজ্জীবনের জন্য শ্রীঘর বাস হ'ত।

৮

যথাসময়ে বিচারে কোলনের ফাঁসী হয়ে গেল, ফাঁসি পূর্ব্বক্ষণে সে আমায় উদ্দেশ করে বলেছিল—"শুন টিকটি তুমি সুদূর দেশ থেকে এসে আমার সাথে বাদ সেধেছ আমি চল্লুম, কিন্তু তুমি আমার হাত থেকে রক্ষা পাবে না আমি পৃথিবীর এক প্রান্ত হতে অপর প্রান্ত পর্য্য তোমার অনুসরণ কর্ব্ব। তারপর সবশেষ।...

বাবু, সেই থেকে আমি এই পঁচিশ বৎসর তা অপেক্ষায় আছি। কত দেশ, কত গ্রাম, কত নগ ঘুরে বেড়িয়েছি কিন্তু এই লোকটার কোনও সন্ধা পেলুম না, জানি সে মরে গেছে, কিন্তু তার আত্মা যে আমায় প্রতিশোধ নেবে বলেছিল; আমি অশরীরি আত্মা খুবই বিশ্বাস করি।...

যাক্ বাবু, তুমি এই লাইনে নূতন ঢুকেছ। অনেক কিছু দেখেছ, আরও কত কি দেখবে, হয়ত এমন কত বি দেখবে। দেখে আমার কথা তোমার মনে হবে।

যখনই কোন কাজ কর্ব্বে ভাল করে আগে ভেবে তবে কর। ভগবান তোমার মঙ্গল করবেন।

রাত্রি অধিক হওয়ায় আমি বিদায় লইয়া বাড়ী চলিয়া গেলাম।...

* The taies of the Amayat N : 6 হইতে অনুবাদিত।

'অচিন দোসর"

শ্রীরাসবিহারী মল্লিক।

কি যেন পেয়েছি, কি যেন হারাই,
মনে-মনে আমি হাসি-কাঁদি তাই,
ভাবি কারে নিতি, সে কোন্ অতিথি—,
এই আসে আর এই যে নাই।
মনে মনে আমি হাসি-কাঁদি তাই॥

* * *

করুণ সুরেতে বাঁশী কার বাজে—
তরুণ-অরুণ স্বপনের মাঝে,
ঘুম-ঘুম-ঘুম নয়ন-কুসুম,—
ফুটে মুদে যায়, দিশা না পাই।
মনে-মনে আমি হাসি-কাঁদি তাই॥

* * *

আঁধারে আঁধারে কে আসে কে যায়
উষার চুমায় কোথায় লুকায়,
খুঁজি সব ঠাঁই খুঁজিয়া না পাই,
প্রাণে প্রাণে তবু তারেই চাই।
মনে-মনে আমি হাসি-কাঁদি তাই॥